তাফসীরে তাবারী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ
(দ্বিতীয় খণ্ড)
তাফসীরে তাবারী প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ
আষাঢ় ঃ ১৩৯৮
যিলহাজ্জ ঃ ১৪১১
জুন ঃ ১৯৯১
ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৯৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৮৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN ঃ 984-06-0025-7

প্রকাশক ঃ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

মুদ্রণে ঃ
পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ,
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০

বাঁধাইকার ঃ
মেসার্স আল আমীন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা
ঢাকা—১১০০

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ রফিকুল ইসলাম

মূল্য ঃ ৪৮০

TAFSIRE TABARI SHARIF (2nd Part) (Commentary on the Holy Quran) written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, Translated under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and Edited by the same Board and published by Translation and Compilation section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram Dhaka,

June, 1991

মহাপরিচালকের কথা

তফসীরে তাবারী জগদ্বিখ্যাত তফসীর। মূল গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষায় রচিত এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের বিখ্যাত আলিম ও মুফাস্‌সির মাসিক আল-বালাগ সম্পাদক হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেবকে সভাপতি করে দেশের কয়েকজন আলিম ও বিদ্বজ্জন নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। আমরা উক্ত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত বর্তমান খণ্ডখানি প্রকাশ করতে পারায় খুবই আনন্দিত। আমরা আশা করি এবং একে সব খণ্ডগুলোর বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। আমি এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যাঁদের আছে, তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাই।

তফসীরে তাবারী শরীফ আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির এক বিশেষ অবদান। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানি প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামীন!!

মোঃ মনসুরুল হক খান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

কুরআন মজীদ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কালাম। ওয়াহীর মাধ্যমে এই কালাম আল্লাহর রাসূল প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ক্রমান্বয়ে নাযিল হয়। ওয়াহী বাহক ফেরেশতা ছিলেন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এ সৎপথের দিশারী। কুরআন মজীদের সূরা জাসিয়ার ২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: এ মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী কওমের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তফসীর গ্রন্থ মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসেবে গণ্য করা হয় তফসীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্রগ্রন্থ। এই তফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবু জা'ফর মুহম্মদ ইবন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম: ৮৩৯ খৃস্টাব্দ/২২৫ হিজরী, মৃত্যু: ৯২৩ খৃস্টাব্দ/৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় যতো তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তফসীর, যা পরবর্তী মুফাসসিরগণের নিকট তফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তফসীরখানা তফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম আল্-জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমলোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীর-খানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারোশ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহান দরবারে জাপন করছি অগণিত শোকর।

আমরা ক্রমান্বয়ে তফসীরে তাবারী শরীফের প্রতি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ। বর্তমান খণ্ডখানির বাংলা তরজমায় অংশ গ্রহণ করেছেন মওলানা আবু বকর রফিক আহমদ, মওলানা শফিকুল্লাহ, মওলানা আ, ন, ম, রুহুল আমীন, মওলানা আবদুল জলিল ও মওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম। আমরা তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে মেহেরবাণী করে তা আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রব্বাল 'আলামীন!!
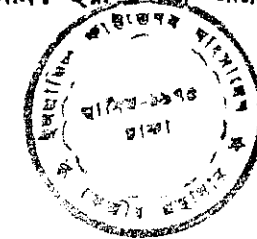
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সম্পাদনা পরিষদের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বিশ্ব মানবের হিদায়াতের জন্য রহমাতুল্লিল 'আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে কুরআনে করীম ফুরকানে হামীদ নাযিল করেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্ব মানবকে সত্য-সুন্দর পথের দিশা দেয় এবং সার্বিক কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দুনিয়ার যেখানে যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুখের আলোকচ্ছটায় সে সব এলাকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁর পরম করুণার নিদর্শন স্বরূপ কুরআনুল করীম নাযিল করেছেন। সেজন্য তাঁর মহান দরবারে লক্ষ কোটি সিজদায়ে শোকরানা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম, যিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দ্বারা এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন এবং কুরআনী যিন্দেগীর নমুনা স্থাপন করেছেন।

কুরআন মজীদ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কালাম। এর ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ সব তাঁরই নিজস্ব। কুরআন মজীদ ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল 'আলায়হিস সালামের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজ্‌তবা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিল হয়। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরেই রয়েছে। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেন। সাহাবা কিরামের আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈনের যুগ পাড়ি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্‌সির বা ভাষ্যকার, টীকাকার তাঁদের সারা জীবনের সাধনায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

www.eelm.weebly.com

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরআন মজীদের ভাষাকে আপন করে এবং মাতৃভাষায় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও ভাষ্য প্রণয়নের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। বিস্তারিত ও মৌলিক তফসীর প্রনয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এই অধম জাতির সামনে বাংলা ভাষায় তফসীরে নূরুল কুরআন নামে একখানা মৌলিক প্রামাণ্য ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তফসীরে নূরুল কুরআন ইনশাআল্লাহ ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকখানা খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ' বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পূর্ণ তাফসীর প্রকাশে সক্ষম হন্নি। অবশ্য উর্দু ভাষায় রচিত কিছু তফসীরের বাংলা অনুবাদ হয়েছে। তার সংখ্যা খুবই কম।

'তফসীরে তাবারী' ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশাল তফসীর। এটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবী ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম হযরত ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। এতে তিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রম ধরনের নির্ভরযোগ্য তফসীর। এই তফসীর গ্রন্থখানা তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রণীত হয়েছিলো। এর পূর্ণ নাম আল জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন। এই তফসীর "তফসীরে ইমাম তাবারী" নামে সমধিক পরিচিত।

এর বাংলায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। যাঁরা অনুবাদের কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরাও এক বিশাল কাজ করেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি এ কাজ সহজ সাধ্য নয়।

অনুবাদ কর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব। তাঁরা দায়িত্ব সচেতন থেকে নিয়মিত কর্মরত আছেন। কাজটি দুরূহ। বাস্তবক্ষেত্রে না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জ্ঞানী-গুণী সবার নিকট আমরা দো'আপ্রার্থী।

আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লা শানুহুর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতী উদ্যোগকে কবুল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা করেন। আরো দো'আ করি, বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জান্নাতের অমিয় ধারা লাভ করতে পারেন।

আমীন! সুম্মা আমীন !!

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লিাহি আলায়হির সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী রহমতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩৮/৮৩৯ খৃস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ঘেরা তাবারিস্তানের আমুল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জারীর, দাদার নাম ইয়াযীদ। পরদাদার নাম কাছীর, তিনি গালিবের ছেলে। তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়সূচক তাবারী শব্দটি তার নামের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনুল করীম মুখস্থ করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত করতে থাকেন। প্রথমত রায় এবং তার নিকটস্থ শহরসমূহে সফর করেন। তারপর হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়নের জন্য বাগদাদ শরীফ গমন করেন। তিনি বাগদাদে পৌঁছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইন্তিকাল হয়। অবশেষে তিনি বসরা ও কূফাতে কিছুকাল অবস্থানের পর আবার বাগদাদ শরীফে ফিরে আসেন। বাগদাদ শরীফে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি মিসরে চলে যান। মিসরের পথে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মিসরে অবস্থানকালেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পুনরায় বাগদাদ শরীফে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ শরীফ থেকে জন্মভূমি তাবারিস্তানে তিনি দুইবার মাত্র স্বল্পকালীন সফরে গিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাগদাদ শরীফে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ভূতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মক্কা মুয়ায্‌যমাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরে মিসর সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন স্থানের খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা। কুরআন মজীদের তফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে জীবনে বহু দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাঁকে অর্ধাহারে-অনাহারে কাটাতে হয়েছে। এক সময় পরপর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর নিজের জামার হাতা বিক্রি করেও জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করতে হয়েছে।

প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আর্থিক

দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারো নিকট থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য, এমনকি সরকারী উচ্চ পদ-মর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর সৃজনশীল এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্রন্থসমূহে। কিরআত (পাঠ পদ্ধতি), তফসীর ফিকাহ্ ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছরকাল তিনি শাফিঈ মযহাবের অনুসরণ করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা থেকে "জারিরিয়া মযহাব" নামে একটি মযহাব বিকশিত হয়। তাঁর পিতার নামে এই মযহাবের নামকরণ হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফেঈ মযহাবের সাথে এ মযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই জারিরিয়া মযহাবের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হানাফী মযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেত্তা। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে যাঁরা মানবেতিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবারী (র)। যুগের প্রভাব সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাস্তব-জ্ঞান এবং যুগ-প্রবাহে জীবনধারার ক্রমগতিকে বিবর্তনের ধারায় অনুভব করার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়েই তিনি তাঁর অমর কীর্তি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত কুরআন মজীদের তফসীর এবং পনেরো খণ্ডে প্রকাশিত মানব জাতির ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মানবেতিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম রেখেছেন "জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" (جامع البيان فى تفسير القران) এবং ইতিহাস গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আখ্বারুর রুসুল ওয়াল মুলুক" (اخبار الرسل والملوك)। তিনি তাঁর মযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তফসীর আর ইতিহাস প্রণয়নেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও সুদূর-প্রসারী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের লেখক ও পণ্ডিতগণের মাঝে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মননশীলতা, একাগ্রতা, বাকসমৃদ্ধি, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী অনন্যসাধারণ, বিস্ময়কর ও প্রশংসার দাবীদার। এ সবের বিচারে তিনি সবার শীর্ষে। তাঁর তফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মূলত তিনি ইতিহাস রচনা করেছিলেন একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত হন এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাত্র পনেরো খণ্ডে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা যায়, হযরত ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনা কতো বিস্তৃত ও বিশদ ছিলো এবং তাঁর জ্ঞানের বিশালতা কতো প্রসারিত ছিলো। আরবী ভাষায় তাঁর আগে কেউ এতো বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেননি। তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে

কালানুক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ত্ব উদ্ধার ও সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষ হাতের তুলনা মেলে না। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসরণে বিখ্যাত ঐতিহাসিক, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ (র.) (ওফাত ১০৩০ খৃঃ) ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (র.) (জীবনকাল ১১৬০ খৃ -১২৩৪ খৃ.) ও যাহাবী (র.) (জীবনকাল ১২৭৪-১৩৪৮ খৃ.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আল-কামিল ফিত্-তারীখ" (চূড়ান্ত ইতিবৃত্ত) রচনায় ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন।

তফসীর ও ইতিহাস উভয় গ্রন্থ রচনায় ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাদীসের ইসনাদের (বরাত বা সূত্রের) খেয়াল রেখেছেন। ইবন ইসহাক (র.) (ওফাত ১৫১ হিজরী), কালবী (র.), ওয়াকিদী (র.), (ওফাত ৩১০ হিজরী) ইবন সায়াদ (র.), ইবন মুকাফফা (র.) প্রমুখের গ্রন্থসমূহ থেকে তিনি বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা দেশ সফর করে তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল-মসলা, তথ্য ও উপাদান যোগাড় করেছেন। কুরআন মজীদের সুবিশাল তফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ্ব জগতের শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩৩১ হিজরী সনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে তাঁর সুবিশাল তফসীর ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'তারীখুর রিজাল' নামে তিনি মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনেতিহাস এবং 'তাহযীবুল আছার' নামে হাদীছের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় মুসলিম জাহানে তাঁর তফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী তফসীরকারগণ তাঁর তফসীর থেকেই বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতানুসারেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর সুবিশাল তফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট। পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ আজো তাঁর গ্রন্থাদি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

১৯৮৮ খৃস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তফসীরে তবারীর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষীগণের ন্যায় বাংলা ভাষাভাষীগণও এই জগদ্বিখ্যাত তফসীরের বাংলা তরজমার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির সেই চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যেই দেশের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞ উলামা কিরামের দ্বারা তার তরজমা ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রায় ১১শ' বছর আগে ৩১০ হিজরী মুতাবিক ৯২৩ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র আমলে মুসলিম জাহানের এ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদ শরীফে ইন্তিকাল করেন।

ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মানব জাতির ইতিহাস জানা এক বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন।" আবুল লাইছ ইব্ন জুরায়জ

রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফিকাহ শাস্ত্রের মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যেমন—ইল্‌মে কিরআত, তফসীর, হাদীছ, ফিকাহ ও ইতিহাস।"

ইবন খাল্লিকান (র.), শায়খ আবু ইসহাক শীরাজী (র.), ইবন সুবুকী (র.), হাফিয আহমদ ইবন আলী সুলায়মানী (র.), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.), ইমাম নববী (র.), ইবন তাইমিয়াহ (র.), আবু হামিদ আলফারায়েদী (র.), মুকাতিল (র.), কালবী (র.), ইবন খুযাইমা (র.) প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে ইমাম আবু জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইল্‌মে তফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীছ উধৃত করেছেন। তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফু হাদীছই তাঁর নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমতকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন্ শব্দ কোন্ সময় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তফসীরে দুইটি বিষয় প্রাধান্য দিয়েছেন। (১) প্রামাণ্য হাদীছের উধৃতি ও (২) পাঠরীতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতামত।

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবা কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন। বিশেষত হযরত ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাবেঈগণের মতামতও উধৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা (ওফাত ২০৯ হি./৮২৪ খৃ.) রহমাতুল্লাহি আলায়হি শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রণীত তফসীর 'মাজাজুল্-কুরআন' অতি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ। কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত 'আল্-ফার্‌রাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রসিদ্ধ তাফসীর 'মাআনিউল-কুরআন' প্রণয়ন করেন।

তৃতীয় যে বিষয় ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তফসীরে সন্নিবেশিত করেছেন, তা হলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন পাঠ-পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিনি 'কিতাবুল্-কিরয়াত' নামে আলাদা ভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি 'তফসীর' ও 'কিরআত'কে দুইটি আলাদা বিষয়রূপে গণ্য করেছেন।

তিনি সংগৃহীত সকল হাদীছই অবিকল বর্ণনা করেছেন। তাতে পরবর্তীকালে এসব হাদীছের বরাত দিতে কোন তফসীরকার ও ব্যাখ্যাকারের কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরা ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ, ইমাম আবু হামিদ আল ফারায়েদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সে যুগে বাগদাদ শরীফ ছিলো ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বাগদাদ শরীফের মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হতো। সারা বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসু মানুষ এখানে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসতেন। তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেক

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন ইমামের যুগ থেকেই তফসীর চর্চা শুরু হয়। ইমাম তাবারী খুলাফায়ে রাশিদীন ও হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে উধৃতি দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এ ব্যাপারে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সে সুবাদে তিনি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ পান। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইল্‌মের তরক্কীর জন্য এবং কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের জন্য দু'আ করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩/১৫ বছরের কিশোর ছিলেন। যে সব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তাঁর জানা ছিলো না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবা কিরামের নিকট থেকে জেনে নেবার জন্য তাঁদের খিদমতে হাযির হতেন। তাঁকে হিবরুল উম্মত' (উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বাহরুল-উলুম' (বিদ্যাসাগর বা জ্ঞানের সমুদ্র)-ও বলা হয়। তিনি কুরআন মজীদ, তাঁর তফসীর ও সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করেন। জাহিলী যুগের ইতিহাস বিষয়েও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহান আল্লাহর পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 'সীরাত' (জীবন চরিত) ও ইল্‌মে ফিকাহ্-তে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমনকি জাহিলী যুগের কাব্য সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিকাহ বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। সবাই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন।

হযরত ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ (সূত্র পরম্পরা) তাঁর ছাত্র ও সঙ্গীগণ কর্তৃক বহু কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। তিনি তাঁর তফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সে কালের কবিদের কবিতার উধৃতি দিতেন, যা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এ সব কবিতার উধৃতি ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির তফসীরের এক বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকেও তিনি তাঁর তফসীরে উধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলকামাহ ইবন কায়স (র.), হযরত কাতাদাহ (র.) হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত ইবরাহীম নখঈ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর কুফাতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে তা'লীম গ্রহণ করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা মুকাররমায়, হযরত ইবন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু কুফাতে এবং হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনা মুনাওয়ারায় তফসীর শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) (ওফাত ৪৫ হিজরী), হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) ওফাত ৯১ হিজরী, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.), (ওফাত ৪২ হিজরী), হযরত আবু হুরায়রা (রা.) (ওফাত ৪৮ হিজরী)

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকেও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কুরআন মজীদের কোন্ আয়াত কোন্ সময়ে কোন ঘটনা বা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তা তিনি সাহাবা কিরামের বর্ণনানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাকের (র.) সংকলন থেকেও তিনি উধৃতি দিয়েছেন।

আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাদীসসমূহের উধৃতির ক্ষেত্রে সনদের শেষ রাবী (বর্ণনাকারী)-এর নাম বর্ণনা করেছি। অধিক আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে তফসীরে তাবারীর মূল কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছি।

তফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে প্রকাশ করার কাজে আমাদের সুযোগ মেলায় আমরা মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে শোকরগুযারী করছি। পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত আলিম-উলামা, সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আমাদের বিশেষ দু'আ রইলো। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হবার এবং সেই অনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দিন। আমীন!

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সভাপতি
তফসীরে তাবারী সম্পাদনা পরিষদ

সূরা বাকারা

(অবশিষ্ট অংশ)

(৫৩) وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

(৫৩) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।

হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আয়াতাংশ و اذ اتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم تهتدون (আর আমি যখন মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, فرقان অর্থ "সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধায়ক"। হযরত মুজাহিদ (র) হতে আয়াতাংশ و اذ اتينا موسى الكتاب و الفرقان এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, উক্ত আয়াতে উল্লিখিত الكتاب এবং الفرقان অভিন্ন বস্তু তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত মুজাহিদের সূত্রে হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, و اذ اتينا موسى الكتاب و الفرقان তে উল্লিখিত الكتاب এবং الفرقان অভিন্ন বস্তু। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধায়ক। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন যে, الفرقان শব্দটি সম্মিলিতভাবে তাওরাত, ইনজীল, যাবুর ও ফুরকান—এ চারটি কিতাবকেই বুঝায়। হযরত ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশ و اذ اتينا موسى الكتاب و الفرقان এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী يوم الفرقان يوم التقى الجمعان এ যে الفرقان এর উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ বদরের দিবস, যেদিন আল্লাহ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছিলেন। আর তা ছিল এমন এক ফায়সালা যার দ্বারা হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে দান করেছেন فرقان যদ্দ্বারা আল্লাহ পাক তাদের সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ

তাঁকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন ও শত্রুদের কবলমুক্ত করেছিলেন। এবং হযরত মূসা (আ)-কে বিজয় দান করে বাতিলপন্থীদেরকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ্ যে ভাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের উপর এ বিজয় দানের মাধ্যমে পার্থক্য বিধান করেছিলেন তদ্রূপ হযরত মূসা (আ) এবং ফির'আউনের মধ্যেও এ বিজয় দানের মাধ্যমে পার্থক্য বিধান করেছিলেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত উভয় উক্তির মধ্যে এই ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যা হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র) ও হযরত মুজাহিদ (র) কর্তৃক বর্ণিত। অর্থাৎ الفرقان যা আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-কে দান করার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে এমন এক কিতাব, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ গুণটি তাওরাতেরই একটি বিশেষণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এইঃ ঐ ঘটনাকে স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে তাওরাত দান করেছিলাম, যা আমি লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম এবং যার দ্বারা আমি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছিলাম, তখন الكتاب শব্দটি তাওরাতের বিশেষণ হবে, যা নাকি তাওরাতের স্থলে উল্লিখিত হয়েছে, যেন এই শব্দের ব্যবহারে তাওরাতের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়। অতঃপর الفرقان শব্দটিকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, কেননা এটিও তাওরাতের বিশেষণ। এ কিতাবের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি الكتاب এর অর্থ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এবং এ প্রসঙ্গে আরো বলেছি যে, مكتوب—كتاب এর অর্থেই ব্যবহৃত অর্থাৎ লিপিবদ্ধ বস্তু। আমার এ ব্যাখ্যা প্রদানের কারণ ছিল এই, এখানে আয়াতের এ অর্থই অধিকতর প্রযোজ্য, যদিও অন্য অর্থেরও অবকাশ রয়েছে, কারণ ইতিপূর্বে الكتاب এর উল্লেখ হয়েছে এবং الفرقان এর অর্থও যে পার্থক্য বিধায়ক, তাও উল্লিখিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে পূর্বে আমি যুক্তি সহকারে এ আলোচনার অবতারণা করেছি। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী আলোচনার পরে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন মনে করি না। আয়াতাংশ لعلكم تهتدون হলো لعلكم تشكرون এর ন্যায়। لتهتدوا এর অর্থ হলো যেন তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। যেন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি মূসাকে ঐ তাওরাত দান করেছিলাম—যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বিধান করে, যেন তোমরা এর দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা এতে সত্যের অনুসরণ করতে পার। কেননা, আমি একে ঐ সমস্ত লোকদের নিমিত্ত হিদায়াতের বস্তু করেছি, যারা এতে হিদায়াতের সন্ধান লাভ করে এবং এর আহকাম-সমূহ মেনে চলে।

(৫৪) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(৫৪) যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট তা-ই উত্তম। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

অর্থাৎ তোমরা ঐ ঘটনাকেও স্মরণ কর, যখন হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেনঃ ওহে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। আর তাদের আত্মার প্রতি তাদের অত্যাচার করার অর্থ হচ্ছে এই, তাদের দ্বারা তাদের আত্মা এমন এক গর্হিত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে যা মোটেই উচিত ছিল না, যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ্র আযাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে যে কেউ এহেন কোন ঘৃণিত কাজ করবে, যদ্দরুন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় জালিম বা অত্যাচারী। কেননা সে নিজের হাতেই আল্লাহর শাস্তিকে নিজের উপর অবশ্যম্ভাবী করে নিয়েছে। আর যে কর্মের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলগণ নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তা হচ্ছে তাদের ধর্ম-ত্যাগ সম্পর্কিত আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ, যা তাদের নিকট থেকে হযরত মূসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে গমন করার পরবর্তী সময়ে গরুর বাছুর পূজার ফলশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে তাদের পাপকার্য থেকে বিরত হয়ে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয়ে ফিরে যাবার আহবান জানিয়েছিলেন। আর আহবান জানিয়েছিলেন তাদের তওবার পন্থা স্বরূপ আল্লাহ্ তাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা শিরোধার্য করে নিতে। মূসা (আ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যে পাপকার্য করেছে তার তওবা হলো নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করা। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তওবার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করে তাঁর সন্তুষ্টির পথে ফিরে আসা। অতঃপর ঐ লোকদেরকে মূসা (আ) তওবার যে পন্থা নির্দেশ করেছিলেন তারা তা মেনে নিল। এ প্রসঙ্গে আবূ 'আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত فاقتلوا انفسكم এর অর্থ—তোমরা একে অপরের গলার দিকে উদ্ধত হয়ে পরস্পরের উপর আঘাত হান।

সাঈদ ইবন জুবাইর ও মুজাহিদ উভয়েই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা পরস্পরের গলদেশে আঘাত করার জন্য উদ্ধত হলো এবং একে অপরকে এমনি ভাবে হত্যা করতে লাগল যে, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করত না। অবশেষে মূসা (আ) নিজের কাপড় পতাকার মতো উত্তোলন করে কাটাকাটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, তখন প্রত্যেকে আপন আপন অস্ত্র বারণ করল। তখন দেখা গেল যে, মোট সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছে। আল্লাহ পাক মূসা (আ)-কে যখন ওহীর মারফত জানালেন ঃ এখন বেশ হয়েছে, এবার তোমরা কাটাকাটি বন্ধ করতে পার, তখন মূসা (আ) কাপড় দ্বারা ইশারা করলেন।

ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে বলেছিলেন যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট তওবা কর, তথা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা কর, এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম পন্থা। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন। তিনিই তো তওবা কবুলকারী—দয়াময়। বর্ণনাকারী বলেনঃ মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ তথা নিজেদেরকে আপন হাতে হত্যা করার কথা বললে পর যারা

বাছুর পূজায় লিপ্ত ছিল, তারা আত্মগোপন করে ঘরে বসে রইল আর যারা বাছুর পূজার কাজে লিপ্ত ছিল, তারাই নিজেদেরকে আপন হাতে কতল করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন একটি অন্ধকার তাদেরকে রাতের মতো আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। এ অন্ধকারে তারা একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল, অতঃপর অন্ধকার কেটে গেলে দেখা গেল যে, মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজারে পরিণত হয়েছে। ওদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর যারা বেঁচে যায় উভয়ের তওবা কবুল হয়েছিল। সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মূসা (আ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে এসে বললেনঃ পবিত্র কুরআনের ভাষায় ...... قال يقوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ... ... ولم ترقب قولى (সূরা তাহা—২০, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৪ পর্যন্ত) যার অর্থ হলো এই যে, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের প্রতি কি তোমাদের প্রতিপালক উত্তম প্রতিশ্রুতি দান করেননি? আয়াতের এ অংশ হতে নিয়ে মূসা কর্তৃক হারূনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হারূনের এই বলে উত্তর দান যে, "আমি ভয় করছি পাছে তুমি এই বলে আমার প্রতি রাগ করবে যে, কেন তুমি আমার অপেক্ষা না করে বনী ইসরাঈলকে দ্বিধা বিভক্ত করলে? তখন মূসা (আ) হারূন (আ)-কে রেহাই দিলেন এবং সামিরীর দিকে উদ্যত হলেন আর পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত অংশের কথা তাকে বললেনঃ

ما خطبك يا سامرى ... ... ثم لننسفنه فى اليم نسفا ○

অর্থাৎ মূসা বলল। হে সামিরী, তোমার ব্যাপার কি? সে বলল, আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখেনি। এরপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্যে এরূপ কাজকে শোভনীয় করেছিল। মূসা বলল, দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি বলবে আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল। তোমার বেলায় যা ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার ইলাহর প্রতি লক্ষ্য কর, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেব, অতঃপর তাকে অবশ্যই বিক্ষিপ্তভাবে সাগরে নিক্ষেপ করব। (সূরা তাহা—২০/৯৫--৯৭)

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর তিনি ঐ বাছুরের গলা কেটে দিলেন, তারপর হাতুড়ি দিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কথিত আছে যে, সে সময়ে যত নদনদী ছিল সবগুলোতে ঐ চূর্ণ গিয়ে পৌঁছেছিল। অতঃপর তাদেরকে বললেন, তোমরা এ নদী হতে পানি পান কর। লোকেরা সেখান থেকে পানি পান করলে যাদের অন্তরে ঐ বাছুরের ভক্তি-শ্রদ্ধা গ্রথিত ছিল, তাদের কাছে ঐ পানির সাথে মিশ্রিত স্বর্ণচূর্ণ পরিলক্ষিত হয়েছিল, অতএব এটাই واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم এর ব্যাখ্যা। মূসা (আ) তূর পাহাড় হতে ফিরে আসার পর যখন বনী ইসরাঈলের হাতেই ঐ বাছুর পূজার অবসান ঘটল আর তারা বুঝতে পারল যে, আসলে ঐ বাছুরকে পূজা করে তারা ভুলই করেছিল, তখন অনুশোচনার সাথে বলতে লাগল, আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতাম। তখন আল্লাহ তাদেরকে ঐ অবস্থার সম্মুখীন করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল করবেন না বলে ঘোষণা দিলেন—যে ব্যবস্থা

বনী ইসরাঈলগণ বাছুর উপাসকদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। অতঃপর মূসা (আ) তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা বাছুর পূজা করে নিজেদের উপর জুলুম করেছ। এখন তোমাদের তওবা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করবে। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাদেরকে দু' সারিতে দাঁড় করানো হয়েছিল। এক সারিতে দাঁড় করানো হয়েছিল ওদেরকে, যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়নি আর অন্য সারিতে তাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছিল, যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল এবং উভয় দলকে তরবারি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। এ কাটাকাটিতে যারা মারা গিয়েছিল, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হত্যাকর্মে বহু লোক মারা পড়েছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে যে, তাদের সত্তর হাজার লোক এ গণহত্যায় মারা পড়েছিল। অবশেষে মূসা (আ) ও হারূন (আ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'আ করলেনঃ হে আমার প্রভু! বনী ইসরাঈল তো একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল, যারা এখনও জীবিত আছে, তাদেরকে জীবিত রাখুন। এবার মহান আল্লাহ্ আদেশ করলেন, অস্ত্র সংবরণ কর; আর তাদের তওবাও কবুল করলেন।

বস্তুত এ যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছিল আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেছিলেন এবং যারা জীবিত ছিল তাদের তওবাও কবুল করলেন। এটাই আল্লাহ্র ঘোষণা فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم এর মর্মার্থ।

হযরত মুহাম্মাদ ইবন 'আমর আল-বাহিলী হযরত মুজাহিদ (র) সূত্রে মহান আল্লাহ্র বাণী "তোমরা গরুর বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ"-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মহান আল্লাহ্র আদেশ সংক্রান্ত ঘোষণা তথা তাদের পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার বিধান জারী করলেন। অতঃপর যখন পিতা ছেলেকে এবং ছেলে পিতাকে হত্যা করছিল, তখন মহান আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন।

হযরত আল-মুছান্না (র) হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র)-এর সনদে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ তারা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে এক সারির লোকেরা অন্য সারির লোকদেরকে হত্যা করেছিল। এতে মৃতের সংখ্যা যতজন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছিলেন ততজনে পৌঁছেছিল। অতঃপর তাদেরকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, হত্যাকারী ও নিহত উভয়ের পাপই মাফ করা হলো। হযরত ইবন শিহাব (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ যখন বনী ইসরাঈলকে নিজেদের হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা একটি নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলো, আর তাদের সঙ্গে ছিলেন হযরত মূসা (আ)। অতঃপর যখন তারা তরবারির সাহায্যে পরস্পরের উপর আঘাত করেছিল এবং বর্শা দ্বারা একে অন্যের গলদেশে আঘাত হানে, তখন হযরত মূসা (আ) হাত উপরে উত্তোলন করে রেখেছিলেন। যখন তিনি শান্ত হলেন, তখন কিছু লোক তাঁর কাছে আসল এবং এ বলে আরযী পেশ করলঃ হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন এবং হযরত মূসা (আ)-এর দু'বাহু ধরে টানতে লাগল। তাদের এ অবস্থা অপরিবর্তিত রইল। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন, পরে তারা কাটাকাটি থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে সংবরণ করার অনুমতি পেল। তাদের মধ্যে যে একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, এজন্য হযরত মূসা (আ) এবং বনী ইসরাঈলের লোকেরা চিন্তিত হলে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-কে ওহীর মারফত জানিয়ে দিলেন যে, চিন্তার কোনই কারণ নেই। কেননা, যারা এ কাটাকাটিতে মারা পড়েছে,

তারা আমার দৃষ্টিতে জীবিত। তাদেরকে রীতিমত রিযিক দান করা হয়ে থাকে। আর যারা
পৃথিবীতে রয়ে গেছে, আমি তাদের তওবা কবুল করলাম। এ সুসংবাদে হযরত মূসা (আ) এবং
বনী ইসরাঈলের লোকেরা আনন্দিত হলেন। ইমাম যুহরী ও হযরত কাতাদা (র) কর্তৃক
আয়াতাংশ فاقتلوا انفسكم এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের
লোকেরা দুই সারিতে দাঁড়িয়েছিল এবং একে অন্যকে তরবারির আঘাত হানতে লাগল, অবশেষে
তাদের বলা হলো ঃ ব্যস, এবার তোমরা কাটাকাটি বন্ধ কর। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ এ
ঘটনায় যারা মারা গিয়েছিল, তারা শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা জীবিত ছিল, তাদের
তওবা কবুল করা হয়েছে। হযরত আতা (র) বলেন ঃ আমি 'উবাইদ ইবন 'উমায়র (র)-কে
বলতে শুনেছি যে, তারা একে অন্যের সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিল এবং পরস্পরে আঘাত হেনে-
ছিল, এমনকি কেউ তার ভ্রাতা কিংবা পিতা কিংবা ছেলের বিষয়েও কোন তোয়াক্কা করেনি। অব-
শেষে তাদের প্রতি তওবার সুসংবাদ এলো। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এ ঘটনায়
মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০ হাজার। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যা বন্ধের আদেশ দিলেন
এবং তাদের তওবা কবুল করলেন। হযরত ইবন জুরায়জ (র) বলেন ঃ এরা দুই সারিতে
দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর আঘাত হানতে লাগল। অবশেষে তাদের মধ্যে যারা মারা পড়েছিল, তাদেরকে
আল্লাহ্ শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন এবং যারা জীবিত ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন।
তাদের পরস্পরে কাটাকাটির এ আদেশ দানের কারণ ছিল এই যে, তাদের কিছু লোক জানত যে,
বাছুর পূজা একটি গোমরাহীর কাজ বটে, কিন্তু তাদেরকে একাজ হতে নিষেধ করতে গেলে
রক্তপাত ঘটবে এ ভয়ে তারা পূজারীদেরকে নিষেধ করেনি। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক তাদের
প্রতি পরস্পরকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইবন ইসহাক (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, হযরত
মূসা (আ) যখন প্রতিশ্রুতি পালনের পর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে এলেন এবং
বাছুরকে আগুনে ভস্ম করে তা নীলনদে নিক্ষেপ করলেন, তখন মহান আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের
সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে মহান আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ করতে গেলেন, তখন একটি
বিকট গর্জন তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। অতঃপর তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হলে হযরত মূসা
(আ) বনী ইসরাঈলের জন্য তওবার আবেদন করলেন (বাছুর পূজার পাপ হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে)।
তখন আল্লাহ্ পাক উত্তর দিলেন যে, পরস্পরে কতল ব্যতীত তাদেরকে অন্য কোন ভাবেই ক্ষমা করা
হবে না। বর্ণনাকারী (ইবন ইসহাক) বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তখন
হযরত মূসা (আ)-কে জবাব দিল—"আমরা আল্লাহ্র আদেশ ধৈর্য সহকারে মান্য করব।" তখন
যারা বাছুর পূজায় শরীক ছিল না, তাদেরকে হযরত মূসা (আ) আদেশ করলেন যারা বাছুর
পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে কতল করতে। তখন এরা নিজ নিজ বাড়ির বারান্দায় বসে
থাকত আর গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে মুক্ত তরবারি নিয়ে আঘাত হানার জন্য ঝাঁপিয়ে
পড়ত। অবশেষে হযরত মূসা (আ) কেঁদে দিলেন এবং গোত্রের মহিলারা ও শিশুরা পর্যন্ত তাঁর
নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিলাপ করতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদের পাপ ক্ষমা
করে দিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-কে অস্ত্র সংবরণ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইবন
যায়দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড় হতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের
নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন সত্তরজন লোক পেলেন যারা হযরত হারূন (আ)-এর সাথে
বাছুর পূজা হতে বিরত ছিল। তাদেরকে হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ চল, তোমাদেরকে মহান

আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সময় পালন করার জন্য যেতে হবে। তখন তারা আরয করল ঃ হে মূসা! আমা-
দের জন্য তওবার কোন উপায় আছে কি? তখন হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তোমাদের
নিজ হাতে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে হবে। এটাই আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য উত্তম
ব্যবস্থারূপে বিবেচিত। অতঃপর তারা উন্মুক্ত তরবারি, ছুরি, দা ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলে
তাদেরকে এক প্রকার ঘন কুয়াশা এসে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তারা
একে অপরকে হাতে স্পর্শ করে পরস্পরকে কতলের উদ্দেশ্যে আঘাত হানত। বর্ণনাকারী বলেন
যে, কোন ব্যক্তি তার পিতা এবং ভাইকে নাগালের মধ্যে পেলেও সে বুঝতে পারত না ইনি পিতা
বা ভাই আর তাকে কতল করে দিত। আল্লাহ্ তাঁর ঐ বান্দাহর প্রতি সদয় হন, যিনি ধৈর্য
ধারণ করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে তার সন্তুষ্টির সুসংবাদ জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র
বাণী নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ○

তাদের মধ্যে নিহতদেরকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হলো এবং জীবিতদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া
হয়েছিল। অতঃপর বর্ণনাকারী নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সারকথা হলো এই ঃ উক্ত সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের
নিকট বাছুর পূজার মাধ্যমে যে অপরাধ করেছিল, তজ্জন্য তারা লজ্জিত হওয়ায় তওবা কবুল
করা হয়েছিল। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فتوبوا الى بارئكم এর অর্থ হলো ঃ
"তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন কর আর ঐ পথে চল, যে পথে
চললে পর তোমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করা যায়।" হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র) হতে বর্ণিত আছে
যে, আয়াতাংশ فتوبوا الى بارئكم এ উল্লিখিত بارئ শব্দের অর্থ—স্রষ্টা। এ শব্দটি আরবী
ভাষায় ব্যবহৃত برى الله الخلق يبرئه فهو بارئ থেকে উদ্ভূত। অর্থ—স্রষ্টা। এবং
সৃষ্টিকে আরবীতে بريئة বলা হয়ে থাকে। এর وزن হলো فعيلة যা مفعولة এর অর্থে ব্যবহৃত
হয়ে থাকে। তবে برية শব্দটি এখন আর همزه যোগে ব্যবহৃত হয় না, যেমনটি لاك শব্দমূল
হতে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ملك শব্দটি হতে همزه বর্জিত হয়েছে।

প্রখ্যাত জাহিলী কবি নাবিগাহ্ আল-যুবইয়ানী তার একটি পংক্তিতে উভয় শব্দের সন্নিবেশ
ঘটিয়েছেন ঃ

إِلَّا سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الْمَلِيكُ لَهُ + قُمْ فِي الْبَرِيَّةِ فَاحْدُدْهَا عَنِ الْفَنَدِ

কারো কারো মতে البرية শব্দে همزه যুক্ত না হওয়ার কারণ, তা البرى মূল শব্দ থেকে
فعيلة এর وزن এ গঠিত একটি বিশেষ্য পদ, البرى অর্থ মাটি। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী
برية এর অর্থ দাঁড়ায়, মাটির তৈরী সৃষ্ট জীব। আবার কারো ধারণা যে, برية শব্দটি আরবীতে

প্রচলিত البرية العود থেকে গৃহীত। এ কারণে তাতে همزة যুক্ত হয়নি। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, بارئكم শব্দের পাঠে همزه কে ى তে পরিবর্তন করা বা همزه কে বাদ দিয়ে পাঠ উভয় প্রকারই প্রচলিত। অতএব بارئكم শব্দে যখন উক্তরূপ পাঠ বৈধ, তাহলে البرية শব্দকেও همزه বিহীনভাবে برى الله الخلق থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলা অযৌক্তিক হবে না।

আয়াতাংশ ذلكم خير لكم عند بارئكم এর অর্থ তোমাদের জন্য নিজেদেরকে হত্যা করা এবং মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে তওবা করা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে একটি উত্তম ব্যবস্থা। কেননা এ ব্যবস্থায় তোমরা পরকালে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে এবং পুরস্কারের যোগ্য বলেও বিবেচিত হবে। আয়াতাংশ فتاب عليكم অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে পদ্ধতিতে তওবার আদেশ দিয়েছেন, তা মান্য করাতে অর্থাৎ নিজেদের হাতেই আপন লোকদেরকে কতল করাতে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করেছেন। এখানে فتبتم শব্দটি উহ্য রয়েছে, কেননা فتاب عليكم এর উল্লেখ করাতে এখানে যে فتبتم ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে, তা স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাচ্ছে। আয়াতাংশ فتاب عليكم এর আভিধানিক অর্থ— তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের কৃত অপরাধের যে ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি কামনা করেছিলে তোমাদের প্রতিপালক সে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান। আয়াতাংশ التواب الرحيم এর অর্থ—যে ব্যক্তি তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে তওবা করে, সে ব্যক্তি যা কামনা করে আল্লাহ্ পাক তা কবুল করেন। الرحيم শব্দের অর্থ শাস্তি হতে পরিত্রাণদাতা, দয়ার মাধ্যমে করুণা প্রদর্শনকারী।

(৫৫) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

(৫৫) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তোমরা তো নিজেরাই দেখছিলে।

এখানে প্রকৃতপক্ষে আয়াতে করীমার অর্থ ঃ

واذكروا ايضا اذ قلتم يموسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله جهرة

অর্থাৎ তোমরা ঐ ঘটনাকেও স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা যতক্ষণ না আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব, আপনার কথা বিশ্বাস করব না এবং আপনি যা আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন, তাও স্বীকার করব না। এভাবে দেখতে চাই যেন আমাদের ও আল্লাহর মধ্যে কোন আড়াল না থাকে, আর যেন আল্লাহকে আমাদের চোখেই দেখতে পাই যেরূপ কুয়ার পরিষ্কার পানি স্পষ্ট চোখে দেখা যায়। যখন কুয়ার পানি মাটিতে তলিয়ে যায় এবং পরে ঐ মাটি সরিয়ে নেয়া হলে স্বচ্ছ পানি বেরিয়ে পড়ে, তখন আরবী প্রবাদে বলা হয় ঃ قد جهرت الركية اجهرها جهرا و جهرة অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজ প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন

করে, তখনও বলা হয় ঃ جهر فلان بهذا الامر مجاهرة و جهارا এ অর্থে বিশিষ্ট উমাইয়া কবি ফরযদক ইবন গালিব রচিত নিম্নোক্ত পংক্তিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

من اللائي يظل الالف منه + منيخا من مخافته جهارا

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতাংশ جهرة এর অর্থ হলো, علانية তথা প্রকাশ্যভাবে। হযরত রবী' (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, جهرة শব্দটি عيانا এর সম অর্থ-বোধক। হযরত ইবন যায়দ (র)-এর বর্ণনা মতে আয়াতাংশ حتى نرى الله جهرة এর অর্থ حتى يطلع الينا অর্থাৎ যতক্ষণ না আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করবেন (আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করব না)। হযরত কাতাদাহ (র)-এর বর্ণনাও হযরত রবী' (রা)-এর অনুরূপ।

বনী ইসরাঈলের উক্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে আল্লাহ তা'আলা এ জন্যই করেছেন যে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসেছিল, যার অংশ-বিশেষও মনের সান্ত্বনা এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি তারা আমবিয়া আলায়হিমুস্ সালামের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা পরস্পরে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়েছিল। আর একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে, তারা এতসব নিদর্শন এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পৌনঃপুনিক ভাবে আগত অকাট্য প্রমাণাদি এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের পরেও তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী আলায়হিস সালামের নিকট অবান্তর দাবী জানানোর ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল—যেমন তারা দাবী জানিয়েছিল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য চিহ্নিত করে দেয়ার, আরও দাবী জানিয়েছিল এ বলে যে, তারা যতক্ষণ আল্লাহকে সুস্পষ্ট দিবালোকে স্বচক্ষে দেখতে না পাবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীর প্রতি বিশ্বাস করবে না। আরেক দফা তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো, পরে তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র নবীর আদেশ এ বলেই প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, হে মূসা! তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর আর আমরা এখানেই বসে থাকব। অন্য একবার তাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র নবী তাদেরকে حطة বলে পাপসমূহ ক্ষমা চাইতে বললে এবং ফটক দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ করার আদেশ দিলে, তারা উত্তরে বলে ঃ حنطة فى شعيرة আর ফটক দিয়ে ঝুঁকে প্রবেশ করার পরিবর্তে পেছনের দিকে বাঁকা হয়ে ঢুকে। ইত্যাকার আরো বহুবিধ অসৎ কার্য ও অশোভনীয় আচরণের মাধ্যমে তারা তাদের নবীর অন্তরে ব্যথা দেয়। তাই মহান আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগামী মুহাজিরদের সম্মুখে বর্তমান বনী ইসরাঈল গোত্রীয় ইয়াহূদীগণকে পূর্বপুরুষদের উক্ত কাহিনীসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদের অনুরূপ এরাও রসূলকে প্রকৃতভাবে চিনতে পারা সত্ত্বেও তাঁকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা সহ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাঁর নুবুওয়াতকে স্বীকার করছে না। এদের বিস্তারিত কাহিনী পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে, আরো বিধৃত হয়েছে তাদের পৌনঃপুনিক ধর্ম ত্যাগের কাহিনীও এবং নবী হযরত মূসা (আ)-এর হাতে আবার তওবাহ করার ও আল্লাহ কর্তৃক তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়ার মতো অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা।

فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ এর ব্যাখ্যা ঃ

যে বিকট আওয়াজের কারণে বনী ইসরাঈল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে কিছু বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন ঃ হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল, হযরত রবী' (র)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তারা একটি গর্জন শুনতে পেয়ে সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, এদের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। হযরত সুদ্দী (র) থেকে একথা বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে আক্রমণ করেছিল একটি বিকট শব্দ। তা ছিল তাঁর মতে আগুন। হযরত ইবন ইসহাক (র) সূত্রে হযরত ইবন হুমায়দ (র) বর্ণনা করেন যে, فَأَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ অর্থাৎ বিকট আওয়াজ, যদ্দরুন তাদের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

الصاعقة শব্দ দ্বারা মূলত মানুষের দৃশ্যমান ও উপলব্ধিযোগ্য ঐসব ভয়াবহ বস্তু বা অবস্থাকে বুঝানো হয়, মানুষ যার সম্মুখীন হলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হুমকি সৃষ্টি হয় এবং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে অথবা শরীরের কোন অঙ্গহানি ঘটতে পারে। চাই তা বিকট কোন শব্দ হোক বা আগুন হোক বা ভূমিকম্প হোক। তবে তাকে যে অবশ্যই মরতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোন ব্যক্তি না মরেও সে مصعوق আখ্যায়িত হতে পারে, তার উদাহরণ হলেন হযরত মূসা (আ)। যেমন আল্লাহ্ পাকের বাণী فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا এর অর্থ হযরত মূসা (আ) বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট উমাইয়া কবি জারীর ইবন 'আতিয়্যাহ রচিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে صواعق শব্দটি অজ্ঞান হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

وَهَلْ كَانَ الْفَرَزْدَقُ غَيْرَ قِرْدٍ - أَصَابَتْهُ الصَّوَاعِقُ فَاسْتَدَارَا

প্রকাশ থাকে যে, হযরত মূসা (আ) তূর পাহাড়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নূরের ঝলক দেখে অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ পাক তাঁর সম্পর্কে এ সংবাদ দান করেছেন যে, হযরত মূসা (আ) উক্ত অবস্থা থেকে হুশ ফিরে পেলে আল্লাহ পাকের কাছে আরয করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কৃত অপরাধের ক্ষমা চাই। উপরোল্লিখিত পংক্তির দিকে দৃষ্টি করলেও দেখা যাবে যে, ফারাযদাককে জারীর যে বানরের সাথে তুলনা করেছেন, তাতেও তার জীবন্ত অবস্থারই তুলনা করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে উদ্ধৃত وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ এর অর্থ যখন তোমাদের প্রতি الصاعقة আপতিত হয়েছিল, তখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

(٥٦) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

(৫৬) আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

البعث শব্দের তাৎপর্য হলো, কোন বস্তুকে তার আসল স্থান হতে উত্তোলন করা। এ অর্থেই আরবদেশে بعث فلان راحلته এর ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার সওয়ারীকে উঠিয়ে দিয়েছে। এ অর্থে নিম্নোক্ত পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

فَأَبْعَثُهَا وَهِيَ صَنِيعُ حَوْلٍ - كَرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةً وَقَاحَا

আরবদেশে প্রচলিত আরেকটি প্রবাদ بعثت فلانا لحاجتى এ উল্লিখিত بعث শব্দটি প্রস্তুত করা ও কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা অমুক ব্যক্তিকে আমার প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করার জন্য তার অবস্থান হতে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণে মনোযোগ দান ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছি। কিয়ামতের দিবসকে يوم البعث নামে অভিহিত করার কারণ এই, উক্ত দিবসে মানবকুলকে তাদের স্ব স্ব কবর হতে উত্তোলন করে হাশরের মাঠে হিসাবের জন্য একত্রিত করা হবে। কাজেই উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায় এই, الصاعقة তথা আগুনের স্ফুলিঙ্গ বা গর্জনের কারণে তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করেছেন। আয়াতাংশ لعلكم تشكرون এর একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে তোমাদের প্রতি যে বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেছি তোমরা যেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করে পৃথিবীতে আবার জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য তোমরা যেন তোমাদের কৃত এ মহা অপরাধ হতে তওবাহ করে পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পার। আসলে এ ব্যাখ্যা ঐ তাফসীরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যারা মনে করেন যে, ثم بعثنا كم এর অর্থ মৃত্যু হতে জীবিত করা। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে ثم بعثنا كم এর অর্থ অতঃপর তোমাদেরকে পরবর্তী সময়ে নবীরূপে সমাজের কাছে পাঠিয়েছি।

হযরত মূসা ইবন হারূন (র) হযরত সুদ্দী (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতাংশ فاخذتكم الصاعقة এর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা এই, তোমাদের উপর الصاعقة (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা বিকট গর্জন) নিপতিত হয়ে তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছি আর তোমরা আমার পুনর্জীবনদান প্রক্রিয়াটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলে, অতঃপর আমি তোমাদেরকে সংবাদদাতা রূপে প্রেরণ করেছি, যাতে তোমরা আমার শোকরিয়া আদায় করতে পার। হযরত সুদ্দী (র) মনে করেন যে, এ আয়াতের যে অংশ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে অর্থের দিক দিয়ে তার স্থান পরে হবে এবং যে অংশ পরে উল্লিখিত হয়েছে তার স্থান হবে পূর্বে। বর্ণনাকারী মূসা অনুরূপভাবে হযরত সুদ্দী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাখ্যাটি এমন যা প্রকাশ্য তিলাওয়াতের পরিপন্থী। আর অন্যান্য ব্যাখ্যাকারিগণও একে একটি ভুল ব্যাখ্যা বলে সর্বসম্মত রায় প্রদান করেন। হযরত সুদ্দী (র)-এর যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি সেমতে لعلكم تشكرون এর সম্পর্ক হয় অবশ্য-ম্ভাবীরূপে ثم بعثنا كم এর সাথে অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সংবাদদাতা রূপে প্রেরণ করার কারণে তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর তাদের মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল, আমরা যতক্ষণ না আল্লাহকে প্রকাশ্যরূপে দেখতে পাব, ততক্ষণ তোমার প্রতি বিশ্বাস করব না। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেছেন যে, যখন হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন, তার তিনি তাদেরকে বাছুর পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন এবং আপন ভাই হযরত হারূন (আ) ও সামিরীকে যা বলার ছিল বললেন, অতঃপর বাছুরটি ভস্ম করে ছাইগুলি নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন সৎ লোককে নির্বাচন করে তাদেরকে বললেন, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র সমীপে তোমাদের কৃত অপরাধের জন্য তওবাহ্ কর এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ, তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা রোযা রাখ এবং নিজেদের আত্মা ও তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র করে নাও—এ বলে তিনি নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত তূর পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত ঐ স্থানে আসতেন না। উল্লিখিত সত্তর ব্যক্তি যখন হযরত মূসা (আ)-এর নির্দেশ পালন করে আল্লাহ্ পাকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চলেছিলেন, তখন তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলেন, হে মূসা! আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের পক্ষ হতে দু'আ করুন, যাতে আমরা আমাদের প্রভুর কথা শুনতে পাই। হযরত মূসা (আ) উত্তর দিলেন, আমি তাই করব। হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, তখন তাদের মাথার উপর একখণ্ড মেঘ এসে উপস্থিত হলো, যা শেষ পর্যন্ত পুরো পাহাড় জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল। আর হযরত মূসা (আ) ঐ পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরাও নিকটবর্তী হও। হযরত মূসা (আ) যখন মহান আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করতেন, তখন তাঁর কপালে এমন একটি নূরের ঝলক প্রকাশ পেত যদ্দরুন কোন লোক তাঁর দিকে তাকাতে পারত না। কাজেই তাঁর ও লোকদের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল সৃষ্টি করা হতো। হযরত মূসা (আ)-এর আদেশক্রমে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, আর যখন তারা মেঘের ছায়াতলে এসে পৌঁছলেন, তখন সকলেই সিজদায় পতিত হলেন এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে হযরত মূসা (আ)-এর বাক্যালাপ শুনতে পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-কে কোন কোন কাজ করার নির্দেশ দিলেন আর কিছু কাজের ব্যাপারে নিষেধ করেন। যখন হযরত মূসা (আ) একাজ সম্পন্ন করলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর মাথার উপর হতে মেঘ কেটে গেল, তখন এরা হযরত মূসা (আ)-এর দিকে অগ্রসর হলেন ও তাঁকে জানালেন, لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة

(আমরা যতক্ষণ না আল্লাহ্‌কে সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাব আপনার কথায় ঈমান আনব না), তখনই তাদের উপর একটি তীব্র ভূমিকম্প শুরু হলো এবং তারা সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এদিকে হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট মোনাজাত করতে থাকলেন। তিনি বললেন ঃ

رب لو شئت اهلكتهم من قبل و اياى ط [হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং আমাকেও আগেই মেরে ফেলতে পারতেন (আল-আ'রাফ ৭/১৫৫)] কেননা, তারা বহু বোকামি করেছে। এখন আপনি যদি বনী ইসরাঈলের বোকামির জন্য এ সত্তরজন লোককে ধ্বংস করে দেন—যাদেরকে আমি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে উত্তম লোক হিসেবে নির্বাচিত করেছি, তাহলে এদের অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে না। এভাবে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ-মোনাজাত করতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জীবন

ফিরিয়ে দিলেন। তখন মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বাছুর পূজাজনিত পাপের তওবাহ্ প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, যতক্ষণ না তারা পরস্পরকে হত্যা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তওবাহ্ কবুল করা হবে না।

হযরত সুদ্দী (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল যখন বাছুর পূজার গুনাহ্ হতে তওবাহ্ করতে চাইল এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পরস্পরে হত্যার আদেশ পালনের কারণে ক্ষমা করে দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করলেন যেন বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে একদল লোক নিয়ে আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত স্থানে হাযির হয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট বাছুর পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং হযরত মূসা (আ) তাদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত করলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে নির্বাচন করলেন এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃত অপরাধের ক্ষমা চাইবার জন্য এদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে হযরত মূসা (আ)-কে বলতে লাগল ঃ আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখতে না পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার কথায় বিশ্বাস করব না। কেননা, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন কাজেই আমাদেরকেও দেখতে দিতে হবে। তখনই একটি বজ্রপাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো আর তারা মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন হযরত মূসা (আ) কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সত্তরজন লোককে এভাবে ধ্বংস করে দিলেন, আমি বনী ইসরাঈলের কাছে কি জবাব দেব? হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে আগেই এদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন এবং আমাকেও। কাজেই নির্বোধেরা যে অপরাধ করেছে তজ্জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন কি? তখন আল্লাহ্ হাকীম ইরশাদ করলেন ঃ এ সত্তর ব্যক্তিও তাদের দলভুক্ত, যারা বাছুর পূজায় শরীক হয়েছিল। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ

ان هى الا فتنتك ط تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء ط ـ ـ ـ انا هدنا اليك

(হে আমার প্রতিপালক! এটি আপনার এক মহা পরীক্ষাই বটে। এর সাহায্যে আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। ... ... আপনি আমাদেরকে আপনার দিকে হিদায়াত দান করুন (সূরা আ'রাফ ১৫৫-৬)। মহান আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীতেও সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

و اذ قلتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصعقة

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করলেন আর তারা এক একজন করে জীবিত হয়ে দাঁড়াতে লাগল, একজন অন্যজনের পুনর্জীবন প্রক্রিয়া অবলোকন করছিল। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ)-কে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আপনি মোনাজাত করুন, কেননা আল্লাহ্ পাকের নিকট আপনি যা চাইবেন তাই তিনি আপনাকে দান করেন। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট মোনাজাত করুন,

তিনি যেন আমাদেরকে সংবাদদাতা করে দেন। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে সংবাদদাতা রূপে মনোনীত করলেন। এজন্য বলা হয়েছে ثم بعثناكم من بعد موتكم কিন্তু এখানে একটি অক্ষরকে নির্ধারিত স্থানের পূর্বে নেয়া হয়েছে ও অন্য একটিকে পরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত, হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে তাওরাতের পাঠ সম্বলিত ফলকসমূহ সহকারে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলেন, তখন তিনি তাদেরকে বাছুর পূজায় রত দেখলেন। তখন তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন নিজেদেরকে হত্যা করার জন্য এবং তারা শেষ পর্যন্ত ঐ আদেশ মান্য করল। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাদের তওবাহ্‌ কবুল করলেন। হযরত মূসা (আ) তাদেরকে বললেন ঃ এই যে ফলক-সমূহ, এতে রয়েছে আল্লাহ্‌ পাকের ঐ সমস্ত নির্দেশাবলী, যা পালনে তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত নিষেধ, যা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা বলল, আপনার কথা কে গ্রহণ করবে? আল্লাহ্‌র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখতে না পাই, তাঁকে এ ঘোষণা দিতে না দেখি যে, "এ হলো আমার কিতাব, তোমরা তা গ্রহণ কর", ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করব না। তাঁর কি হলো যে, হে মূসা! তোমার সঙ্গে তিনি কথা বলেন, আমাদের সঙ্গে কেন বলবেন না, তিনি বলবেন, এ হলো আমার কিতাব তোমরা তা গ্রহণ কর। বর্ণনাকারী অতঃপর এ আয়াত তিলা-ওয়াত করলেন لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً তখনই আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে গযব এসে নিপতিত হলো, যা তাদের সকলকেই প্রকম্পিত করে ছাড়ল আর সাথে সাথে সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করলেন। আর তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) বললেন, এখন তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের কিতাবকে গ্রহণ কর, তখন তারা উত্তর দিল—"না"। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ তোমাদের উপর কি অবস্থা এসেছিল? তারা বলল ঃ আমরা মৃত্যুবরণ করেছিলাম, অতঃপর আমাদেরকে পুনর্জীবন দান করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ এবার তোমরা আল্লাহ্‌ পাকের কিতাবকে গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল ঃ না। তখন আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি ফেরেশতা পাঠালেন, যারা তূর পাহাড়টি তাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون ثم بعثنا كم من بعد موتكم এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পরে আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে পুনর্জীবিত করলেন যাতে তারা জীবনের বাকী সময়টুকু অতিবাহিত করতে পারে। হযরত রবী ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ فأخذتكم الصاعقة এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এরা ছিলেন ঐ সত্তরজন লোক, যাদেরকে হযরত মূসা (আ) নির্বাচন করেছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তারা আল্লাহ্‌ পাকের কালাম শ্রবণ করে অতঃপর বলে, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে দেখতে না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও বিশ্বাস করব না। তখনই তারা শুনতে পেল এক বিকট শব্দ এবং এতে তাদের সকলেই মারা গেল। কাজেই আয়াতাংশ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, অতঃপর মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হলো, কেননা তাদের ঐ মৃত্যু ছিল একটি শাস্তি মাত্র। এজন্য জীবনের

বাকী অংশটুকু পূর্ণ করার নিমিত্ত তাদেরকে পুনর্জীবন দান করা হয়েছিল। এ শাস্তি এজন্য হয়েছিল যে, তারা বলেছিল لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً কিন্তু বর্ণনাকারী এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তাতে বনী ইসরাঈল কর্তৃক কথিত لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى ... ... এর কারণ যে এটিই, সে সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। এমনও হতে পারে যে, এ উক্তিটি তারা হযরত মূসা (আ)-কে যা বলেছিল তার অংশবিশেষ। যদিও এতদসম্পর্কে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নেই, যদ্দ্বারা এ উক্তিকে এ বিষয়েও যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে এ কথা বলা যথার্থ হবে যে, মহান আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এ খবর দিয়েছেন যে, তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল যে, يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আর আল্লাহ্‌ পাক ঐ সমস্ত লোককে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যারা এ আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে তিরস্কার করা। অথচ রসূল (স) যাদের সাথে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তা অকাট্যরূপেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যাদেরকে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য এর কারণ ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে একথা সত্য যে, যাদের ঘটনা আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা উক্ত কথাটি নিঃসন্দেহে বলেছিল অথবা এমনও হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে কথাগুলি বলেছিল মর্মে আমাদের নিকট বর্ণনা এসেছে তার কিয়দংশ সত্য।

(৫৭) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(৫৭) আর আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম। তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, তোমাদেরকে উত্তম যা কিছু দান করেছি, তা থেকে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নি। বরং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

এ অংশটুকু ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ لخ এর সাথে যুক্ত (عطف) করা হয়েছে। পুরো অংশের অর্থ ঃ অতঃপর আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করেছি এবং তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছি। এভাবে তাদেরকে যে সমস্ত অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত করা হয়েছিল, তার সবকয়টি এক এক করে গণনা করা হয়েছে—যাতে তোমরা আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উল্লিখিত غمام শব্দটি غمامة এর বহুবচন, যেমন السحاب শব্দটি سحابة এর বহুবচন। আরবীতে غمام বলা হয় ঐ বস্তুকে, যা আকাশকে আচ্ছাদনের মতো আবৃত

রাখে। যথা মেঘমালা, কুয়াশা ইত্যাদি, যার কারণে আকাশ দৃষ্ট হয় না। একে আরবীতে مغموم শব্দ দ্বারাও বুঝানো হয়। এক বর্ণনা মতে বনী ইসরাঈলের মাথার উপর যে বস্তুটি ছায়া দিয়েছিল, তা মেঘমালা ছিল না। হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, আয়াতাংশ وظللنا عليكم الغمام তে উল্লিখিত غمام মেঘমালা ছিল না। হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, আয়াতাংশে উল্লিখিত الغمام কোন মেঘমালা ছিল না, বরং কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে যে এক প্রকার ধূম্রবৎ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তদ্রূপ ধূম্রজাল বনী ইসরাঈলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী وظللنا عليكم الغمام তে উল্লিখিত الغمام ছিল মেঘবৎ একটি বস্তু। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) وظللنا عليكم الغمام এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : তা এ পরিচিত মেঘমালার চেয়েও ঠাণ্ডা এবং উত্তম একটি বস্তু ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী في ظلل من الغمام তে উল্লিখিত যে الغمام এর ছায়ায় কিয়ামতের দিনে আল্লাহ হাকীমের সাধারণ্যে প্রকাশিত হবার কথা বলা হয়েছে তারই অনুরূপ মেঘময় অবস্থা। বদর যুদ্ধের দিন যে মেঘমালার ছায়ায় ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছিলেন, তাও অনুরূপ একটি মেঘ ছিল। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : ঐ মেঘই ছিল تيه প্রান্তরে মাথার উপর ছায়াদানকারী। আর الغمام এর যে ক'টি ব্যাখ্যা আমরা বর্ণনা করেছি তার মধ্যে এ ব্যাখ্যা মতে তা প্রকৃত অর্থেই মেঘ ছিল না বরং এমন একটি অবস্থা যাতে আকাশ স্পষ্ট দৃষ্ট হতো না। বনী ইসরাঈলকে যে غمام দ্বারা ছায়াদান করা হয়েছিল এ উক্তিটির যথার্থতা থাকছে না, কেননা যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঐ غمام এর সাহায্যে তাদের মাথার উপর ছায়া করার কাজটি নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সেহেতু তা আকাশের একটি ধূসর বর্ণ ধারণ জাতীয় অবস্থা হতে পারে না। কোনো কোনো বর্ণনা মতে তা মেঘের চাইতেও বেশী সাদা একটি বস্তু বলে উল্লিখিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وأنزلنا عليكم المن এর তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ المن এর বিবরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, المن বৃক্ষের আঁঠা জাতীয় একটি বস্তু বিশেষ। মুহাম্মদ ইবন আমর (র) বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী وأنزلنا عليكم المن তে উল্লিখিত المن এর অর্থ বৃক্ষ হতে নির্গত আঁঠা জাতীয় একটি বস্তু। অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা হযরত কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, আয়াতাংশ وأنزلنا عليكم المن والسلوى তে উল্লিখিত المن হলো বরফের ন্যায় একটি বস্তু; আর অন্যান্য কয়েক জনের মতে তা পানীয় দ্রব্য। এ অর্থে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

হযরত রবী' ইবন আনাস (রা)-এর মতে المن এক প্রকার পানীয়। যা মধুর ন্যায় নাযিল হতো। তারা তা পানির সাথে মিশিয়ে পান করত। অন্য কয়েকজন বলেন, المن মধু বিশেষ। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য : হযরত ইবনে যায়দ (র) বলেন : المن এক প্রকার মধু বিশেষ, যা বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ হতে থাকত আসমান থেকে। হযরত আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তোমাদের এ মধু المن এর সত্তর ভাগের একাংশ। অন্যান্য কয়েকজন

বলেন : المن এক প্রকার কোমল রুটি বিশেষ। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখযোগ্য : হযরত আবদুস সামাদ (র) বলেন : আমি হযরত ওয়াহাব (র)-কে المن কি বস্তু, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি, তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তা এক প্রকার কোমল রুটি বিশেষ। ভুট্টা বা ময়দার রুটির মতো। অন্য একদলের মতো المن জাম্বুরা (ترنجبين) জাতীয় ফল বিশেষ। এর সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে : হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত যে, المن জাম্বুরা বৃক্ষের উপর পতিত এক প্রকার ফল বিশেষ। অন্যান্য কয়েকজন বলেন, المن হলো ঐ বস্তু বিশেষ, যা বৃক্ষের উপর পতিত হতো এবং মানুষ তা খাবাররূপে গ্রহণ করত। এ উক্তির সমর্থনে বর্ণনা : হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, المن তাদের বৃক্ষের উপর পতিত হতো এবং তারা প্রত্যূষে উঠে তা সংগ্রহ করত আর মন ভরে আহার করত। অন্য একটি বর্ণনায় আল-মুছান্না আমিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি وأنزلنا عليكم المن -এ উল্লিখিত المن এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : المن হলো ঐ বস্তু, যা বৃক্ষের উপর পতিত হতো। হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীস আছে যে, তিনি বলেছেন, المن ঐ বস্তু বিশেষ, যা আসমান থেকে বৃক্ষের উপর পতিত হতো। আর লোকেরা তা আহার করত। অপর একটি বর্ণনায় আমিরের সূত্রে আহমদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : من হচ্ছে ঐ বস্তু, যা বৃক্ষের উপর পতিত হতো। কথিত আছে যে, من জাম্বুরা জাতীয় বস্তু বিশেষ। অন্য কয়েকজন বলেছেন, তা ثمام ও عشر নামক তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের উপর পতিত হতো। তা মধুর ন্যায় সুমিষ্ট ছিল। প্রখ্যাত আরব কবি আল-আ'শা মায়মুন ইবন কায়স তাঁর নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। পংক্তিটি এই :

لو أطعموا المن والسلوى مكانهم + ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا

অর্থাৎ "তাদেরকে তাদের অবস্থানে রেখে যদি 'মান' ও 'সালওয়া' পরিবেশন করা হতো, তাহলে লোকেরা বিকল্প আর কোন উপাদেয় খাদ্যের দিকে তাকাত না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ 'মান'-এর স্বগোত্রীয়। এর নিংড়ানো রসে চক্ষু রোগের উপশম হয়। কেউ কেউ বলেছেন, المن এক প্রকার সুমিষ্ট পানীয় বিশেষ, যা তারা সিদ্ধ করে পান করত। তবে অন্য একজন আরব কবি উমায়্যা ইবন আবিস্‌সালত তাঁর কবিতায় من কে মধুর সমার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি 'তীহ' প্রান্তরে তাদের অবস্থা ও আহার্যের বর্ণনা দিয়ে নিম্নোক্ত পংক্তি ক'টি রচনা করেছেন :

فرأى الله أنهم بمضيع + لا بذي مزرع ولا مثمورا

فنشاها عليهم غاديات + ومرى مزنهم خلايا وخورا

عسلا ناطفا وماء فراتا + وحليبا ذا بهجة ممرورا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক লক্ষ্য করলেন যে, তারা (বনী ইসরাঈল) একটি মরুময় অনুর্বর প্রান্তরে অবস্থান করছে, যেখানে না কোনরূপ কৃষিকার্যের সম্ভাবনা আছে, আর না কোনো শস্য জন্মানোর অবকাশ রয়েছে। তখন আল্লাহ্ পাক যে প্রান্তরের দিকে প্রত্যূষে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠালেন, তা ওই প্রান্তরের উঁচু-নীচু সমস্ত এলাকা জুড়ে বর্ষণ করল। আর অবতীর্ণ করলেন ফোঁটা ফোঁটা প্রবাহিত মধু এবং সুমিষ্ট ঝর্ণাধারা ও বিশুদ্ধ দুগ্ধ।

السلوى এর ব্যাখ্যা ঃ

سلوى এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা السمانى নামক পাখির সদৃশ। سلوى শব্দটি একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ভাষাবিদের মতে একবচনে السلوى বহুবচনে سلواة। এ ব্যাখ্যার সপক্ষে ইবনে 'আব্বাস (রা) ও ইবন মাস'উদ (রা) রাসূল (স)-এর একদল সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, السلوى এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা السمانى পাখির সদৃশ। সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তা السمانى নামক পাখির চেয়ে আকারে একটু বড়। কাতাদাহ (র) বলেন যে, السلوى এক প্রকার পাখি বিশেষ, যা দখিনা হাওয়াতে তাড়িত হয়ে তাদের নিকট এসে জমায়েত হতো। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, السلوى এক প্রকার পাখি বিশেষ। মুজাহিদ (র) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা রয়েছে, السلوى এক প্রকার পাখি বিশেষ।

আবদুস সামাদ (র) বলেন ঃ আমি ওয়াহাবকে বলতে শুনেছি যে, سلوى কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, কবুতরের ন্যায় এক প্রকার মোটাতাজা পাখি বিশেষ। হযরত রবী' ইবন আনাস (র) বর্ণনা করেছেন যে, السلوى ছিল এক প্রকারের পাখি বিশেষ, যা আকারে সামানী পাখি সদৃশ। হযরত আমির (র)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, السلوى হলো সামানী নামক পাখি। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, السلوى হলো সামানী জাতীয় পাখি। হযরত ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্রে হযরত আমির (র) হতে বর্ণিত আছে যে, السلوى হলো সামানী পাখি। হযরত দাহহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সামানী سلوى পাখির অপর নাম।

যদি কোন প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন রাখে যে, ঐ জাতিকে মেঘমালার ছায়া দান করার এবং المن ও السلوى অবতীর্ণ করার তাৎপর্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বজ্ঞানিগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। আমাদের নিকট যে উক্তিসমূহ আছে, সেগুলো এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করলেন এবং নির্বাচিত সত্তরজনকে পুনর্জীবিত করেন, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের যে আরীহা নামক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হবার আদেশ দান করেন, তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চল। তারা রওনা হলো। শেষ পর্যন্ত তারা উক্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী হলো। তখন তাদের মধ্য হতে বার জনকে নাকীব (নেতা) নিযুক্ত করা হলো এবং ঐ অঞ্চলের শক্তিধরদের সাথে যখন মুকাবিলা করার প্রশ্ন আসল, তখন আল্লাহ পাকের কিতাবের বর্ণনানুযায়ী হযরত মূসা (আ)-এর কওমের লোকেরা উত্তর দিল ঃ তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে মুকাবিলা কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। তখন হযরত মূসা (আ) রাগ করে তাদের উপর বদ দু'আ করলেন। তিনি বললেন ঃ

رب انى لا املك الا نفسى و اخى فافرق بيننا و بين القوم الفسقين ○

[হে আমার প্রতিপালক! আমি একমাত্র আমার ও আমার ভাইয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখি। কাজেই আমার ও পাপিষ্ঠ গোত্রের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিন (সূরা মায়িদা—৫/২৫)।] এ বদ দু'আ করার ব্যাপারে হযরত মূসা (আ) তাড়াহুড়া করেছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর বদ দু'আর জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

فانها محرمة عليهم اربعين سنة ج يتيهون فى الارض ط

[উক্ত (আরীহা) অঞ্চল হতে চল্লিশ বছর তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো। এ সময়কাল তারা প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকবে (সূরা মায়িদা ৫/২৬)।] যখন তীহ্ নামক প্রান্তরে তাদেরকে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো, তখন হযরত মূসা (আ) লজ্জিত হলেন এবং তাঁর প্রতি যাঁরা অনুগত ছিল, তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলতে লাগলেন ঃ হে মূসা! আপনি আমাদেরকে কোন্ বিপদে ফেললেন? অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন লজ্জিত হলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন,

فلا تاس على القوم الفسقين ○ [(মূসা!) তুমি পাপিষ্ঠ জাতির জন্য কোন আফসোস কর না (সূরা মায়িদা ৫/২৬)।] অর্থাৎ যে জাতিকে তুমি নিজেই পাপিষ্ঠ আখ্যা দিয়েছ, তাদের জন্য এখন আর অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। তখন তিনি আর তাদের জন্য কোন আফসোস করেন নি। এবার তারা হযরত মূসা (আ) কে বলল ঃ এখানে আমাদের পানির কি ব্যবস্থা হবে? আর আমরা খাদ্য কোথায় পাব? তখন আল্লাহ পাক তাদের জন্য المن অবতীর্ণ করলেন—যা জাম্বুরা বৃক্ষের উপর পতিত হতো এবং سلوى হচ্ছে সামানীর ন্যায় পাখি। ঐ গোত্রের লোকেরা এসে পাখির দিকে তাকাত। এগুলোর মধ্যে যেগুলো মোটাতাজা, সেগুলো যবেহ করত এবং অন্যগুলোকে ছেড়ে দিত। অতঃপর ঐ পাখি একটু মোটা হলে আবার আসত। এবার হযরত মূসা (আ)-এর গোত্রের লোকেরা তাঁকে বলল ঃ এইতো আমাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা হলো। এখন আমাদের পানীয়ের ব্যবস্থা কি হবে? তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন ঃ লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলে পাথর থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো—তখন প্রতিটি গোত্র এক একটি ঝর্ণাধারা হতে পানি পান করতে লাগল, তখন তারা বলল ঃ এবার আমরা আহার ও পানীয় প্রাপ্ত হলাম। এখন আমাদের জন্য ছায়ার কি ব্যবস্থা হবে? তখন আল্লাহ্ তাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করলেন। এবার তারা বলল ঃ এখন আমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা হলো তা বেশ, তবে পোশাকের জন্য কি ব্যবস্থা হবে? তখন যেভাবে মানব সন্তান শারীরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, তদ্রূপ তাদের বস্ত্রসমূহও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল এবং ঐ বস্ত্র কখনও জীর্ণ হতো না। বস্তুত মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী ঃ

و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوى ط

এবং

و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ط فانفجرت

منه اثنتا عشرة عينا ط قد علم كل اناس مشربهم ط

[স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ পানির ঘাট চিনে নিলো (সূরা বাকারা ২/৬০)] এর দ্বারা ঐ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত ইবন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করলেন এবং হযরত মূসা (আ)-কে হুকুম দিলেন বাছুর পূজার কারণে তাদের উপর যে অস্ত্র পরিচালনার আদেশ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে, তখন হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর হবার আদেশ করা হলো। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য ঐ অঞ্চলকে আবাসভূমি ও শান্তিময় বাসস্থানরূপে চিহ্নিত করে রেখেছি। কাজেই তুমি তাদের নিয়ে ঐ দেশেই যাও এবং সেখানে যে সমস্ত শত্রুদল রয়েছে, তাদেরকে বহিষ্কার কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভে তোমাদেরকে সাহায্য করব। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ্র আদেশে পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর যখন তিনি মিসর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল তীহ্ প্রান্তরে উপনীত হলেন, ঐ প্রান্তরটি ছিল এমন একটি মাঠ, যেখানে কোন আড়াল বা ছায়াদার কিছুই ছিল না। তখন হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় গরমে কষ্ট পাচ্ছিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে ছায়ার জন্য মোনাজাত করলেন এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে মেঘের ছায়া দান করলেন। আর হযরত মূসা (আ) যখন তাদের জন্য রিযকের দু'আ করলেন, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের জন্য পাঠালেন المن ও السلوى।

হযরত রবী' (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী وظللنا عليكم الغمام এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তীহ্ প্রান্তরে তাদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করা হয়েছিল। তারা তিন বা পাঁচ মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চলে গন্তব্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রত্যহ ভোরে উঠে তারা সফর আরম্ভ করত এবং সন্ধ্যা বেলায় পূর্ববর্তী স্থানে এসে উপনীত হতো। তাদের উপর চল্লিশ বৎসর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারা যখন এ অবস্থায় নিপতিত ছিল, তখন তাদের উপর অবতীর্ণ হতে থাকত মান্না-সালওয়া। তাদের পরিধেয় বস্ত্রও পুরাতন হতো না। তাদের সঙ্গে ছিল তূর পাহাড়ের একটি পাথর। যা তারা তাদের সঙ্গে বহন করত। যখনই তারা কোন স্থানে গিয়ে অবতরণ করত, তখন হযরত মূসা (আ) তাঁর লাঠি দ্বারা ঐ পাথরে আঘাত করলে সেখান হতে বারোটি স্রোতধারা প্রবাহিত হতো। আল-মুছান্না ওয়াহাব-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের জন্য যখন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সময় পর্যন্ত পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন আর তারা ঐ সময়ে মাঠে-ময়দানে দিশেহারা অবস্থায় গন্তব্যহীনভাবে ঘুরাফেরা করছিল, তখন তারা মূসা (আ)-এর নিকট বলল ঃ আমরা খাব কি? তখন মূসা (আ) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য শিগগির এমন বস্তু সরবরাহ করতে যাচ্ছেন, যা তোমরা আহার করতে পারবে। তখন তারা উত্তরে বলল ঃ কোথা থেকে তৈরী রুটি আসবে? রুটি কি আমাদের উপর বর্ষিত হবে? মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি শিগগিরই পাকানো রুটি পাঠাচ্ছেন। অতঃপর তাদের প্রতি المن অবতীর্ণ হতে লাগল। ওয়াহাব-এর কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, من কি জিনিস? তিনি উত্তর দেন, ভুট্টার রুটির ন্যায় এক প্রকার কোমল আটা বা ময়দার রুটি বিশেষ। খাদ্য প্রাপ্ত হবার পর তারা প্রার্থনা করতে লাগল, আমরা তরকারি চাই। মূসা (আ) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সালুনের ব্যবস্থা করবেন। তারা বলল,

বায়ুর প্রবাহে তা আমাদের কাছে এসে না পৌঁছলে তো তা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। মূসা (আ) বললেন ঃ তা হলে বায়ু তোমাদের নিকট তার প্রবাহের সাহায্যে সালওয়া সরবরাহ করবে। বায়ু দ্বারা তাড়িত হলে তাদের নিকট سلوى নামক পাখি এসে ভিড়ত। ওয়াহাব-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো ঃ السلوى কি জিনিস? তখন তিনি বললেন, কবুতরের ন্যায় এক প্রকার মোটা-তাজা পাখি বিশেষ, যা তাদের নিকট এসে পৌঁছত এবং তারা এক শনিবার হতে অন্য শনিবার পর্যন্ত এক সপ্তাহের জন্য তা ধরে রাখত। তারা আবার বলল, আচ্ছা আমরা কি বস্ত্র পরিধান করব? মূসা (আ) বললেন, তোমাদের কারো পরিধেয় চল্লিশ বৎসর যাবত পুরাতন হবে না। তারা বলল, আমাদের তো ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাদের জন্য কোথা হতে পানীয় সংগ্রহ করব? মূসা (আ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তার ব্যবস্থাও করবেন। তারা বলল ঃ তা কি করে সম্ভব, কেননা পানির উৎস তো একমাত্র প্রস্তরই হতে পারে! তখন আল্লাহ্ মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন তাঁর লাঠি দিয়ে যেন পাথরে আঘাত করেন। তারা বলল ঃ এখন মেঘের অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছাদিত। আমরা কিভাবে দেখতে পাব? তখন আল্লাহ্ তাদের শিবিরের মধ্যস্থলে একটি আলোকময় স্তম্ভ সৃষ্টি করে দিলেন, যার আলোকে পুরা ছাউনি আলোকিত হয়ে পড়ল। তারা বলল, আমাদের উপর প্রখর সূর্যতাপ হতে বাঁচার জন্য ছায়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দান করবেন। ইবন যায়দের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, তাদের জন্য তীহ্-এর প্রান্তরে এমন সব বস্ত্র আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছিলেন, যা জীর্ণ হবে না অথবা ময়লাও হবে না। ইবন জুরায়জ আরো বলেন যে, যদি কেউ মান্না ও সালওয়া থেকে একদিনের অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করত, তাহলে নষ্ট হয়ে যেত, তবে শুক্রবার দিন শনিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করলে তা নষ্ট হতো না।

كلوا من طيبات ما رزقناكم এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশটি সুস্পষ্টভাবে একটি উহ্য বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ আয়াতাংশ وظللنا عليكم الغمام ও وانزلنا عليكم المن والسلوى এর পরে كلوا من طيبات الخ এর উল্লেখ একথাই বুঝায় যে, পূর্ণ কথাটি ছিল এরূপ وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم অর্থাৎ وقلنا لهم কথাটি উহ্য রয়েছে। এর কারণ, তাদেরকে সম্বোধন করার প্রকাশ্য অংশের ইঙ্গিত এবং মহান আল্লাহ তা'আলা كلوا من طيبات ما رزقناكم দ্বারা একথাই বুঝিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে যে উপাদেয় আহার্য প্রদান করেছি তা তোমরা আহার কর। কোন কোন তাফসীরকারের মতে من طيبات الخ এর অর্থ من حلاله الذى ابحناه لكم অর্থাৎ তার যে হালাল অংশ আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি এবং তাকে তোমাদের জন্য রিযিক করে দিয়েছি, তা তোমরা গ্রহণ কর। উপরোক্ত দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমোক্তটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, এ অর্থ তারা যে প্রাচুর্য ও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে ছিল, তারই ইঙ্গিতবহ। এ মর্মে الطيب শব্দ দ্বারা "উপাদেয়" অর্থ বুঝানো অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এবং ما رزقناكم এ ما অব্যয় الذى বা সর্বনামের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটির প্রকৃত অর্থ এরূপ দাঁড়াবে যে, আমি তোমাদেরকে যে সব উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দান করেছি, তা তোমরা আহার কর।

وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون এর ব্যাখ্যা ঃ

এ অংশও এমন একটি উক্তি, যার উল্লিখিত অংশ দ্বারা উহ্য অংশের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর তা এভাবে যে, তাদেরকে এ নির্দেশ দান করার পর যে উৎকৃষ্ট রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা আহার কর, তারা আমার হুকুমের অমান্য করল ও তারা তাদের প্রতিপালকের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলের প্রতি অবাধ্য হলো। و ما ظلمونا বাক্যে উল্লিখিত অংশ দ্বারা অনুল্লিখিত অংশের প্রতি ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র বাণী و ما ظلمونا অর্থ ঃ তারা তাদের এ আচরণ দ্বারা আসলে আমার প্রতি অবিচার করেনি, তারা তাদের আত্মার প্রতিই অবিচার করছিল। অর্থাৎ তারা তাদের ঐ আচরণ এবং অবাধ্যতা দ্বারা আমার কোনই ক্ষতি করতে পারেনি, বরং তারা তাদের আত্মাকেই ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, يظلمون অর্থ يضرون। ইতিপূর্বেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, মূলত ظلم এর অর্থ হচ্ছে وضع الشيء في غير موضعه। যেহেতু ঐ আলোচনাই যথেষ্ট বলে মনে করি, তাই তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আমাদের মহান প্রভুকে কোন পাপিষ্ঠের পাপকর্ম কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না বা কোন অত্যাচারীর অত্যাচার তাঁর ভাণ্ডারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না অথবা কোন অনুগত বান্দার ইবাদত-বন্দেগীও তাঁর কোনরূপ কল্যাণ করে না এবং কোন ন্যায়বিচারকের ন্যায়পরায়ণতাও তাঁর সাম্রাজ্যের কিছুই বর্ধিত করে না, বরং অত্যাচারী তার অত্যাচারের মাধ্যমে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, পাপিষ্ঠ পাপের মাধ্যমে নিজেরই নির্ধারিত প্রাপ্য অংশকে নষ্ট করে এবং অনুগত বান্দা তার আনুগত্য দ্বারা নিজেই লাভবান হয়ে থাকে। আর ন্যায়বিচারক তার সুবিচারের মাধ্যমে নিজের সৌভাগ্যই অর্জন করে।

(৫৮) وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৫৮) স্মরণ কর, আমি যখন বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। জনপদের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশের সময় নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা চাই)। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং সৎলোকদের প্রতি আমার দয়াদান বৃদ্ধি করব।

আমাদের নিকট যে সমস্ত বর্ণনা পৌঁছেছে, ঐ সবের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতে উল্লিখিত القرية দ্বারা যে গ্রামে প্রবেশ করে তাদেরকে ইচ্ছানুরূপ আহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চল। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ

হযরত কাতাদাহ (র) হতে ادخلوا هذه القرية এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, ঐ গ্রামটি বায়তুল মুকাদ্দাস। হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية তে উল্লিখিত القرية অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাস। হযরত রবী' (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়াতাংশ ادخلوا هذه القرية অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাস। হযরত ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, ঐ গ্রামটি اريحا আর তা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি অঞ্চল।

فكلوا منها حيث شئتم رغدا এর ব্যাখ্যা ঃ

এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা উক্ত গ্রামে পৌঁছে যা ইচ্ছে কর, পেট পুরে নির্দ্বিধায় ও অবাধে আহার কর। এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে আমি رغدا শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি এবং এ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতামতও উল্লেখ করেছি।

ادخلوا الباب سجدا এর ব্যাখ্যা ঃ

তাদেরকে যে ফটক দিয়ে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা কোনটি? কোন কোন বর্ণনা মতে তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের باب الحطة নামক গেইট। এ কথার বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, ادخلو الباب سجدا-এ উল্লিখিত الباب বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ঈলিয়া অঞ্চলে অবস্থিত باب الحطة। হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুদ্দী (র) থেকে ادخلوا الباب سجدا প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, উল্লিখিত ফটকটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটকসমূহের মধ্যে একটি। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ادخلو الباب سجدا এর الباب হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটকসমূহের মধ্যে একটি ফটক। ঐ ফটকটি باب الحطة নামে প্রসিদ্ধ এবং سجد অর্থ ركعا তথা অবনত মস্তকে। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি ادخلوا الباب سجدا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তোমরা একটি ছোট দরজা দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ادخلوا الباب سجدا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদেরকে অবনত হয়ে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। سجود শব্দের মূল অর্থ কারো উদ্দেশ্যে সম্মান-প্রদর্শনের নিমিত্ত সিজদাহ্ করে তার প্রতি নুয়ে পড়া। কাজেই সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ঝুঁকে পড়া অবস্থাকে সিজদাহ্ বলা হয়। কবির নিম্ন বর্ণিত পংক্তিতে উল্লিখিত سجدا শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

بجمع تضل البلق في حجراته + ترى الاكم فيه سجدا للحوافر

কবি আ'শা (أعشى)-এর নিম্নোক্ত পংক্তিতেও سجود শব্দটি সামনের দিকে নুয়ে পড়ার অর্থ প্রদান করেছে ঃ

فراوح من صلوات المليك طورا سجودا و طورا جوارا

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-ও মহান আল্লাহ্‌র বাণী ركعا سجدا এর ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করেছেন। কেননা راكع এর ركوع অবস্থাও নুয়ে পড়ার একটি অবস্থা, ساجد এর সিজদায় তার নুয়ে পড়ার মাত্রাটি আরো বেশী।

وقولوا حطة এর ব্যাখ্যা ঃ

حطة শব্দটি فعلة এর অনুরূপ। حط الله عنك خطاياك বাক্য হতে এর উৎপত্তি। যার অর্থ আল্লাহ্ আপনার পাপসমূহ মোচন করুন। কেউ কোন কিছু মোচন করলে, তখন তা حط حطها و حطة বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন ক্রিয়ারূপ حددت - رددت - مددت হতে حدة, ردة ও مدة ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (مصدر) গঠিত হয়ে থাকে। তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আমাদের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এ মতের সমর্থনে বর্ণনাসমূহ ঃ হযরত হাসান (র) ও হযরত কাতাদাহ (র) وقولوا حطة এর অর্থ করেছেন احطط عنا خطايانا অর্থাৎ আমাদের গুনাহসমূহ দূরীভূত করুন। হযরত ইবন যায়দ (র) وقولوا حطة এর অর্থ করেছেন এভাবে ঃ وقولوا حطة يحط الله عنكم ذنبكم و خطاياكم অর্থাৎ তোমাদের গুনাহসমূহ আল্লাহ মাফ করুন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হবে يحط عنكم خطاياكم অর্থাৎ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, حطة অর্থাৎ مغفرة —। হযরত রবী' (র) থেকে বর্ণিত যে, حطة অর্থ يحط عنكم خطاياكم —। ইবন জুরায়জ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমাকে 'আতা وقولوا حطة এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা শুনতে পেয়েছি যে, এর অর্থ يحط عنهم خطاياهم —। অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে এর অর্থ قولوا لا اله الا الله তথা তোমরা এমন কালিমা পাঠ করে প্রবেশ কর, যদ্দ্বারা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে, আর তা হচ্ছে لا اله الا الله —। এ অর্থ যারা গ্রহণ করেছেন তৎসম্পর্কিত বর্ণনা ঃ হযরত ইকরামাহ (র) হতে বর্ণিত ঃ وقولوا حطة এর অর্থ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, তা قولوا لا اله الا الله।—অন্যান্য কয়েকজন তাফসীরকারও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তবে তাঁরা বনী ইসরাঈলকে যে বাক্য পাঠ করার কথা বলা হয়েছিল, তাকে الاستغفار বলে উল্লেখ করেছেন। যারা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। সে সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, وقولوا حطة এর অর্থ তাদেরকে ইস্তিগফার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আর অন্য কয়েকজন হযরত ইক্‌রামাহ (র)-এর মতের অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন যে, তাদেরকে যে কথাটি উচ্চারণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা এই ঃ তারা যেন বলে যে, তাদের প্রতি প্রদত্ত আদেশ যথার্থ। এ উক্তির সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ وقولوا حطة এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এর অর্থ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যথার্থ। আরবী ভাষাবিদ্যায় حطة শব্দটি مرفوع (পেশ বিশিষ্ট) হওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। বস্‌রাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন যে, حطة শব্দটি পেশ বিশিষ্ট হওয়ার কারণ এই ঃ তা আসলে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, لتكن منك حطة لذنوبنا যেমনটি কোন লোক অন্য লোকের মনোযোগ আকর্ষণ কামনা করতে চাইলে বলে থাকে ঃ سمعك —। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ঐ শব্দটি এমন, যা আল্লাহ্ তাদেরকে ঐ ভাবেই পেশ বিশিষ্ট রূপে পড়তে আদেশ করেছিলেন। এবং ঐ ভাবেই বলা তাদের জন্য ফরয করেছিলেন। কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ বলেন, এ শব্দের পূর্বে একটি هذه

সর্বনাম উহ্য থাকার কারণে এর উপর পেশ দিয়ে (مرفوع) পড়তে হয়। অর্থাৎ তাদেরকে আদেশ দান করা হয়েছিল যে, তোমরা هذه حطة বল। আরো কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে, حطة বিধেয় (خبر) হিসেবে مرفوع বা পেশ বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যেন এভাবে বলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, ما هو حطة বল। এক্ষেত্রে حطة 'ما' এর خبر হবে। এখানে আমার নিকট যে বক্তব্যটি অপেক্ষাকৃত সঠিক ও প্রকৃত অর্থের কাছাকাছি মনে হয় তা হলো এই ঃ আমরা حطة কে একটি অনুল্লিখিত مبتدا (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়) ধরে رفع (পেশ) অবস্থায় পাঠ করব। উক্ত আয়াতাংশ পাঠের প্রকাশ্য দিকটি এ উহ্য অংশের প্রতি ইঙ্গিতবহ। তথা دخولنا الباب سجدا حطة অর্থাৎ অবনতভাবে আমাদের ফটক দিয়ে প্রবেশ করাই حطة বা পাপসমূহ ক্ষমা পাওয়ার পন্থা। কাজেই প্রকাশ্য অংশের ইঙ্গিত দ্বারা উহ্য অংশটি হতে বিরত রাখা হয়েছে। আর ঐ অংশটি হলো — ادخلوا الباب سجدا। যেমনটি অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما ن الله مهلكهم او معذبهم
عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم

[স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্তির জন্য (সূরা আ'রাফ ৭/১৬৪)] এ আয়াতে معذرة শব্দের দ্বারা একটি উহ্য কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ موعظتنا اياهم معذرة الى ربكم —। অনুরূপভাবে আমার মতে وقولوا حطة এর অর্থ হবে وقولوا دخولنا ذلك سجدا حطة لذنوبنا —। এ অর্থ রবী' ইবন আনাস, ইবন জুরায়জ, ইবন যায়দ প্রমুখ তাফসীরকারগণও গ্রহণ করেছেন, যা আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি। ইকরামার মতানুযায়ী حطة যবর (نصب) সহকারে পড়তে হবে। কেননা, ঐ গোত্রের লোকজনকে যদি لا اله الا الله ও استغفر الله বলার আদেশ দানের কথা ধরে নেয়া হয়, তখন তাদেরকে নিশ্চয়ই এও বলা হয়েছিল যে قولوا هذا القول —। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী قولوا ক্রিয়াপদটি حطة কে পেশ (رفع) দান করেছে। কেননা, 'ইকরামার বর্ণনা অনুযায়ী আদিষ্ট حطة এর অর্থ হচ্ছে لا اله الا الله বলা। আর যদি তা لا اله الا الله হয়ে থাকে, তাহলে قولوا ক্রিয়াপদটি حطة এর উপর আরোপিত। উদাহরণ স্বরূপ যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে উত্তম কথা বলার আদেশ দেয় এবং তাকে বলে যে قل خيرا তখন خيرا যবর বিশিষ্ট (منصوب) হবে আর একে পেশ (رفع) দিয়ে পড়া শুদ্ধ হবে না। যদি কেউ এমনটি পড়ে, তাহলে তা হবে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন পাঠকদের সর্বসম্মতভাবে এই শব্দের পেশবিশিষ্ট (مرفوع) হওয়ার অভিমত 'ইকরামার বর্ণনার তথা قولوا حطة এর বিপরীত। অনুরূপ আমরা হাসান ও কাতাদাহ্‌র যে ভাষ্য উল্লেখ করেছি, তদনুযায়ী وقولوا حطة এর পাঠে حطة কে যবর (نصب) যোগে পড়তে হবে। কেনো, আরবদের রীতি অনুযায়ী কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে কোন ক্রিয়াপদের স্থলে ব্যবহার

করা হলে এবং ক্রিয়াপদের উল্লেখ না করা হলে সেক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে (مصدر) যবর (نصب) যোগে পাঠ করা হয়। যেমন এসম্পর্কে কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

اتجـدوا بأيدى عصبة و سيوفهم + على امهات الهام ضربا شاميا

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য একজনকে বলে ঃ سمعا و طاعة অর্থাৎ اسمع سمعا و اطيع طاعة। যেমন মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ معاذ الله অর্থাৎ نعوذ بالله।

نغفر لكم এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে نغفر لكم এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব এবং তা গোপন রাখব। তাই এর কারণে শাস্তি প্রদান পূর্বক তোমাদেরকে অপমানিত করব না। الغفر শব্দের মূল অর্থ 'ঢাকা' ও পর্দা দেওয়া। যে বস্তু অন্য বস্তুকে ঢেকে রাখে, তাই হলো غافر। এ জন্য লৌহ নির্মিত বর্মের যে অংশটি মস্তককে আবৃত করে, তাকে مغفر বলা হয়, অর্থাৎ 'শিরস্ত্রাণ'। কেননা, তা মাথাকে ঢেকে রাখে। এবং এ কারণে বস্ত্রকে غفر বলা হয়। কেননা, তা লজ্জাস্থান নিবারণ করে এবং কোন দর্শকের চোখ থেকে আচ্ছাদিত অংশকে গোপন করে রাখে। অনুরূপভাবে আউস ইবন হুজার নামক কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ শব্দটি ঢাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন—

فلا اعتب ابن العم ان كان جاهلا + و اغفر عنه الجهل ان كان اجهلا

[আমি আমার চাচাত ভাইকে তিরস্কার করি না, যদিও সে মূর্খ হয়, আমি তার মূর্খতাকে গোপন রাখি, সে যত বড় মূর্খই হোক।]

উক্ত পংক্তিতে غفر عنه الجهل অর্থ استر عليه جهله তথা তার মূর্খতাকে তার নিকট প্রকাশ করি না (সহিষ্ণুতা দেখাই)।

خطايا كم এর ব্যাখ্যা ঃ

خطايا বহুবচন, একবচনে خطيئة। যেমন "مطية" "المطايا" এর বহুবচন এবং "حشايا" "حشية" এর বহুবচন। আর الخطايا বহুবচনরূপে হামজাহ (همزه) কে বাদ দেওয়ার কারণ হলো, এর একবচনের همزه বিহীন রূপটি "خطيه" همزه বিশিষ্ট রূপের চাইতে অধিকতর প্রচলিত এবং তা همزه বিহীন রূপটির বহুবচন। কোন কোন সময় خطيئة এর همزه বিশিষ্ট রূপের বহুবচন خطيئات অর্থাৎ همزه ও ت সহ ব্যবহৃত হয়। "خطيئة" فعيلة এর অনুরূপ। خطأ يخطئ خطيء তথা فعل ، يفعل ، فعلا রূপে এর অর্থ হচ্ছে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে خطا শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত ঃ

و ان مهاجرين تكنفاه + لعمر الله قد خطئا و خابا

অর্থাৎ তারা উভয়েই সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে অকৃতকার্য হয়েছে।

و سنزيد المحسنين এর ব্যাখ্যা ঃ

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান মুসলিম, তার নিষ্ঠা আরো বৃদ্ধি করা হবে, আর যারা পাপী, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় পূর্ণ আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে

এরূপ ঃ "ঐ কথাটি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে প্রবেশ কর, যেখানকার সমস্ত পবিত্র দ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ। তাতে তোমাদের জন্য অপরিমিত প্রাচুর্য দান করা হয়েছে। তবে তোমরা সে জনপদে ফটক দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর এবং বল ঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমাদের এ সিজদাহ্ আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আমাদের পাপসমূহ মোচনের একটি উপায় বিশেষ। তখন আমি তোমাদের পাপীদেরকে দয়া দ্বারা বেষ্টন করব এবং তাদের পাপসমূহ ঢেকে দেব এবং এর বোঝাও তাদের উপর হতে হাল্কা করে দেব এবং তোমাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণকে আমার পক্ষ হতে পূর্ববর্তী করুণার সাথে আরো করুণা বর্ধিত করে দেব।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মহা অজ্ঞতার এবং তাদের প্রভুর প্রতি অবাধ্যতার সংবাদ দান এবং তাদের নবীগণের বিরোধিতা ও রসূলগণের প্রতি বিদ্রূপের সংবাদ দেন, এমতাবস্থায় যে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর বড় বড় নিয়ামত এবং তাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা আল্লাহ্র বহু চমৎকার নিদর্শন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের যে সমস্ত বংশধর বর্তমান রয়েছে এবং এ আয়াতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে ভর্ৎসনা করা এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের প্রতি রসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রেরণের মতো আল্লাহর এতবড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নুবূওয়াতকে অস্বীকার করে তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করার মাধ্যমে সীমা লংঘন করেছে। তদুপরি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হাতে প্রকাশিত বহু অকাট্য প্রমাণাদি থাকার পরও রসূলের সাথে তাদের ঐ আচরণ তাদের পূর্বসূরীদের অনুরূপ। এ আয়াতে যাদের চরিত্রের বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যাদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ অতঃপর অত্যাচারীরা এমন একটি বাক্যের সাহায্যে তাদের প্রতি নির্দেশিত বাক্যটিকে পাল্টিয়ে দিয়েছে, যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কাজেই অত্যাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম।

(৫৯) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

(৫৯) কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

এখানে فبدل শব্দের অর্থ হলো فغير তথা পরিবর্তন করে দিল এবং الذين ظلموا অর্থ যারা এমন সব কাজ করেছে, যা করা তাদের জন্য মোটেই উচিত ছিল না এবং قولا غير الذى قيل لهم দ্বারা এ অর্থ করা হয়েছে যে, তাদেরকে যা বলতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পরিবর্তিত করে দিল। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল (স) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা অবনতভাবে ফটক দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন; আমি তোমাদেরকে

ক্ষমা করে দেব। কিন্তু তারা এ নির্দেশ পালনে বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করল এবং পেছনের দিকে বাঁকা হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশ করল আর حطة শব্দ উচ্চারণের পরিবর্তে তারা حبة في شعرة বলল। হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য একটি সূত্রে হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) রসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, তারা যে প্রবেশদ্বার দিয়ে অবনত হয়ে প্রবেশ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল, তারা বরং পেছনের দিকে ঝুঁকে একথা উচ্চারণ করতে করতে প্রবেশ করেছিল যে, حنطة في شعيرة —।

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে حطة সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা حطة শব্দটিকে বিকৃত করে حبة বলতে লাগল। আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة এ আদেশ পালনে বিকৃতি ঘটিয়ে তারা حنطة حمراء فيها شعيرة বলেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতাংশ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ادخلوا الباب سجدا এর ব্যাখ্যা করেছেন ادخلوا الباب ركعا من باب صغير —। অতঃপর তারা পিঠের দিকে উল্টোভাবে ঐ দরজায় প্রবেশ করল এবং বিদ্রূপবশত حنطة শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم দ্বারা এ ঘৃণ্য কাজের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ ও হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে, ادخلوا الباب سجدا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন : তাদেরকে যেভাবে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, তারা তার বিপরীতভাবে প্রবেশ করে, যেমন তারা পেছনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং তাদেরকে যে বাক্য উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পরিবর্তন করে নিয়েছিল। তারা বলল : حبة في شعرة —। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে অবনত হয়ে ফটক দিয়ে প্রবেশের আদেশ দিয়েছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন حطة বলার জন্য। তাদের জন্য প্রবেশদ্বারটি সংকুচিত করা হয়েছিল, যাতে তারা ঝুঁকে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা ঝুঁকে প্রবেশ করেনি, বরং পেছনের দিকে উল্টোভাবে প্রবেশ করেছিল আর حطة বলার পরিবর্তে বলেছিল حنطة —। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে মসজিদে প্রবেশ করার এবং حطة বলার আদেশ দিয়েছিলেন, তাদের জন্য প্রবেশদ্বার সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, যাতে তাদেরকে ঝুঁকে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু সামনের দিকে ঝোঁকার পরিবর্তে তারা পাহাড়ের দিকে পৃষ্ঠ দিয়ে পেছনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করল। এটা ছিল ঐ পাহাড়, যেখানে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-এর জন্য আপন তাজাল্লী প্রকাশ করেছিলেন এবং তারা নির্দেশিত حطة এর পরিবর্তে বলেছিল حنطة —। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم দ্বারা এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত দান করেছেন। হযরত ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, তারা বলেছিল هطى سمقا يا ازبة هزبا আরবীতে এর অর্থ হলো حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء —। মহান আল্লাহ্‌র বাণী فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم এর অর্থও তাই। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি و ادخلوا الباب سجدا এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তারা পিছনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করেছিল। হযরত ইকরামাহ (রা)

থেকে বর্ণিত যে, "তোমরা প্রবেশদ্বার দিয়ে ঝুঁকে প্রবেশ কর" বলা হলে তারা পেছনের দিকে মাথা বেঁকে এবং তাদেরকে حطة বলার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা তার পরিবর্তে حنطة حمراء فيها شعيرة বলে ঐ আদেশ ভংগ করল। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم এর তাৎপর্যও তাই। হযরত রবী' ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة প্রসংগে তিনি বলেন : তারা এ নির্দেশ লংঘন করে গাল মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করেছিল। এবং و قولوا حطة এর অর্থ হলো, তোমরা حطة বল, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—এই কথার স্থলে তারা বলল, حنطة —। কারো কারো মতে তারা حبة في شعيرة বলেছিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবন যায়দ (র) বলেন : মহান আল্লাহ্‌র বাণী و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة এর অর্থ হলো, তোমরা حطة বলতে বলতে প্রবেশদ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর, তবেই তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন যে, তারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি বিদ্রূপ করে বলল যে, মূসা আমাদের সহিত حطة বলার আদেশ দ্বারা একটি চালবাজি করছেন—তখন তারা পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল حنطة —। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা প্রবেশ করার সময় حبة في شعيرة বলেছিল। এভাবে যা বলার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা হতে ভিন্ন কথা উচ্চারণ করে তারা ঐ আদেশকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।

فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء এর ব্যাখ্যা :

এই আয়াতাংশে উল্লিখিত على الذين ظلموا অর্থ যারা এমন কাজ করল, যা করার কোনো অধিকার তাদের ছিল না—তথা তাদের প্রভু তাদেরকে যা বলার আদেশ দিয়েছিলেন তাকে ভিন্ন কথার সাহায্যে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং তাদের আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কারণে এবং যে পাপকার্য করা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, সে কাজের আশ্রয় লওয়ার দরুন তাদের প্রতি আমি আকাশ থেকে গযব নাযিল করলাম ; কেননা, তারা পাপকার্য করছিল।

আরবী ভাষায় رجز শব্দটির অর্থ হচ্ছে আযাব। মহানবী (স) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে طاعون সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তা এক প্রকার আযাব বিশেষ, যদ্দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। উসামা ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মহানবী (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন যে, এই ব্যথা অথবা বলেছেন এই রোগ হচ্ছে একটি শাস্তি বিশেষ, যদ্দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 'আমির ইবন সাআদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সা'আদ ইবন মালিকের নিকট উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (স) ইরশাদ করেছেন, মহামারী (طاعون) এক প্রকার আযাব বিশেষ, যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তীদের (অথবা বলেছেন, যা দ্বারা বনী ইসরাঈলকে) শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য তাফসীরকারগণও আমাদের এই উক্তির অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

এতদসম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে : رجزا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন, এর অর্থ عذاب তথা শাস্তি। আবুল 'আলিয়াহ হতে বর্ণিত আছে : فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন الرجز অর্থ গযব। ইবন

যায়দ (র) বলেছেন ঃ যখন বনী ইসরাঈলকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা অবনত মস্তকে প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর এবং তোমরা حطة উচ্চারণ কর, তখন অজাচারীরা এমন বাক্য দ্বারা তাকে পরিবর্তন করেছিল, যা তাদের প্রতি আদেশকৃত বাক্যের চাইতে ভিন্নতর। কাজেই মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি মহামারী প্রেরণ করলেন এবং তাদের কেউই আর জীবিত থাকেনি। তিনি এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের আয়াত فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون পাঠ করলেন। তিনি বলেন, এই মহামারীতে শিশুগণই শুধু বেঁচেছিল। তাদের মধ্যেই বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন কল্যাণকর কাজ (الفضل), ইবাদত ইত্যাদি প্রচলিত হলো। আরো প্রচলিত হলো ভাল কাজসমূহ। তাদের পিতৃগণের সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। মহামারী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ইবন যায়দ (র) বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত رجزا অর্থ আযাব এবং কুরআনে যে যে স্থানে رجز শব্দের উল্লেখ হয়েছে, সব স্থানেই তা আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, رجزا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের কিতাবে যে যে স্থানে رجز শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা আযাব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, الرجز এর ব্যাখ্যা হলো আযাব। মহান আল্লাহ্‌র আযাবের আবার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। আল্লাহ্ পাক সংবাদ দান করেছেন যে, আমরা যাদের বিষয়কে رجز এর ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছি, তিনি তাদের প্রতি তা অবতীর্ণ করেন। হতে পারে যে, তা মহামারী রূপে হবে অথবা অন্য কিছু। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনায় অথবা কোন সুস্পষ্ট হাদীসে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, তা কোন নির্দিষ্ট প্রকারের আযাবের নাম কিনা। কাজেই এ প্রসংগে সঠিক কথা হলো আল্লাহ্ তা'আলা যা ইরশাদ করেছেন, তা উল্লেখ করা। তিনি ইরশাদ করেন ঃ "অতঃপর আমি তাদের পাপের দরুন আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম।" তবে হযরত ইবন যায়দ (র) বর্ণিত ভাষ্যটি সঠিক বলে ধারণা করা যায়। তিনি তার স্বপক্ষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তির যে বর্ণনা পেশ করেছেন, তার কারণে এ উক্তিতে তিনি মহামারীকে আযাব বলে সংবাদ দান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এ মহামারীর মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী যুগের একটি জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যদিও আমি একথা বলছি না যে, তা সন্দেহাতীতভাবে ঐ প্রকার আযাবই ছিল। কেননা, মহানবী (স) হতে হাদীসে ঐ মহামারী দ্বারা কোন্ বিশেষ উম্মতকে শাস্তিদান করা হয়েছিল, তার উল্লেখ নেই। এমনও হতে পারে যে, যাদেরকে ঐ বিশেষ শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল, তারা আয়াতাংশ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم-এ উল্লিখিত বিশেষণের সম্প্রদায় নাও হতে পারে।

بما كانوا يفسقون-এর ব্যাখ্যা ঃ

আমি এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে এ মর্মে বিশ্লেষণ করেছি যে, فسق শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর পরিধি হতে বের হয়ে যাওয়া। এ হিসেবে بما كانوا يفسقون এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা ও আদেশ লংঘনের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল।

(৬০) وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

(৬০) স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইল, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, প্রতিটি সম্প্রদায় যার যার ঘাট চিনে নেয়। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর। এবং দুষ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না।

এ আয়াতে উল্লিখিত و اذ استسقى موسى لقومه , এর অর্থ ঃ আর মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য আমার নিকট পানির আবেদন করল, যেন আমি তার সম্প্রদায়ের লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির ব্যবস্থা করি। এখানে উল্লিখিত অংশের উপর নির্ভর করে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে فقلنا اضرب بعصاك الحجر عينا এখানেও উল্লিখিত অংশ দ্বারা উহ্য অংশের আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। এ অংশের প্রকৃত অর্থ ঃ "অতঃপর আমি বললাম, তুমি তোমার লাঠির সাহায্যে পাথরে আঘাত কর। সে আঘাত করল এবং স্রোতধারার উৎসরণ আরম্ভ হলো।" এখানে হযরত মূসা (আ)-এর পাথরে আঘাত করার সংবাদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, উল্লিখিত অংশে তার উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অনুরূপভাবে قد علم كل اناس مشربهم এর অর্থ হলো قد علم كل اناس منهم مشربهم —। এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে আমি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছি যে, اناس শব্দটি বহুবচন, তার একবচন কোন শব্দ নেই। الانسان শব্দকে যখন বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকে اناسى ও اناسية বলা হয়। হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় হলো বনী ইসরাঈল। এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক যাদের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তারা যখন 'তীহ' নামক প্রান্তরে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় পড়েছিল, তখন হযরত মূসা (আ) তাদের পানির জন্য দু'আ করেছিলেন। যেমন হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি و اذ استسقى موسى لقومه আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এ ঘটনাটি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন তারা প্রান্তরে অবস্থানকালে তাদের নবীর নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ উত্থাপন করল, আর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে তূর পাহাড়ের এক টুকরো পাথর সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন— যাতে হযরত মূসা (আ) তাঁর লাঠির সাহায্যে আঘাত হানতে পারেন। তারা তূর পাহাড়ের একটি প্রস্তরখণ্ড তাদের সাথে রেখেছিল। যখনই এরা কোন মনযিলে গিয়ে পৌঁছত, তখন হযরত মূসা (আ) তাতে আঘাত করতেন। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ সৃষ্টি হতো। প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট ঝর্ণাধারা চিহ্নিত করা হতো। সব ক'টিতে পর্যাপ্ত পানির প্রবাহ থাকত। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ ঘটনাটি তীহ প্রান্তরে ঘটেছিল। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মেঘমালার দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন। তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন المن ও السلوى এবং তাদের জন্য এমন পোশাকের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা ময়লা হতো না ও পুরানো হতো না এবং তাদের সামনে একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাথর স্থাপন করে হযরত মূসা (আ)-কে তাতে আঘাত করার আদেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) উক্ত পাথরে আঘাত করলে

সেখান থেকে বারোটি পানির উৎসরণ সৃষ্টি হলো—তথা এর প্রতিটি কোণ থেকে তিনটি করে উৎসরণ সৃষ্টি হয়ে ঐগুলির এক একটি প্রবাহ প্রতিটি গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। তারা যেখানেই গমন করত, উক্ত প্রস্তরখণ্ডও সেখানে তাদের অবতরণস্থলের প্রথম তাঁবুর নিকটে দৃষ্ট হতো। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তা ছিল 'তীহ'-এর প্রান্তরে। হযরত মূসা (আ) তাদের জন্য পাথরে আঘাত করলেন এবং সেখানেই সৃষ্টি হলো বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ। প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে উৎসরণ নির্ধারিত ছিল, যেখান থেকে তারা পানি পান করত। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি فقلنا ضرب بعصاك الحجر الاية প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে ঝর্ণার উৎসরণ নির্দিষ্ট ছিল। এ সমস্ত ছিল 'তীহ্' প্রান্তরে, যখন তারা দিগ্বিদিক ঘোরাঘুরি করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি اذ استسقى موسى لقومه الاية এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তারা 'তীহ' প্রান্তরে তৃষ্ণায় কষ্ট পাওয়ার ভয় করলে তাদের জন্য প্রস্তরখণ্ড হতে বারোটি ঝর্ণার উৎসরণ হলো, যা হযরত মূসা (আ)-এর আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الاسباط অর্থ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরগণ। তাঁর বারোজন পুত্র ছিলেন। প্রত্যেক পুত্রের সন্তান-সন্তুতি এক একটি উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রতিটি পরিবারের লোকেরা এক একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। হযরত ইবন যায়দ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) 'তীহ' প্রান্তরে তাদের পানির জন্য দুআ করেছিলেন। অতঃপর তাদের জন্য ছাগলের মস্তক সদৃশ একখণ্ড পাথর হতে পানির ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরো বলেন, তারা যখন ভ্রমণ করত, তখন কোন স্থানে অবতরণ করলে তাদের তাঁবুর নিকটবর্তী একটি স্থানে ঐ পাথরখণ্ডটি দৃষ্ট হতো এবং হযরত মূসা (আ) তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেই সেখান হতে বারোটি উৎসরণ সৃষ্টি হতো। তাদের প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে উৎসরণ নির্দিষ্ট হতো। বনী ইসরাঈল তা থেকে পানি পান করত। অবশেষে তাদের লোকজন ঐ স্থান ত্যাগ করলে ঐ উৎসরণ বন্ধ হয়ে যেতো এবং কোন কোন বর্ণনানুযায়ী তাকে এক পার্শ্বে রেখে দেওয়া হতো। যখন তিনি কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তাকে স্থাপন করতেন। তিনি লাঠি দিয়ে ঐ পাথরে আঘাত দিতেন আর তা হতে প্রতিটি পার্শ্ব দিয়ে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় পানির উৎসরণ বের হতো। হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এটা ছিল তীহ প্রান্তরের অবস্থা, তবে قد علم كل اناس مشربهم এর দ্বারা আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে এ সংবাদটুকু দান করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য পানির যে উৎসরণ সৃষ্টি করেছিলেন এবং যেভাবে আল্লাহ্ এ আয়াতে ঐ উৎসরণের প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন, তা সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রচলিত অর্থের বিপরীত তথা আল্লাহ্ তাআলা সাধারণত পর্বতমালা ও যমীন হতে যে ভাবে পানির উৎসরণ সৃষ্টি করেন, তার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এ আকাশ ও যমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহ পাক ১২টি গোত্রের প্রতিটির জন্য পাথরখণ্ড হতে নিঃসৃত এক একটি ঝর্ণাধারা নির্ধারণ করে দেন, যার প্রকৃতি এ আয়াতে তিনি বর্ণনা করেছেন। ঐ ঝর্ণাধারা হতে ঐ সকল গোত্রের লোকেরা পানি পান করত। কিন্তু এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের (বা পরিবারের) জন্য নির্ধারিত ঝর্ণা হতে পানি পান করত না। এছাড়াও প্রতিটি গোত্রের জন্য পাথরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পানি নিঃসরণের উৎস চিহ্নিত ছিল, যেখান হতে প্রতিটি গোত্রের লোক পানি পান করত। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের ব্যাপারে সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের পানির ঘাট সম্পর্কে অবহিত ছিল। ঐ বিশেষ গোত্রের লোকেরা ব্যতীত অন্যরা তাদের পানি পান করার স্থান

বা সূত্র সম্পর্কে জানত না। কেননা, ঐ পানির উৎসে তারা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের শরীক ছিল না। আর না তার প্রবাহে কেউ শরীক ছিল। কেননা, ঐ বারোটি গোত্রের প্রতিটিই এক একটি উৎস হতে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকারী ছিল। আবার অন্য উৎসসমূহে ঐ বিশেষ গোত্রের কোন অধিকার ছিল না বা কোন্‌টি কোন্ গোত্রের, তাও তাদের জানা ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু প্রতিটি গোত্রকে তাদের পানির উৎস জানার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

كلوا واشربوا من رزق الله এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশও এমন একটি বাক্যাংশ বিশেষ, যেখানে প্রকাশিত অংশের ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে উহ্য অংশের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজনীয়। তা এভাবে যে, উক্ত বাক্যের পূর্ণ রূপ হলো ঃ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَهُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ فَقِيلَ لَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ -

এজন্য আল্লাহ্ তাঁর বাণীতে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে 'তীহ' প্রান্তরে যে রিযিক দান করেছেন, তা ভক্ষণ করার আদেশ দিয়েছেন—যেমন 'মান' ও 'সালওয়া' এবং তথায় পানির যে উৎসরণ সৃষ্টি করেছেন, তা হতে পান করার আদেশ দিয়েছেন। যে উৎসরণ ছিল একটি স্থিতিহীন পাথরখণ্ড হতে নিঃসৃত। যেখানে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অসীম কুদরত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর পক্ষে এরূপ সুনিশ্চিত ঝর্ণাধারার উৎসরণ সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন, তার বিবরণ ও তাদেরকে বিশেষ নিয়ামত দানের তথা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গর্ব ও বড়াই করে পৃথিবীর বুকে চলতে নিষেধ করেছেন, সে প্রসংগে ইরশাদ করেন و لا تعثوا فى الارض مفسدين —।

و لا تعثوا فى الارض مفسدين এর ব্যাখ্যা ঃ

ولا تعثوا فى الارض مفسدين এর অর্থ لا تطغوا و لا تسعوا তথা তোমরা পৃথিবীর বুকে সীমা লংঘন কর না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, لا تعثوا فى الارض مفسدين অর্থ لا تسعوا فى الارض فسادا —। হযরত ইবন যায়দ (র) হতে প্রসংগে বলেন যে, لا تعث অর্থ لا تطغ তথা সীমা লংঘন কর না। হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত ঃ لا تعثوا فى الارض مفسدين অর্থ لا تسيروا فى الارض مفسدين (অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর না)। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ঃ لا تعثو فى الارض مفسدين অর্থ لا تسعوا فى الارض (চরম অশান্তি সৃষ্টি কর না)। العثا শব্দের প্রকৃত অর্থ شدة الافساد

তথা চরম অশান্তি সৃষ্টি করা। আরবী ভাষায় ব্যবহৃত عثى فلان فى الارض দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্তৃক দেশে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়। একাধিক ব্যক্তির কথা বুঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে هم يعثون । عثا ক্রিয়াপদের উৎস সম্পর্কে আরো দুটি মত আছে। প্রথম মতানুযায়ী তা عثا يعثو عثوا তথা باب نصر হতে নিঃসৃত। এই মত অনুযায়ী لا تعثو এর মধ্যবর্ণ পেশযুক্ত হবে। কিন্তু কোন পাঠক এ কিরায়াত অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে যে ব্যক্তি এই কিরায়াতে নিজের ক্রিয়া ব্যক্ত করতে চাইবে, সে বলবে عثوت اعثو । আর যে প্রথম মত অবলম্বন করবে, সে বলবে عثيت اعثى । অন্য কয়েকজন মনে করেন যে, তা عاث يعيث عيثا , عيوثا و عيثانا হতে রূপান্তরিত। এসব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবি রুবাহ্ ইবনুল আজ্জাজ রচিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে ব্যবহৃত عاث শব্দটি عيث ক্রিয়ামূল হতে নিষ্পন্ন। যেমন ঃ

وعاث فينا مستحل عائث + مصدق او تاجر مقاعث

এখানে উল্লিখিত عاث فينا অর্থ افسد فينا (সে আমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে)।

(৬১) وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّۦنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

(৬১) এবং স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য দুআ কর। তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তু দিয়ে বদল করতে চাও। তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো ও তারা আল্লাহর গযবে পতিত হলো। আর তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমা লংঘন করার কারণে তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।

এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে আমরা صبر শব্দের অর্থ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। صبر শব্দের অর্থ নিজেকে কোন বস্তু থেকে বিরত রাখা। কাজেই যদি صبر অর্থ এ হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ঃ

واذكروا اذ قلتم يا معشر بنى اسرائيل لن نطيق حبس انفسنا على طعام واحد -

(হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা কোন অবস্থাতেই এক প্রকার খাদ্যের উপর সবর করতে পারব না।) এক প্রকার খাদ্য হলো তা, যে সম্বন্ধে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন, যা তিনি ময়দানে তীহে খাদ্য হিসেবে দান করেছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারের মতে তা ছিল 'সালওয়া'।

হযরত ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (র) বলেন, এ আয়াতে যে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, তা গোশতের সাথে মিহিন ময়দার রুটি। কাজেই (হে মূসা!) আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাদের জন্য জমিতে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করেন, যেমন তরকারি, কাঁকুড় ইত্যাদি এবং আল্লাহ্ পাক তার সাথে যেসব বস্তুর উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, তারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসব কিছুর আবেদন করেছিল এবং হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসব কিছুর আবেদন করার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত কাতাদাহ (র) و اذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ঐ সম্প্রদায়টিকে 'তীহ' প্রান্তরে মেঘের ছায়া দান করা হয়েছিল এবং তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল 'মান' ও 'সালওয়া'। তাতে তারা অস্বস্তি বোধ করল এবং মিসরে থাকাকালীন সময়ের জীবনধারার কথা স্মরণ করছিল। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আদেশ দিলেন ঃ তোমরা একটি নগরে অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সবই মওজুদ আছে।

হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি لن نصبر على طعام واحد এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলগণ এক প্রকারের খাদ্য কিছু দিন ধরে খাওয়ার দরুন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তখন তারা ইতিপূর্বেকার জীবনধারার কথা স্মরণ করতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ)-কে বলল ঃ আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ করুন যাতে তিনি আমাদের জন্য জমিতে উৎপাদিত দ্রব্য উৎপন্ন করে দেন—যেমন বরবটি, ক্ষিরে ও শিম ইত্যাদি। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত, তিনি و اذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে তাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল 'সালওয়া' এবং পানীয় ছিল 'মান'। অতঃপর তারা উল্লিখিত বস্তুসমূহ চাইলে তাদেরকে বলা হলো ঃ اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত কাতাদাহ (র) বলেছেন যে, তারা যখন সিরিয়া অঞ্চলে উপনীত হলো, তখন ইতিপূর্বেকার খাদ্যদ্রব্যসমূহ যা তারা খেয়ে অভ্যস্ত ছিল, তা আর পেল না, তখন তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলল ঃ ادع لنا ربك يخرج لنا ... ... الاية এবং তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করা হয়েছিল আর তাদের নিকট 'মান' ও 'সালওয়া' প্রেরণ করা হতো। এতে তারা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এবং মিসরে থাকাকালীন যে জীবনধারায় তারা অভ্যস্ত ছিল, তার

কথা স্মরণ করতে লাগল। لن نصبر على طعام واحد এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত আবু নাজীহ (র) বলেছেন যে, তা ছিল 'মান' ও 'সালওয়া'। তারা তার পরিবর্তে আয়াতে উল্লিখিত বরবটি ইত্যাদি পেতে চেয়েছিল। হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে তীহ প্রান্তরে যা দেওয়ার ছিল, তা দেওয়া হয়েছিল। এতে তারা বিরক্তি বোধ করল এবং তারা বলল ঃ হে মূসা, আমরা এক প্রকার খাদ্যে সন্তুষ্ট হতে পারব না! কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুআ কর যেন তিনি আমাদের জন্য জমি হতে উৎপন্ন তরিতরকারি দেন, যেমন বরবটি, ক্ষিরে, শিম, ডাল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি।

হযরত ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত ঃ 'তীহ' প্রান্তরে বনী ইসরাঈলের জন্য এক প্রকার খাদ্য এবং এক প্রকার পানীয় ছিল। তাদের পানীয় ছিল মধু, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হতো। তার নাম ছিল 'মান'। আর তাদের আহার্য ছিল এক প্রকার পাখি, যাকে 'সালওয়া' বলা হতো। তারা পাখির গোশত খেত এবং মধু পান করত। তারা রুটি ইত্যাদি কিছুই পেত না। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ)-কে বলল ঃ হে মূসা, আমরা এক জাতীয় খাদ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট হব না। কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, যেন আমাদের জন্য জমি হতে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেন, যেমন বরবটি ইত্যাদি। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি فإن لكم ما سألتم পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারা হযরত মূসা (আ)-কে যে ভাবে দুআ করতে বলেছিল, অর্থাৎ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্য অমুক অমুক বস্তু উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করে দেন, যেমন বরবটি, ক্ষিরে ইত্যাদি। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত من হরফটি অংশবোধক (تبعيضية) অব্যয়। এজন্য مما تنبت الخ বলার মাধ্যমে সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ করেন নি। কেননা, من অব্যয়টি থাকার কারণে ঐ কথার অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলে اصبح اليوم عند فلان من الطعام তখন অর্থ দাঁড়াবে যে, সে এর কিয়দংশ গ্রহণ করেছে। অনেকের মতে এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত ও অর্থহীন। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে يخرج لنا ما تنبت الارض من بقلها এ উক্তির সপক্ষে আরবদের প্রচলিত একটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন তারা ما رايت من احد বলতে ما رايت احدا বুঝিয়ে থাকে। তারা তাদের এ মতের সপক্ষে আল্লাহ্ পাকের কালাম হতে একটি উক্তি পেশ করেছেন ঃ যথা و يكفر عنكم من سيئاتكم বলে আল্লাহ্ পাক و يكفر عنكم سيئاتكم বুঝিয়েছেন। এবং আরো একটি উক্তি পেশ করেছেন যে, আরব অঞ্চলে قد كان من حديث فخل عني حتى اذهب বলে قد كان حديث বুঝানো হয়ে থাকে। আরবী ভাষাবিদদের এক দল এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, من নিরর্থক অব্যয় রূপে এসেছে। তাঁদের মতে, من অব্যয়টি যেখানেই আসুক না কেন, তার একটি অর্থ অবশ্যই থাকে এবং তার এ অর্থ হয়ে থাকে যে, ব্যবহারকারী তাকে যে জন্য ব্যবহার করেছে, তার অংশবিশেষ বুঝানো হয়েছে—পুরোটা নয়। এই من যেখানেই এসেছে একটি অর্থ প্রদান করেছে। কাজেই এ আলোচনার আলোকে আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াবে فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الارض من بقلها و قثائها উল্লেখ্য যে, بقل ، قثاء ، عدس ও بصل এ সমস্ত উৎপন্নজাত দ্রব্য তাদের পরিচিত বস্তু। তবে فوم শব্দের অর্থ নিয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কারো মতে তা গম ও রুটি। এ মতের সপক্ষে বর্ণনা ঃ হযরত আবু নাজীহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ الفوم অর্থ রুটি। হযরত আতা (র) ও মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন

যে, وفومها অর্থ وخبزها তথা রুটি। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি فومها এর অর্থে বলেন الخبز (রুটি)। হযরত কাতাদাহ (র) ও হযরত হাসান (র) হতে বর্ণিত যে, الفوم ঐ শস্য বিশেষ, যদ্দ্বারা মানুষ রুটি তৈরি করে। হযরত কাতাদাহ (র) ও হযরত হাসান (র) উভয়ে উক্ত রূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ মালিক فومها এর অর্থ করেছেন الحنطة (গম)। হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত আছে فومها অর্থ الحنطة। হযরত হাসান (র) ও হযরত হাসীন (র) আবূ মালিক হতে বর্ণনা করেছেন فومها অর্থ الحنطة। হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত যে, الفوم অর্থ ঐ শস্য, যদ্দ্বারা লোকেরা রুটি তৈরি করে থাকে। হযরত ইবন আবী রুবাহ্ و فومها সম্পর্কে বলেছেন وخبزها। হযরত মুজাহিদ (র)-ও তাই বলেছেন। হযরত ইবন যায়দ (র) বলেছেন, فوم হলো রুটি। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, فومها এর অর্থ গম ও রুটি। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তা হলো গম। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী و فومها এর অর্থ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বনী হাশিম গোত্রের পরিভাষায় الفوم হলো গম। হযরত আবূ নাঈম (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ্র বাণী فومها এর অর্থ প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'গম'। তিনি আরো বলেন যে, তুমি কি কবি উহায়হা ইবন আল জাল্লাহর নিম্নোক্ত পংক্তি শুনতে পাওনি?

قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا + ورد المدينة عن زراعة فوم

অর্থাৎ মদীনাতে গম ফসল এসে পৌঁছেছে। অন্য এক দলের মতে الفوم অর্থ রসুন। এ মতের সমর্থনে বর্ণনাসমূহ ঃ লাইছ কর্তৃক হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, তা 'রসুন'। হযরত রবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, الفوم الثوم এবং কোন কোন পাঠ অনুযায়ী و فومها এর স্থলে و ثومها আছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গম ও রুটিকে فوم আখ্যায়িত করা প্রাচীন ভাষারই প্রথাবিশেষ। যেমন এই ভাষাভাষীদের একটি জনশ্রুত প্রবাদ আছে যে, তারা فوموا لنا কে اختبزوا لنا অর্থে ব্যবহার করত। অর্থাৎ আমাদের জন্য রুটি তৈরি কর। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর পাঠ و ثومها —। যদি এ বর্ণনা শুদ্ধ হয়, তাহলে তার কারণ এও হতে পারে যে, فاء এবং ثاء এমন দুটি বর্ণ, যেগুলি একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন وقعوا في عاثور شر ও وقعوا في عافور شر উভয়ই সমার্থক। আর যেমন الاثافي ও الاثاثي এবং مغافير ও مغاثير ইত্যাদিতে ثاء কে فاء দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে, কেননা فاء এবং ثاء এর উৎসস্থল কাছাকাছি। المغافير এক প্রকার মিষ্টি পানীয় যা আকাশ হতে বিভিন্ন বৃক্ষের উপর মধুর ন্যায় পতিত হয়।

أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير এর ব্যাখ্যা ঃ

মূসা (আ) তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা কি ঐ বস্তু গ্রহণ করতে চাও, যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও স্বল্প মূল্যের। এভাবেই তারা বিনিময় করছিল। আরবী শব্দ الاستبدال আসলে কোন একটি বস্তুকে বর্জন করে অন্যটি গ্রহণ করার নাম। আয়াতে উল্লিখিত أدنى অর্থ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের ও

কম গুরুত্বের অধিকারী। এ শব্দটি আরবীতে প্রচলিত উক্তি هذا رجل دنى بين الدناءة হতে উদ্ভূত। তার কোন কোন ব্যক্তি যখন নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ সন্ধান করে, তখন বলা হয় انه ليدنى فى الامور হামযা (همزه) বিহীন ভাবে। আবার কখনো আরবী ভাষার কোন কোন প্রথানুযায়ী (শ্রুতিনির্ভর) তা همزه সহকারে ব্যবহৃত হয়, যেমন বলা হয় ما كنت دانئا বা و لقد دانأت। আমাদের কোন কোন বন্ধু আমাকে কবি আ'শার নিম্নোক্ত পংক্তিটি নিম্নরূপ পাঠ করে শুনিয়েছেন ঃ

باسانة الوقع سرابيلها + بيض الى دانئها الظاهر

এ পংক্তিতে دانئى শব্দটি همزه সহকারে। তিনি আরো বলেছেন, তিনি আরবদের অনেককে انه لدانئى خبيث কে همزه সহকারে পাঠ করতে শুনেছেন। যদি এ উক্তি শুদ্ধ হয়, তাহলে বলতে হবে যে, همزه বিহীন ও همزة সহকারে উভয়ই এক একটি ভাষাগত পদ্ধতি বিশেষ। বস্তুত যারা 'মান' ও 'সালওয়া' স্থলে তরকারি, ক্ষিরা, ডাল, পেঁয়াজ ও রসুন ইত্যাদি চেয়েছিল, তারা নিঃসন্দেহে উত্তম বস্তুকে পরিহার করে নিকৃষ্টতরকেই গ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ الذى هو ادنى এর ব্যাখ্যা করেছেন الذى هو اقرب দ্বারা। এ ব্যাখ্যায় শব্দটি دنو হতে আধিক্যবোধক বিশেষ্য পদ (التفضيل) এর অর্থ নিকটতর। কিন্তু আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাফসীরকারদের একটি দলও সে রকম মত পোষণ করেন। এ মত প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ হযরত কাতাদাহ্ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ اتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير অর্থ اتستبدلون الذى هو شر بالذى هو خير منه (তোমরা কি ভালো জিনিসের পরিবর্তে মন্দ জিনিস ব্যবহার করতে চাও?) হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, الذى هو ادنى অর্থ اردأ (অধিকতর নিকৃষ্ট)।

اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم এর ব্যাখ্যা ঃ

যখন মূসা দুআ করল, তখন আমি তার দুআ কবুল করলাম এবং তাদেরকে আদেশ দিলাম যে, তোমরা একটি নগরে প্রবেশ কর। এ অংশটুকু উহ্য বাক্যের অর্থ বহন করে। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, الهبوط الى المكان অর্থ কোনো স্থানে অবতরণ করা। এ অর্থে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই ঃ

و اذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال لهم موسى اتستبدلون الذى هو اخس و أردأ من العيش بالذى هو خير منه فدعا لهم موسى ربه ان يعطيهم ما سألوه فاستجاب الله له دعاءه فاعطاهم ما طلبوا و قال الله لهم اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم -

পাঠবিশারদগণ مصرا এর পাঠ সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখিয়েছেন। অধিকাংশ পাঠবিশারদ এটিকে مصرا রূপে تنوين যোগে পাঠ করেছেন। আবার কেউ কেউ তা تنوين ব্যতীত পাঠ করেছেন এবং লেখার সময় مصر আলিফকে বাদ দিয়ে লিখেছেন। যারা একে تنوين সহকারে পাঠ করার পক্ষপাতী, তাঁদের মতে তা যে কোন একটি শহর—কোন নির্দিষ্ট শহর নয়। এই ভাষ্য মোতাবেক অর্থ দাঁড়াবে, তোমরা শহরসমূহের কোনো একটিতে প্রবেশ কর—নির্দিষ্ট

কোন শহরে নয়। এ অর্থে একে অনির্দিষ্ট করার তাৎপর্য হবে এই যে, যেহেতু তোমরা মরুবাসী বেদুঈন, আর যা তোমরা কামনা করেছ, তা মরু অঞ্চলে পাওয়া অসম্ভব। বরং তা গ্রামে বা শহরেই সম্ভব, সেহেতু তোমরা যে কোন শহরে অবতরণ করলে তা পাবে। এমনও হতে পারে যে, যাঁরা শব্দটিকে تنوين সহকারে পাঠের পক্ষে মত পোষণ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ এর অর্থ করেন এ ভাবে যে ঃ তোমরা যে শহরকে মিসররূপে জান এবং তোমাদেরকে যেখান হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাতে প্রবেশ কর। এক্ষেত্রে এ শব্দটিতে الف ও تنوين যোগ করার অর্থ হবে পবিত্র কুরআনের মূল লিপির অনুকরণ করা। কারণ, কুরআনের মূল লিপিতে الف যোগে লেখা হয়েছে। এই মতানুযায়ী مصرا কে الف যোগে লেখার পদ্ধতিটি قواريرا من فضة -এর قواريرا লেখার মতই হবে। আর যাঁরা مصر কে تنوين ছাড়া পাঠ করেছেন, তাঁদের মতে এর দ্বারা ঐ مصر এর কথাই বুঝানো হয়েছে, যেখান হতে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাফসীরকারগণ مصرا এর পাঠ সম্পর্কে যেরূপ মতপার্থক্য প্রদর্শন করেছেন, তদ্রূপ এর অর্থ নিয়েও মতপার্থক্য করেছেন। সাঈদ কর্তৃক কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত যে, اهبطوا مصرا অর্থ শহরসমূহের যে কোন একটিতে অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যাদি রয়েছে। সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা যে কোন একটি শহরে অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এরপর তারা তীহ্ প্রান্তর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিকট 'মান' ও 'সালওয়া' আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারা তরিতরকারি খেতে আরম্ভ করল। কাতাদাহ্ হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি اهبطوا مصرا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেছেন ঃ শহরসমূহের যে-কোন একটিতে অবতরণ কর। মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, اهبطوا مصرا অর্থ শহরসমূহের যে-কোন একটি (مصرا من الامصار)। তাদের ধারণা যে, তারা দ্বিতীয়বার মিসরে ফিরে যায়নি। ইবনে যায়দ বলেছেন, اهبطوا مصرا অর্থ مصرا من الامصار। যেহেতু তাদের ভাষায় مصر শব্দের প্রচলন ছিল না, তাই হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, আপনি কোন্ শহর (مصر) উদ্দেশ্য করেছেন? তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, ঐ পবিত্র শহর (بيت المقدس), যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এ বলে তিনি (ইবন যায়দ) আল্লাহর বাণী ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم পাঠ করলেন।

অন্য একদল তাফসীরকারের মতে, তা ছিল সে নির্দিষ্ট মিসর নগরী, যেখানে ফেরআ'উন রাজত্ব করত। এতদপ্রসংগে বর্ণনা ঃ রবী কর্তৃক আবুল আলিয়া হতে বর্ণিত ঃ তিনি اهبطوا مصرا -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এর অর্থ ফিরআ'উনের মিসর। রবী হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

যাঁরা বলেন, اهبطوا مصرا এর অর্থ مصرا من الامصار বা নগরসমূহের যে কোন একটিকে বুঝানো হয়েছে, আর ফিরআ'উনের মিসর বুঝানো হয়নি, তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য তাদেরকে মিসর হতে বের করার পরে সিরীয় অঞ্চলকে আবাসভূমিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে তারা শক্তিশালী অত্যাচারীদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে 'তীহ্' প্রান্তরে অবস্থানের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ) তাদেরকে বললেন ঃ "ওহে

আমার সম্প্রদায়! তোমরা ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং তোমরা পেছনের দিকে ফিরে যেও না—তা হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" তারা জবাব দিল ঃ "হে মূসা, তথায় রয়েছে একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী ... যতদিন না তারা সেখান হতে বের হয়ে যাবে, আমরা তথায় প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব।" এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এরকম উক্তিকারীদের উপর ঐ অঞ্চলকে হারাম করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা 'তীহ্'-এর প্রান্তরে সকলেই মৃত্যুবরণ করল এবং তাদেরকে সে প্রান্তরে সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে থাকার হুকুম দিলেন। অতঃপর তাদের বংশধরেরা সিরিয়াতে অবতরণ করল এবং তাদেরকে সে পবিত্র ভূমিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তাদের হাতেই আল্লাহ্ পাক সেই শক্তিধর অত্যাচারী জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। আর তা হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত য়ূশা' ইবন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে একথা বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য এ পবিত্র ভূমি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে এ সংবাদ দান করেননি যে, তিনি তাদেরকে মিসর দেশে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের জন্য اهبطوا مصر পড়াও বৈধ হবে। তখন ব্যাখ্যা হবে এরূপ যে, তিনি তাদেরকে মিসরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাফসীরকারগণ বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি এ যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন যে, فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ

كَذٰلِكَ ؕ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ إِسْرَآئِيْلَ ؕ

[পরিণামে আমি ফিরআ'উন গোষ্ঠীকে বের করে দিলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য বাসস্থান থেকে। এরূপই ঘটেছিল। আর বনী ইসরাঈলকে করে দিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (শুআরা ঃ ২৬/৫৭-৫৯)] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا

فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ كَذٰلِكَ قف وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

[তারা পশ্চাতে রেখে গেছে কত উদ্যান ও ঝর্ণা, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য বাসস্থান, কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল। এবং আমি এ সবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্যান্য সম্প্রদায়কে। (দুখান ঃ ৪৪/২৫-২৮)]

আল্লাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) ঐ সব কিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের একটি দলকে ঐ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করানো ব্যতীত তার মালিক বানিয়ে দেওয়ার বা তা হতে উপকৃত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। এ মতের লোকেরা আরো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, এ আয়াতটিকে উবাই ইবন কা'আব এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ

اهبطوا مصر রূপে পাঠ করেছেন (আলিফবিহীন)। তাঁরা বলেন যে, এ পাঠরীতি মতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তা দ্বারা নির্দিষ্ট শহর মিসরকেই বুঝানো হয়েছে।

আমরা বলব যে, আল্লাহ্র কিতাবে এ দু'টি মতের কোন্টি অধিকতর সঠিক, সে বিষয়ে কোনো ইংগিত নেই, এমনকি হযরত নবী করীম (স.)-এর কোনো হাদীস দ্বারাও এ দুই মতের কোন্টি যথার্থ, তার কোন দলীল নেই। এদিকে তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কাজেই আমাদের নিকট এ সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ও যথার্থ মত হলো এরূপ ব্যাখ্যা করা যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যমীন হতে উৎপন্ন-জাত যে সমস্ত শস্য লাভের কথা বলেছিলেন, তাদেরকে তা দান করার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট মুনাজাত করেছিলেন। এমতাবস্থায় যখন তারা মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর মুনাজাত কবুল করলেন এবং তাঁর সাথে সম্প্রদায়ের যে সমস্ত লোক ছিল তাদেরকে নিয়ে একটি এমন সমভূমিতে উপনীত হবার আদেশ দিলেন, যা তাদের জন্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারে। যা তারা চেয়েছিল তা শহর ও গ্রামাঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও উৎপাদিত হয় না। আর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ঐ সব অঞ্চলে অবতরণ করার শর্তে তা দান করেছিলেন। এখন ঐ সমতলভূমি মিসরও হতে পারে এবং সিরিয়াও হতে পারে।

আমার মতে اهبطوا مصرا অর্থাৎ تنوين ও الف যোগে পাঠ করার রীতিই একমাত্র বৈধ পাঠরীতি। কেননা, মুসলমানদের নিকট বিদ্যমান সকল গ্রন্থেই এ পদ্ধতি লিখিত আছে এবং সকল কুরআন পাঠবিশারদ এ পাঠরীতির উপর একমত হয়েছেন। এ পাঠরীতিকে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত অন্য কেউ تنوين ও الف ছাড়া পাঠ করেননি। প্রসিদ্ধ পাঠরীতির বিপক্ষে তা কোন যুক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ وضربت عليهم অর্থ ووضعت عليهم و الزموها الذلة। তথা তাদের উপর লাঞ্ছনা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এবং তারাও একে নিজেদের জন্য অবশ্যম্ভাবী করেছে। এটি আরবী ভাষায় প্রচলিত উক্তি ضرب الامام الجزية على اهل الذمة হতে উদ্ধৃত। এ উক্তিদ্বয়ে ضرب অর্থ وضع। وضرب الرجل على عبده الخراج —অনুরূপভাবে অন্য একটি উক্তি فالزمه اياه-এর অর্থ ضرب الامير على الجيش البعث অর্থাৎ শাসক সৈন্যদের প্রতি যুদ্ধে গমন অবশ্যকর্তব্য করে দিয়েছেন। الذلة শব্দটি ذل فلان يذل ذلا وذلة যেমন صغر الامر থেকে الصغرة এবং قعد হতে القعدة। অর্থাৎ আল্লাহ এবং মু'মিনগণ তাদেরকে যে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় রেখেছেন তা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনার কারণে। তারা যেন এ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বিরাজ করে, তা হতে জিয্য়া কর দান ব্যতীত অব্যাহতি না পায়।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ○

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্য় ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়। (তাওবাহ ঃ আয়াত ২৯)

হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র.) হতে মা'মার বর্ণনা করেছেন, وضربت عليهم الذلة এর অর্থ প্রসংগে তাঁরা বলেছেন যে, তারা বিনীতভাবে স্বহস্তে নিজেদের জিয্য়া কর আদায় করে। المسكنة শব্দটি مسكين শব্দের মূল উৎস। আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে ما فيهم اسكن من فلان এবং ماكان مسكينا — لقد تمسكن مسكنة কোন কোন আরব অঞ্চলে تمسكن تمسكنا ও বলা হয়ে থাকে। এ স্থানে مسكنة শব্দটির অর্থ দারিদ্র, অনাহার ও অভাব, বিনম্র ভাব, লাঞ্ছনাকর অবস্থা। হযরত রবী' (র.) কর্তৃক আবুল 'আলিয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, والمسكنة এর অর্থ প্রসংগে তিনি যা বলেন, তা হলো ক্ষুধা। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত وضربت عليهم الذلة والمسكنة তথা ক্ষুধা। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) وضربت عليهم الذلة والمسكنة এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, ওরা ছিল বনী ইসরাঈলীয় য়াহূদী সম্প্রদায়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের সম্মানকে লাঞ্ছনা দ্বারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। অনুকম্পাকে দৈন্যদশা দিয়ে এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্টিকে অসন্তোষ দ্বারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। তা ছিল আল্লাহ্র আয়াত-সমূহের প্রতি তাদের অবিশ্বাস, অন্যায় ও সীমালংঘন করে আল্লাহ পাকের নবী-রাসূলগণকে হত্যা করা এবং আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়া এবং তাঁর আদেশসমূহ লংঘন করার পরিণতি।

وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের বাণী وباؤا بغضب من الله অর্থ তারা প্রত্যাবর্তন করল। আরবী ভাষায় باءوا ক্রিয়াপদটি ভাল বা মন্দ কোন একটি বিশেষ্যের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে ব্যবহৃত হয় না। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواءا মহান আল্লাহ্র বাণী انى اريد ان تبوء باثمى واثمك

অর্থাৎ আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপের বোঝা বহন কর। (আল মায়েদা ঃ আয়াত ২৯) এ অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্ পাকের বাণীর অর্থ হবে এই ঃ ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط

অর্থ ঃ যখন তারা ফিরে আসবে গুনাহ্র বোঝা বহন করে এমন অবস্থায় যে, তারা আল্লাহ্ পাকের গযবে পতিত হবে এবং তাদের উপর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি অপরিহার্য হয়েছে। রবী থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন باءوا بغضب من الله-এর অর্থ, তাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে গযব পতিত হয়েছে। দাহহাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহ্ পাকের গযবের উপযুক্ত হয়েছে।

এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে আমরা আল্লাহ্র গযব-এর মর্মার্থ বর্ণনা করেছি। তাই এ পর্যায়ে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী ذالك অর্থাৎ তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের মোহর অংকিত করা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত নির্ধারিত করা। এখানে ذالك সর্বনাম দ্বারা هو-ই বুঝানো হয়েছে, যার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। কারো কথায় ব্যবহৃত ذالك দ্বারা ইংগিত করা হলে বহু অর্থ বুঝানো সম্ভব। بانهم كانوا يكفرون-এর অর্থ যেহেতু তারা নাফরমানী করত। অর্থাৎ তাদের প্রতি আমার লাঞ্ছনা প্রদান, দারিদ্রে নিক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রদর্শনের কারণ, তারা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং অবৈধভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করত।

وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله

অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে এই শাস্তি বিধানের কারণ হলো, আমার নিদর্শনসমূহে তাদের অস্বীকৃতি এবং আমার আম্বিয়ায়ে কিরামকে তাদের হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ। আমরা এ কিতাবের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, كفر শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে লুকিয়ে রাখা, এবং গোপন করা, আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ তথা তাঁর তাওহীদের ইংগিতবহ প্রমাণাদি, চিহ্নসমূহ এবং তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রতি বিশ্বাস; অথচ এরা তার সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাখ্যার আলোকে উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই ঃ আমি তাদের সাথে এ আচরণ এজন্যই করেছি যে, তারা আল্লাহ্ পাকের তাওহীদ সম্পর্কিত প্রমাণসমূহকে অস্বীকার করত এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেও প্রত্যাখ্যান করত ও তাঁর সত্যতাকেও খণ্ডন করত আর তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করত।

ويقتلون النبيين بغير الحق অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ পাকের ঐ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করত, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর বাণী সহকারে রিসালাত দান সম্পর্কিত সংবাদ

পৌঁছানের জন্য প্রেরণ করেছেন। الأنبياء শব্দটি বহুবচন, এক বচনে نبي (همزة বিহীন), এর মূল শব্দটি হামযা বিশিষ্ট ; কেননা নবী তিনিই যিনি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সঠিকভাবে খবর দেন। انباء عنه فهو ينبئ انبأ عن الله এ হতে فاعل اسم-এর রূপ হবে منبئ । কিন্তু কার্যত وهو مفعل এর স্থলে وهو فعيل রূপে نبي হয়েছে। যেমন, مسمع হতে سامع এর স্থলে فعيل রূপে سميع হয়ে থাকে, এবং مبصر এর স্থলে بصير হয়ে থাকে ইত্যাদি। نبي শব্দে همزة এর স্থলে 'ى' রয়েছে। এতে শব্দটির চূড়ান্ত রূপ দাঁড়িয়েছে, نبي, বহুবচনে الأنبياء—এর বহুবচনে انبياء হওয়ার কারণ হচ্ছে نبي এ همزه এর স্থলে ى যোগ করা। কেননা, ياء/واو বিশিষ্ট فعيل রূপে ব্যবহৃত صفة সমূহে এ পদ্ধতিই প্রচলিত। ভাষাবিদগণ এ জাতীয় শব্দকে افعلاء এর রূপে বহুবচন করেছেন। যেমন ولي বহুবচনে اولياء — وصي বহুবচনে اوصياء এবং دعي বহুবচনে ادعياء—। যদি শব্দটির প্রকৃত রূপ অনুযায়ী তথা همزه বিশিষ্ট শব্দ হতে তার বহুবচন রূপ করা হতো, তাহ'লে তাকে فعلاء এর রূপে রূপান্তরিত করা হতো এবং তার বহুবচন দাঁড়াত نبئاء যেমন نبيع এর বহুবচন نبعاء —। কেননা, فعيل এর রূপ বিশিষ্ট সকল শব্দ যার মূল অক্ষরসমূহে واو বা ياء নেই, তার বহুবচন فعلاء রূপে আসে—যেমন شريك শব্দটি বহুবচনে شركاء, عليم শব্দটি বহুবচনে علماء এভাবে حكيم বহুবচনে حكماء ইত্যাদি। আরবী ভাষাভাষীদের নিকট হতে نبي এর একটি বহুবচন نبئاء আসে, এ মর্মে একটি জনশ্রুতি আছে। তা ঐ সমস্ত লোকের মতানুযায়ী হবে, যারা نبي কে همزه যুক্ত শব্দ বলে মনে করেছেন। এ কারণেই তারা তাকে نبئاء রূপে বহুবচন করেছেন। ঐ মতের সপক্ষে হযরত নবী করীম (স.)-এর প্রশংসায় রচিত আব্বাস ইবন মিরদাস-এর নিম্নবর্ণিত পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

يا خاتم النبآء انك مرسل + بالخير كل هدى السبيل هداك

হে সর্বশেষ নবী! নিশ্চয় আপনি প্রেরিত হয়েছেন কল্যাণ নিয়ে, সকল হিদায়াতই আপনার হিদায়াত। কবি এখানে একবচনে نبي ধরে বহুবচনে نبآء করেছেন। কেউ কেউ النبي এবং النبوة কে همزة বিহীনভাবে পড়েছেন। তাদের মতে, তা النبوة - النجوة শব্দের অনুরূপ। অর্থাৎ উঁচু স্থান। আর তিনি বলতেন যে, النبي এর মূল অর্থ الطريق তথা পথ। তিনি এ মতের সমর্থনে القطامي এর একটি পংক্তি পেশ করেছেন :

لما وردن نبيا واستتب بها + مسحنفر كخطوط السيح منسحل

তিনি বলেন : الطريق (রাস্তা)-কে নবী আখ্যায়িত করা হয়। কেননা. তা সুস্পষ্ট ও সকলের নিকট পরিচিত। এর মূল শব্দ نبوة হতে উদ্ভূত। তিনি আরো বলেন, আমি কাউকেও نبي শব্দটি همزة যোগে পাঠ করতে শুনিনি। এখন এ শব্দ সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করেছি যা এ শব্দের জন্য যথেষ্ট।

ويقتلون النبيين بغير الحق

অর্থ : তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোন অনুমতি ব্যতীতই আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে হত্যা করত এমতাবস্থায় যে, তারা তাঁদের রিসালাতকে অস্বীকার করত এবং নুবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ এর ব্যাখ্যা :

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ذلك শব্দটি প্রথমোক্ত আয়াতাংশে উল্লিখিত ذلك এর দিকে ফিরেছে। উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, তাদের উপর আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের অস্বীকৃতি এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তাদের প্রতিপালকের অবাধ্যতা এবং সীমালংঘনের দরুন তারা আল্লাহ পাকের গযবের উপযুক্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ذلك بما عصوا তথা তা তাদের অবাধ্যতার কারণেই এবং সীমালংঘন সহকারে কুফরের দরুন। الاعتداء শব্দের অর্থ, ঐ সীমা অতিক্রম করা যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাহদের জন্য অন্যের প্রতি দায়-দায়িত্বরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি অন্যের সাথে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে তা সীমালংঘন করার শামিল। আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, আমি তাদের সাথে যে আচরণ করেছি তার কারণ তারা আমার আদেশের অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে এবং আমার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে আমার নিষেধ অমান্য করেছে।

(٦٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(৬২) যারা মু'মিন, যারা য়াহুদী এবং খৃস্টান ও সাবিঈন—যারাই আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الذين امنوا এর অন্তর্ভুক্ত ঐ সকল লোক, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ঐসব বিষয় সত্য বলে গ্রহণ করেছে, যে সত্য বাণী তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট নিয়ে এসেছেন এবং ঐ সবের প্রতি ঈমান এনেছে. যার আলোচনা আমরা এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে বর্ণনা করেছি।

الذين هادوا দ্বারা য়াহুদীগণকেই বুঝানো হয়েছে। هادوا অর্থাৎ تابوا —। এ শব্দযোগেই আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে যে, هاد القوم يهودون هودا و هادة —। উক্ত সম্প্রদায়ের একটি উক্তি انا هدنا اليك থেকেই তাদেরকে اليهود (য়াহূদী) নামকরণ করা হয়েছে।

হযরত হাজ্জাজ ইবন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, য়াহূদীগণকে য়াহূদী নামকরণ করার কারণ, তারা বলেছিল انا هدنا اليك —।

وَالنَّصٰرٰى-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, النصارى বহুবচন, একবচনে نصران যেমন سكرى এর একবচন سكران এবং نشاوى একবচনে نشوان —। এভাবে প্রত্যেক বিশেষণ যার একবচনে فعلان এর রূপ, বহুবচনে তা فعالى রূপে এসে থাকে। কিন্তু আরবী ভাষায় نصارى শব্দটি একবচনে نصران বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে يـاء ব্যতীত (نصران রূপেও) এর ব্যবহার হয় বলে জনশ্রুতি আছে। যেমন, কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটিঃ

تراه اذا زار العشى محنفا + ويضحى لديه وهو نصران شامس

نصران শব্দটি স্ত্রীলিংগে نصرانة হয়ে থাকে। যেমন নিম্নোক্ত পংক্তিঃ

فكلتاهما خرت واسجد رأسها + كما سجدت نصرانة لم تحنف

اسجد ক্রিয়াপদের অর্থ হলো, সে ঝুঁকে পড়ল। কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনে نصارى এর স্থলে انصار হয়ে থাকে। যেমন কবির ভাষায়ঃ

لما رأيت نبطا انصارا

شمرت عن ركبتى الازارا

كنت لهم من النصارى جارا

উপরোক্ত পংক্তিসমূহের সব ক'টিতে ব্যবহৃত نصارى শব্দটি পরস্পরকে সাহায্য করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে نصارى দেরকে এ নামে চিহ্নিত করার কারণ হলো, তারা ناصرة নামক স্থানে বসবাস করেছিল। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, نصارى দেরকে نصارى নামে অভিহিত করার কারণ, তারা ناصرة নামক স্থানে অবতরণ করেছিল। অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, তাদেরকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর من انصارى الى الله বলা। হযরত ইব্ন আব্বাস (র.) হতে এক অসমর্থিত বর্ণনায় বর্ণিত আছেঃ তিনি বলতেন যে, নাসারাকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো, হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)-এর গ্রামের নাম ছিল নাসিরাহ এবং তাঁর অনুসারিগণকে বলা হতো নাসিরিয়ীন এবং হযরত ঈসা (আ.)-কেও নাসিরী বলে ডাকা হতো। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদেরকে নাসারা নামে অভিহিত করার কারণ, তারা ناصرة নামক একটি গ্রামে বাস করত, যেখানে হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.) বাস করতেন। কাজেই তা এমন একটি নাম, যা তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এ নাম গ্রহণ করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের বাণী الذين قالوا انا نصارى এর ব্যাখ্যা প্রসংগে

তিনি বলেছেন, তারা ناصرة নামক একটি গ্রামের নামানুসারে এ নামে অভিহিত হয়েছেন— যে গ্রামে হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.) অবস্থান করতেন।

وَالصّٰبِئِيْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الصابئون শব্দটি صابى এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আপন ধর্মকে বাদ দিয়ে নতুন কোন ধর্ম অবলম্বন করে, যেমন কোন ইসলাম অনুসারীর ইসলাম ত্যাগ করা। এভাবে যে বা যারা যে ধর্ম অনুসরণ করত, তা বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে আরবের লোকেরা তাকে صابى নামে আখ্যায়িত করত। এভাবে صبأ فلان يصبأ صبأ অর্থাৎ সে প্রচলিত ধর্ম ত্যাগ করেছে। صبأت النجوم তার কারাজি উদিত হয়েছে, এবং صبأ علينا فلان موضع كذا وكذا অর্থাৎ সে অমুক অমুক স্থানে আমার সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাফসীরকারগণ সাবা নামধারী কারা—এ প্রসংগে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তি সাবী, যে তার আপন ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মহীনতাকে অবলম্বন করে। তাঁদের মতে, আল্লাহ পাকের বাণী الصابئون শব্দ দ্বারা ঐ সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে, যাদের কোন ধর্ম নেই। এ প্রসংগে বর্ণনাঃ হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, الصابئون তারা য়াহূদীও নয়, খৃস্টানও নয়, তাদের কোন ধর্মই নেই। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, الصابئون সম্প্রদায় হলো য়াহূদী ও অগ্নি উপাসকদের মাঝামাঝি আর একটি সম্প্রদায়। তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, আর তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা বৈধ নয়। অন্য একটি সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.)-এর বর্ণনায় হযরত হাসান (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন আবী নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত, য়াহূদ ও অগ্নিপূজকদের মাঝামাঝি, তাদের কোন ধর্ম নেই। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.)-এর সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, আতাকে আমি বলেছিলাম, الصابئون সম্প্রদায় মনে করে যে, এরা একটি কৃষ্ণাংগ কবীলা (গোত্র) থেকে উদ্ভূত, এরা মাজুস (অগ্নি-উপাসক) য়াহূদ বা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী নয়। তিনি বলেন যে, আমরা এরূপই শুনেছি, আরবের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের নবী আলায়হিস সালামকে বলেছিল যে, قد صبأ অর্থাৎ সে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে। হযরত ইবন যায়দ (র.) الصابئون এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, الصابئون একটি ধর্ম বিশেষের নাম, যারা মুসেল এলাকায় বিদ্যমান, তারা لا اله الا الله মুখে বলত, তাদের কোন কিতাব বা নির্দিষ্ট কাজ (عمل) ছিল না لا اله الا الله উচ্চারণ ছাড়া। তাদের কোন নবীও ছিল না। তিনি আরো বলেন, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) প্রতি ঈমান আনেনি। এ কারণেই মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র নবী এবং তার অনুসারিগণকে বলত, এরা صابئون। এভাবে মুসলমানগণকে তাদের সাথে তুলনা করত। অন্যদের মতে তারা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা ফিরিশতাদের পূজা করত এবং কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করত।

এ বর্ণনার সমর্থনে হাদীসঃ হযরত বিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, صابئون হলো, যারা কিবলার দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের উপর হতে জিয্য়া কর রহিত করার ইচ্ছা করা হলো। এমতাবস্থায় সংবাদ পাওয়া যায় যে, এরা ফিরিশতাদের পূজা করে। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, الصابئون। এমন এক সম্প্রদায় যারা ফিরিশতাদের পূজা করত, কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করত এবং যাবূর কিতাব পড়ত। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, الصابئون। আহলে কিতাব-এর এক সম্প্রদায়, যারা যাবূর কিতাব পড়ত। আবূ জা'ফর আর্‌রাযী (র) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, الصابئون। এমন এক সম্প্রদায়, যারা ফিরিশতাদের পূজা করত, যাবূর কিতাব পড়ত এবং কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। অন্য একদল বলেন, বরং এরা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। এতদ্‌সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ আবূ সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত সুদ্দী (র)-কে সাবিয়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন যে, তারা আহলে কিতাব-এর এক সম্প্রদায়।

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ-এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, من آمن بالله واليوم الآخر অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, এভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে প্রতিদান, অর্থাৎ তাদের জন্য সৎকর্মের ছওয়াব নির্ধারিত আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। যদি কোন প্রশ্নকারী আমাদের কাছে প্রশ্ন করে যে, এ আয়াতাংশের তথা ان الذين ... الصابئين এর পরিসমাপ্তি কোথায়? উত্তরে বলা হবে, তার চূড়ান্ত হলো من آمن بالله واليوم الآخر। কেননা, আয়াতের অর্থ, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং বিশ্বাস করেছে পরকালে। এ আয়াতে منهم শব্দটির উল্লেখ পূর্বাপর কথার ইংগিতের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, যে অংশটুকু উল্লিখিত আছে তা উক্ত অংশের প্রতি ইংগিত বহন করছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই কথার তাৎপর্য কি? উত্তরে বলা হবে যে, মু'মিনদের মধ্য হতে এবং য়াহূদী, নাসারা বা সাবিঈ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাদের প্রতি-পালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। যদি বলা হয়, মু'মিন আবার ঈমান আনবে কি করে? উত্তরে বলা হবে যে, এখানে উল্লিখিত المؤمن। শব্দের যে অর্থ তোমরা ধারণা করেছ তথা এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া নয়। যেমন য়াহূদী বা নাসারাদের ইসলামগ্রহণ। যদিও বা এ রকম একটি মতও রয়েছে যে, এখানে من آمن بالله বলতে ঐ সমস্ত আহলে কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের স্ব-স্ব নবীর প্রতি ঈমান রাখত, অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে তাঁর আনীত বিধানকেও গ্রহণ করল। এ কারণেই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান স্থাপনকারী হিসাবে যখনই

তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাওয়ার পর ঈমান আনল, তখন তাদেরকে বলা হয়েছে من آمن بالله। তবে এ স্থানে মু'মিনের ঈমান আনার অর্থই হলো ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া। য়াহূদ, নাসারা ও সাবিয়ীনের ঈমান আনার অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন (পবিত্র কুরআন), তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কাজেই তাদের মধ্য হতে যারা হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে আর সৎ কর্ম করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ মত পরিবর্তন করবে না, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ পাকের নিকট তাদের আমলের পুরস্কার এবং প্রতিদান---যেভাবে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, এখানে فلهم اجرهم عند ربهم বহুবচনের সর্বনাম আনার তাৎপর্য কি? অথচ من শব্দটি একবচনরূপেই ব্যবহৃত এবং এর সাথে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদও একবচন রূপে এসেছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, من শব্দটি এবং তার সাথে মিলিত ক্রিয়াপদটি যদিও একবচনরূপে ব্যবহৃত, কিন্তু তথাপি এর অর্থ একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন সবই হতে পারে। এমনকি পুংলিংগ ও স্ত্রীলিংগ পর্যন্ত। কেননা, তা সব ক্ষেত্রে একইভাবে কোন রূপান্তর ছাড়াই ব্যবহৃত হয়। আরবগণ এর সাথে কখনও ক্রিয়াপদকে একবচনরূপে ব্যবহার করেন, যদিও অর্থের দিক থেকে তা বহুবচন এবং কখনও অর্থের দিকটাকে বিবেচনা করে এর সাথে ক্রিয়াপদকে বহু-বচনরূপে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ০

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ০

[তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাবে, তারা না বুঝলেও? তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? সূরা য়ূনুস, ৪২-৪৩]

এখানে দেখা যায় যে, من এর সাথে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি একবার এর অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতেও ব্যবহৃত হয়েছেঃ

الما بسلمى عنكما عرضتما + وقولا لها عوجي على من تخلفوا

এখানে تخلفوا ক্রিয়াপদটি من এর অর্থের দিক বিচারে বহুবচনরূপে এসেছে। বহুবচনে الذين এর অর্থে।

ফারাযদাকের নিম্নোক্ত পংক্তি প্রণিধানযোগ্যঃ

تعال فإن عاهدتني لا تخونني + نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

এখানে দেখা যায় যে, يحزنون ক্রিয়াপদটি দ্বিবচনরূপে এসেছে আর তা من এর অর্থের সাথে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াত—

من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم

এখানে امن এবং وعمل صالحا এর ক্রিয়াপদদ্বয় একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। من এর শাব্দিক দিক বিবেচনায় এবং فلهم اجرهم-এ উল্লিখিত সর্বনামকে তার অর্থের বিবেচনায় বহুবচন রূপে আনা হয়েছে, কেননা তা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন।

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون দ্বারা মহান আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন যে, এ চরিত্রের লোকরা যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে কিয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তারা ভীত হবে না এবং দুনিয়াতে যা কিছু ফেলে এসেছে তজ্জন্য চিন্তিত হবে না। আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য যে সমস্ত সুখ ও আনন্দ এবং পুরস্কার নির্ধারিত করেছেন, তা তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে।

من امن بالله আয়াতাংশ দ্বারা এ অর্থ করেছেন যে, এর উদ্দেশ্য ঐ সব আহলে কিতাব মু'মিনগণ, যারা হযরত রাসূল (স.)-কে পেয়েছেন সে সম্পর্কিত আলোচনা।

হযরত সুদ্দী (র.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, ان الذين امنوا والذين هادوا الاية সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এ আয়াতটি সালমান ফারসীর সংগীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সালমান ফারসী ছিলেন জুনদী শাহপুর-এর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি। সম্রাটের পুত্র ছিল তাঁর অন্তরংগ বন্ধু। তাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব ছিল যে, তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন কোনই কাজ করত না। তারা উভয়ে মিলে সকল শিকার-অভিযান করত। এক বারের ঘটনা, তারা উভয়েই কোন শিকারে গমন করলে তাদের জন্য নির্মিত হয়েছে এক সুউচ্চ তাঁবু। তারা যখন তাঁবুতে প্রবেশ করল, তখন তারা দেখতে পেল যে, এক ব্যক্তি তাদের সামনে একটি পবিত্র কুরআন পাঠ করছেন এবং ক্রন্দন করছেন। এরা দু'জনেই তার নিকট জিজ্ঞেস করল যে, এ কি? লোকটি উত্তর দিলেন, যারা এ থেকে কিছু শিখতে চায়, তারা তোমাদের মত এ উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারে না। যদি তোমরা এতে কি আছে তা জানতে চাও, তাহলে নিচে নেমে এসো। আমি তোমাদেরকে শেখাব। অতঃপর দু'জনই অবতরণ করে তাঁর নিকট এলো। তখন লোকটি বললেন, এ এমন একটি গ্রন্থ, যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে। এতে তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আদেশ দান করেছেন এবং তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। এতে রয়েছে যেমন, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, অন্যের সম্পদ অন্যায়-ভাবে গ্রহণ করবে না। এভাবে লোকটি তাদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইনজীল নামক কিতাব সম্পর্কে এ গ্রন্থে কি আছে তাও বর্ণনা করলেন। লোকটির এ কথাগুলি তাদের মনে দাগ কাটল এবং তারা লোকটির অনুসরণ করল ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। লোকটি তাদেরকে আরো বললেন যে, তোমাদের সম্প্রদায়ের যবাহ করা পশু তোমাদের উভয়ের জন্য হারাম। অতঃপর তারা উভয়ে ঐ লোকটির সংগে রইল ও তাঁর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকল। অবশেষে যখন সম্রাটের উৎসবের দিন উপনীত হলো, তখন সম্রাট ভোজের ব্যবস্থা করলেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করলেন ও সম্রাটতনয়ের নিকট লোক পাঠালেন ও তাকে জনতার সাথে ভোজে শরীক হতে বললেন। তখন রাজার ছেলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন আর বললেন,

আপনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আপনি আপনার সংগী-সাথীদেরকে নিয়ে আহার করুন। তখন তার নিকট সম্রাট প্রেরিত আরো অধিক সংখ্যক দূত যোগদান করল। তখন তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন সম্রাট তার ছেলেকে ডেকে পাঠালেন ও জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি হলো- এ অবস্থা কেন? সে বলল, আমরা আপনাদের যবাহ করা গোশত খাব না। কেননা, আপনাদের যবাহ করা পশু আমাদের জন্য অবৈধ। তখন সম্রাট তাকে বললেন, তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে? তখন ছেলে জানাল যে, একজন ধর্মযাজক তাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। তখন সম্রাট ঐ যাজককে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, আমার ছেলে কি বলে? জবাবে যাজক বললেনঃ আপনার ছেলে যথার্থই বলেছেন। তখন সম্রাট বললেনঃ আমাদের ধর্মে হত্যা করা মহাপাপ না হলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। কিন্তু তুমি আমার দেশ ত্যাগ করে চলে যাও। এভাবে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো। সালমান বললেনঃ এতে আমরা তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলাম। তখন লোকটি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হলে মুসেল অঞ্চলে চলে এসো এবং আমাদের সাথে মিলিত হও। সেখানে আমরা ষাটজন লোক এ শপথ নিয়েছি এবং এক সাথে মিলে আল্লাহ্র ইবাদত করছি। এ কথা বলে ঐ যাজক লোকটি প্রস্থান করলেন এবং যুবরাজ ও সালমান থেকে গেলেন। সালমান যুবরাজকে বললেনঃ চল তুমি আমাদের সংগে। যুবরাজ জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখনই যুবরাজ তার আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি দেরী করছেন দেখে সালমান রওয়ানা দিলেন ও তাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি যে ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিকট অবস্থান করলেন। ঐ বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা ছিলেন সকলেই নামযাদা যাজক শ্রেণীর লোক। সালমানও তাদের সাথে থেকে ইবাদতে মশগুল হলেন এবং খুবই পরিশ্রম করতে লাগলেন। তখন শায়খ তাকে বললেনঃ তুমি একজন স্বল্প বয়সী যুবক, তুমি ইবাদতে সাধ্যাতীত কষ্ট করে থাক। আমার ভয় হয় যে, তুমি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে। তুমি নিজের জন্য আরো সহজ পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের অবস্থার প্রতি সদয় হও। তখন সালমান বললেনঃ দেখুন, আপনি যা বলছেন তা উত্তম, না আমি যা করছি তা উত্তম? তখন শায়খ উত্তর দিলেন, বরং তুমি যা করছ তাই উত্তম। তখন সালমান বললেনঃ তাহলে আমাকে বর্তমান অবস্থায় থাকতে দিন। অতঃপর যার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁকে ডেকে বললেন যে, তুমি কি জান যে, এ শপথ গ্রহণের প্রধান ব্যক্তিত্ব আমি এবং আমিই এই শপথের শর্তাদি পালনের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ব্যক্তি? আমি ইচ্ছে করলে এ সমস্ত লোককে শপথের এ সমস্ত শর্ত হতে অব্যাহতি দিতে পারি? কিন্তু আমি এ সমস্ত লোকের ইবাদতের তুলনায় অধিকতর দুর্বল, তাই আমার ইচ্ছা যে, আমি যেন এ শপথ হতে অন্য একটি সহজতর কর্মসূচীর শপথ গ্রহণ করি, যা এদের চাইতে ইবাদতের বিষয়ে সহজতর। এখন তুমি যদি এখানে অবস্থান করতে চাও, করতে পার, অথবা আমার সাথে যেতে চাইলেও যেতে পার। তখন উত্তরে সালমান বললেনঃ এই দুই শপথের কোন্‌টি অধিকতর শ্রেয়? তিনি বললেন, 'এইটি।' তখন সালমান বললেন, তাহলে আমি এই বায়'আতে থাকব। এই বলে সালমান তাতেই রয়ে গেলেন। অতঃপর সে বায়'আতের প্রধান ব্যক্তি এ বায়'আত সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিকে সালমানের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলেন। সালমান তাদের সাথে ইবাদতে নিমগ্ন হলেন। অতঃপর দলের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করার মনস্থ করলেন। তখন তিনি সালমানকে বললেন,

যদি তুমি আমাদের সাথে যেতে চাও, তাহলে যেতে পার। আর যদি এখানে থাকতে চাও, থাকো। তখন সালমান বললেন, এ দুটির মধ্যে কোন্‌টা উত্তম হবে? আপনার সাথে যাওয়া, না এখানে অবস্থান করা? তিনি বললেন, বরং আমার সংগে যাওয়াই উত্তম হবে। একথা শুনে সালমান তাঁর সাথে রওনা হয়ে গেলেন। পথ চলতে চলতে তাঁরা রাস্তার উপরে লোককে বসা অবস্থায় দেখলেন। লোক যখন তাঁদের উভয়কে দেখে ডাকলো, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক! আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যাজক তার সাথে কথা বললেন না। এমনকি দৃষ্টিপাতও করলেন না। তারা পথ চলতে লাগল। অবশেষে উভয়েই বায়তুল মুকাদ্দাস এসে পৌঁছল। তখন শায়খ সালমানকে বললেন ঃ যাও, জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, এ মসজিদে পৃথিবীর জ্ঞানিগণ একত্র হয়ে থাকেন। অতঃপর সালমান গিয়ে তাদের নিকট জ্ঞানের বিষয় শ্রবণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি চিন্তিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন শায়খ তাঁর অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে সালমান! তোমার কি হলো? সালমান উত্তর দিলেন ঃ আমার মনে হয় আমাদের পূর্ববর্তিগণ সমস্ত নবী ও তাঁদের অনুসারীরা কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন। তখন শায়খ তাঁকে বললেন ঃ চিন্তা করো না, এমন একজন নবী এখনো বাকী রয়ে গেছেন তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো নবীর আগমন হবে না। এটিই হলো সে যুগ, যে যুগে তাঁর আবির্ভাব হবে। তবে আমি তাঁকে পাব বলে আশা করি না। কিন্তু তুমি যুবক, সম্ভবত তুমি তাঁকে পেতে পার। তিনি আরব দেশে আবির্ভূত হবেন। যদি তুমি তাঁকে পাও, তাহলে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে। তখন সালমান বললেন ঃ তাহলে আমাকে তাঁর কোন চিহ্ন বলে দিন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ (শুন), তাঁর পৃষ্ঠদেশে খাতামুন্নাবুওয়াতের মুহর অংকিত থাকবে। তিনি হাদইয়াহ্ গ্রহণ করবেন, কিন্তু সদাকা গ্রহণ করবেন না। এরপর তারা প্রত্যাবর্তন করলেন। যখন ঐ উপবিষ্ট লোকটির স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকটি তাদেরকে আহবান করে বলল ঃ হে শ্রেষ্ঠ যাজক, আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন। অতঃপর এই যাজক তার দিকে নিজের গাধাটি ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং বৃদ্ধ উপবিষ্ট লোকটিকে হাত ধরে উঠালেন ও মাটিতে আঘাত করলেন। তার জন্য দুআ করে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও। তখন লোকটি একেবারে পূর্ণ শক্তি সহকারে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। সালমান এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল এবং যাজক পথ চলতে চলতে সালমানের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। সালমান তাঁর প্রস্থানের বিষয় জানতেন না। অতঃপর সালমান যাজককে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে সন্ধান করতে লাগলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে আরবের কিলাব গোত্রের দু'জন লোক মিলিত হলে সালমান তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা কি ধর্মযাজককে দেখেছ?' তখন উক্ত দু'ব্যক্তির একজন তাঁর সওয়ারীকে দাঁড় করিয়ে বলল ঃ 'হ্যাঁ, এই উট চালকই যাজক।' এ বলে সে তাঁকে উটের পিঠে তুলে নিল এবং তাকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে গেল। সালমান বললেন, এতে আমার এমন চিন্তা পেল যেরূপ আমার জীবনে কখনও পাইনি। অতঃপর ওরা তাঁকে বিক্রি করে দিল। জুহায়ন গোত্রের একজন মহিলা তাঁকে খরিদ করল। আর তিনি এবং ঐ মহিলার একজন কিশোর ছেলে তার উট চরাত। তাদের দু'জনের মধ্যে প্রত্যেকেই একদিন করে ছাগল চরাবার কাজ ভাগাভাগি করে নিত। সালমান হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের অপেক্ষায় টাকাকড়ি সঞ্চয় করতে লাগলেন। একদিন তিনি ছাগল চরাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাজের সাথী এসে বলল, 'সালমান, তুমি কি জানতে পেরেছ যে, অদ্য মদীনায় এমন এক ব্যক্তি এসেছেন

যিনি মনে করেন যে, তিনি নবী। সালমান তাকে বললেন ঃ তুমি মেষপালের সাথে থাক যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। অতঃপর সালমান মদীনা তায়্যিবায় এসে অবতরণ করলেন এবং তিনি হযরত নবী করীম (স.)-এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁর চতুর্দিকে ঘুরে দেখলেন। যখন নবী করীম (স.) তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন এবং আপন পিঠের কাপড় সরিয়ে দিলেন যেন তাঁর মুহরটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সালমান যখন তা দেখতে পেলেন, তখন তাঁর নিকট এসে কিছু আলাপ করলেন, অতঃপর ফিরে গেলেন এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তাঁর কিয়দংশের সাহায্যে একটি বকরী খরিদ করলেন এবং বাকী অংশ দিয়ে কিনলেন রুটি। অতঃপর তা নিয়ে হযরত (স.)-এর নিকট আসলেন। হযরত (স.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কি? সালমান বললেন ঃ সাদাকা। তিনি বললেন ঃ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই; এগুলি এখান থেকে সরিয়ে নাও; মুসলমানগণ তা খেতে পারবে। তিনি এবারও চলে গেলেন এবং আর একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রুটি ও গোশত খরিদ করলেন। তা নিয়ে নবী (স.)-এর নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কি? সালমান বললেন ঃ হাদ্‌ইয়াহ্। তখন হুযুর (স.) বললেন ঃ তুমি বসো। সালমান বসলেন। অতঃপর উভয়েই তা খেলেন। সালমান হুযুর (স.)-এর সাথে আলাপ প্রসংগে তাঁর সংগীদের কথা স্মরণ করলেন এবং তাদের সম্পর্কে হুযুর (স.)-কে সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, তাঁরা রোযা করত, নামায পড়ত এবং আপনার প্রতি ঈমান রাখত। তারা এ সাক্ষ্যদান করত যে, আপনি অচিরেই একজন নবীরূপে প্রেরিত হবেন। সালমান যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আল্লাহ্‌র নবী (স.) তাঁকে বললেন, "তারা দোযখবাসী।" এ কথাটি সালমানের মনে খুবই পীড়াদায়ক হলো। কেননা, সালমান তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি তারা আপনাকে পেতো, তাহলে আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করত ও আপনার আনুগত্য স্বীকার করত। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

কাজেই য়াহূদীর ঈমানের অর্থ হলো এই, যে ব্যক্তি তাওরাতের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করেছে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শকে অনুসরণ করেছে যতক্ষণ না হযরত ঈসা (আ.) আগমন করলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পরে যারা তাওরাত অনুযায়ী আমল করত এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণ করত, তাদের মধ্যে তা ছেড়ে যে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ করেনি, সে ধ্বংস হয়েছে। আর খৃস্টানদের ঈমান আনার অর্থ যারা ইনজীল কিতাবে বিশ্বাস করেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর শরী'আতের অনুসরণ করেছে, তারা গ্রহণযোগ্য মু'মিনরূপে চিহ্নিত হবে। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পর যারা তাঁর দাওয়াতকে কবুল করল না এবং তাঁর অনুসরণ করল না এবং তাঁর পূর্ব অনুসৃত ধর্মকে ত্যাগ করল না, তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, হযরত সালমান আল-ফারসী (রা.) হযরত নবীজী (স.)-কে ঐ সমস্ত খৃস্টানের আমল সম্পর্কে বলেছেন। উত্তরে হযরত নবী করীম (স.) বলেন যে, তারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেনি।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, এ কথা শুনে দুনিয়াটা আমার কাছে অন্ধকার মনে হয়েছিল এবং তিনি তাদের সাধনার কথাও উল্লেখ করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি (নবীজী) হযরত সালমান (রা.)-কে ডেকে বললেন, এ আয়াত তোমার সংগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হযরত নবী করীম (স.) বললেন, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর দীনের উপর মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার আগমনের সংবাদ পাওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে, সে কল্যাণের পথে আছে। আর যে ব্যক্তি আমার কথা শুনতে পেয়েছে, অতঃপর আমার প্রতি ঈমান আনেনি, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— ان الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصابئين হতে ولا هم يحزنون পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الاية

এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এ মত পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করছেন যে, য়াহূদী, নাসারা ও সাবিয়ীনের মধ্য থেকে যারা নেক আমল করবে, তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত প্রদান করা হবে। অতঃপর ومن يبتغ غير الاسلام এ আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়। কাজেই এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঐরূপ যা আমরা হযরত মুজাহিদ (র.) ও হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণনা করেছি— তথা এ উম্মতের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে আর য়াহূদ, খৃস্টান ও সাবী সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় থাকবে না আর না তারা চিন্তামগ্ন হবে। আর আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি, তা পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঈমান সহকারে সৎকর্মের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি দ্বারা কোন বিশেষ সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে কোন বিশেষ সৃষ্টিকে বিশেষিত করেননি, এবং من امن بالله واليوم الاخر الاية দ্বারা আয়াতের প্রথমাংশে যাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকলের ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

(৬৩) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

(৬৩) স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধে স্থাপন করেছিলাম, বলেছিলাম, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, الميثاق শব্দটি وثيقة হতে উদ্ভূত এবং مفعال এর রূপে গঠিত। তা শপথের মাধ্যমে হতে পারে, অথবা অন্য কোন ভাবে। এ আয়াতে উল্লিখিত ميثاق বলতে ঐ চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈল থেকে এ শপথ নিয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও

ইবাদত করো না এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং এতদসম্পর্কিত আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয়াদি পালন সম্পর্কেও ইবন যায়দের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের নিকট হতে বিশেষ শপথ নেয়ার কারণ এই ছিল। (হাদীস) ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, ইব্ন যায়দ বলেছেন ঃ যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর রবের নিকট হতে তখ্তীসমূহ সহকারে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে বললেন ঃ এই তখ্তীসমূহে রয়েছে আল্লাহ পাকের কিতাব এবং তাঁর সমস্ত আদেশমালা, যা তিনি তোমাদেরকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন আর ঐসব নিষেধাজ্ঞা, যা থেকে তোমাদেরকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল ঃ তোমার এ কথা আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারি না, যতক্ষণ না আল্লাহ প্রকাশ্যে আমাদের সামনে এসে বলবেন যে, এটি আমার কিতাব, তোমরা তা ধারণ কর। কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেরূপ তোমার সাথে বাক্যালাপ করেন? কেন তিনি বলেন না যে, এটি আমারই গ্রন্থ, তোমরা একে ধারণ কর? বর্ণনাকারী বলেন, এতে আল্লাহ্র পক্ষ হতে এক বিশেষ গযব তাদের উপর আপতিত হলো, এক বিকট গর্জন, এতে তারা সকলেই প্রাণহীন হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) যখন বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র কিতাব ধারণ কর। তারা বলল যে, না। তখন হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তোমাদের উপর কি অবস্থা ঘটেছিল বলতো! তারা উত্তর দিল, আমরা মৃত্যুবরণ করেছিলাম। অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হয়েছি। হযরত মূসা (আ.) বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাবকে ধারণ কর। তখন তারা উত্তর দিল ঃ না। তখন আল্লাহ পাক তাঁর ফিরিশতা পাঠিয়ে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরলেন। এবার হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা একে চিন কি? তারা বলল, হ্যাঁ, এটি তূর পাহাড়। তিনি বললেন ঃ হয় আল্লাহ্র কিতাবকে গ্রহণ কর, অন্যথায় এই পাহাড় তোমাদের উপর পতিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এবার তারা ওয়াদা করতে প্রস্তুত হলো। এ বলে ইব্ন যায়দ মহান আল্লাহ্র বাণী

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا...... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিনি আরো বলেন, যদি ওরা প্রথম বারেই তা গ্রহণ করত, তাহলে কোন ميثاق বা ওয়াদাবিহীনভাবে গ্রহণ করত।

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ الطور শব্দটি আরবী ভাষায় পাহাড়ের সমার্থক। আল-'আজ্জাজ রচিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত ঃ

وانى جناحية من الطور فمر + تقضى البازى اذا البازى كسر

কেউ কেউ বলেন যে, তা একটি নির্দিষ্ট পাহাড়ের নাম। বর্ণিত আছে যে, তা ঐ পাহাড়ের নাম, যার উপরে হযরত মূসা (আ.) তাঁর রবের সাথে প্রার্থনায় রত হয়েছিলেন। কেউ বলেন, এটি ঐ পাহাড়ের

নাম, যেখানে ঐসব বস্তু উৎপন্ন হয়, যা ইতিপূর্বে আর কোনদিন হয়নি। যারা এরূপ বলেছেন যে, তা ঐ পাহাড়, যা ঐ নামে পরিচিত ছিল—এতদসম্পর্কিত বর্ণনা প্রসংগে হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে ফটক দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ করার হুকুম দিলেন এবং এও আদেশ করলেন যেন তারা حطة বলতে থাকে। তাদের জন্য প্রবেশদ্বারটি সংকুচিত করা হয়েছিল, যাতে তাদেরকে অবনত হয়ে ঢুকতে হয়। কিন্তু তারা ঝুঁকে প্রবেশ করার পরিবর্তে পেছনের দিকে বেঁকে প্রবেশ করল এবং তারা حطة এর পরিবর্তে বলতে লাগল حنطة —। অতঃপর তাদের মাথার উপর পাহাড় উঠানো হলো। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, পাহাড়টিকে ভূমি হতে মূলসহ উত্তোলন করে তাদের মাথার উপরে ছায়ার মত ধরা হয়েছিল। সিরীয় ভাষায় الطور। অর্থ পাহাড়। তাদের উপর পাহাড় উঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। উক্ত হাদীসের সূত্র পরম্পরায় একজন রাবী হযরত আবূ আসিম (রা.) এ অর্থ বুঝানোর জন্য কি تخويف শব্দটি বলা হয়েছিল, না خوف এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। অতঃপর তারা (পরিস্থিতির চাপে পড়ে) অবনত মস্তকে প্রবেশ করল এমতাবস্থায় যে, তাদের চোখ ছিল পাহাড়ের দিকে। তা ছিল ঐ পাহাড়, যে পাহাড়ের উপর আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য তাজাল্লী দান করেছিলেন। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাদের মাথার উপর মেঘের মত পাহাড় উঠানো হয়েছিল। তোমরা যেন অবশ্যই এতে বিশ্বাস স্থাপন কর। অন্যথায় তা তোমাদের উপর পতিত হবে। এ অবস্থা দৃষ্টে তারা ঈমান আনল। সিরীয় ভাষায় الطور। অর্থ الجبل —। হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেনঃ الطور। শব্দের অর্থ পাহাড়। এরা ঐ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছিল। অতঃপর তাদের মাথার উপর মূলসহ ঐ পাহাড়টি তুলে ধরা হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার আদেশসমূহ গ্রহণ কর, অন্যথায় তা তোমাদের মাথার উপর ছুঁড়ে মারব। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, ورفعنا فوقكم الطور-এ উল্লিখিত الطور। একটি নির্দিষ্ট পাহাড়ের নাম। তাকে মূলোৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন এবং বললেনঃ আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং তারা এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করল। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরা হলো এবং তার দ্বারা তাদের ভয় দেখানো হলো। হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الطور। অর্থ الجبل —। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা প্রবেশদ্বার দিয়ে সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং حطة জপতে থাক, তারা সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল আর আল্লাহ পাক পাহাড়কে আদেশ করলেন যেন ওদের উপর পতিত হয়। অতঃপর তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পাহাড়টি তাদের মাথার উপর এসেছে। তখন তারা অগত্যা সিজদায় পতিত হলো। কিন্তু কপালের এক পাশে সিজদাহ করে অন্য পার্শ্ব দিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহম করলেন এবং পাহাড় সরিয়ে নিলেন। এ কথাই নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়েও বর্ণিত হয়েছে: واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة [স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ। (সূরা আ'রাফ ১৭১)] এবং ورفعنا فوقكم الطور [এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম।

(সূরা বাকারা, আয়াত ৯৩)]। হযরত ইব্‌ন যায়দ (রা.) বলেছেন যে, সিরীয় ভাষায় الطور। পাহাড়কে বলা হয়। অন্য ভাষাবিদদের মতে الطور। ঐ পাহাড়ের নাম, যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের সাথে মুনাজাত করেছিলেন।

এতদসম্পর্কিত আলোচনায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, الطور। সেই বিশেষ পাহাড়ের নাম, যার উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি, আর বনী ইসরাঈল এ পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। হযরত 'আতা (র) বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড়টি তুলে ধরে বলা হয়েছিল তোমরা এর প্রতি ঈমান আন, অন্যথায় তা তোমাদের উপর পতিত হবেই এবং كانه ظلة দ্বারা তাই ইংগিত করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে তূর একটি বিশেষ শ্রেণীর পাহাড়ের নাম, যেখানে বিশেষ বৃক্ষ জন্মে থাকে।

যারা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের বর্ণনা : হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, الطور। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন, الطور। ঐ পাহাড়কে বলা হয়, যাতে তরুলতা জন্মায়। আর যাতে তরুলতা জন্মায় না, তা তূর নয়।

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, (আরবী) ভাষাবিদগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মতভেদ করেছেন। বাসরাহ্‌বাসী কোনো ব্যাকরণবিশারদ বলেন যে, এ আয়াতের উল্লিখিত অংশ ورفعنا فوقكم দ্বারা এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। তা এভাবে যে, উল্লিখিত কথার অর্থ الطور وقلنا لكم خذوا ما اتيناكم بقوة والا قذفناه عليكم। এবং কূফাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে, তাদের নিকট হতে শপথ নেওয়াই একটি কথা বিশেষ। তাই কোন অংশকে উহ্য ধরার প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে وقلنا لكم জাতীয় কোন অংশকে উহ্য ধরলে তখন দুটি كلام একত্র হয়ে যাবে। তবে যারা উপরোক্ত আয়াতাংশে وقلنا لكم জাতীয় কোন কথা উহ্য থাকার বিরোধী, তারা এখানে একটি ان। থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী—

انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك الاية

কাজেই এখানেও একটি ان। কে উহ্য ধরে নেওয়া যায়। আমাদের মতে এ সমস্ত স্থানের ব্যাখ্যার যথার্থ মত হলো এই যে, প্রত্যেক ঐ বাক্যে যেখানে উল্লিখিত অংশ দ্বারা পুরো অর্থ ভালভাবে বুঝা যায়, সেখানে কোন অংশ উহ্য ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কাজেই এখানে خذوا ما اتيناكم অর্থ ما امرناكم فى التوراة — الايتاء। শব্দের আসল অর্থ الاعطاء। তথা দান করা, আর بقوة—অর্থ بجد-আমি যা কিছু আদেশ করেছি তা পালনের ব্যাপারে অধ্যবসায় অবলম্বন কর। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, خذوا ما اتيناكم بقوة এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন যে, তোমরা আমার নির্দেশানুযায়ী আমল কর। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : خذوا ما اتيناكم بقوة অর্থ الطاعة —। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত,

خذوا ما آتيناكم بقوة-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন যে, القوة। অর্থ الجد। (অধ্যবসায়) সহকারে তা ধারণ কর, অন্যথায় এ পাহাড়টি তোমাদের উপর ছুঁড়ে মারব। তিনি বলেন, এ ভাবে তারা স্বীকার করেছিল যে, তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তাকে তারা অধ্যবসায় সহকারে গ্রহণ করবে। (হাদীস) আসবাত কর্তৃক হযরত সুদ্দী (র.) হতে بقوة-এর অর্থ بجد و اجتهاد বর্ণিত আছে। ইব্‌ন ওয়াহাব বলেনঃ আমি ইব্‌ন যায়দ হতে خذوا ما آتيناكم بقوة এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وبحق —। কাজেই এদিক দিয়ে উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, এ গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যা কিছু ফরয করেছি, তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং কোনরূপ কার্পণ্য প্রদর্শন ছাড়া তা বাস্তবে কার্যকর করতে চেষ্টা সাধন কর। তাকে অধ্যবসায়ের সংগে গ্রহণ করার অর্থ তাই।

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ০-এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন যে, এর অর্থ 'আমি তোমাদেরকে আমার এ কিতাবের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি, ভীতি প্রদর্শন তথা জান্নাতের প্রলোভন ও জাহান্নামের ভীতি ইত্যাদি প্রদান করেছি, তা স্মরণ কর এবং তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর এবং সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। যদি তোমরা তা কর তবেই তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে এবং বারংবার তোমাদের গোমরাহীর পথ অবলম্বনে আমার অবধারিত শাস্তির কথা চিন্তা করে ভয় করতে পারবে, আর পরিণামে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারবে এবং বর্তমানে তোমরা যে আমার নাফরমানী করছ, তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, لعلكم تتقون অর্থ তোমরা বর্তমানে যে গোমরাহীতে রয়েছ, তা পরিত্যাগ করতে পারবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে যা দান করেছিলেন তা হলো তাওরাত। হযরত আবুল আলিয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতাংশ واذكروا ما فيه অর্থ واذكروا ما في التوراة (হাদীস) (যা কিছু তাওরাতে আছে, তা স্মরণ কর)। হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি واذكروا ما فيه-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, তাদেরকে তাওরাত কিতাবে যা কিছু ছিল, তা বাস্তবায়নের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) হযরত ইব্‌ন যায়দের (রা.) নিকট واذكروا ما فيه-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর অর্থ 'তাতে যা কিছু আছে, তোমরা তদনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে আমল কর।' তিনি আরো বলেন যে, واذكروا ما فيه অর্থ তাতে যা আছে, সে আদেশ-নিষেধকে ভুলে যেয়ো না বা তা থেকে গাফিল হয়ো না।

(৬৪) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ০

(৬৪) এর পরেও তোমরা মুখ ফিরালে। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী ثم توليتم-এর অর্থ ثم اعرضتم —। এ ক্রিয়াপদটি تفعلتم রূপে গঠিত (তোমরা ফিরে গেলে)। আরবী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ ولاني فلان دبره অর্থ অমুক ব্যক্তি আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। এ শব্দটি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত, যে আল্লাহ পাকের বিধানের প্রতি আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, تولى فلان عن طاعة فلان ও تولى عن مواصلته (অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির আনুগত্য থেকে সরে পড়েছে এবং তার সাথে মিলিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছে)। আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণীঃ

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ০

[অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদের দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাল। (সূরা তাওবা, ৭৬ আয়াত)]

তারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছিল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ০

[আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দেবো এবং সৎ হবো। (সূরা তাওবা, আয়াত ৭৫)]

আরবদের প্রচলিত একটি রীতি হলো, একটি শব্দকে তার সমার্থক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা। যেমন প্রখ্যাত কবি আবূ যুওয়ায়ব আল হাযালী বলেছেনঃ

فليس كعهد الدار يا ام مالك + ولكن احاطت بالرقاب السلاسل

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل + سوى الحق شيئا واستراح العواذل

উক্ত পংক্তিদ্বয়ের প্রথমটিতে উল্লিখিত احاطت بالرقاب السلاسل তথা 'আমাদের কাঁধ জিঞ্জির বেষ্টন করেছে' কথা দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম এমন অনেক বস্তু ও কর্ম হতে বিরত রেখেছে, যা তারা জাহিলী যুগে করত। আর এভাবে ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা কাঁধে শিকল পরার সমান। আর কাঁধে শিকল পড়ে যাওয়ায় ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে যার হাতে হাতকড়া পরার কারণে সে তার কাংখিত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। আরবী ভাষায় এ ধরনের উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। অনুরূপ ثم توليتم من بعد ذالك এর অর্থ হলো, আমি যে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়ে তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলাম তোমরা তোমাদের প্রভুকে ঐ ওয়াদা দান করার পরে এবং তোমাদের কিতাবে বর্ণিত আদেশ-নিষেধসমূহ পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তদনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত রয়েছ এবং ঐ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছ। আয়াতে উল্লিখিত ذالك সর্বনাম দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যথা- واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور —।

فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী--فلولا فضل الله عليكم এর অর্থ, তোমাদের মাথার উপর তূর তুলে ধরার সময় তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা করেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তাঁর নির্ধারিত অবশ্যপালনীয় কর্তব্য আদায় করবে, তাঁর হুকুম পালনে আর তোমাদের প্রতি প্রদত্ত কিতাবে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তোমাদের এ সুদৃঢ় শপথ ভংগ করার পরও যদি আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে ক্ষমা না করতেন এবং তোমাদেরকে ইসলামের নি'মাত দান না করতেন আর তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা না করতেন ও তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করতেন, তাহলে তোমরা অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে। এ কথার দ্বারা যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, সে সব ব্যক্তি যদিও ছিলেন নবী করীম (স.)-এর হিজরতের পরে মদীনা তায়্যিবাহর মুহাজিরগণের সহ-অবস্থানকারী আহলে কিতাব, কিন্তু তথাপি তা হলো, তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ। এভাবে উপরোল্লিখিত পন্থায় যাদেরকে নিয়ে এ কাহিনী তাদের স্থানে মূল কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আমরা পূর্ববর্তী অংশে বর্ণনা করেছি যে, আরবের কোন গোত্র নিজেদের বীরত্ব-গাথা রচনা ইত্যাদির সময় অন্য একটি গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ করে থাকে। তারা তাতে পূর্ববর্তীদের কৃতকর্মকে নিজেদের সাথে সম্পর্কিত করে বলে থাকে যে, আমরা তোমাদের সাথে এরূপ আচরণ করেছি। এ কিতাবের পূর্ববর্তী অংশে এতদসম্পর্কিত কিছু কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করেছি কবিতার সাহায্যে। কেউ কেউ মনে করেন যে, এ আয়াতসমূহে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, যদিও উল্লিখিত কর্ম তারা সম্পাদন করেনি, কিন্তু বনী ইসরাঈলের পূর্ববর্তীরা যা কিছু করেছিল এরা তাকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করে থাকে। এজন্য পূর্ববর্তীদের কর্মকে এদের বৈধ করার কারণে আল্লাহ্ পাক এদেরকে ঐ কর্মের সম্পাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাদেরকে উক্ত কর্মের সম্পাদক হিসাবে সম্বোধন করার কারণ, তারা পূর্ববর্তীদের কর্ম সম্পর্কে জানত। যদিও সম্বোধনটি বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা জীবিত আছে. তাদেরকেই করা হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করা। আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্ববর্তীদের কর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের দরুন তাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। যেমন কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে দেখা যায় ঃ

اذا ما انتسبنا لم تلد نى لئيمة + ولم تجدى من ان تقرى به بدا

এই পংক্তিতে উল্লিখিত اذا ما انتسبنا। اذا ক্রিয়াপদের পূর্বে শর্তবোধক اذا এর ব্যবহার চায় যে, তার পরবর্তী ক্রিয়াপদটি ভবিষ্যত কালবোধক (مستقبل) হোক, কিন্তু তথাপি তাকে مستقبل আনার পরিবর্তে অতীত কালবোধক ক্রিয়াপদ لم تلد نى لئيمة বলা হয়েছে। যার অর্থ, জন্ম তো ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তাকে مستقبل এর পরিবর্তে অতীত কালের ক্রিয়াপদে আনার কারণ, শ্রবণকারী এর প্রকৃত অর্থ কি তা জানে। এজন্যই আহলে কিতাবের যারা হযরত নবী করীম (স.)-এর হিজরতের পরবর্তী সময়ে তাঁর সামনে রয়েছে, তাদেরকে সম্বোধন করে পূর্ববর্তীদের কর্মকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত এবং পূর্বে যা উল্লেখ

করেছি, তার দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় বিরল নয়। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) فلولا فضل الله عليكم ورحمته এর ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন, যা আমরা বর্ণনা করেছি। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি فلولا فضل الله عليكم ورحمته এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, এখানে فضل الله দ্বারা ইসলামকে এবং ورحمته দ্বারা আল-কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থঃ যদি তোমাদের অপরাধ ও পাপের তওবাহ কবুল করে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পরিত্রাণ না করতেন, বিশেষ অনুকম্পা ও করুণা না করতেন, তাহলে এ অপরাধের কর্মফল তোমাদেরকে সর্বদাই ভোগ করতে হতো এবং তোমাদের ওয়াদা ভংগ ও আল্লাহ পাকের আদেশ লংঘনের অপরাধের দরুন তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে। এ কিতাবের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে الخسارة শব্দের অর্থ আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, তাই এ প্রসংগে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না।

(৬৫) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ০

(৬৫) এবং নিশ্চয়ই তোমরা জান তাদেরকে, যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছে। আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও'।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ولقد علمتم অর্থ ولقد عرفتم (তোমরা চিনতে পেরেছ)। যেমন আরবী ভাষায় প্রচলিত কথা لقد علمت اخاك ولم اكن اعلمه অর্থ عرفته--। অর্থাৎ আমি তোমার ভাইকে চিনেছি, যাকে আমি চিনতাম না। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم অর্থাৎ لا تعرفونهم الله يعرفهم আর যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ পাক তাদেরকে জানেন।

الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

যারা শনিবারে আমার নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে এবং আমি ঐ দিবসে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করেছি তারা তা করেছে ও আমার আদেশ অমান্য করেছে। পূর্ববর্তী অংশে দলীল সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, الاعتداء শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোন কাজে সীমা লংঘন

করা। কাজেই এস্থানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহে তুমি তিলাওয়াত করবে যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী (স.)-এর যুগে আনসারদের সহাবস্থানকারী বনী ইসরাঈলের সম্মুখে এ সূরার মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষগণ যে আল্লাহর প্রতি প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছিল এবং চুক্তির অবমাননা করেছিল তার বর্ণনার মাধ্যমে এদের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। আর এই আয়াতে সম্বোধিতদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এরা তাদের সেই কুফরে আরো বাড়াবাড়ি করলে এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করলে এবং তার অনুসরণ না করলে ও সত্য বলে না জানলে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো আকৃতির বিকৃতি, তড়িতাহত হওয়া, গর্জনের মাধ্যমে ধ্বংস ইত্যাদি আরো বহু নতুন নতুন আযাব দ্বারা তাদের ধ্বংস করা হবে। ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন যে, এর অর্থ ولقد عرفتم —। তা তাদের পাপকর্ম সম্পর্কিত সতর্কবাণী বিশেষ। আল্লাহ পাকের বাণীর অর্থ এই, শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘনকারীদের যে পরিণতি হয়েছিল তোমাদেরও সেরূপ পরিণতি হতে পারে—এই মর্মে সতর্ক থাক, اعتدوا অর্থ اجترؤا في السبت (তারা শনিবারে পাপকার্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, যখনই কোন নবীকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন তাঁকে শুক্রবারের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, আকাশেও ফিরিশতাদের চোখে এর মর্যাদার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর বলা হয়েছে যে, শুক্রবারেই অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। অতঃপর যারা পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ করবে, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের লোকেরা জুমআর পূর্ববর্তী সময়ের নির্দেশ মান্য করেছে এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদেশ মান্য করে তার মর্যাদাকে উপলব্ধি করেছে আর আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী তার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তাদের কল্যাণ অবধারিত। আর যারা এই নির্দেশ অমান্য করেছে, তাদের অবস্থা হবে ঐরূপ যেমন ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت-এ উল্লিখিত হয়েছে। তাদের পরিণাম সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক বানরে রূপান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল এই, হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জুমআর মর্যাদা রক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা উত্তর দিল ঃ 'হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য জুমআর দিনকে পবিত্র জ্ঞান করার আদেশ দাও কিভাবে এবং তাকে অন্য দিবসসমূহের চাইতে অধিক মর্যাদা দান করতে বল কেন? আসলে শনিবারই তো সকল দিনের সেরা দিন। কেননা, আল্লাহ ছয় দিনে আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং শনিবারে সব কিছুই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, খৃস্টানদেরকে যখন হযরত ঈসা (আ.) আদেশ দিয়েছিলেন জুমআর দিন মর্যাদাবান দিনরূপে মান্য করতে, তখন তারা জওয়াব দিল, আপনি আমাদেরকে জুমআর মর্যাদার আদেশ দিচ্ছেন কেন? আসলে প্রথম দিনই তো সবচাইতে সম্মানের দিন এবং দিনসমূহের সর্দার তুল্য, সর্ব প্রথম বস্তুই সব চাইতে মর্যাদাবান, যেমন আল্লাহ এক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে বললেন যে, তুমি তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকে ঐ দিনে অমুক অমুক দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে, কিন্তু তারা ঐ দায়িত্ব পালন করেনি। এজন্য আল্লাহ এ পবিত্র কিতাবে তাদের অবাধ্যতার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে শনিবার সম্পর্কে উক্তরূপ জওয়াব দিয়েছিল, তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-কে বললেন,

তাদেরকে শনিবারের ব্যাপারে স্বাধীনতা দাও, কিন্তু শর্ত থাকবে যে, তারা ঐ দিনে মৎস্য বা অন্য কিছু শিকার করতে পারবে না এবং কোন কাজকর্মও করতে পারবে না। যেমনটি তারা যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। এরপর দেখা গেল শনিবার আসলে সমুদ্রের মৎস্যকুল পানির উপরিভাগে ভেসে উঠত। إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا দ্বারা এ ঘটনার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। شرعا অর্থ সুস্পষ্টভাবে পানির উপরিভাগে দেখা দিত। এ পরিণাম হয়েছিল তাদের হযরত মূসা (আ.)-এর উপদেশ অমান্য করার কারণে। আর শনিবার ছাড়া অন্য দিনসমূহে শিকারের অবস্থা ছিল অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিক এবং বর্ণনাকারী বলেন যে, ويوم لا يسبتون لا تأتيهم দ্বারা এ কথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। কেননা, মৎস্যকুল মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা করেছিল। অবশেষে সকল বনী ইসরাঈল এ অবস্থা দেখলে তারা মৎস্য শিকারের প্রতি লোভী হয়ে পড়ল আর আল্লাহর শাস্তিরও ভয় ছিল। তাদের কিছু লোক ঐ মৎস্য আহরণ করল এবং ঐ ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রইল না। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কিত সতর্কবাণী ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তারা যখন দেখল যে, তাদের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন শাস্তি আসছে না, তখন তারা ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি করল এবং অন্যদেরকেও জানাল যে, তারা মৎস্য শিকার করেছে অথচ তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। তখন বহু লোক এ কাজে প্রবৃত্ত হলো। তারা ভাবল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কথা ছিল ভিত্তিহীন।

মহান আল্লাহর বাণী-

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ০

দ্বারা সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। যা আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলেছিলেন, যারা মৎস্য শিকার করেছিল, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে পাপের দরুন বিকৃত করে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মাত্র তিন দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিল, পানাহারও করেনি এবং তাদের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থাও হয়নি। আল্লাহ তাআলা যেভাবে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন ছয় দিনে বানর, শূকর ইত্যাদি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। এবং এই সম্প্রদায়কে তিনি বানররূপে বিকৃত করে দেন। এ ভাবেই আল্লাহ পাক যাকে যেমন করতে চান করতে পারেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের জন্য ঐ (সাপ্তাহিক) দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন যাকে তোমাদের জন্যও করেছেন (তথা জুমআর দিনকে)। অতঃপর তারা এর বিরোধিতা করে শনিবারে পরিবর্তিত করল এবং ঐ দিনকে পবিত্র জ্ঞান করল। আর যাকে পবিত্র জ্ঞানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা ত্যাগ করল। যখন তারা শনিবার ব্যতীত আর কিছুতেই রাযী হলো না, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে শনিবারের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। এমন কিছু কাজ সেদিনের জন্য আল্লাহ পাক হারাম করেছিলেন, যা ছিল অন্য দিনে হালাল। তারা আয়লা ও তূর অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান করছিল। ঐ গ্রামটির নাম ছিল মাদইয়ান। আল্লাহ পাক তাদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার ও মাছ খাওয়া হারাম করে দিলেন। তারা দেখতে পেল যে, শনিবার আসলে মৎস্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমানভাবে সমুদ্রের উপকূলের কাছাকাছি স্থানে এসে একত্র হতো আর শনিবার চলে গেলে ঐগুলো

চলে যেত। ছোট-বড় কোন মাছই আর দেখা যেত না। বহুদিন পর্যন্ত এ অবস্থা চলার পর তাদের মধ্যে মাছ শিকার ও মাছ খাওয়ার উগ্র বাসনা জন্মাল। কোন কোন লোক গোপনে শনিবারে মাছ শিকার করে, তাকে দড়ির সাহায্যে বেঁধে পানিতে ছেড়ে দিত এবং উপকূলে একটি খুঁটি গেড়ে বেঁধে রাখত। পরবর্তী দিন আসলে সে তখন ঐ মাছ ধরে নিত, আর বলত যে, সে শনিবারে মাছ শিকার করেনি। অতঃপর সে ঐ মাছ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেত। পরবর্তী শনিবার আসলে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করত। এভাবে যখন গ্রামের লোকেরা মাছের গন্ধ পেল, তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, আমরা মাছের গন্ধ পাই। এভাবে ঐ লোকটি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল অন্যরাও তার সন্ধান লাভ করলে অনুরূপ কাজে প্রবৃত্ত হলো। বহুদিন পর্যন্ত গোপনে তা চলতে লাগল। এ সময়ে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি আযাব প্রেরণে তাড়াহুড়া করেননি। অবশেষে যখন লোকেরা প্রকাশ্যে মাছ শিকার করা আরম্ভ করল এবং বাজারে বিক্রি করা শুরু করে দিল, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু একটি দল তাদেরকে বলল, সর্বনাশ। তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং তাদেরকে তাদের অপকর্ম হতে নিষেধ করল। আর একদল যারা মাছ খায়নি এবং তাদেরকে নিষেধও করেনি, তারা বলতে লাগল—

لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى
ربكم ولعلهم يتقون ۝

[আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয়। (সূরা আরাফ আয়াত ১৬৪)] তখন প্রথম দলটি উত্তর দিল ঃ আমাদের উপদেশ এজন্য যে, তাতে যেন আমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আমাদের অপারগতার বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারি এবং এ আশায় যে, তারা যেন আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে পারে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, যখন তারা এহেন গর্হিত কাজে লিপ্ত ছিল, আর ঐ অবশিষ্ট লোকেরা তাদের মজলিস-কক্ষে ও উপাসনালয়সমূহে সকাল বেলা একত্র হয়েছিল, তখন দেখে দোষী লোকেরা অনুপস্থিত, তাদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয়ই এদের কোন ঘটনা ঘটেছে। ব্যাপারটা কি হয়েছে দেখ। তখন লোকেরা তাদের খুঁজে তাদের গৃহে গিয়ে দেখতে পেল যে, ঘরের দরজা বন্ধ। তারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ভোর হতে না হতেই এরা বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। লোকেরা তাদের পুরুষদেরকে চিনতে পেরেছিল, তারা নর বানরে এবং মহিলাদেরকেও চিনতে পারল, তারা মাদী বানরে এবং ছেলেমেয়েদেরকেও চিনতে পারল, তারা বানরের সন্তানে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি না আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করতেন যে, যারা অপকর্ম হতে নিষেধ করেছিল তাদেরকে তিনি ধ্বংসের হাত হতে বাঁচিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই আমরা একথা বলতাম যে, তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাফসীরকারগণ বলেন, তা ছিল ঐ গ্রাম, যে গ্রাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বলেছেন ঃ

وسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر الاية

(তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন. . . .। (সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৬৩) হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত—

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ۝

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য মৎস্যকে হালাল করেছিলেন। তবে পরীক্ষামূলকভাবে তা শনিবারে শিকার করা অবৈধ করে দেন, যাতে প্রকাশ্যে জানা যায় কারা আল্লাহ্ পাকের অনুগত, আর কারা অবাধ্য। এতে ঐ গোত্রের লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল যারা শনিবারে মৎস্য শিকার ও ভক্ষণ হতে বিরত ছিল এবং অন্যদেরকে নিষেধ করেছিল। আর একদল যারা নিজেরাই বিরত থাকল শুধু। আর একদল যারা আল্লাহ্‌র নিষেধের সীমালংঘন করেছিল এবং পাপকর্মে স্থির রইল। যখন তারা পাপাচারের ব্যাপারে সীমা লংঘনে বিরত থাকতে চাইল না, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন যে, তোমরা তুচ্ছ ও ঘৃণিত বানরে পর্যবসিত হয়ে যাও। তারপর এরা বানরে পরিণত হয়ে গেল। এদের একটি করে লেজ গজাল, এরা পরস্পরে চিৎকার দিতে লাগল। ইতিপুর্বে এরা পুরুষ ও স্ত্রীজাত মানুষ ছিল। হযরত কাতাদাহ (র.)

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে শনিবারে মৎস্য শিকার হতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু মৎস্য শনিবারে পানির উপরিভাগ দিয়ে তাদের নিকট এসে উপস্থিত হতো, তার তাদেরকে এভাবেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সীমালংঘন করে মৎস্য শিকার করল। এজন্য পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করে দিলেন। হযরত সুদ্দী (র.) হতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, এরা 'আয়লা'বাসী, যা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের একটি গ্রাম বিশেষ। আল্লাহ পাক য়াহূদীদের প্রতি শনিবারে সকল প্রকার কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন আর শনিবারেই সমুদ্রের মৎস্য ঐ গ্রামের উপকূলের কাছে এসে ভিড় জমাত। এমনকি মৎস্য পানির উপরিভাগে তাদের ঠোঁট বের করে দিত। আর রোববার হলে সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যেত। অতঃপর পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত আর কোন মৎস্য দেখা যেত না।

وسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ يعدون فى السبت
اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم ج

[তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো, তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো, শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না, সেদিন মাছ তাদের নিকট আসত না। (সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৬৩]

মাছের এ অবস্থা দেখে তাদের কিছু কিছু লোকের মাছ খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হলো। তখন তারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করল যে, সমুদ্রের পার্শ্বেই গর্ত খনন করে সমুদ্রের সাথে তাকে একটি পরিখা দ্বারা যুক্ত করল। শনিবার আসলে পরিখাটি খুলে দিত এবং ঢেউয়ের আঘাতে তাড়িত হয়ে মাছগুলো ঐ গর্তে এসে জমায়েত হতো। মাছ গর্ত হতে বের হতে চাইলেও পানির স্বল্পতার দরুন আর বের হতে পারত না এবং ঐখানেই থেকে যেত। রোববার এসে তারা ওগুলো ধরে নিত। ঐ লোকটি মাছ ভাজা করলে তার

প্রতিবেশী মাছের গন্ধ পেয়ে তার নিকট জিজ্ঞেস করত, তখন ওরা তাদের মাছ ধরা সম্পর্কিত সংবাদ দান করত আর তারাও প্রতিবেশীদের মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করত। অতঃপর যখন মাছ খাওয়ার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের যাজক সম্প্রদায় তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরার বিষয়ে বলল, আফসোস! তোমরা কি শনিবার দিন মাছ শিকার করো? অথচ তা তো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তারা বলল, আমরা রোববারে মাছ শিকার করছি। কেননা, আমরা রোববারেই তা করছি। তখন ফুকাহাগণ বললেনঃ না বরং তোমরা ঐদিনই মাছ শিকার করেছ, যেদিন মাছ প্রবেশ করার জন্য পরিখার মুখ খুলে দিয়েছ। উত্তরে এরা বলল যে, 'না।' এভাবে ঐ গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকতে এরা অস্বীকৃতি জানাল। তখন যারা তাদেরকে নিষেধ করেছিল, তাদের একদল অন্যদলকে বললঃ তোমরা ঐ লোকদেরকে নিষেধ কর কেন, যাদেরকে আল্লাহ (তাদের কৃতকর্মের দরুন) হয় ধ্বংস করে দিবেন অথবা কঠোর আযাবের শাস্তি দিবেন। তোমরা তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মানছে না। উত্তরে তাদের কেউ কেউ বললঃ আমরা এ জন্যেই উপদেশ দিচ্ছি যাতে প্রভুর নিকট আমরা দায়মুক্ত হতে পারি। আর এ জন্যেই উপদেশ দিচ্ছি যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে। যখন শেষ পর্যন্ত ওরা উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন তাদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা বললঃ আমরা তোমাদের সাথে একত্রে একই গ্রামে বসবাস করব না। তারপর তারা গ্রামের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করে গ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করল। এভাবে মুসলমানগণ তাদের জন্য একটি প্রবেশদ্বার রাখল আর সীমালংঘনকারীরা আরেকটি। হযরত দাউদ (আ.) এদের প্রতি অভিসম্পাত দান করেছিলেন। এরপর মুসলমানগণ একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে যাতায়াত করত এবং অবাধ্যগণ অন্য একটি দিয়ে। একদিন মুসলমানগণ তাদের প্রবেশদ্বার খুললেও কাফিরগণ তাদেরটি খুলেনি। এভাবে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রবেশদ্বার না খুললে মুসলিমগণ দেওয়াল টপকিয়ে তাদের অঞ্চলে ঢুকে দেখতে পায় যে, ওরা সকলেই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে; এরা সকলেই লাফালাফি করছিল। এরা তাদের প্রবেশদ্বার খুলে দিলে তারা মাঠে বের হলো।

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ٥

[তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল, তখন তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও।' (সূরা আ'রাফঃ আয়াত ১৬৬)

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ط

[বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়াম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। (সূরা মায়িদাঃ আয়াত ৭৮)]

এ দুটি আয়াতাংশে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যাদের প্রতি লা'নত করা হয়েছিল, তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যারা বানরে পরিণত হয়েছিল। মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি আয়াত—

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ٥

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, তাদেরকে আসল অর্থে বানরে রূপান্তরিত করা হয়নি, বরং তা একটি রূপক অর্থ বিশেষ। আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদেরকে রূপক অর্থে বানর আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, كمثل الحمار يحمل اسفارا ط [তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ (জুম'আ ঃ ৫)] এ আয়াতে গাধার সাথে তুলনা করার বিষয়টিও একটি রূপক উপমা বিশেষ। মুজাহিদ (র.) হতে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ... ... قردة خاسئين ٥

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেনঃ তাদের অন্তর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তাদের আকৃতি বানরের রূপ হয়নি। আর এ ছিল একটি উপমা বিশেষ, যা আল্লাহ রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, كمثل الحمار يحمل اسفارا আয়াতাংশে الحمار। এর ব্যবহার একটি উপমা বিশেষ। মুজাহিদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত এই উক্তি আল্লাহ পাকের কিতাবে বর্ণিত প্রকাশ্য আয়াতের বর্ণনার পরিপন্থী। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে 'বানর' আর কিছু সংখ্যক লোককে 'শূকর'-এ পরিণত করে দিয়েছেন এবং করেছেন কিছু লোককে তাগুতের পূজারী। যেমন তাদের সম্পর্কে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, তারা তাদের নবীদেরকে বলেছিল, "আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্‌র দীদারের ব্যবস্থা করে দাও এবং আল্লাহ তা'আলা এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাদেরকে এ প্রশ্ন করার সময়ে 'তড়িৎ' ও 'গর্জন' কর্তৃক মূর্ছাগ্রস্ত করে দিয়েছিলেন এবং এ সংবাদও দান করেছেন যে, তারা বাছুর পূজা করেছিল। এজন্য তাদের তওবা হিসেবে নিজেদেরকে কতল করার বিধান প্রদান করেছিলেন এবং এ সংবাদও দান করেছেন যে, তাদেরকে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' অঞ্চলে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, যাও তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করে আস, আমরা এখানেই বসে থাকব। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে তীহ্ প্রান্তরে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরাফেরা করার বিপদে ফেলেছিলেন। কাজেই কোন মন্তব্যকারী যদি মন্তব্য করে যে, তাদের বানররূপে বিকৃত করা হয়নি তাতে কিছুই আসে-যায় না। কেননা, মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক তাদের কিছু লোককে বানর করে দিয়েছেন এবং কিছু সংখ্যককে শূকর করে দিয়েছেন। অন্য কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যেসব ঘোষণা দিয়েছেন, ওগুলোর মধ্যে ঐ সব চরিত্র বিদ্যমান ছিল, যেমন তাদের নবীদের বিরোধিতা করার কথা, তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের আযাব ও শাস্তি আসার কথা ইত্যাদি কিছুই প্রকৃত অর্থে ছিল না। কিন্তু যে কেউ এ সব কিছুর একটিকেও অস্বীকার করবে এবং অন্য রকম বলে বিবৃত করবে, তার নিকট প্রমাণ চাওয়া হবে এবং তার এহেন অস্বীকারকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। অতঃপর এসব দলকে জিজ্ঞেস করা হবে তাদের মতের সমর্থনে সহীহ ও কোন মশহুর হাদীস আছে কি না? হযরত মুজাহিদ (র.)-এর এ মত ঐ সব দলীল-

প্রমাণের বিরোধী, যার পরে আর ভুল-ভ্রান্তির কোন অবকাশ থাকে না। এতদ্‌সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের উপর তাফসীরকারগণের ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং এসব দলীলের ভ্রান্তি সম্পর্কে কোন ইজমা' সংগঠিত হয়েছে এ কথা বলাও ভুল।

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

فقلنا لهم অর্থাৎ فقلنا للذين اعتدوا যারা শনিবারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছিল। السبت। এর অর্থ মূলত নীরবতা, শান্তি ও বিশ্রাম। এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে مسبوت বলা হয়। কেননা, সে ঐ সময়ে নীরব আর বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وجعلنا نومكم سباتا—আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি তোমাদের শরীরের জন্য শান্তিদায়ক। তা ক্রিয়াপদ سبت فلان يسبت سبتا এর মূল উৎস। এর তাৎপর্য সম্পর্কিত অন্য একটি ভাষ্য অনুযায়ী একে السبت। নামে অভিহিত করার কারণ বলা হয়ে থাকে যে, سبت নাম রাখার কারণ, জুমআর দিনে আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টি পূর্ণ করেছেন, আর তা হলো শনিবারের পূর্ব দিন। كونوا قردة خاسئين অর্থ صيروا (তোমরা হয়ে যাও) الخاسى। অর্থ বিদূরিত ও বিতাড়িত যেমন—কুকুরকে বিতাড়িত করা হয়। এ শব্দ হতে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদসমূহ উদ্ভূত ঃ خساته اخسؤه خسا و خسوءا وهو يخسا خسوء اخساته فخسأ وانخسأ একটি رجز পংক্তিতে এই শব্দটি নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

كالكلب ان قلت له اخساء انخسا—يعنى ان طردته انطرد ذليلا صاغرا

অনুরূপভাবে كونوا قردة خاسئين এর অর্থও ঘৃণিত ও বিতাড়িত বানরে রূপান্তরিত হয়ে যাও। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি كونوا قردة خاسئين এর অর্থ বর্ণনা করেছেন صاغرين বা ঘৃণিত। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে আরেক সূত্রে বর্ণিত كونوا قردة خاسئين অর্থ صاغرين (ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত)। হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, كونوا قردة خاسئين অর্থ صاغرين ذلة—অতিশয় ঘৃণিত। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, خاسئا অর্থ ذليلا (ধিক্কৃত)।

(৬৬) فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ০

(৬৬) আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

তাফসীরকারগণ ها এবং الف। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে এ প্রসংগে ها দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে দুটি বর্ণনা রয়েছে। প্রথমত যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতাংশ فجعلناها অর্থ فجعلنا تلك العقوبة বা ধিক্কৃত করে দেওয়া (المسخة)। কাজেই এ ব্যাখ্যানুযায়ী

সর্বনাম ها এর সম্পর্ক হচ্ছে المسخة— । তা مسخة الله مسخهم হতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (مصدر)। এ ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াবে, فصاروا قردة ممسوخين এবং فجعلناها অর্থ فجعلنا عقوبتنا و مسخنا اياهم —।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় মত হলো যেমন ঃ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين অর্থ الحيتان —। এই ব্যাখ্যানুসারে সর্বনাম ها এর সম্পর্ক হবে ذكر الحيتان —। কিন্তু এর আলোচনা পূর্ববর্তী কথায় উল্লিখিত হয়নি। পরবর্তী আলোচনায় তার প্রসংগ উল্লিখিত হওয়ায় এর উল্লেখ ইংগিতের মাধ্যমে হয়েছে এবং এর ইংগিতবহ অংশ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت —। অন্যদের মতে فجعلناها অর্থ فجعلنا القرية التى اعتدى اهلها فى السبت —। এ ব্যাখ্যার আলোকে এদের মতে সর্বনাম ها দ্বারা الذين سفوا القوم قرية বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে فجعلناها অর্থ فجعلنا القردة الذين مسخوا نكالا الخ —। এঁদের মতে ها সর্বনাম দ্বারা القردة এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অন্য তাফসীরকারগণের মতে فجعلناها অর্থ فجعلنا الامة التى اعتدت فى السبت نكالا (অর্থাৎ যে সম্প্রদায় শনিবারে সীমালংঘন করেছে, তাদের শাস্তি স্বরূপ)

نَكَالًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

نكال শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। যেমন, نكل فلان بفلان تنكيلا و نكالا —। النكال। শব্দটি মূলত العقوبة-এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন ঃ عدى بن زيد العبادى এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ لا يسخط الضليل ما سمع العبد و لا فى نكاله تنكير

উপরে বর্ণিত আমাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ একটি মত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ نكالا অর্থ العقوبة। (শাস্তি)। হযরত রবী' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فجعلناها نكالا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ اى عقوبة (শাস্তি)।

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا-এর ব্যাখ্যা ঃ

মুফাসসিরগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যেমন ঃ হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ পাকের বাণী—لما بين يديها এর ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে পরবর্তিগণ আমার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে আর وما خلفها এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যারা তাদের সংগে অবশিষ্ট ছিল। হযরত রবী' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি لما بين يديها و ما خلفها আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত পাপাচার ইতিপূর্বে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল আর وما خلفها অর্থ ওরা যে সমস্ত মাছ শিকার করেছিল তার শাস্তি স্বরূপ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لما بين يديها-এর ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত সম্প্রদায়ের পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ আর وما خلفها অর্থ মাছ ধরার শাস্তি স্বরূপ। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

www.eelm.weebly.com

بين يديها এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে সমস্ত পাপ কাজ পূর্বে করেছিল এবং وما خلفها অর্থ যে সমস্ত পাপ কাজের দরুন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, نكالا لما بين يديها وما خلفها-এর অর্থ প্রসংগে তিনি বলেন যে, بين يديها অর্থ ما مضى من خطاياهم এবং وما خلفها অর্থ خطاياهم التى هلكوا بها । হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তিনি وما خلفها-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, خطيئتهم التى هلكوا بها । অন্য কয়েকজনের মতে, যেমন হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, اما ما بين يديها فما سلف من عملهم (তাদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ) এবং وما خلفها অর্থ তাদের পরবর্তী যুগের জাতিসমূহও যদি এদের মত পাপ কাজে লিপ্ত হয় তা হলে আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহারই করবেন। অন্য কয়েকজনের মত হলো যেমন হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها অর্থ الحيتان। (ঐ মৎস্যগুলিকে) তাদের পূর্ববর্তী পাপকাজসমূহ এবং মৎস্য শিকারের পরবর্তী সময়ে কৃত অপরাধসমূহের শাস্তির কারণ স্বরূপ করেছি। ما بين يديها وما خلفها সম্পর্কিত আলোচনা এই যা আমরা বর্ণনা করলাম। কিন্তু এসব ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হলো তা, যা হযরত দাহ্হাক (র.) কর্তৃক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, সর্বনাম ها দ্বারা তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তিসমূহ যেমন শাস্তি ও বিকৃতি ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। কেননা, উল্লিখিত শাস্তির কথা দ্বারা উহ্য শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তাঁর শাস্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা‘আলা نكالا শব্দ দ্বারা সে শাস্তি বুঝিয়েছেন, যা ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি নিপতিত হয়েছে—আর তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয়। কাজেই نكالا বলতে উল্লিখিত শাস্তিসমূহ ধরা হলে অন্য কোন অর্থের দিকে সর্বনামের সম্পর্কের চাইতে উত্তম হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এইঃ এ অর্থে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য জাতিসমূহকে এদের মত দুষ্কর্ম করতে নিষেধ করেছেন, যে রকম দুষ্কর্ম করেছে ঐ সব বিকৃত লোকেরা। কেননা, তখন তাদেরকেও ঐরূপ আযাব দেওয়া হবে। আর যারা فجعلناها অর্থ الحيتان। فجعلناها বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের সে অর্থ উদ্ধার করা একটি সুদূরপরাহত ব্যাপার। কেননা, الحيتان। এর উল্লেখ আয়াতে করা হয়নি। হয়ত উল্লেখ থাকলে তা বলা যেত। যদি কেউ মনে করেন যে, এভাবে অনুল্লিখিত বস্তুর প্রতি ইংগিত করাও অসুবিধার কথা নয়। কেননা, আরবগণ কোন কোন সময় কোন বিশেষ নামের উল্লেখ ছাড়াও তার সর্বনাম ব্যবহার করে থাকে। যদি এদিক দিয়ে বিচার করা হয়, তবে তা আল্লাহ পাকের কিতাবের প্রকাশ্য বর্ণনাভঙ্গির বিরোধী। বিশেষ করে যেখানে কিতাবের সুস্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, সেখানে তা বাদ দিয়ে এমন অর্থ গ্রহণ উচিত হবে না, যা কুরআনের বাকরীতি দ্বারা সমর্থিত নয়, আর রাসূলের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়; এমনকি এ বিষয়ে উলামায়ে দীনের কোন সর্বসম্মত (ইজমা) মতও নেই।

অনুরূপভাবে যারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ঐ এলাকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিবাসীকে বুঝিয়েছেন, তাদের ব্যাপারেও পূর্বোক্ত মত প্রযোজ্য।

مَوْعِظَةً-এর ব্যাখ্যা :

যখন কেউ কাউকে উপদেশ দেয়, তখন আরবীতে প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়ঃ وعظت الرجل اعظه وعظا وموعظة (আমি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছি।) আর এ প্রবাদ বাক্যই হলো الموعظة শব্দের উৎস। যার অর্থ উপদেশ দান করা। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين ليتعظوا بها ويعتبروا ويتذكروا بها -

অর্থাৎ অতঃপর আমি এ ঘটনাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষা হিসাবে এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখেছি, যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্মরণ রাখে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, الموعظة। অর্থ تذكرة وعبرة للمتقين (মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা)।

لِّلْمُتَّقِينَ-এর ব্যাখ্যা :

المتقون। তারা, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরযসমূহ আদায়ে যত্নবান হয় এবং আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ وموعظة للمتقين অর্থ المتقون الذين يتقون الشرك। (যে মু’মিনগণ শিরক থেকে আত্মরক্ষা করে)। এভাবে সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়। শনিবারের বিষয়ে যারা সীমালংঘন করেছিল, তাদের শাস্তির বিষয়টি متقين-এর জন্যই উপদেশ রূপে উপস্থাপিত করেছেন। তা মু’মিনদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকবে। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে যারা এ শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য নয়, যেমন হযরত ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, وموعظة للمتقين অর্থাৎ الى يوم القيامة (কিয়ামত পর্যন্ত এ ঘটনা উপদেশ হিসাবে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, وموعظة للمتقين অর্থাৎ بعدهم (যারা পৃথিবীতে তাদের পরে আসবে তাদের জন্য নসীহত)। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, موعظة للمتقين দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত রবী‘ (রা.) হতে বর্ণিত আছে وموعظة للمتقين এর অর্থ প্রসংগে তিনি বলেনঃ فكانت موعظة للمتقين خاصة (এ নসীহত শুধু মুত্তাকীদের জন্য)। হযরত ইব্ন জুরায়জ হতে বর্ণিত যে, وموعظة للمتقين অর্থাৎ لمن بعدهم (যারা পরবর্তীতে আসবে, তাদের জন্য উপদেশ হয়ে থাকবে)।

(৬৭-৬৮) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

(৬৭-৬৮) স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাহর আদেশ দিয়েছেন, তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই, যাতে আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর, যেনো তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তা কি? মূসা বলল, আল্লাহ বলেছেন, তা এমন একটি গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে তাই পালন কর।

এ আয়াত এমন আয়াতসমূহের অন্যতম, যার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষগণ, যারা আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা করে তা ভংগ করেছে, তাদের প্রতি ধমক দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে উদ্দেশ করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "তোমরা আরো স্মরণ কর তোমরা আমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা ভংগের কথা, যখন হযরত মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিল—ওরা যখন তাদের জনপদে একজন নিহত ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ করছিল—আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার আদেশ দিয়েছেন। উত্তরে তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে খেল-তামাশা করছ? الهزو। অর্থ খেল-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ। যেমন কোন কবি তার একটি رجز পংক্তিতে বলেছেন—

قد هزأت مني أم طيسلة + قالت أراه معدما لا شئ له

এখানে ব্যবহৃত قد هزئت অর্থ قد سخرت و لعبت —। আসলে আম্বিয়া আলায়হিমুস্‌সালাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সব আদেশ-নিষেধ বিষয়ক বাণী নিয়ে আসেন ঐ ব্যাপারে কোনরূপ বিদ্রূপ করা নেহায়েত অনুচিত। কিন্তু বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে মনে করেছিল যে, তিনি আল্লাহ পাকের আদেশ তথা নিহত ব্যক্তির ঘাতক চিহ্নিত করার বিষয় নিয়ে তাদের বিরোধ নিরসনে তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার ব্যাপারটি ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। أتتخذنا هزوا এখানে ক্রিয়াপদের (قالوا) সাথে একটি فاء ছিল, যা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, তা جواب এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। فاء-এর উল্লেখ না করার কারণ, পূর্ববর্তী কথায় فاء-এর প্রতি ইংগিত রয়েছে। কেননা, إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة-এর পর বাক্যের অর্থ পূর্ণ হওয়ার দরুন শ্রবণকারীর জন্য প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকছে না। এজন্য أتتخذنا هزوا।

কথার পূর্বে فاء কে উহ্য রাখা সম্ভব হয়েছে। যেমন, فما خطبكم أيها المرسلون (ইবরাহীম বলেন, "হে ফিরিশতাগণ, তোমাদের বিশেষ কাজ কি?" এ কথার পর ফিরিশতাদের উক্তি قالوا إنا أرسلنا [তারা বলল, "আমাদেরকে (এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি) পাঠানো হয়েছে।" সূরা যারিয়াত ঃ ৩১-৩২] এ আয়াতাংশেও فاء কে বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা উত্তম বিবেচিত হয়েছে। এখানে فقالوا إنا أرسلنا বলা হয়নি। যদিও বাক্যরীতি অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা। তবে قالوا إنا أرسلنا এর স্থলে فقالوا বললেও হতো, কিন্তু পূর্ণ একটি বাক্যের উত্তরে না হয়ে একটিমাত্র পদের পরে আসলে তখন فقالوا তথা فاء কে উল্লেখ করতে হতো। এর উদাহরণ হলো এ রকম যে, আমরা বলি ঃ قمت و فعلت كذا وكذا কেননা, তা عطف এর ক্ষেত্র, استفهام-এর ক্ষেত্র নয়—যেখানে দুই ক্রিয়াপদের মধ্যে وقف করা যেতে পারে। এজন্যই যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে যা বলার ছিল তা বলেছিল, তখন উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন যে, আল্লাহ পাকের সংবাদ নিয়ে কোনরূপ কৌতুকের আশ্রয় নেওয়া অজ্ঞতারই নামান্তর এবং তাঁর ব্যাপারে ওরা যে সন্দেহ পোষণ করেছিল তিনি নিজেকে তা হতে পবিত্র করলেন। তিনি বললেন, أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين "আমি ঐ সমস্ত মূর্খের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চাইতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও অমূলক সংবাদ দান করে।" হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة বলার কারণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন কর্তৃক 'উবায়দা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নিঃসন্তান লোক ছিল, তাকে তার এক উত্তরাধিকারী হত্যা করে দিয়েছিল এবং তাকে কাঁধে নিয়ে তার বাড়ীর বাইরে আবর্জনা স্তূপে ফেলে আসল। অতঃপর তার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরম্ভ হলো এক বিরাট বিবাদ। অবশেষে তারা অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকেরা বলতে লাগল, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের রাসূল বিদ্যমান থাকতে তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করছ কেন?" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা আল্লাহ পাকের নবীর কাছে আসল। নবী তাদেরকে বললেন, 'তোমরা একটি গাভী যবাহ কর।' তখন তারা বলতে লাগল ঃ আপনি কি আমাদের সংগে বিদ্রূপ করছেন? তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ পাকের নিকট (এ রকম বিদ্রূপকারী অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।' তখন তারা বলল ঃ (তাহলে) আপনি আল্লাহ্‌র নিকট ঐ গাভীর বিবরণ জানার জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ পাক বলেন, وإذ قال موسى لقومه (এ অংশ থেকে) فذبحوها وما كادوا يفعلون পর্যন্ত পাঠ করলেন। (সূরা বাকারা ঃ ৬৭-৭১ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে নিহত ব্যক্তির গায়ে নির্দেশিত পন্থায় আঘাত করা হলে সে তার ঘাতকের নাম জানিয়ে দিল। বর্ণনাকারী আরও বলেন যে, গাভীটি তার সম পরিমাণের স্বর্ণ ব্যতীত খরীদ করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন, যদি তারা যে কোন একটি নিকৃষ্ট ধরনের গাভীও যবাহ করত, তাতেও কাজ হতো। এ হত্যার কথা জ্ঞাত হওয়ার ফলে হত্যাকারী ঐ লোকেরা উত্তরাধিকারী হয়নি। অন্য একটি হাদীসে হযরত রবী' (র.) কর্তৃক হযরত 'আবুল আলিয়াহ (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন

অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিল এবং সে ছিল নিঃসন্তান, তার এক নিকটতম আত্মীয় ছিল, যে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, সে তার সম্পত্তি লাভ করার জন্য ঐ লোককে হত্যা করে রাস্তার সংযোগস্থলে ফেলে রেখেছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল, আমার আত্মীয়কে কে বা কারা হত্যা করেছে। হে আল্লাহ্র নবী! এখন আমি এ হত্যা রহস্য উদঘাটনের জন্য আপনাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও দেখছি না। তখন হযরত মূসা (আ.) জনতাকে একত্র করে আল্লাহ পাকের শপথ-সহ ঘোষণা দিলেন, যে কেউ এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, সে যেন তা প্রকাশ করে। আসলে জনতা এতদ্সম্পর্কে জানত না। তখন প্রকৃত হত্যাকারী অগ্রসর হয়ে বলল, আপনি আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে প্রকৃত ঘাতকের নাম বাতলিয়ে দেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করলে আল্লাহ পাক ওয়াহীর মারফত জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার হুকুম দিচ্ছেন। এতে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগল, আপনি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছেন? (এ কথা হতে মহান আল্লাহ্র বাণী أتتخذنا هزوا হতে وما كادوا يفعلون পর্যন্ত উল্লেখ করলেন)। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে লোকেরা যখন গাভী যবাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল, তখন যে কোন একটি গাভী উপস্থিত করে তা যবাহ করলে তাতেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি জটিল করে তুলেছে। তাই আল্লাহ পাকও তাদের জন্য কঠিন করে দিয়েছেন এবং যদি তারা (অবশেষে) وإنا إن شاء الله لمهتدون না বলত, তাহলে কোন দিনই তারা কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারত না। আমাদের কাছে বর্ণনা এসেছে যে, তারা উক্ত বিশেষণের গাভী তালাশ করতে করতে অবশেষে এক বৃদ্ধার নিকট গিয়ে তা পেলো, যার কিছু ইয়াতীম সন্তান ছিল, আর সে বৃদ্ধাই ছিল ওদের সমস্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল। যখন সে বুঝতে পারল যে, উক্ত গাভী ছাড়া তাদের অন্য কোন গাভী যবাহ করার উপায় নেই, তখন তার দাম দ্বিগুণ চাইল। তখন এরা হযরত মূসা (আ.)-কে এসে ঐ সংবাদ জানালে হযরত মূসা (আ.) বললেনঃ 'আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সহজ করে দিলেন, কিন্তু তোমরা বাড়াবাড়ি করে নিজেরাই নিজেদের জন্য ব্যাপারটি কঠিন করে ফেলেছ। এখন গিয়ে তার দাবীকৃত অর্থ দিয়েই তা খরীদ করে নাও।' তখন তারা এসে ঐ গাভীটি তাদের দাবীকৃত মূল্যে খরীদ করল এবং তা যবাহ করল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে ঐ গাভীর একটি হাড় নিয়ে নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করতে বললেন। তারা তা করায় তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলো এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দিয়ে আবার মৃত অবস্থায় ফিরে গেল, যেমন ইতিপূর্বে ছিল। তখন লোকেরা হত্যাকারীকে পাকড়াও করল। আর সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে নিহত ব্যক্তির পক্ষে অভিযোগ পেশ করেছিল। এভাবে আল্লাহ পাক তাকে নিকৃষ্ট কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড দান করলেন। সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, বনী ইসরাঈলের একজন খুব ধনবান লোক ছিল, তার এক কন্যা ও এক অভাবী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তারপর তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে ঐ লোক তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র রাগান্বিত হয়ে শপথ করল যে, সে তার চাচাকে হত্যা করবে এবং তার কন্যাকে বিয়ে করে তার সম্পত্তির মালিক হবে। এবং তার চাচার রক্তপণ দাবী করে ঐ অর্থও নিজে ভোগ করবে। একদিন শহরে বনী ইসরাঈলের কোন কোন গোষ্ঠীর নিকট বাইরের কিছু ব্যবসায়ী আসে। তখন যুবকটি চাচাকে গিয়ে বললঃ চাচা! আপনি আমার

সাথে চলুন এবং ঐ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে আমার জন্য কিছু ব্যবসার সামগ্রী খরীদ করে দিন। কেননা, আপনাকে দেখলে এরা আমাকে পণ্য দিতে রাযী হবে। আমার আশা, এ ব্যবসায় আমি মুনাফা করতে পারব। ভাতিজার এ প্রস্তাবে চাচা রাত্রিবেলা ভাতিজার সাথে বাড়ী হতে বের হলো। বৃদ্ধ চাচা যখন ঐ গোষ্ঠীর অঞ্চলে পৌঁছল, তখন ভাতিজা তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে আসে। সকালে সে তার চাচাকে তালাশ করার জন্য বাড়ীতে এলো আর এমন ভাব দেখাল যেন সে উক্ত হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কিছুই জানে না। এরপর সে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করল। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল যে, লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হয়েছে। সে তাদেরকে গিয়ে ধরল এবং বলতে লাগল যে, তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করেছ। শেষ পর্যন্ত মৃতের রক্তপণ দিতে তারা রাযী হলো। যুবকটি মাটি আঁচড়িয়ে তার গায়ে মাখল এবং 'হায় চাচা', 'হায় চাচা' বলে বিলাপ করতে লাগল। সে তাদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট বিচার চাইল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে রক্তপণ দেয়ার রায় দিলেন। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আরয করলঃ 'হে আল্লাহ্র নবী, আপনি আল্লাহ্র নিকট দুআ করুন যেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে তা আমরা জানতে পারি এবং প্রকৃত হন্তাকেই ধরা যেতে পারে। আল্লাহ্র কসম, তার দিয়্যাত (রক্তপণ) দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন কোন কাজ নয়; কিন্তু আমাদেরকে তার হত্যার অপবাদ দেওয়া হোক তা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে এই ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ○

(স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে—তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন। সূরা বাকারা, আয়াত ৭২)

তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেনঃ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة। তখন লোকেরা বললঃ আমরা আপনার নিকট নিহত ব্যক্তি ও তার হত্যাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আর আপনি আমাদেরকে বলছেন একটি গাভী যবাহ করতে—আপনি কি এভাবে আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছেন? তখন হযরত মূসা (আ.) উত্তরে বললেনঃ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যদি তারা যে কোন একটি গাভী উপস্থিত করে তা যবাহ করত, তাহলে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো, কিন্তু তারা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বিরক্ত করেছে। পরিণামে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর হয়েছেন। তখন তারা বললঃ

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ط قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ط عوان بين ذلك ○

"হে মূসা (আ.) আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বলে দেন, তা কি? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, তা এমন গাভী, যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়—মধ্য বয়সী।" الفارض অর্থ এমন বৃদ্ধা যা বাচ্চা ধারণে অক্ষম। البكر অর্থ যে মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। العوان অর্থ এমন হতে হবে যা উভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের।

যে সন্তান প্রসব করেছে এবং তার সন্তানও সন্তান প্রসব করেছে। فافعلوا ما تؤمرون
তোমাদেরকে যা নির্দেশ দান করা হয়েছে তা-ই কর। তখন তারা বলল ঃ

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ط قال انه يقول انها بقرة صفراء
فاقع لونها تسر الناظرين ○

"আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দুআ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন তার রং কিরূপ?
উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বললেন ঃ (আল্লাহ) বলছেন যে, তা হবে এমন একটি গাভী, যার রং হবে
উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ, যা দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে দেয়।" তখন তারা বলল ঃ

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ط ان البقر تشابه علينا ط وانا ان شاء
الله لمهتدون ○

"আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যাতে তিনি আমাদেরকে বলে দেন, গাভীটি কি রকম? কেননা,
গাভীর বর্ণনা এখনও আমাদের নিকট অস্পষ্ট। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা সঠিক লক্ষ্যে
পৌঁছতে পারি।" তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন, তা এমন একটি গাভী, যা
শ্রমে নিয়োজিত নয়। অর্থাৎ যা লাংগল টানে না বা ক্ষেতে পানি দেয় না, সকল দোষত্রুটিমুক্ত, যার
শরীরে কোন প্রকার দাগ নেই, এর সারা গায়ের রং অভিন্ন। মাঝে মাঝে সাদা, কাল বা লাল ফুট নেই।
তখন তারা বলল, এখনই আপনি আমাদেরকে সঠিক বিবরণ দিয়েছেন। এবার তারা উক্ত বিবরণের
গাভী তালাশ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ইসরাঈলের মধ্যে একজন পিতৃভক্ত
লোক ছিল, তার নিকট একজন লোক একটি মুক্তা বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসল আর তার দাম চাইল
সত্তর হাযার দিরহাম। কিন্তু লোকটির পিতা ছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় এবং চাবি ছিল তার মাথার নিচে।
তাই এ লোকটি বলল, তুমি আমার আব্বা ঘুম হতে জাগার জন্য অপেক্ষা কর, আমি তোমার নিকট
হতে তা আশি হাযার দিরহাম দিয়ে কিনব। তখন বিক্রেতা ব্যক্তি বলল ঃ তুমি তাকে জাগিয়ে
দাও, আমি তোমাকে ষাট হাযারে দিতে রাযী আছি। এভাবে মুক্তা বিক্রেতা দাম কমাতেই
থাকল। অবশেষে সে ত্রিশ হাযার দিরহামে গিয়ে পৌঁছল। অন্যদিকে ঐ ব্যক্তি তার পিতা
জাগ্রত হওয়ার শর্তে দাম বাড়াতে থাকল। অবশেষে সেও একশত হাযার (এক লক্ষ)
দিরহাম দিতে রাযী হলো। এরপর ঐ বিক্রেতা যখন এ বিষয়ে আরো বাড়াবাড়ি করতে থাকল,
তখন এ লোকটি উত্তর দিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন মূল্যের বিনিময়েই তোমার নিকট হতে
ঐ মুক্তা খরীদ করতে রাযী নই এবং কোন অবস্থাতেই সে তার পিতাকে নিদ্রা হতে জাগাতে
অস্বীকার করল। আল্লাহ তাআলা তাকে এ মুক্তার বিনিময় দান করলেন এভাবে যে, তিনি
ঐ গাভীটি তার জন্য নির্ধারিত করলেন। আর বনী ইসরাঈল ঐ সব গুণ বিশিষ্ট গাভীর সন্ধান করতে
লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা এ লোকের কাছে ঐ গাভীটি দেখতে পেল এবং তাকে ঐ গাভীটি তাদের
নিকট বিক্রয় করার প্রস্তাব দিল। অন্য একটি গাভীর বিনিময়ে সে এতে রাযী না হলে তারা দুটির
বিনিময়ে কিনতে চাইল। এবারও সে রাযী হলো না। তারা তিনটির বিনিময়ে কিনতে চাইল।
এবারও সে রাযী হলো না। এভাবে গাভীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। এমনকি দশটি গাভীর বিনিময়ে
হলেও পেতে চাইল। এবার বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা

তোমার নিকট হতে এ গাভী নিয়েই ছাড়ব। অবশেষে ঐ লোকটিকে নিয়ে তারা হযরত মূসা (আ.)
-এর নিকট গেল। আর তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আপনার বর্ণিত গাভীটি এ লোকের
নিকট প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা তাকে অনেক প্রকার মূল্য দানের প্রস্তাব দেওয়ার পরেও সে আমাদের
নিকট এ গাভীটি বিক্রি করতে রাযী হয়নি। হযরত মূসা (আ.) বললেন, 'তুমি তোমার গাভীটি
এদেরকে দিয়ে দাও।' তখন লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ ভোগ করার
ব্যাপারে সকলের চাইতে বেশী হকদার। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'
তখন তিনি তার গোত্রের লোকদেরকে বললেন, "তোমরা যে কোন প্রকারেই হোক, এ লোককে রাযী
করেই তবে নিতে পার। তখন তারা ঐ লোককে গাভীর সম পরিমাণ স্বর্ণ দিতে তৈরি হলো। এতেও
সে রাযী না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত দশগুণ স্বর্ণ দানের বিনিময়ে সে ঐ গাভী বিক্রি করতে রাযী
হলো। এবার হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা এই গাভী যবাহ কর। অতঃপর তারা তাকে যবাহ
করল। হযরত মূসা (আ.) বললেন ঃ এর কিয়দংশ দিয়ে লোকটির শরীরে আঘাত কর। তখন
লোকেরা গাভীর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী হাড় নিয়ে মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করল। এভাবে লোকটি
জীবিত হলো। লোকেরা তার নিকট জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? লোকটি বলল,
"আমাকে আমার ভাতিজা হত্যা করেছে। সে এ পণ করেছিল যে, সে আমাকে হত্যা করে আমার
কন্যাকে বিয়ে করবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে।" এবার লোকেরা ঐ যুবককে বন্দী করে
হত্যা করল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, সকলেই সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যে কারণে মূসা
(আ.) তাদেরকে বলেছিলেন ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة। তা ছিল 'উবায়দা, আবুল
আলিয়াহ ও সুদ্দী (র.) কর্তৃক বর্ণিত কারণের অনুরূপ। তবে কারো কারো বর্ণনায় এর উল্লেখ আছে
যে, যে ব্যক্তি লোকটিকে হত্যা করেছিল, সে ছিল নিহত ব্যক্তির (قتيل এর) ভাই। তাদের কেউ কেউ
উল্লেখ করেছেন যে, সে ছিল নিহত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র। আবার কেউ এও উল্লেখ করেছেন যে,
হত্যাকারী একজন ছিল না বরং তার উত্তরাধিকারীদের (وارث) একটি দল ছিল—যারা তার
মৃত্যুকে বহু বিলম্ব মনে করে তাকে হত্যা করেছিল। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তারা
যখন মূসা (আ.)-এর নিকট এ হত্যাকাণ্ডের বিচার দায়ের করল, তখন তিনি নিহত ব্যক্তির
হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি গাভী যবাহ করার নির্দেশ দিলেন। আর এ
আদেশদান ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশেই। তখন তারা জবাব দিয়েছিল যে, তারা যে বিষয়ের বিচার
প্রার্থনা করতে তাঁর নিকট এসেছিল তার সাথে গাভী যবাহ করার সম্পর্ক কিসের? এজন্য
কেউ কেউ মূসা (আ.)-কে বলতে লাগল যে, তিনি তাদের সাথে বিদ্রূপ করছেন না তো! ইবন যায়দ
বলেন, বনী ইসরাঈলের একজন লোক নিহত হলো। আর ঐ লাশটি কোন একটি গোত্রের এলাকায় ফেলে
রাখা হয়। তখন নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা এগোত্রের লোকদের নিকট এসে দাবী করল, "আল্লাহ্‌র
কসম, তোমরাই একে হত্যা করেছ।" তখন তারা বলল, "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাকে হত্যা করিনি।"
তারপর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমাদের এই নিহত ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র কসম তারাই
হত্যা করেছে। তখন তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে, আমরা হত্যা করিনি।

বরং এই নিহত ব্যক্তিটিকে আমাদের অঞ্চলে ফেলে রাখা হয়েছে। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন ঃ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ط —। তখন তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছেন ? মূসা (আ.) উত্তরে বললেন ঃ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ০ —।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স হতে বর্ণিত আছে যে, যখন নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন এবং যাদের বিরুদ্ধে ঐ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তারা মূসা (আ.)-এর নিকট এসে তাদের ঘটনা খুলে বলল, আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াহী-এর মারফত জানালেন, তারা যেন একটি গাভী যবাহ্ করে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন ঃ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ...... أن أكون من الجاهلين —। তারা বলল ঃ নিহতের সাথে গাভীর কি সম্পর্ক ? তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ্ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, অথচ তোমরা বলছ, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যাদেরকে হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ্ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা একথা জানার পরেও এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরেও যে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে যে কথার নির্দেশ দিয়েছেন তথা একটি গাভী যবাহ্ করার আদেশ—একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তা করেছেন এবং তা কোন বিদ্রূপ নয় বরং বাস্তব কথা, তখন তারা বলল ঃ আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, গাভীটি কি ধরনের তা যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলে দেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য যে কোন একটি গাভী যবাহ্ করাই যথেষ্ট ছিল, কোন বিশেষ ধরন, বর্ণ বা চরিত্রের গাভী যবাহ্ করার মধ্যে সীমিত ছিল না। কিন্তু তারা তাদের চরিত্রের বক্রতা, প্রকৃতির রূঢ়তা ও বোধশক্তির অভাবে এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য শ্রমসাধ্যতা শিথিল করা সত্ত্বেও তাদের রাসূলের মনে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতার কারণে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين তখন এরা তাকে মনোকষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য এই প্রার্থনা করুন, যেন তা কোন্ প্রকৃতির গাভী তা সুস্পষ্ট করে দেন। কিন্তু যখন তারা অজ্ঞতা-বশত ও নবীর প্রতি দুর্ব্যবহারবশত এমন ব্যাপারে না বুঝার ভান করল, যেখানে যে কোন ধরনের একটি গাভী যবাহ্ করলেই যথেষ্ট হতো, বিশেষ করে আল্লাহ্ পাকের নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদেরকে যে সংবাদ দান করেছিলেন সে সম্পর্কে أتتخذنا هزوا। এর মত ঘৃণ্য মন্তব্য করার পরও আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবে শাস্তিদান করলেন যে, যেখানে তিনি তাদেরকে যে কোন একটি গাভী যবাহ্ করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেখানে একটি বিশেষ জাতের গাভী যবাহ্ করার হুকুম দান করলেন। যেমন তাদের উক্তি "ঐ গাভীর বিশেষ চরিত্র ও দৈহিক বিবরণ কি কি আমাদেরকে বাতলাতে বলুন।" এর জবাবে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন— إنها بقرة لا فارض ولا بكر ط —। এখানে فارض অর্থ গাভীটি এমন নয় যে বেশী বার্ধক্যের ফলে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আরবী فرضت البقرة বলতে এ অর্থই বুঝানো হয়। এর ক্রিয়াপদ تفرض فروضا —। কবির নিম্নোক্ত পংক্তিতে শব্দটি নিম্নরূপ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

يا رب ذي ضغن علي فارض + له قروء كقروء الحائض

এখানে فارض শব্দটি قديم এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমার প্রতি বহু দিনের হিংসা ও বিদ্বেষ। অন্য একজন কবির একটি পংক্তিতে শব্দটি নিম্নরূপ এসেছে ঃ

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا + تساق إليه ما تقوم على رجل

فارض সম্পর্কে আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবার বর্ণনা ঃ হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, لا فارض অর্থ لا كبيرة —। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, لا فارض অর্থ لا كبيرة —। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, الفارض। অর্থ বার্ধক্যে উপনীত। অন্য একটি স্থানে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি لا فارض এর অর্থ করেছেন ليست بكبيرة هرمة —। আর একটি বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, لا فارض অর্থ الهرمة —। অন্য একটি সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, الفارض। অর্থ الكبيرة —। অন্য একটি সূত্রে হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে, لا فارض অর্থ لا هرمة —। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, الفارض الهرمة। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, الفارض। অর্থ الهرمة —। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই ঃ ليست بالهرمة ولا البكر عوان بين ذلك —। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, الفارض الهرمة التي لا تلد —অর্থাৎ এমন বৃদ্ধা গাভী যা কোন সন্তান প্রসব করে না। অন্য একটি বর্ণনায় ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ الفارض الكبيرة —।

وَلَا بِكْرٌ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আদম সন্তান বা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যেসব স্ত্রীজাতি পুরুষের সংস্পর্শে আসেনি, তাকে البكر বলা হয়। এ শব্দটির প্রথম অক্ষর باء — كسرة বিশিষ্ট। এটি একটি বিশেষ্য পদ। তা কোন ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়নি। আর البكر-এর প্রথম অক্ষর فتحة বিশিষ্ট হলে তখন অর্থ হবে অল্প বয়সী উষ্ট্র। মহান আল্লাহ তা'আলা এই ولا بكر দ্বারা ولا صغيرة لم تلد বুঝিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, ولا بكر অর্থ صغيرة —। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, البكر الصغيرة। অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) অথবা 'ইকরামা (রাবীর সন্দেহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ولا بكر অর্থ الصغيرة —। অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, ولا بكر অর্থ الصغيرة —। অন্য এক সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, ولا بكر ولا صغير অন্য এক সূত্রে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ولا بكر অর্থ ولا صغيرة ضعيفة —। অন্য একটি সূত্রে আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত যে, ولا بكر অর্থ ولا صغيرة —। অন্য একটি সূত্রে আবূ জা'ফর কর্তৃক রবী' হতে অনুরূপ বর্ণিত এবং হযরত সুদ্দী (র.) হতে البكر। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত আছে—لم تلد إلا ولدا واحدا (যে গাভী শুধুমাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করেছে।)

عَوَانٌ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ العوان। অর্থ মধ্যবর্তী, যা পরপর দু'বার বাচ্চা প্রসব করেছে। তা بكر এর বিশেষণ নয়। আরবী ভাষায় বলা হয়েছে যে, عونت অর্থ যে গাভীটি عوان এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। আয়াতের অর্থ হলো এই ঃ انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر بل عوان بين ذالك এখানে عوان শব্দটি مستأنفة হিসাবেই সঠিক। কেননা, ذالك بين দ্বারা الفارض والبكر بين বুঝানো হয়েছে। এজন্য عوان শব্দটি পূর্বোক্ত দুটি শব্দের পূর্বে আসার কোন সুযোগ নেই। কবি আল আখতালের একটি পংক্তিতে শব্দটির নিম্নরূপ ব্যবহার লক্ষণীয়ঃ

وما بمكة من شمط محفلة + وما بيثرب من عون وابكار

এখানে عون শব্দটি عوان-এর বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে امرأة عوان من نسوة عون। কবি তামীম ইব্ন মুকবিল-এর একটি পংক্তিতেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

وما تم كالدمى حور مدامعها + لم تيأس العيش ابكارا ولا عونا

আরবী ভাষায় ব্যবহৃত بقرة عوان وبقر عون। আবার শব্দটি কখনও কখনও عون রূপেও ব্যবহৃত হয়। তখন তা عانة এর বহুবচন বলে চিহ্নিত হয় (عانة من الحمر)। আবার আরবীতে শব্দটি যুদ্ধ-বিগ্রহের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন حرب عوان বলা হয় ঐ যুদ্ধকে যেখানে প্রথমবার হতাহত হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আরো কিছু হতাহত হয়।

হযরত ইব্ন যায়দ (র.) থেকে পংক্তিটি পাঠ করে শুনিয়েছেন ঃ

قعود لدى الابواب طلاب حاجة + عوان من الحاجات وحاجة بكرا

অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের মত যারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আবেদন নিয়ে এসেছে এবং যারা নতুন প্রয়োজন নিয়ে এসেছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ পংক্তিটি ফারাযদাক রচিত। আমরা শব্দটির যে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেছি বর্ণনাভিত্তিক ভাষ্যকারগণও এর ব্যাখ্যা অনুরূপ করেছেন। যেমন হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, عوان بين ذالك অর্থ وسط যা একটি অথবা দুটি বাচ্চা প্রসব করেছে। অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, العوان العانس النصف। অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, العوان النصف (মধ্য বয়সী)। অন্য এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) অথবা ইকরামা হতে বর্ণিত (রাবী শুরায়ক-এর সন্দেহ) তিনি বলেন যে, عوان অর্থ بين ذالك (মধ্য বয়সী)। অন্য এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, عوان অর্থ بين الصغيرة والكبيرة কম ও অধিক বয়সীর মাঝামাঝি গাভী বা মধ্যবয়সী। চতুষ্পদ জন্তুর জন্য এই সময়টি তার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দেখতে সুন্দর। আরেকটি সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, عوان অর্থ (মধ্য বয়সী)। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, عوان অর্থ النصف। অন্য এক সূত্রে হযরত রবী' (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত যে, العوان نصف بين ذالك। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, عوان হচ্ছে ঐ পশু, যা কোন বাচ্চা প্রসব করার উপযুক্ত এবং বাস্তবে একটি বা দুটি বাচ্চা প্রসব করেছে। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, العوان হলো একটি পশুর বাচ্চা প্রসব করা এবং এর বাচ্চার বাচ্চা প্রসব করার মধ্যবর্তী স্তর। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, العوان بين ذالك অর্থ অল্প বয়সীও নয় এবং অধিক বয়সীও নয়।

بَيْنَ ذَٰلِكَ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

بين ذالك অর্থ بين البكر والهرمة (কম বয়স ও অধিক বয়সের মধ্যবর্তী সময়)। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে, بين ذالك অর্থ بين البكر والهرمة। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, بين সর্বদাই দুই অথবা অধিক বস্তুর মধ্যে বুঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, অথচ এখানে ذالك সর্বনামটি একবচনের জন্য নির্দিষ্ট, এর উত্তরে বলা হবে যে, যদিও ذالك সর্বনামটি একবচনের, কিন্তু এখানে তা দ্বারা দুটি অবস্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আরবরাও ذالك দ্বারা দুটি বস্তু বা দুটি অর্থের দিকে ইংগিত করে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি বলে থাকে اظن اخاك قائما وكان عمرو اباك। অতঃপর সে যদি বলে যে قد كان ذالك واظن ذالك সে ক্ষেত্রে তার কথিত ذالك وذالك এর দ্বারা كان ও اظن এর اسم ও خبر উভয়ের দিকে ইংগিত বুঝাবে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এই—

قال انه يقول انها بقرة لا مسنة هرمة ولا صغيرة لم تلد ولكنها بقرة نصف قد ولدت بطنا بعد بطن بين الهرم والشباب

হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, তা হবে এমন একটি গাভী যা খুব বেশী বয়সী বৃদ্ধ নয় এবং কম বয়সীও নয়, যা সন্তান প্রসব করেনি। বরং তা হবে মধ্য বয়সী এমন একটি গাভী, যা দুই বার বাছুর প্রসব করেছে। অধিক বুড়া ও অল্প বয়সের মধ্যবর্তী পর্যায়ের। এই ব্যাখ্যানুযায়ী ذالك সর্বনাম দ্বারা তার شباب (যৌবনাবস্থা) ও هرم (বার্ধক্যাবস্থা) উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি الفارض এবং البكر এর স্থলে দু'জন ব্যক্তির নাম হতো, তখন ذالك দ্বারা ঐ দু'জনকে একত্রিত করতে পারত না। কেননা, ذالك দু'জন ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন যে ব্যক্তি এ কথা বলল যে كنت بين زيد وعمرو সেক্ষেত্রে كنت بين ذالك বলা শুদ্ধ নয়। কারণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, দুই বিশেষ্য পদের মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হতে পারে না।

فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ্ পাক তাদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, "আমি তোমাদেরকে যে কাজের আদেশ দিয়েছি, তা তোমরা বাস্তবায়ন কর, তাহলেই তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে এবং আমার নিকট তোমাদের প্রার্থনা কবুল হবে। আর আমি তোমাদেরকে যে গাভীটি যবাহ করার আদেশ

দিলাম, তা তোমরা যবাহ কর। এতে আমার আদেশের আনুগত্যের মাধ্যমে তোমরা নিহত ব্যক্তির ঘাতক কে তা জানতে পারবে।"

(٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝

(৬৯) তারা বলল, তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদেরকে বাতলিয়ে দেন (যে গাভীটি যবাহ করতে বলা হয়েছে) তার বর্ণ কিরূপ। সে (মূসা) বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ় যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

এটাও প্রথম বারের পর তাদের আর একটি হঠকারিতা বিশেষ। কেননা, প্রথম বারে তারা আল্লাহ্‌র নবীকে গোয়ার্তুমিবশত প্রশ্ন করলে তাদেরকে গাভীর যে চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছিল, তদনুযায়ী কাজ করলে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কেননা, আল্লাহ কোনো বিশেষ রং-এর গাভীকে চিহ্নিত করে দেননি। কিন্তু তারা অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি না করে ক্ষান্ত হয়নি, আর এর ফলশ্রুতিতে তারা তাদের নবীর প্রতি গোয়ার্তুমিবশত বলল– যেমন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর—যেন তিনি আমাদেরকে তার রং কি তা বাতলিয়ে দেন। তখন শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বলা হলো যে, তা একটি উজ্জ্বল হলুদ রং-এর গাভী, যা দর্শকদেরকে বিমোহিত করে দেয়। এভাবে তাদেরকে একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে গাভীটি যবাহ করার আদেশ দিয়েছি, তা উজ্জ্বল হলুদ রং বিশিষ্ট। আর يبين لنا ما لونها অর্থ اى شئ لونها এবং এজন্যই ما لونها পদটি مرفوع রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এটি ما এর معمول আর يبين لنا এর مفعول হিসেবে ما কে نصب না দেওয়ার কারণ হলো এই যে, আরবীতে اى এবং ما এর প্রশ্নসূচক শব্দ দ্বারা অনেক বস্তুর মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন যদি বলা হয়ঃ

يبين لنا اسوداء هذه البقرة ام صفراء-

আর যেহেতু তা يبين لنا যুক্ত প্রশ্নের মত ব্যবহৃত হয়নি, তাই তাকে استفهام ধরে منصرف হিসাবে رفع দান করা হয়েছে। কিন্তু এর স্থলে اى আসলে তাতে পেশ হতো না। কেননা, তাতে একাধিক বিষয়কে একত্রিত করা হয়। অনুরূপ অন্যান্য যে সমস্ত শব্দ এর সমার্থক, তারাও একই অবস্থা এবং একই আমল করে, যা ما এবং اى করে থাকে।

صفراء এর অর্থ প্রসংগে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ سوداء شديدة السواد। এমত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহঃ হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি صفراء فاقع لونها এর অর্থ প্রসংগে বলেন যে, سوداء شديدة السواد —। অন্য একটি সূত্রেও হাসান হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অন্য এক দলের মতে, صفراء فاقع لونها অর্থ

صفراء القرن و الظلف —। এতদসম্পর্কিত বর্ণনাসমূহঃ হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি صفراء এর ব্যাখ্যা করেছেন صفراء القرن والظلف দিয়ে। অন্য এক সূত্রে হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি صفراء فاقع لونها-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, كانت وحشية —। অন্য একটি বর্ণনায় জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সাঈদ ইবন জুবায়র (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, بقرة صفراء فاقع لونها অর্থ صفراء القرن و الظلف —। অন্য একটি বর্ণনা মতে হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, انها بقرة صفراء অর্থ هى صفراء —। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فاقع لونها এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, যদি তারা কোন রকম একটি হলুদ রং-এর গাভী যোগাড় করতো, তাতেই যথেষ্ট হতো। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন, আমার মতে যারা صفراء-এর অর্থ سوداء দিয়ে করেছেন, তারা কালো বর্ণের উটকে هذه ابل صفر এবং هذه ناقة صفراء বলার রীতি হতে এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ উক্তি দ্বারা কালো বর্ণের উটকেই বুঝানো হয়ে থাকে। উটের মধ্যে কালো বর্ণের এ বিশেষণে ভূষিত করার একটি প্রধান কারণ হলো এই, সাধারণত কালো বর্ণের উটের রং হলুদ মিশ্রিত হয়ে থাকে। এ অর্থে কবির নিম্নোক্ত পংক্তি উল্লেখযোগ্যঃ

تلك خيلى منها و تلك ركابى + هن صفر اولادها كالزبيب

এখানে هن صفر দ্বারা هن سود বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটি যদিও উটের একটি বিশেষ গুণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গরুকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় না। তদুপরি আরবী ভাষায় سواد বা কালো বর্ণকে فاقع দিয়ে বিশেষিত করা হয় না; বরং গাঢ় কালো বুঝাবার জন্য حلوكة-এর বিশেষণ هو اسود حالك و حالك و حلكوك و اسود غربيب و دجوجى ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন هو اسود فاقع বলা হয় না, কিন্তু هو اصفر فاقع এর মাধ্যমে صفرة কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ فقوع এর বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এরূপ ব্যবহারই ঐ সমস্ত লোকের ভাষ্যের বিরোধী, যারা মনে করেন যে, فاقع অর্থ গাঢ় কালো বর্ণ।

فَاقِعٌ لَّوْنُهَا-এর ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ خالص অবিমিশ্রিত হলুদ রং-এর, হলুদ বর্ণে فقوع বিশেষণটি ঐরূপ, যেমন সাদা বর্ণে نصوع যার অর্থ গাঢ় ও অকৃত্রিম।

যেমন আ'মার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, কাতাদাহ (র.) বলেছেন যে, فاقع لونها অর্থ তার রং অকৃত্রিম ও অবিমিশ্রিত। অন্য একটি সূত্রে রবী' (র.) কর্তৃক আবুল 'আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, فاقع لونها অর্থ صاف لونها —। অন্য একটি সূত্রে আবূ জা'ফর কর্তৃক রবী' (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আর একটি বর্ণনায় আসবাত (র.) কর্তৃক সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فاقع এর অর্থ করেছেন نقى لونها দিয়ে। অন্য একটি বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, فاقع لونها অর্থ شديد الصفرة তথা এত বেশী উজ্জ্বল রঙের যদ্দরুন তা শুভ্রতার কাছাকাছিতে উপনীত হয়। আবূ জা'ফর (র.) বলেন, আমার মতে তা সাদা রংকেই বলা হয়েছে। যেমন, ইব্‌ন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, ইব্‌ন যায়দ فاقع لونها এর অর্থ প্রসংগে বলেছেন যে, شديدة صفرتها —। এ শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন

ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন فقع لونه يفقع فقعا وفقوعا فهو فاقع ইত্যাদি। এ শব্দটি কবির ভাষায় নিম্নরূপ ব্যবহৃত হয়েছে :

حملت عليه الورد حتى تركته + ذليلا يسف الترب واللون فاقع

تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○-এর ব্যাখ্যা :

تسر الناظرين অর্থ ঐ গাভীটি, তার সুগঠিত দেহ, চমৎকার দৃশ্য এবং তার দিকে তাকানো লোকদেরকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। অন্য একটি বর্ণনায় 'আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল বর্ণনা করেন যে, তিনি ওয়াহাবকে বলতে শুনেছেন যে, تسر الناظرين অর্থ তুমি তার দিকে তাকালে মনে করবে যে, তার লোম হতে সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেমন আসবাত (র.) সুদ্দী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, تسر الناظرين অর্থ تعجب الناظرين।

(٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ لا إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ط وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

(৭০) তারা আবার বলল : তোমার রবের নিকট আবেদন কর, যেন তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে আমাদের জন্য জানিয়ে দেন গরুটি কি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন : আয়াতে উল্লিখিত قالوا (তারা বল্ল) দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়কে যখন গাভী যবাই করার হুকুম দেওয়া হলো, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বল্ল। তবে আয়াতে موسى (মূসা) শব্দ অথবা মূসা (আ.)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী সর্বনামের উল্লেখ করা হয়নি, কারণ, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা বুঝা যায়। আয়াতের অর্থ হবে এই, قالوا له ادع ربك অর্থাৎ তারা তাঁকে মূসা (আ.) কে বলল : তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর। সুতরাং উপরোল্লিখিত কারণে এখানে له সর্বনাম উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ পাকের বাণী يبين لنا ما هى দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তৃতীয় বার মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মূর্খতা ও তাদের নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তাদেরকে যখন গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন সহজলভ্য একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের কাজ সম্পন্ন হতো। কেননা, তাদেরকে তখন কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়নি। অতঃপর তারা যখন গাভীর ধরনের কথা জিজ্ঞেস করলো, তখন তাদের বিভিন্ন বয়সের গাভীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বয়সের গাভীর বর্ণনা দেওয়া হয়। তাদের বলা হয়, তা হবে এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধাও নয় এবং দুর্বল বাছুরও নয়। অতঃপর তাদেরকে যখন গাভীর বয়সের বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন এ বয়সের নিকৃষ্টমানের একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের প্রয়োজন মিটে যেতো। কারণ, এ অবস্থায় গাভীর একটি নিদিষ্ট বয়স সীমার বর্ণনা ছাড়া

অন্য কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। গাভীটি একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণের হতে হবে এ কথাও তাদের বলা হয়নি। এরপরও তারা এরূপ গাভী যবাহ করতে অস্বীকার করলো যতক্ষণ না তা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য জন্তু থেকে চিহ্নিত না করা হয়। এভাবে বনী ইসরাঈল জাতি যখন তাদের নবীকে বার বার প্রশ্ন করে এবং তাঁর সাথে মতবিরোধ করে নিজেদের উপর কঠোরতা আনয়ন করে, তখন আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি কঠোর হুকুম দান করেন। আর এ কারণেই আমাদের নবী (স.) নিজের উম্মতকে সম্বোধন করে বলেন : "আমি তোমাদেরকে যে অবস্থায় ছেড়ে দিই তোমরা আমাকে তোমাদের সে অবস্থায় রাখতে দাও। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা অধিক প্রশ্ন করে এবং তাদের নবীর সাথে মতবিরোধ করে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তোমরা তা পালন কর এবং যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাঁকে খুব যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর হন এবং শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এ প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যদি তারা নিম্নমানের যে কোন একটি গাভী যবাহ করত, তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হতো; কিন্তু তারা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করল। তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর হলেন। উবায়দাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তারা একটি সাধারণ গাভী যবাহ করলেই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। 'উবায়দাহ আল্-সালমানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : তারা বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ কারণে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। 'ইকরামাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : বনী ইসরাঈল যে কোন একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের কাজ সমাপ্ত হতো। তিনি আরও বলেন : তারা যদি وانا ان شاء الله لمهتدون (আল্লাহ চাইলে আমরা সে গাভীর সন্ধান লাভ করব) না বলত, তবে তারা কখনও কাংখিত গাভীর সন্ধান লাভ করতে পারত না। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী

واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة

(অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে বলেন, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবাহ করার আদেশ করছেন)-এর ব্যাখ্যায় বলেন : তারা যে কোন প্রকার একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর হযরত মুজাহিদ (র.) পরবর্তী আয়াত---

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر

(তারা বলল : তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বল। হযরত মূসা (আ.) বললেন : আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয় এবং একেবারে বাছুরও নয়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন : তারা যদি এ প্রকার একটি গাভী যবাহ করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর হযরত মুজাহিদ (র.) পরবর্তী আয়াত---

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ○

(তারা বলল : তোমার প্রতিপালকের কাছে এটাও জিজ্ঞেস করে লও যে, গাভীটির রং কি
হবে? মূসা বলল : তিনি বলছেন : গাভীটি অবশ্যই হলুদ রঙের হবে---এর রং এতখানি
চাক্‌চিক্যপূর্ণ হবে যে, তা দেখে দর্শকরা সন্তুষ্ট হতে পারবে।)-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন :
যদি তারা হলুদ রঙের একটি গাভী যবাহ করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত
মুজাহিদ (র.) থেকে অপর একটি সনদের মাধ্যমেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। তবে এ বর্ণনায় অতি-
রিক্ত এসেছে : "কিন্তু, তারা কঠোরতা অবলম্বন করেছে, তখন তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ
করা হয়েছে।" অপর একটি হাদীসে ইব্‌ন জুরায়জ (ابن جريج) (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তারা যে কোন একটি গাভী যবাহ করলেই তাদের প্রয়োজন
মিটে যেতো। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র.) আরও বলেন যে, হযরত আতা (عطاء) (র.) তাঁকে
বলেছেন : তারা যদি নিকৃষ্টমানের একটি গাভী যবাহ করত, তবে তাও যথেষ্ট হতো। হযরত
ইব্‌ন জুরায়জ (র.) আরো বলেন : হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : তাদের
একটি নিকৃষ্টমানের গাভী যবাহ করার নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন বিষয়টিকে
তাদের উপর কঠোর করে দেয়, তখন আল্লাহ পাকও তাদের উপর কঠোর হুকুম আরোপ করেন।
আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি "ইন্‌-শা আল্লাহ" না বল্‌ত, তবে কখনও তাদেরকে গাভীর স্পষ্ট ও
সঠিক বর্ণনা দেওয়া হতো না। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) (ابو العالية) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন : ঐ জাতিকে যখন গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন যদি তারা কোন একটি
গাভী পেশ করত এবং সেটি যবাহ করত, তবে তাতেই তাদের কাজ হয়ে যেত। কিন্তু তারা নিজেদের
আত্মার উপর কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদের প্রতি কঠোর হন। এই সম্প্রদায়
যদি ان شاء الله لمهتدون (আল্লাহ চাইলে আমরা গাভীর সন্ধান লাভ করব) না
বলত, তবে তারা কখনও এই গাভীর সন্ধান লাভ করতে পারত না। হযরত কাতাদাহ (র.)
(قتادة) থেকে বর্ণিত আছে : তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত
নবী করীম (স.) বলতেন : এই জাতিকে একটি সাধারণ গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া
হয়েছিল, কিন্তু তারা যখন কঠোরতা অবলম্বন করে, তখন তাদের প্রতিও কঠোরতা করা হয়।
হযরত নবী করীম (স.) আরও বলেন : শপথ সে আত্মার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ রয়েছে—
যদি তারা ইন্‌শাআল্লাহ না বলত, তবে কখনও তাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হতো না। হযরত
ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন : তারা যদি একটি গাভী পেশ করে তা যবাহ
করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা কঠোরতা অবলম্বন করে এবং হযরত
মূসা (আ.)-কে কষ্ট দেয়। এতে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কঠোর হন। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস
(রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি এ জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাঈল একটি সাধারণ গাভী যবাহ
করত, তবে তাদের কাজ সম্পন্ন হতো। কিন্তু তারা কঠোরতা অবলম্বন করে, তাই তাদের প্রতিও
কঠোরতা করা হয়। অতঃপর তারা গাভীর চামড়া দীনার দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়ার শর্তে একটি গাভী
ক্রয় করে। হযরত ইব্‌ন যায়দ (ابن زيد) (র.) বলেন : তারা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী
একটি গাভী গ্রহণ করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তাদের এ সকল প্রশ্নে
বিপদ নেমে আসে। তারা বলল, "হে মূসা! তুমি তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করে গাভী সম্পর্কে
কিছু বিস্তারিত জানাতে বল।" এতে আল্লাহ পাক তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করেন। হযরত মূসা

(আ.) বললেন : আল্লাহ পাক বলছেন, "তা এমন একটি গাভী হবে যা বৃদ্ধাও নয় এবং একেবারে বাছুরও
নয়, বরং তা হবে মধ্যম বয়সের।" তখন তারা আবার বলল, তোমার রবের নিকট এটাও জিজ্ঞাসা
করে লও যে, গাভীটির রং কিরূপ হবে? হযরত মূসা (আ.) বললেন : তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই
হলুদ রঙের হবে—তা এমন চাক্‌চিক্যপূর্ণ হবে যা দেখে লোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে। হযরত
ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন : এবার আল্লাহ পাক তাদের উপর প্রথম বারের চেয়ে অধিক কঠোর
নির্দেশ দান করেন। তারা এতেও গাভী যবাহ করতে অস্বীকার করে। তারা এবার বল্‌ল, তোমার
প্রতিপালকের নিকট পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করে বল, গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা, গাভী
নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় রয়েছে। আল্লাহ চাইলে আমরা এর সন্ধান লাভ করব।
এবার তাদের উপর আরও কঠোর শর্ত আরোপ করা হলো। হযরত মূসা (আ.) তাদের এ প্রশ্নের
জবাবে বল্‌লেন : তিনি ইরশাদ করেছেন, ওটা এমন গাভী হবে, যা দ্বারা কোন কাজ করা হয়নি।
জমিও চাষ করে না, পানি সেচের কাজও করে না এবং তা হবে নিখুঁত ও নির্মল। হযরত ইব্‌ন
যায়দ (র.) বলেন : এতে তারা বিশেষ গুণে গুণান্বিত একটি গাভী যবাহ করতে বাধ্য হলো— যা ছিল
হলুদ বর্ণের, তাতে কালো বা সাদার কোন মিশ্রণ ছিল না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা উপরে সাহাবী, তাবিঈ এবং তাদের পরবর্তি-
গণের যে সকল মন্তব্য উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈলরা যদি একটি স্বাভাবিক
গাভী যবাহ করত, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো, কিন্তু তারা কঠোরতা অবলম্বন করে বলে আল্লাহও
তাদের প্রতি কঠোর হন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরো বলেন, এ সকল বিশেষজ্ঞের মন্তব্যে
সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ নিজ কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে সকল হুকুম বা
নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, তা বাহ্যিকভাবে সাধারণ নির্দেশজ্ঞাপক। এগুলো অভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ নির্দেশ
বহন করে না। তবে অবতীর্ণ কোন হুকুম অপর আয়াত দ্বারা অথবা আল্লাহ্‌র রাসূল খাস করতে
পারেন। পাক কুরআনের বাহ্যিক আয়াত যে হুকুম বহন করে, যদি অন্য কোন আয়াত বা রাসূলের
নির্দেশ সে হুকুমের বিপরীত হুকুম জারী করে উক্ত আয়াতকে খাস করে, তবে শুধুমাত্র খাসকৃত
এ হুকুমটিই উক্ত আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে বহিষ্কৃত হবে। আয়াতের অন্যান্য হুকুম পূর্বের
ন্যায় সাধারণ অবস্থায় বহাল থাকবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ বিষয়টি নিজ কিতাব
কিতাবুর রিসালা মিন্‌ লাতীফিল্‌ কাওলি ফিল্‌ বায়ানি আন্‌ উসূলিল্‌ আহ্‌কামি (كتاب الرسالة
من لطيف القول في البيان عن اصول الاحكام)-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা
করেছেন। তিনি নিজ মতের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন : উপরোল্লিখিত বিশেষজ্ঞ-
গণের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তাঁরা সকলেই বনী ইসরাঈলের কুৎসা বর্ণনা করেছেন। কারণ, তাদের
যখন গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা তাদের নবীকে গাভীর বৈশিষ্ট্য, বয়স
এবং তার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। এতে বুঝা যায়, তাঁদের মতে বনী ইসরাঈল তাদের
নবীকে জিজ্ঞাসা করে ভুল পথ অবলম্বন করেছিল। তাদের যখন আল্লাহ পাক গাভী যবাহ করার
হুকুম দিয়েছিলেন, তখন তারা একটি সাধারণ গাভী যবাহ করলেই আল্লাহ্‌র হুকুম পালন হতো
এবং সত্যের অনুসরণ করা হতো। কেননা, এ অবস্থায় তাদের কোন নির্দিষ্ট প্রকার গাভী বা
নির্দিষ্ট বয়সের গাভীর কথা বলা হয়নি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি তাঁকে গাভীর
বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন তাদের সকল গাভী থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়স ও নির্দিষ্ট

প্রকারের গাভীর বর্ণনা দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞগণের মত অনুসারে হযরত মূসা (আ.)-এর জাতিকে যখন একটি বিশেষ গাভীর বর্ণনা দেওয়া হলো, তখন তারা তাঁকে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে প্রথম বারের ভুলের ন্যায় আর একটি ভুল করেছিল। তাঁদের মতে তারা তৃতীয় বার প্রশ্ন করে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের মত তৃতীয় ভুল করে। তাঁদের মতে প্রথম বার তাদের উপর কর্তব্য ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাহ্যিক দিক পালন করে যে কোন একটি গাভী যবাহ করা। দ্বিতীয় বার তাদের কর্তব্য ছিল, একেবারে বৃদ্ধাও নয় এবং একেবারে বাছুরও নয় বরং মধ্যম বয়সের একটি গাভী যবাহ করা। উপরোল্লিখিত বিশেষজ্ঞগণের কেউ এই মত পোষণ করেন নি যে, দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তাদের প্রতি যে বিশেষ ধরনের গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা প্রথম বারের প্রকাশ্য হুকুম থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিশেষ হুকুমে রূপান্তরিত হয়েছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) অতঃপর বলেন, উপরোল্লিখিত বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্য এবং তাঁদের মতের সপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত হাদীস স্পষ্ট দলীল বহন করে যে, আয়াতের হুকুম আম ও খাস হওয়া সম্পর্কে আমাদের অভিমত সঠিক ও বিশুদ্ধ। আর কুরআন পাকের আয়াতে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত হুকুম খাস না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ নির্দেশজ্ঞাপক। এই আয়াতের কোন হুকুমকে খাস করা হলে খাসকৃত এই হুকুমটি আয়াতের সাধারণ নির্দেশ থেকে বহির্গত হবে এবং আয়াতের অপরাপর হুকুম পূর্ববৎ সাধারণ অবস্থায় বহাল থাকবে।

কোন কোন চরম মূর্খ ব্যক্তি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়ার পর মূসা (আ.)-কে গাভী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল এই, তারা ধারণা করে যে, তাদের নির্দিষ্ট গাভী যবাহ করার হুকুম করা হয়েছে এবং এটা তাদের জন্য খাস করা হয়েছে যেমন মূসা (আ.)-কে একটি খাস লাঠি দেওয়া হয়েছে। একারণেই তারা গাভীর আকৃতি বর্ণনা করার জন্য মূসা (আ.)-কে বলে—যাতে তারা গাভীকে চিনতে পারে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ মতকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেন, যদি এই মূর্খ ব্যক্তি তার বক্তব্যকে গভীরভাবে চিন্তা করত, তবে এ কঠিন বিষয়টি তার নিকট সহজ হতো। সেটি এই, তার মতে মূসা (আ.)-এর কাওম তাঁকে গাভী সম্পর্কে যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তা ঠিক ছিল। অথচ এতে তাদের প্রতি কঠিন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এছাড়া তিনি তাদের প্রতি আর একটি দূষণীয় বস্তু আরোপ করেছেন। সেটি এই, তার মতে মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় মনে করত যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি কোন বস্তু ফরয (অবশ্য কর্তব্য) করার পর তার বর্ণনা না দেওয়া বৈধ ছিল। অতঃপর তারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট তা জিজ্ঞাসা করে নিতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি এ ধরনের বিষয় আরোপ করা মোটেই বৈধ নয়। এতদ্ব্যতীত তার মত অনুসারে উক্ত জাতির চরম মূর্খতা প্রকাশ পায় যে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের উপর নতুন ফরয নির্দেশ অবতীর্ণ করার আবেদন জানায়। ان البقر تشابه علينا (গরুটি সম্পর্কে আমরা সন্দেহে পতিত হয়েছি)। بقرة (বাকারাহ)-এর বহুবচন بقر (বাকার)। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ بقر (বাকার)-এর স্থলে باقر (বাকির) পাঠ করেছেন। আরববাসীদের কথায় باقر (বাকির) শব্দ পাওয়া যায়। যেমন মায়মুন ইব্‌ন কায়স বলেনঃ

وما ذنبه ان عافت الماء باقر+وما ان يعاف الماء الا ليضربا

কবি উমায়্যা বলেনঃ

ويسوقون باقر السهل للطود+ل مهازيل خشية ان تبورا

উল্লিখিত চরণদ্বয়ে باقرا শব্দের ব্যবহার থাকলেও আরবদের পবিত্র কালামে এভাবে পাঠ করা বৈধ নয়। কেননা, তা সুপরিচিত পাঠ পদ্ধতিতে নেই। تشابه علينا —আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি। تشابه শব্দে বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি রয়েছে। কোন কোন পঠন পদ্ধতি অনুসারে شين (শীন)-কে تخفيف (তাশদীদ নয়)-এর সাথে এবং هاء (হা)-এর উপর نصب (যবর) দিয়ে পড়া হয়। যেমন تفاعل (তাফা'আলা)। بقر শব্দটি بقرة-এর বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও تشابه ক্রিয়াকে মুযাক্কার ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে শব্দের একবচনে هاء রয়েছে এবং বহুবচন করার সময় هاء কে বাদ দেওয়া হয়, সেটাকে 'আরবরা মুযাক্কার এবং মুওয়ান্নাছ উভয় পদ্ধতিতে ব্যবহার করে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ كانهم اعجاز نخل منقعر এখানে نخل-এর صفت—منقعر কে মুযাক্কার ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, نخل শব্দটি মুযাক্কার। অপর একটি আয়াতে نخل-এর صفت-কে মুওয়ান্নাছ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, نخل—نخلة-এর বহুবচন। আয়াতটি এইঃ كانهم اعجاز نخل خاوية এখানে خاوية কে মুওয়ান্নাছ ব্যবহার করা হয়েছে। অপর একটি পঠন পদ্ধতিতে شين-এর উপর تشديد এবং هاء-এর উপর ضمه (পেশ) রয়েছে। এ অবস্থায় بقر কে মুওয়ান্নাছ ধরে تشابه ক্রিয়াকে মুওয়ান্নাছ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন نخل-কে মুওয়ান্নাছ ধরে خاوية কে মুওয়ান্নাছ ব্যবহার করা হয়েছে। মুওয়ান্নাছের চিহ্ন স্বরূপ تشابه-এর শুরুতে একটি تاء আনা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় تاء কে شين এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। কেননা, تاء এবং شين-এর مخرج (বহির্গত হওয়ার স্থান) কাছাকাছি। সুতরাং شين এর মধ্যে تشديد হয়েছে। تشابه ক্রিয়া مستقبل হওয়ার ফলে এবং جزم (সাকিন) ও نصب (যবর) থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে هاء-এর মধ্যে رفع (পেশ) হয়েছে। আর একটি পঠন পদ্ধতিতে تاء-এর স্থানে ياء এবং هاء-এর উপর رفع (পেশ) দিয়ে পড়া হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে يشابه ক্রিয়াকে মুযাক্কার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—تشابه (تخفيف)-এ মুযাককার ব্যবহার করা হয়েছে। شين-এর উপর تشديد অবস্থায় مستقبل হওয়ার কারণে যেমন هاء এর উপর ضمة (পেশ) দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে يشابه-এর هاء এর উপর مستقبل (ভবিষ্যত কাল) হওয়ার কারণে ضمه (পেশ) দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে تشابه (شين-এর تخفيف এবং هاء-এর উপর نصب) পঠন পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ। কেননা, কিরায়াত বিশেষজ্ঞগণ এ পঠন পদ্ধতির বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○-এর ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতাংশ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বুঝাতে চেয়েছে যে, তাদেরকে যে গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে গাভী চিহ্নিত করার ব্যাপারে তারা সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে। এখন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের এ সন্দেহ বিদূরিত হবে এবং তারা প্রকৃত

www.eelm.weebly.com

গাভীর সন্ধান লাভ করবে। এস্থানে ايها অর্থ গাভীসমূহের মধ্যে কোন্ গাভী যবাহ করা তাদের কর্তব্য, সে সন্ধান লাভ করা।

(৭১) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ط قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

(৭১) মূসা বলল, 'তিনি বলছেন, সেটি এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি—সুস্থ নিখুঁত।' তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য এনেছ।' যদিও তারা যবাহ করতে উদ্যত ছিল না, তবুও তারা সেটিকে যবাহ করল।

এখানে ذلول অর্থ এমন গাভী যাকে কাজ দুর্বল করে দেয়নি। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো এমন গাভী যাকে যমীন চাষ দুর্বল করেনি এবং তাকে দিয়ে পানি সেচের কাজও করা হয়নি। যেমন আরোহণ অথবা কর্ম কোন জন্তুকে দুর্বল করে দিলে আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়ঃ دابة ذلول بينة الذل —। অনুরূপভাবে কর্ম কোন মানুষকে দুর্বল করে তুললে বলা হয়, رجل ذليل بين الذل والذلة —। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন সুঠাম দেহের গাভী যাকে যমীন কর্ষণের কাজ দুর্বল করেনি এবং যে ক্ষেতে পানি সেচ দেয় না। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এটা এমন দুর্বল গাভী নয়, যা দিয়ে ক্ষেতের কাজ করা হয় এবং যা দিয়ে পানি সেচের কাজও করা হয় না। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.)-এর মতে এটা এমন দুর্বল গাভী নয়, যে যমীন চাষ করে এবং ক্ষেতে পানি বহন করে। রবী' (র.)-বলেন, لا ذلول এর অর্থ তা এমন গাভী নয় যার ক্ষুরের আঘাতে যমীন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যমীন কর্ষণ করেছে আর لا تسقى الحرث অর্থ সে গাভী ক্ষেতে কাজ করে না। হযরত মুজাহিদ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা এমন দুর্বল গাভী নয় যে কাজ করে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি تثير الارض। এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন গাভী যে ক্ষেত-খামারের উদ্দেশ্যে জমি চাষ করে। আর এ অর্থেই 'আরবের লোকেরা বলেঃ اثرت الارض اثيرها اثارة। (অর্থাৎ আমি ক্ষেতি করার উদ্দেশ্যে মাটিকে উল্টিয়ে দিয়েছি)। হযরত কাতাদাহ (র.) আরও বলেন, মহান আল্লাহ গাভীটির এরূপ বর্ণনা এজন্যই দিয়েছেন, কেননা, এর আগে তা ছিল বন্য পশু। হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উক্ত গাভীটি ছিল বন্য পশু।

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ط-এর ব্যাখ্যাঃ

مسلمة শব্দটি مفعلة এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। তা السلامة। শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ মুক্ত হওয়া। তা কোন্ বস্তু থেকে মুক্ত এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত

একটি অংগ দিয়ে তাকে আঘাত কর, তবে সে জীবিত হবে। তারা তখন তাকে আঘাত করল এবং সে জীবিত হলো। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এ ধরনের নির্দেশ দেখা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ (তুমি লাঠি দ্বারা সাগরকে আঘাত কর, তখন তা দ্বিখণ্ডিত হলো। সূরা শু'আরা, আয়াত ৬৩) অর্থাৎ فضرب فانفلق—তিনি আঘাত করলেন এবং দ্বিখণ্ডিত হলো।

এখানে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার পর জীবিত হয়েছে একথা পরবর্তী আয়াত দ্বারাও বুঝা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখান। আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ لا-এর ব্যাখ্যাঃ

এর দ্বারা মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করেছেন। আর তিনি যে দুনিয়াতে বনী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন এটা থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ হে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অস্বীকারকারীরা! এই নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবন দান করা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা, আমি যেমন তাকে দুনিয়াতে জীবন দান করেছি অনুরূপভাবে আমি মৃতদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করব এবং রোয হাশরে পুনরুত্থিত করব। মহান আল্লাহ এ ঘটনা থেকে 'আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধেও দলীল উপস্থাপন করেছেন। কেননা, তারা অক্ষরজ্ঞানহীন সম্প্রদায় ছিল। তাদের নিকট কোন আসমানী গ্রন্থ ছিল না। তারা তাদের মাঝে অবস্থিত বনী ইসরাঈল থেকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। কেননা, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাদের নিকট এ ঘটনা এ জন্যই ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারা পূর্ববর্তীদের অবস্থা জানতে পারে।

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○-এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও দলীলসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, হে কাফিররা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী এ জন্যই দেখান, যেন তোমরা এ কথা অনুধাবন করতে পার যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন নবী এবং সত্যবাদী। আর তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে।

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

(৭৪) এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথরও কতক এমন যে, তা হতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের কাফিরদেরকে বুঝান হয়েছে। তাফসীরকারদের বর্ণনা অনুসারে এরা
হচ্ছে নিহত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র। আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, এ সব নিদর্শন দেখার পরও
তোমাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছে। قسا ، عسا ও عتا এগুলো হচ্ছে সমার্থবোধক
শব্দ। কোন ব্যক্তি কঠিন, শক্ত এবং কঠোর অন্তরবিশিষ্ট হলে (আরবী ভাষায়) বলা হয়,
قسا قلبه يقسو قسوا قسوة و قساوة و قساء এ সমস্ত শব্দ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

দ্বারা বুঝান হয়েছে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার পর মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর
সংবাদ প্রদান করে এবং কেন তাকে কতল করা হয়েছে এর কারণও সে উল্লেখ করে।
এভাবে আল্লাহ তাদের মধ্যে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।
এ বর্ণনার পর নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম
প্রকাশ করে। আর দ্বিতীয় বার মৃত্যুবরণ করার পর হত্যাকারীরা তাদের এ হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার
করে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) স্বীয় সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি
বলেন, যখন নিহত ব্যক্তিকে গাভীর একটি অংগ দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তখন সে জীবিত হয়ে বসে
পড়ে। তাকে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাকে কে হত্যা করেছে? তখন সে বলল, আমার
ভ্রাতুষ্পুত্ররা আমাকে হত্যা করেছে। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্ররা বলে,
আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে হত্যা করি নি। তারা এভাবে সত্যকে দেখার পর অস্বীকার করে। এ
প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেন, এরপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বৃদ্ধের
ভ্রাতুষ্পুত্রদের অন্তর কঠিন হয় এবং তা পাথরের মত অথবা তার চেয়েও অধিক কঠিন হয়। আর
একটি সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে মৃত ব্যক্তিকে
জীবিত করে দেখাবার পর এবং নিহত ব্যক্তির ঘটনা প্রদর্শনের পর তাদের অন্তর পাথর অথবা
তার চেয়েও কঠিন হয়ে পড়ে।

সম্পর্কিত এরূপ ব্যাপারে বলা যায় না যে, তুমি এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। কেননা, এর অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, তিনি ইতিপূর্বে সঠিক বর্ণনা দেননি।

কোন কোন পূর্বসূরীর মতে, মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে "তুমি এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ" একথা বলার ফলে কুফরী করেছে এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে, তাদের এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গাভীর ব্যাপারে মূসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য তাদের মতানুসারে সঠিক ছিল না। তাদের এ আচরণ এবং এ বক্তব্য কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লামা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে, এ পূর্বসূরীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তারা গাভী যবাহ করে আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করেছে। অবশ্য হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তাদের ইতিপূর্বের কথাবার্তা মূর্খতা এবং ভ্রান্তিমূলক ছিল।

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশের অর্থ—আল্লাহ মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে যে ধরনের গাভী যবাহ করার হুকুম দিয়েছেন তারা ঠিক সে ধরনের গাভী যবাহ করেছে। وما كادوا يفعلون-এর অর্থ অতি সম্ভাবনা ছিল যে, তারা গাভী যবাহ করতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতি আল্লাহ পাক যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা বর্জন করত।

ব্যাখ্যাকারগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, কি কারণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আরোপিত কর্তব্য পালনের স্থলে তারা তা বর্জনের নিকটবর্তী হয়েছিল?

কোন একজন 'আলিমের মতে এর কারণ ছিল, নির্দেশিত এবং বর্ণিত গাভীটির মূল্য ছিল অতি চড়া। 'আল্লামা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) স্বীয় সূত্রে নিম্নলিখিত আলিমদের থেকে এ মত ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ ইবন কা'আব আল কুরজী থেকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, অধিক চড়া দামের কারণে তারা গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকার নিকটবর্তী হয়। অপর এক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব এবং মুহাম্মদ ইব্ন কায়স থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। এতে উল্লেখ আছে, গাভীর মূল্য চড়া হওয়ার কারণে তারা নিহত ব্যক্তির সম্পদ থেকে গাভীর দাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ গ্রহণ করে। আর একটি সূত্রে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা গাভী যবাহ করতে চাচ্ছিল না। কিন্তু তাদের ইচ্ছা সফল হয়নি। ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনের যে সকল স্থানেই كاد অথবা كادوا উল্লেখ আছে এর অর্থ হবে لا يكون—। এর উপমা اكاد اخفيها—। অপর একদল 'আলিমের মতে, নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট যে আরযী পেশ করেছিল এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ হত্যাকারীর সন্ধান দিলে তারা লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হবে এ ভয়ে গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল।

আল্লামা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে, তাদের গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকার পিছনে দু'টি কারণ ছিল। (ক) গাভীর দাম ছিল অতি চড়া। (খ) হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের নিকট হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা হলে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হবে

এ ভয়। গাভীর মূল্য অধিক হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিবরণ রয়েছে। 'আল্লামা তাবারীর স্বীয় সনদে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা গাভীকে দশ বার ওজন করে তার পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মালিক থেকে গাভী ক্রয় করে। 'উবায়দাহ থেকে বর্ণিত আছে, তারা গাভীর চামড়া পূর্ণ দীনারের বিনিময়ে গাভীটি ক্রয় করে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, গাভীটি এমন এক ব্যক্তির ছিল, যে তার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করত। আল্লাহ তাকে এ গাভীটি দান করেন। ফলে, সে গাভীর চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে তা বিক্রি করে। মুজাহিদ থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা গাভীর মালিককে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ দিয়ে তার নিকট থেকে গাভীটি ক্রয় করে। 'আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারা মালিককে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে দীনার দেওয়ার শর্তে তার নিকট থেকে গাভীটি ক্রয় করে। এরপর তারা গাভী যবাহ করে দীনার দিয়ে তার চামড়া পূর্ণ করে এবং তা মালিকের নিকট হস্তান্তর করে। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা গাভীটি এমন এক ব্যক্তির নিকট পায়, যে কোন প্রকার মালের বিনিময়ে তা কখনও বিক্রি করবে না বলে তাদেরকে জানায়। তারা তাকে গাভীটি বিক্রি করার জন্য বারবার অনুরোধ জানায়। এরপর তারা গাভীর মালিককে এ শর্তে রাযী করতে সক্ষম হয় যে, তারা গাভীর চামড়া খুলে তা দীনার দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে। আবুল 'আলিয়াহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা একটি বৃদ্ধার নিকট ছাড়া আর কোথাও এ ধরনের গাভী দেখতে পায়নি। বৃদ্ধা গাভীর কয়েকগুণ মূল্য দাবী করে। হযরত মূসা (আ.) তখন তাদেরকে বললেন, বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করে তার দাবী অনুযায়ী তাকে মূল্য দাও। তারা সেভাবে গাভী ক্রয় করে যবাহ করে। ইব্ন সীরীন 'উবায়দাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারা এ গাভীটি একটি মাত্র ব্যক্তির নিকট ছাড়া আর কোথাও পায়নি। তখন তারা তার নিকট থেকে গাভীর ওজন পরিমাণ স্বর্ণ অথবা চামড়া পূর্ণ করে স্বর্ণ দেওয়ার শর্তে গাভীটি খরীদ করে যবাহ করে। আর একটি সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন 'উবায়দাহ আস্-সালমানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা এমন এক ব্যক্তির নিকট গাভীটি পায়, সে বলল, গাভীর চামড়া স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে না দিলে তা আমি বিক্রয় করব না। তখন তারা এ শর্তে গাভীটি ক্রয় করে। ইব্ন যায়দ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা গাভীর দাম বাড়াতে থাকে। অবশেষে গাভীর চামড়া ভর্তি করে স্বর্ণ দেওয়ার বিনিময়ে তারা গাভীটি ক্রয় করে। আর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, গাভীর দাম স্বল্প এবং ভয়ভীতি কম হওয়া সত্ত্বেও তারা গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকতে চায়। এ প্রসংগে 'আল্লামা তাবারী (র.) স্বীয় সনদে 'ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, গাভীটির মূল্য মাত্র তিন দীনার ছিল। এ মত অনুসারে দেখা যায় যে, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হওয়ার আশংকায় তারা গাভী যবাহ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ রয়েছে। ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলে, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? কারণ, তারা জানত, গাভী যবাহ করা হলে তারা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে। আর এ কারণেই তারা এ থেকে বিরত থাকতে চায়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক যখন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন এবং সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর সংবাদ প্রদান করে, তখন হত্যাকারীরা এ সত্য নিদর্শন অবলোকন করার পর বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি।

(৭২) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

(৭২) স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে—তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা ব্যক্ত করছেন।

অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর ঐ ঘটনাকে, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। এই নিহত ব্যক্তিই ছিল যার ঘটনা ইতিপূর্বের আয়াত واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة এ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ "যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার হুকুম দিয়েছেন।"

فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর ইখতিলাফ এবং ঝগড়া-ফাসাদ করেছ। فادراتم শব্দটি মূলে فتدارأتم ছিল। যেমন تفاعلتم—। এটি دره থেকে উদ্ভূত। درء শব্দের অর্থ العوج। বা বক্রতা। কবি ابو النجم العجلى-এর নিম্নলিখিত শ্লোকে الدرء শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

خشية طعام اذا هم جسر + يأكل ذا الدره ويقصى من حقر

এখানে ذاالدره শব্দের অর্থ ذاالعوج والعسر অর্থাৎ বক্র এবং কঠিন। কবি رؤبة بن العجاج এর নিম্নশ্লোকে উল্লিখিত دره শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

ادركتها قدام كل مدره + بالدفع عنى دره كل عنجه

হাদীসেও এ শব্দটি এ অর্থে উল্লেখ আছে। হযরত সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা উমায়্যার দুই সন্তান উসমান এবং যুহায়র নবী করীম (স.)-এর নিকট গমন করে তাঁর দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত নবী করীম (স.) তখন বলেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদের দুইজন থেকে অনেক বেশী জানি। এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি জাহিলী যুগে আমার অংশীদার ছিলে না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনার প্রতি আমার পিতা ও মাতা উৎসর্গ হোক, আপনি কতই না উত্তম সাথী ছিলেন। لا تمارى ولا تدارى—আপনি ঝগড়া করতেন না এবং মতবিরোধ করতেন না। এখানে لا تدارى অর্থ আপনি আপনার সাথী এবং শরীকদের সাথে ইখতিলাফ, ঝগড়া-ফাসাদ এবং খারাপ ব্যবহার করতেন না। فَادّٰرَأْتُمْ মূলত فتدارأتم ছিল। تاء এবং دال অক্ষর দুইটির মাখরাজ নিকটবর্তী হওয়ায় تاء কে دال-এ পরিবর্তন করা হয় এবং دال কে دال এর মধ্যে ادغام করা হয়। تاء জিহবার কিনারা এবং দুই ঠোঁটের মূল থেকে বের হয়। আর دال জিহবার কিনারা এবং দুই ঠোঁটের কিনারা থেকে বের হয়। কবির শ্লোকেও এ ধরনের উপমা পাওয়া যায়। যেমন ঃ

تولى الضجيع اذا ما اشتاقها خصرا + عذب المذاق اذا ما اتابع القبل

এখানে মূলে ছিল ঃ اذا ما تتابع القبل একটি تاء কে অপর تاء-এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। فَادّٰرَأْتُمْ এর تاء কে دال এর মধ্যে ادغام করার পর দুটি دال যখন ساكن বিশিষ্ট হয়, তখন শুরুতে একটি الف বৃদ্ধি করা হয়। 'আরবী ভাষার নিয়ম অনুসারে ساكن বিশিষ্ট অক্ষরের পূর্বে কোন অক্ষর থাকলে এভাবে ادغام করা হয়। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতেও এ ধরনের ادغام দেখা যায়। যেমন حتى اذا اداركوا فيها جميعا এখানে اداركوا মূলে تداركوا ছিল।

تاء কে دال এর মধ্যে ادغام করে دال কে تشديد বিশিষ্ট করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী পদের সংগে সংযোজনের জন্য একটি الف বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে ادغام ঠিক থাকে। আর ادغام বিশিষ্ট অক্ষরের পূর্বে সংযোজনের জন্য কোন অক্ষর না থাকলে তখন সে অক্ষরের মধ্যে হরকত দিয়ে পড়া হয়। যেমন বলা হয় تداركوا এবং تثاقلوا—। কারো কারো মতে, اداركوا এবং ادارأوا পড়া হয়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার فادارأتم فيها এর অর্থ করেন—فتدافعتم অর্থাৎ তোমরা নিজেদের উপর থেকে এ হত্যার অভিযোগ খণ্ডন করতে থাক। যেমন, লোকেরা বলে। درأت هذا الامر عني। (আমি আমার উপর থেকে এ বস্তুর অভিযোগ খণ্ডন করেছি।) পবিত্র কুরআনের আয়াত ويدرأ عنها العذاب এর অর্থ يدفع عنها العذاب অর্থাৎ তার উপর থেকে শাস্তি খণ্ডন করেছে। প্রথম মতের তুলনায় এ অর্থ আয়াতের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ। কেননা, উক্ত সম্প্রদায় নিহত ব্যক্তির হত্যাকে অস্বীকার করে এবং কোন গোত্রই এ হত্যাকাণ্ডকে স্বীকার করেনি। বিভিন্ন তাফসীরকার থেকেও আয়াতের এ অর্থ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) স্বীয় সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, فادارأتم فيها এর অর্থ اختلفتم فيها। অর্থাৎ তোমরা এ হত্যা-কাণ্ড সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধ করেছ। আর একটি ভিন্ন সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের একদল অপর দলকে বলে, তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলে, তোমরাই হত্যা করেছ। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, فادارأتم فيها-এর অর্থ اختلفتم। আর এ ইখতিলাফ অর্থ তারা পরস্পর হত্যার বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। তাদের এক দল বলে, তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলে, না। তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের এ অভিযোগ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ছিল, যাকে তারা নিজেরাই হত্যা করেছে। আর একটি সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, আল্-বাকারা-এ বর্ণিত ব্যক্তি বনী ইসরাঈল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাকে এক ব্যক্তি হত্যা করে অন্যদের গৃহের সম্মুখে ফেলে রাখে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা তখন তাদের নিকট রক্তপণ দাবী করে। কিন্তু তারা এ হত্যাকে অস্বীকার করে।

হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তিকে নিয়ে এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর অভিযোগ করতে থাকে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে এক অপ্রীতিকর পরিবেশের উদ্ভব ঘটে। পরিশেষে তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র নবীর নিকট উপস্থাপন করে। আল্লাহ পাক তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে একটি গাভী যবাহ করার নির্দেশ দেন। এরপর গাভীর একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে বলেন। এতে নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলে যে, তার যে ওয়ারিস রক্তপণ দাবী করেছে, সে-ই তাকে তার মীরাস লাভ করার উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে সূরা আল-বাকারার এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে বনী ইসরাঈল-এর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি অধিক সম্পদের মালিক ছিল। তার ভাইয়ের সন্তানরা ছিল গরীব। তাদের কোন সম্পদ ছিল না। বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল নিঃসন্তান। তার ভাতিজারাই ছিল তার উত্তরাধিকারী। তারা বলতে লাগল, আমাদের চাচার যদি মৃত্যু হতো, তবে আমরা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতাম। এদিকে দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন তাদের চাচার মৃত্যু হলো না, তখন শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলল, তোমরা কি তোমাদের চাচাকে হত্যা করতে পারবে? এতে তোমরা তার ধন-সম্পদের উত্তরা-ধিকারী হতে পারবে এবং তোমরা যে শহরের বাশিন্দা নও, সে শহরের লোকজন থেকে তোমাদের

চাচার রক্তপণও লাভ করতে পারবে। কারণ, সেখানে পাশাপাশি দু'টি শহর ছিল। তারা এর একটি শহরে বসবাস করত। নিহত ব্যক্তিকে শহরদ্বয়ের মাঝে ফেলে দিলে যে শহরটি তার নিকটবর্তী হবে, সে শহরের লোকজনকেই তার রক্তপণ আদায় করতে হবে। শয়তান তাদের অন্তরে এ প্ররোচনা প্রদানের পরও যখন তাদের চাচা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন, তখন তারা স্বীয় চাচাকে হত্যা করে অপর শহরের দ্বারদেশে তাকে ফেলে দেয়। সকাল বেলায় নিহত বৃদ্ধের ভাতিজারা ঐ শহরের অধিবাসীদের নিকট গিয়ে বলল, আমাদের চাচা তোমাদের শহরের দ্বারদেশে নিহত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের চাচার রক্তপণ দিতে হবে। এতে শহরবাসীরা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি, তার হত্যাকারী সম্পর্কে আমরা জানি না এবং শহরের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে সকাল হওয়ার পূর্বে আমরা শহরের দরজা খুলিনি। এবং তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট গমনের ইচ্ছা করল। যখন তাঁর নিকট হাযির হলো, তারা বলল, আমরা ঐ বৃদ্ধ লোকটির ভাতিজা। আমাদের চাচাকে আমরা অমুক শহরের দ্বারপ্রান্তে পেয়েছি। শহরবাসী বলল, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং শহরের দরজা সকাল পর্যন্ত খুলিনি। এরপর জিবরাঈল (আ.) মহাশ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে মূসা (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। আল্লাহ পাক বলেন, ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة —হে মূসা, তাদেরকে বল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহ্ করার হুকুম দিচ্ছেন। অতঃপর এর একটি অংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) স্বীয় সূত্রে হযরত মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব আল-কুরজী (র.) এবং হযরত মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র যখন লোকদেরকে অধিক হারে অপকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখে, তখন তারা একটি শহর নির্মাণ করে সেখানে মন্দ লোকদের থেকে পৃথক হয়ে বসবাস শুরু করে। সন্ধ্যার সময় কোন ব্যক্তিকে তারা শহরের বাইরে অবস্থান করতে দিত না। সকাল বেলায় গোত্র নেতা শহরের অভ্যন্তরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে যখন আপত্তিকর কিছু দেখত না, তখন তিনি শহরের দরজা খুলে দিতেন। লোকেরা বের হয়ে পড়ত এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যদের সাথে কাজকর্ম করত। এদিকে বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি বহু সম্পদের অধিকারী ছিল। ভাতিজা ছাড়া তার কোন ওয়ারিস ছিল না। সে দীর্ঘজীবী হয়েছিল। এ দেখে তার ভাতিজা তার সম্পদের ওয়ারিস হওয়ার লোভে তাকে হত্যা করে এবং তাকে বহন করে নিয়ে উক্ত শহরের দ্বারপ্রান্তে ফেলে আসে। এরপর সে এবং তার সাথীরা আত্মগোপন করে। বর্ণনা-কারী বলেন, শহরের সর্দার শহরের দরজায় লক্ষ্য করে যখন আপত্তিকর কিছু দেখতে পায়নি, তখন সে দরজা খুলে দেয়। দরজা উন্মুক্ত করে সে নিহত ব্যক্তির লাশ দেখে পুনরায় দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন নিহত ব্যক্তির ভাতিজা এবং তার সাথীরা চিৎকার করে উঠল, আফসোস! তোমরা তাকে হত্যা করেছ, এরপর আবার দরজা বন্ধ করছ। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর বনী ইসরাঈলে তাঁর সাথিগণের মাঝে অন্যায় হত্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে দেখেন, তখন তিনি যাদের মধ্যে নিহত ব্যক্তিকে পেতেন তাদেরকে এজন্য পাকড়াও করতেন। এদিকে নিহত ব্যক্তির ভাতিজা এবং শহরবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং উভয় দল যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরিশেষে তারা সংঘর্ষ থেকে বিরত হয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট গিয়ে

তাদের ঘটনা ব্যক্ত করে। নিহত ব্যক্তির পক্ষের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট শহরবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের লোককে হত্যা করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। শহরবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! সকল কুকর্ম থেকে আমাদের বিরত থাকার কথা আপনি জানেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আমরা লোকদের দুষ্কর্ম থেকে পৃথক থাকার উদ্দেশ্যে একটি শহর তৈরি করেছি। আমরা হত্যা করিনি এবং হত্যাকারী সম্পর্কে আমরা জানিও না। তখন মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওয়াহী পাঠিয়ে একটি গাভী যবাহ করতে নির্দেশ দান করেন। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে গাভী যবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত উবায়দাহ (র.) থেকে আর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলে এক নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বহু সম্পদের মালিক ছিল। তার ভাতিজা তাকে হত্যা করে অপর লোকদের দ্বারপ্রান্তে তাকে ফেলে আসে। অতঃপর সকাল বেলায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এ নিয়ে উভয় দল যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয় এবং সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তখন তাদের ব্যক্তিরা বলেন, আল্লাহর নবী তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও কি তোমরা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হবে? তারা তখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করে। এ প্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করতে নির্দেশ দেন এবং গাভীর একটি অংশকে নিহত ব্যক্তির দেহের সাথে স্পর্শ করতে বলেন। তারা তখন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, قالوا أتتخذنا هزوا—আপনি কি আমাদের সংগে উপহাস করছেন? হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি মূর্খ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) তার একটি সনদে হযরত ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় ভিন্ন গোত্রে পাওয়া যায়। তখন তার স্বগোত্রীয় লোকেরা ঐ গোত্রের নিকট এসে বলে, আল্লাহর শপথ! তোমরাই আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা উত্তরে বলল, না, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলে, এদের মাঝে আমাদের এ ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আল্লাহর কসম! তারাই তাকে হত্যা করেছে। এরা তখন বলল, না, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি, তাকে আমাদের মাঝে এনে ফেলা হয়েছে। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা উপরোল্লিখিত তাফসীরকারদের থেকে নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের যে মতবিরোধ ও ঝগড়া-ফাসাদের বর্ণনা দিয়েছি এটাকেই ادارأ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের অবশিষ্ট আওলাদকে সম্বোধন করে বলেন, فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ০ অর্থাৎ তোমরা তা নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছ। তোমরা যা গোপন কর আল্লাহ তা প্রকাশ করেছেন।

والله مخرج ما كنتم تكتمون ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতের অর্থ প্রসংগে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, তোমরা যে হত্যাকে গোপন করে একে অপরকে দায়ী করেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। এখানে اخراج

অর্থ যার নিকট ঘটনা অপ্রকাশিত রয়েছে, তার নিকট প্রকাশ করা এবং অনবগতকে অবগত করান। যেমন, আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বলেন—

الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموت و الارض

(তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশসমূহ এবং যমীনের গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন। সূরা নমল, আয়াত ২৫) অর্থাৎ আল্লাহ পাক গোপন রাখার পর গোপন বস্তুকে প্রকাশ করে দেন। যে বস্তুকে বনী ইসরাঈল গোপন করেছে এবং আল্লাহ পাক প্রকাশ করেছেন, তা ছিল নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর নাম। হত্যাকারীকে যারা হত্যা কাজে সহায়তা করেছে, তারা তার নাম এবং স্বয়ং হত্যাকারীও নিজের নাম গোপন করেছে। অবশেষে আল্লাহ পাক তার নাম এমন সব লোকের নিকট প্রকাশ করে দেন, যারা তাকে হত্যাকারী হিসেবে জানত না। আয়াতে উল্লিখিত تكتمون এর অর্থ تسرون এবং تغيبون অর্থাৎ তোমরা গোপন করেছিলে এবং লুকিয়ে রেখেছিলে। হযরত মুজাহিদ (র.) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

(৭৩) فقلنا اضربوه ببعضها ط كذلك يحي الله الموتى لا ويريكم ايته لعلكم تعقلون ◎

(৭৩) আমি বললাম, এর কোন অংশ দ্বারা তাকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

এর দ্বারা আল্লাহ পাক বুঝাতে চেয়েছেন যে, মূসা (আ.)-এর যে জাতি হত্যার ঘটনাকে পরস্পর পরস্পরের উপর চড়াচ্ছিল, তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা। اضربوه-এর ه-টি দ্বারা القتيل বুঝান হয়েছে। ببعضها-এর ها দ্বারা ببعض البقرة বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যে গাভী যবাহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একটি অংশ। তা গাভীর দেহের কোন্ অংশ ছিল, তা নিয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কয়েক জন মুফাস্‌সিরের মতে গাভীর 'রান' দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, গাভীর রান দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হলে সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে এবং বলে, قتلنى فلان (অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে)। অতঃপর সে পুনরায় মৃত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, গাভীর রান দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। তখন সে জীবিত হয়ে বলে, আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে। অতঃপর সে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আর একটি ভিন্ন সনদে পূর্বের ন্যায় বর্ণনা এসেছে। হযরত উবায়দাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তারা নিহত ব্যক্তিকে গাভীর রানের গোশ্ত দিয়ে আঘাত করেছে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত কাতাদাহ

(র.) থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা গাভীর রান দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করে। আল্লাহ্ পাক তখন তাকে জীবিত করে দেন। সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর খবর দেয়। কথা বলার পর মৃত্যুবরণ করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের গোশ্‌ত দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। একটি সূত্রে নিম্নলিখিত তাফসীরকার থেকে এ মত বর্ণিত আছে ঃ

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, তারা তাকে দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের গোশ্‌ত দিয়ে আঘাত করে, তখন সে জীবিত হয়। তারা তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে উত্তরে বলল, আমার ভাতিজা।

অপর কয়েকজন মুফাসসিরের মতে, গাভীর কোন একটি হাড় দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। এ মতের সমর্থনে হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত মূসা (আ.) গাভীর একটি হাড় দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে নির্দেশ দেন। তারা তখন তাকে হাড় দিয়ে আঘাত করে। এতে তার রূহ ফিরে আসে এবং সে তাদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম বলে। অতঃপর সে পূর্ববৎ মৃত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। হত্যাকারীকে তখন পাকড়াও করা হয়। এ হত্যাকারী ছিল সেই ব্যক্তি, যে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ পাক তাকে তার এ অপকর্মের ফলে মৃত্যুদান করেন। আর একটি সনদে হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গাভীর একটি অংগ দিয়ে আঘাত করা হয়। সে তখন বসে পড়ে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলল, আমার ভাতিজা। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারী এ ব্যক্তি তাকে হত্যা করে এবং বহন করে নিয়ে অভিযুক্ত গোত্রে নিক্ষেপ করে। সে তাদের নিকট থেকে দিয়াত লাভ করার ইচ্ছায় এ কাজ করেছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এক্ষেত্রে সঠিক অভিমত হলো, আল্লাহ্ তাদেরকে গাভীর কোন একটি অংশ দিয়ে আঘাত করতে হুকুম দিয়েছেন এবং এতে সে জীবিত হয়। আয়াত বা হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাদেরকে গাভীর নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করতে বলা হয়েছে। হতে পারে যে, রান দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, লেজ দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছে, অথবা ঘাড়ের নরম গোশ্‌ত, অথবা অন্য কোন অংশ দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট অংগ সম্পর্কে জানলে বা এ সম্পর্কে জানা না থাকলে কোন লাভ বা ক্ষতি নেই। অবশ্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে গাভীর একটি অংগ দ্বারা আঘাত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এভাবে আল্লাহ নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, গাভীর একটি অংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার অর্থ কি? তিনি বলেন, এর জবাবে বলা যাবে, এভাবে আঘাত করলে নিহত ব্যক্তি জীবিত হবে এবং আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ.) ও পরস্পরের উপর দোষারোপকারীদের নিকট তার হত্যাকারীর নাম বলবে। এতে যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ পাকের এ কথা কোথায় উল্লেখ আছে? এর জবাবে বলা যাবে যে, উল্লিখিত আয়াতে এ মর্ম বুঝা যায় বলে সরাসরি এটা উল্লেখ করা হয় নি। আয়াতের পুরা অর্থ এই ঃ আমরা বললাম, তোমরা এর

মুজাহিদ (র.) এর অর্থে বলেন, তা যে কোনো প্রকার দাগ থেকে মুক্ত। তিনি لا شية فيها এর অর্থ প্রসংগে বলেন, এতে সাদা অথবা কালো রং নেই। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা এমন গাভী যা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) দুটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) এবং রবী' (র.) مسلمة শব্দের অর্থে বলেন, গাভীটি হবে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) مسلمة এর ব্যাখ্যায় বলেন, لا عوار فيها অর্থাৎ এর চোখ হবে দৃষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে, হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.), হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) এবং তাঁদের ন্যায় ব্যাখ্যা-তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যা থেকে উত্তম। তিনি বলেন, مسلمة অর্থ যদি এর চামড়ার রং অন্যান্য সকল রংয়ের মিশ্রণ থেকে মুক্ত হওয়া বুঝাত, তবে এ অর্থ প্রকাশের জন্য مسلمة শব্দই যথেষ্ট হতো। لا شية فيها উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না। সুতরাং لا شية সুস্পষ্ট করে দেয় যে, এর অর্থ এবং مسلمة এর অর্থ এক নয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ এই ঃ হযরত মূসা (আ.) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, তা হবে এমন গাভী যমীনের কর্ষণ, যমীনের মাটিকে উলটানো এবং ক্ষেতির উদ্দেশ্যে পানির সেচ যাকে দুর্বল করেনি। এছাড়া গাভীটি হবে সুস্থ এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। لا شية فيها এর অর্থ গাভীটির মধ্যে এমন কোন রং নেই, যা তার চামড়ার রংয়ের বিপরীত। شية শব্দ وشي الثوب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কাপড়ের তানা ও বানার রংসহ বিভিন্ন প্রকার দোষ থেকে মুক্ত করে কাপড়কে সুন্দর করা। এ মূল অর্থের প্রেক্ষিতেই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদশাহ অথবা অন্য কোন লোকের নিকট কুৎসা রটনাকারীকে আরবী ভাষায় واش কুৎসা-রটক বলা হয়ে থাকে। কেননা, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং তার এ মিথ্যা উক্তিকে বিভিন্ন বাতিল যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সুন্দর করে তুলে ধরে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদশাহর নিকট গিয়ে এভাবে কুৎসা রটনা করা হলে আরবীতে বলা হয়ে থাকে ঃ وشيت به الى السلطان — وشاية। কা'আব ইব্‌ন যুহায়র এ অর্থের প্রেক্ষিতেই বলেন ঃ

تسعى الوشاة جنابيها وقولهم + انك يا ابن ابى سلمى لمقتول

(অর্থাৎ কুৎসা রটনাকারীরা তার নিকট গিয়ে কুৎসা করেছে। তারা আরও বলেছে, হে আবু সুলমা-তনয়! তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে।) এ শ্লোকে উল্লিখিত وشاة শব্দটি واش এর বহুবচন। অর্থাৎ তারা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন বাতিল কথা বলছে এবং তারা কবিকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, কবি যদি নবী করীম (স.)-এর নিকট গমন করেন, তবে তিনি তাকে হত্যা করবেন।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে وشي শব্দের অর্থ হলো ঃ চিহ্ন। এ অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতের কোন অর্থ হয় না। কেননা, وشيت بفلان الى فلان এর অর্থ এটা করা বৈধ হবে না যে, আমি অমুকের নিকট অমুকের একটি চিহ্ন বর্ণনা করেছি। তবে وشيت الثوب এর অর্থ تحسين الثوب بالاعلام হতে পারে। অর্থাৎ কাপড়ে ডোরা দিয়ে কাপড়কে সুন্দর করা। شية শব্দ وشيت থেকে উদ্ভূত। وشيت এর শুরু থেকে واو অক্ষরটি ফেলে দেওয়ার পর এর পরিবর্তে

শেষে একটি ـه অক্ষর আনা হয়। আরবী ভাষায় এর অনুরূপ অনেক শব্দ রয়েছে। যেমন وزنه থেকে زنة, وسمه থেকে سمة, وعد থেকে عدة এবং وديه থেকে دية —।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা لا شية فيها এর যে অর্থ বর্ণনা করেছি ব্যাখ্যা-কারগণও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, لا شية فيها এর অর্থ لا بياض فيها অর্থাৎ এর মধ্যে সাদা রংয়ের কোন মিশ্রণ নেই। আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (র.) এর অর্থ বর্ণনা প্রসংগে বলেন: এতে সাদা এবং কালো রং নেই। 'আতিয়্যা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী لا شية فيها এ আয়াতাংশের অর্থ হলো: গাভীটি হবে এক রঙের। যাতে অন্য কোন রঙের মিশ্রণ নেই। সুদ্দী (র.) বলেন, এর অর্থ এতে সাদা, কালো এবং লাল রং নেই। ইবন যায়দ বলেন, গাভীটি হলুদ রঙের। এতে সাদা এবং কালো রং নেই। রবী' (র.) বলেন, لا شية فيها এর অর্থ এতে কোন সাদা রং নেই।

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ-এর ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যাকারগণ আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বিবিধ মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, এর অর্থ—এবার তুমি আমাদেরকে সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। ফলে, তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে এবং আমরা চিনতে পেরেছি যে, তা একটি নির্দিষ্ট গাভী। কাতাদাহ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কারো কারো মতে, এই আয়াত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মতামত সম্পর্কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি খবর স্বরূপ। তারা হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে এমত পোষণ করেছে যে, তিনি তাদেরকে এর পূর্বে গাভী সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেননি। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ থেকে এ মত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তারা এমন একটি গাভী চিহ্নিত করতে বাধ্য হয় যার অনুরূপ তারা অন্য কোন গাভী খুঁজে পায়নি। ওটা ছিল একটি হলুদ রঙের গাভী। তাতে কালো এবং সাদা রঙের মিশ্রণ ছিল না। গাভীটির বিস্তারিত বর্ণনা আসার পর তারা বলল, তা তো অমুকের গাভী। তুমি আমাদের নিকট এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে, এ দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে কাতাদাহ (র.)-এর ব্যাখ্যাটি উত্তম। অর্থাৎ তারা বলল, গাভীর ব্যাপারে এবার তুমি আমাদেরকে সঠিক বর্ণনা দিয়েছ। আমরা চিনতে পেরেছি যে, কি প্রকার গাভী যবাহ করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এরপর মহান আল্লাহ তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তারা এ কথা বলার পর মূসা (আ.)-এর নির্দেশ মেনে নেয় এবং গাভী যবাহ করার বিষয়টি অতি কঠিন ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও তারা গাভী যবাহ করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: فذبحوها وما كادوا يفعلون ০ (অতঃপর তারা এরূপ একটি গাভী যবাহ করল। অন্যথায় তারা এ কাজ করবে বলে মনে হচ্ছিল না।) অবশ্য তাদের এ বক্তব্য যে, হে মূসা, এবার তুমি আমাদেরকে সঠিক বর্ণনা দিয়েছ—এটা তাদের একটি ভ্রান্ত ও অমূলক কথা ছিল। কেননা, তাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে হযরত মূসা (আ.)-এর বর্ণনা ছিল সঠিক এবং স্পষ্ট। "তুমি আমাদেরকে এবার সঠিক বর্ণনা দিয়েছ"—এ কথা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, যে ইতিপূর্বে সঠিক বর্ণনা দেয়নি। যাঁর প্রতিটি বাক্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট, আল্লাহ্‌র কোন হুকুম বা নিষেধজ্ঞাপক এবং আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয (فرض)

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً-এর ব্যাখ্যা:

আয়াতে উল্লিখিত هى সর্বনাম দ্বারা তাদের অন্তরসমূহকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমাদের সত্যকে দেখার পর, সত্যকে জানার পর এবং সত্যের প্রতি অনুগত হওয়া ও তা স্বীকার করে নেওয়া তোমাদের জন্য কর্তব্য। এ সত্য অনুধাবন করার পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ পাক এখানে او اشد قسوة কেন বলেছেন? কারণ, আরবী ভাষাবিদদের নিকট او শব্দ বাক্যে সন্দেহের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ মহান আল্লাহর কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর জবাবে বলা হয়, এটি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদে কোন সন্দেহকে প্রকাশ করে না, বরং এর দ্বারা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট এ বিরাট নিদর্শন দেখার পরও সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, যে সকল লোক তাদের এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবে, তাদের নিকট এদের অন্তর পাথরের মত শক্ত অথবা তার চেয়েও কঠিন বলে প্রতীয়মান হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, 'আরবী ভাষাবিদরা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত এ ধরনের সন্দেহ অর্থ প্রদানকারী او সম্পর্কে কতিপয় মতামত প্রদান করেছেন। একদল আলিম বলেন: فهى كالحجارة او اشد قسوة এখানে আল্লাহ পাক বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক, সে জ্ঞান আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এ ধরনের উল্লেখ আছে। যেমন—وارسلناه الى مائة الف او يزيدون (আমরা তাকে এক লক্ষ অথবা তার চেয়ে অধিক লোকের নিকট প্রেরণ করেছি। সূরা সাফফাত, আয়াত ১৪৭)

وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ০ (আমরা অথবা তোমরা হিদায়াত অথবা স্পষ্ট গোমরাহীর উপর রয়েছি, সূরা সাবা, আয়াত ২৪)। অর্থাৎ এটির কোন্‌টি তা তিনি জানেন। একদল 'আলিম আরও বলেন, আরববাসীদের বাক্যে এর উপমা পাওয়া যায়। যেমন—اكلت بسرة اورطبة (আমি শুকনা অথবা পাকা খেজুর খেয়েছি।) ভক্ষণকারী জানে যে, সে কোন্‌টি ভক্ষণ করেছে। কিন্তু সে সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট বিষয়টি সন্দেহজনক করে উত্থাপন করেছে। কবি আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লীর কবিতায়ও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন:

احب محمدا حبا شديدا + وعباسا وحمزة والوصيا

فان يك حبهم رشدا اصبه + ولست بمخطئ ان كان غيا

(অর্থাৎ আমি হযরত মুহাম্মদ (স.) আব্বাস, হামযা এবং ওয়াসীকে (র.) অধিকভাবে ভালবাসি। তাঁদেরকে ভালোবাসা যদি হিদায়াত হয়, তবে আমি সঠিক। আর যদি এটা গোমরাহী হয় তবে আমি ভ্রান্ত নই।)

এ সকল তথ্যজ্ঞানী বলেন, আবুল আসওয়াদ কখনও এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না যে, উল্লিখিত মহৎ ব্যক্তিদের ভালোবাসা হিদায়াত নয়। তবে তিনি সম্বোধিত বাক্যে বিষয়টিকে সন্দেহ-মূলক করে তুলে ধরেছেন। আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি এ পংক্তিগুলো রচনা করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন? তিনি জবাবে বলেন, অবশ্যই নয়, আল্লাহর কসম! অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন: وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ০ তিনি বলেন, যে মহান সত্তা এ কথা বলেছেন, তিনি কখনও এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না যে, কে হিদায়াতপ্রাপ্ত অথবা পথভ্রষ্ট।

অপর একদল 'আলিমের মতে, এটা এমন, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে মিষ্টি এবং টক উভয় প্রকার খাদ্য খাওয়ানোর পর তাকে বলছে, ما اطعمتك الا حلوا او حامضا (অর্থাৎ আমি তোমাকে খাওয়াইনি তবে মিষ্টি অথবা টক জাতীয় খাদ্য।) এক দল 'আলিম বলেন, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, উক্ত ব্যক্তি তাকে মিষ্টি এবং টক উভয় জাতীয় খাদ্য খাইয়েছে। তবে তার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার পরিবেশিত খাদ্য এ দুই প্রকারের বাইরে নয়। অনুরূপভাবে فهي كالحجارة او اشد قسوة অর্থ—তাদের অন্তর এ দুই প্রকার উপমার বহির্ভূত নয়। অর্থাৎ তাদের অন্তর কঠিন হওয়ার দিক থেকে পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়ে আরও কঠিন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ—তাদের কারো কারো অন্তর পাথরের মত কঠিন এবং কারো কারো অন্তর পাথরের চেয়েও অধিক কঠিন। আর কোন কোন তথ্যজ্ঞানী বলেনঃ এখানে او শব্দ واو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ واشد قسوة—। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ولا تطع منهم اثما او كفورا (তুমি তাদের মধ্যে পাপী অথবা অস্বীকারকারীদের অনুসরণ কর না। সূরা দাহ্র, আয়াত ২৪) এখানে او كفورا অর্থ وكفورا—।

কবিদের কবিতায়ও এর উপমা পাওয়া যায়। যেমন জারীর ইব্ন 'আতিয়্যাহ বলেনঃ

نال الخلافة او كانت له قدرا + كما اتى ربه موسى على قدر.

(অর্থাৎ তিনি খিলাফত লাভ করেন এবং খিলাফত তাঁর জন্য একটি মর্যাদা স্বরূপ ছিল। যেমন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট একটি মর্যাদায় ভূষিত হন।) এখানে او كانت এর او টি واو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি আন-নাবিগাহ বলেনঃ

قالت الا ليتما هذا الحمام لنا + الى حمامتنا او نصفه فقد

এখানে او نصفه এর او টি واو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর একদল 'আলিমের মতে এখানে او শব্দটি بل (বরং)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের মতানুসারে আয়াতের অর্থ হবে—তাদের অন্তর পাথরের মত বরং পাথরের চেয়েও কঠিন। যেমন আল্লাহর বাণী—وارسلناه الى مائة الف او يزيدون এখানে او অর্থ بل অর্থাৎ بل يزيدون—। কারো কারো মতে এর অর্থ, فهي كالحجارة او اشد قسوة অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহ তোমাদের নিকট পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়েও কঠিনতর। আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোল্লিখিত মতামতসমূহের প্রত্যেকটির পক্ষে দলীল রয়েছে এবং আরবী ভাষায় এর উপমা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আমার মতে, প্রথমে উল্লিখিত মতটি অধিক পসন্দনীয়। কেননা, তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হওয়ার দিক থেকে দুই অবস্থা থেকে বহির্ভূত নয়। তাদের অন্তরসমূহ হয় পাথরের মত কঠিন অথবা তার চেয়ে অধিক কঠিন। او শব্দটি যদিও কোন কোন স্থানে واو-এর স্থলে ব্যবহৃত হয় এবং উভয়ের অর্থ কাছাকাছি হওয়ার কারণে কোথাও কোথাও দুটির অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু মূলত او শব্দটি দুটি বস্তুর মধ্যে কোন একটিকে বুঝাবার জন্যই বানান হয়েছে। আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, এই জন্যই যে স্থলে او কে তার নিজস্ব অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব, সেখানে তাকে তার স্বীয় অর্থে এবং প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করাই আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। واشد قسوة-এর উপর দুই কারণে رفع হতে পারে। (ক) كالحجارة-এর كاف-এর উপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ فهي مثل الحجارة او اشد قسوة (খ) এখানে আর একটি هي ধরে مرفوع পড়া হয়। অর্থাৎ فهي كالحجارة او هي اشد قسوة من الحجارة

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط -এর ব্যাখ্যাঃ

এখানে আল্লাহ্ পাক বুঝাতে চেয়েছেন যে, পাথরের মধ্যে কোন কোন পাথর এমন রয়েছে যার থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে ঝর্ণাধারায় পরিণত হয়। আয়াতে انهار (ঝর্ণাধারাসমূহ) উল্লেখ থাকার কারণে الماء (পানি) শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি। الانهار বহুবচন হওয়ার কারণে স্ত্রীলিংগ। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও يتفجر ক্রিয়াকে পুংলিংগ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে ما শব্দ পুংলিংগ। ما-এর অনুসারেই فعل-কে পুংলিংগ ব্যবহার করা হয়েছে। التفجر শব্দ বাবে التفعل-এর অন্তর্গত। তা فجر الماء থেকে উদ্ভূত। যখন ঝর্ণা থেকে পানি বের হয়ে আসে, তখন বলা হয় فجر الماء—। অনুরূপভাবে প্রবহমান কোন বস্তু যখন তার উৎসস্থল থেকে বের হয়ে আসে সেটা পানি অথবা রক্ত অথবা পুঁজ অথবা অন্য কোন বস্তু হোক তাকে আরবীতে বলা হয় انفجر—। কবি 'উমার ইবনু লাজা' বলেনঃ

ولما ان قربت الى جرير + ابى ذو بطنه الا انفجارا

এখানে انفجارا অর্থ বের হওয়া এবং প্রবাহিত হওয়া।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط -এর ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ কোন কোন পাথর এমন যা ফেটে যায়। يشقق মূলত يتشقق ছিল। تاء কে شين-এ পরিবর্তিত করে এক شين-কে অন্য شين-এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। ফলে شين অক্ষর تشديد যুক্ত হয়েছে। فيخرج منه الماء অর্থ টুকরা টুকরা পাথর থেকে বহির্গত পানি প্রবহমান ঝর্ণাধারা এবং চলমান নহরের রূপ লাভ করেছে।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط -এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে ভীত-শংকিত হয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে যমীনে নেমে আসে। ما-এর উপর প্রবেশকৃত لام দ্বারা خبر-কে تاكيد করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আয়াতে পাথরের আলোচনা করে বলেন, কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায় এবং তার থেকে পানি প্রবাহিত হয়, আবার কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে যায়। কিন্তু বনী ইসরাঈলদের অন্তর পাথরের চেয়েও অনেক কঠিন। তারা আল্লাহর রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ তিনি তাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী এবং শিক্ষণীয় বস্তুসমূহ দেখিয়েছেন এবং তারা তাঁর অকাট্য দলীল ও প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি অনুগ্রহ করে তাদেরকে বিবেচক আত্মার অধিকারী করেছেন। কিন্তু পাথর এবং ইটকে

এরূপ কোন বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান দান করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোন পাথর ফেটে যায় এবং কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে নেমে যায়। মহান আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের যে সকল অন্তরকে সত্যের প্রতি আহবান জানান হয়েছে, তাদের অন্তর থেকে কোন কোন পাথর অধিক কোমল। হযরত ইব্ন ইসহাক (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) স্বীয় সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মতামত উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে-সব পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হয় কিংবা পানি থেকে ফেটে যায় অথবা পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে, তা আল্লাহর ভয়েই হয়। পবিত্র কুরআনে এ কথারই উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে আর একটি ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত কা'তাদাহ (র.) فهي كالحجارة او اشد قسوة-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পাক তাঁর এ কালামের মাধ্যমে পাথরের ওযর কবুল করেছেন, কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণের ওযর গ্রহণ করেন নি। তাই তিনি বলেছেন, কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে চলে পড়ে। আর একটি ভিন্ন সনদে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (পাথরকে কঠিন বলে উল্লেখ করার পর) আল্লাহ পাক পাথরের ওযর গ্রহণ করেছেন এবং বলেন, কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয় এবং সেটা থেকে পানি নির্গত হয়। হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, যে সকল পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হয় অথবা বিদীর্ণ হয়ে নির্গত হয় অথবা পাহাড় থেকে ভূপাতিত হয় এসব আল্লাহর ভয়ে হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ কথা অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আরবী ব্যাকরণবিদগণ পাথরের অবতরণের অর্থ নিয়ে একাধিক মতামত প্রকাশ করেছেন:

একদল ভাষাবিদের মতে আল্লাহর ভয়ে পাথর পতিত হওয়ার অর্থ এর ছায়া পতিত হওয়া। আর একদলে ভাষাবিদের মতে এর দ্বারা সেই পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, যে পাহাড়ের উপর আল্লাহর জ্যোতি পতিত হওয়ার কারণে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কারো কারো মতে, এর দ্বারা এমন কিছু সংখ্যক পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ পাক অনুধাবন শক্তি এবং আল্লাহকে জানার ও বুঝার শক্তি দান করেছেন। ফলে, সেগুলো আল্লাহ পাকের অনুগত হয়েছে। যেমন হাদীসে একটি খেজুর বৃক্ষ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স.) স্বীয় মসজিদে একটি (শুকনো) খেজুর গাছের অংশ বিশেষে হেলান দিয়ে খুত্‌বা দিতেন। এরপর তিনি যখন তা থেকে সরে গেলেন, তখন বৃক্ষটি গুনগুন রবে ক্রন্দন করতে শুরু করে। নবী করীম (স.) থেকে আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে একটি পাথর আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে ভালোভাবে চিনি। অন্যান্য কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মতে, "পাথর আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়" এর অর্থ পবিত্র কুরআনের আর একটি আয়াত جدارا يريد ان ينقض-এর অর্থের অনুরূপ।

মূলত পাঁচিলের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। এ সকল তাফসীরকার বলেন, পাথরের পতিত হওয়া দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মাহাত্ম্যের কারণে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে মনে হয় পাথর ভূপাতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যেমন কবি যায়দ আল-হায়ল বলেন:

بجمع تضل البلق في حجراته + ترى الأكم فيها سجدا للحوافر

সুওয়ায়দ ইব্ন আবূ কাহিল তাঁর শত্রুকে অপমানিত ভেবে তার বর্ণনা প্রসংগে বলেন:

ساجد المنخر لا يرفعه + خاشع الطرف اصم المستمع

কবি জরীর ইব্ন 'আতিয়্যাও বলেন:

لما اتى خبر الرسول تضعضعت + سور المدينة والجبال الخشع

(যখন রাসূলুল্লাহর (স.) খবর মদীনা তায়্যিবায় আসে, তখন মদীনা শরীফের পাঁচিল এবং ভীত বিহবল পাহাড় কম্পমান হয়ে পড়েছিল।)

অন্যান্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে, পাথর আল্লাহ্ পাকের ভয়ে পতিত হয়—এর অর্থ অন্যান্যদের আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব। কারণ, পাথরের এ অবস্থা তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যেমন 'আরবরা উত্তম এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উটনী সম্পর্কে বলে: ناقة تاجرة (ব্যবসায়ী উটনী)। কারণ, এ ধরনের উটনী লোকদেরকে তার প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করে থাকে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) কবি জরীর ইব্ন আতিয়্যার কবিতা দ্বারা এ মতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের যে সব তা'বীল করা যেতে পারে উপরোল্লিখিত মতামতসমূহ তার সাথে যদিও অধিক অসংগতিপূর্ণ নয়, কিন্তু উম্মাতের পূর্ব-সূরী ভাষ্যকারদের মতামত এর বিপরীত। এ জন্য আমরা এ সকল অর্থ অনুযায়ী আয়াতের তা'বীল করতে চাই না। আমরা ইতিপূর্বে خشية শব্দের অর্থ ভয় এবং শংকা বলে বর্ণনা করেছি এবং এর পক্ষে দলীলও উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমরা এ স্থানেও خشية শব্দের অন্য অর্থ করা পসন্দ করি না।

وما الله بغافل عما تعملون ○-এর ব্যাখ্যা:

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক বুঝাতে চান যে, হে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মিথ্যা জ্ঞানকারী, তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী এবং তাঁর সম্পর্কে অমূলক কথা রচনাকারী বনী ইসরাঈল জাতি এবং য়াহূদী ধর্মযাজকগণ! আল্লাহ্ তোমাদের অন্যায় আচরণ এবং কুনীতি সম্পর্কে আদৌ গাফিল নন। বরং তিনি তোমাদের এ সব দুষ্কর্মকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখেন এবং এর জন্য পরকালে তোমাদের শাস্তি বিধান করবেন। অথবা দুনিয়াতেই এর জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। غفلة এর তাৎপর্য হলো কোন বস্তুকে ভুলক্রমে পরিত্যাগ করা, অথবা তার কথা ভুলে যাওয়া। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ আয়াত দ্বারা সতর্ক করেছেন যে, তিনি তাদের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে গাফিল নন এবং এ বিষয়কে তিনি বিস্মৃত হননি, বরং এগুলোকে সংরক্ষণ ও হিফাযত করেছেন।

www.eelm.weebly.com

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ (৭৫)

(৭৫) তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে। যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শুনত ও বুঝবার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত !

মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, হে মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান গ্রহণকারী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর আনীত বস্তুসমূহকে সত্য প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা, তোমরা কি এই আশা পোষণ কর যে, বনী ইসরাঈলের য়াহূদীরা তোমাদের দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে?

أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ—তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তারা কি সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নেবে? এ প্রসংগে হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীগণ, তোমরা কি এ আশা পোষণ কর যে, য়াহূদীরা তোমাদের দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে? কাতাদাহ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, এখানে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে য়াহূদী জাতি।

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, فريق বহুবচন। এর একবচন নেই। যেমন طائفة বহুবচন। এরও কোন একবচন শব্দ নেই। فريق শব্দ فعيل-এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ—দল। যেমন حزب অর্থ—জামা'আত। حزب শব্দ تحزيب থেকে উদ্ভূত। ছা'লাবা গোত্রের কবি আ'শার পংক্তিতে এরূপ নযীর বিদ্যমান।

اجدوا فلما خفت ان يتفرقوا + فريقين منهم مصعد ومصوب

আয়াতে উল্লিখিত منهم দ্বারা বনী ইসরাঈল জাতিকে বুঝান হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর পরবর্তী যুগে বনী ইসরাঈলের যে সকল য়াহূদী ছিল, তাদের সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীগণকে আল্লাহ পাক বলছেন, افتطمعون ان يؤمنوا لكم (তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে?) এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাদের যুগ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের সম্পর্কে এ কথা কেন বলা হয়েছে? এর জবাবে মুফাস্‌সির বলেন, যেহেতু তারা এদের পূর্বপুরুষ এবং পূর্বসূরী ছিল এ জন্য তাদেরকে এদের মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে। যেমন অতীতকালের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পরবর্তী কালের কোন আলোচক বলে থাকেন كان منا فلان (অমুক ব্যক্তি আমাদের ছিলেন।) এটা তিনি তখনই বলেন, যখন পূর্বসূরী তার মতাবলম্বী অথবা তার সম্প্রদায়ের অথবা তার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) স্বীয় সূত্রের মাধ্যমে হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে সকল লোক আল্লাহ পাকের কালামকে পরিবর্তন ও গোপন করত, এরা ছিল বনী ইসরাঈলের ধর্মযাজক সম্প্রদায়। অপর একটি ভিন্ন সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা আল্লাহ পাকের যে কালামকে পরিবর্তন করে, সেটা ছিল তাওরাত গ্রন্থ। হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) يسمعون كلام الله ثم يحرفونه এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পাক তাদের উপর যে তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, তারা সে গ্রন্থটিকে পরিবর্তন করে। তারা এ গ্রন্থে উল্লিখিত হালালকে হারাম-এ পরিণত করত। আবার হারামকে হালাল-এ পরিণত করত। হক-কে বাতিল-এ এবং বাতিলকে হক-এ পরিণত করত, কোন সঠিক দাবীদার তার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ঘুষ নিয়ে আসলে তারা আল্লাহ পাকের কিতাব উল্লেখ করে তার পক্ষে রায় দিত। কোন বাতিল দাবীদার তাদেরকে ঘুষ দিলে তারা আল্লাহ পাকের কিতাবকে পরিবর্তন করে তা সঠিক হওয়ার ঘোষণা দিত। আর যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করত, যাতে সত্যের বা ঘুষের বা অন্য কোন কিছুর সম্পর্ক থাকত না, তখন তারা তাকে সঠিক নির্দেশ দিত। এ প্রসংগেই আল্লাহ পাক কুরআনে হাকীমে ইরশাদ করেন ঃ

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ط

افلا تعقلون ○

অর্থ ঃ তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের হুকুম দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে থাক। অথচ তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাব তিলাওয়াত কর, তোমরা কি অনুধাবন করতে পার না? (সূরা বাকারা ৪৪)

এ প্রসংগে হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা আল্লাহ পাকের কালামকে শ্রবণ করত—যেমনভাবে নবী আলায়হিস্ সালামের অনুসারিগণ শ্রবণ করত এবং তা ভালো করে বুঝার পর তারা তাকে পরিবর্তন করত এবং তারা তাদের এ পরিবর্তন সম্পর্কে ভালোভাবে জানত। হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম তাওরাত গ্রন্থকে শ্রবণ করত। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তারা সকলেই তাওরাতকে শুনেছে। তাওরাত শ্রবণকারী ব্যক্তিরা শুধু তারাই, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার আবেদন জানিয়েছিল এবং এক বিকট ধ্বনি তাদের পাকড়াও করে। আর একটি সূত্রে হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন কোন জ্ঞানীজন বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় একদা তাঁকে বলল, আমাদের এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে পর্দা রয়েছে যাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনি যখন তাঁর সাথে কথা বলবেন, তখন আমাদেরকে তাঁর কথা শুনাবেন। হযরত মূসা (আ.) তখন আল্লাহ তাআলার নিকট এ প্রার্থনা জানান। আল্লাহ তাআলা তখন সম্মতি দিয়ে বলেন, তাদেরকে পবিত্র হতে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করতে হুকুম দাও এবং তাদেরকে রোযা রাখতে

বল। তারা এসব নির্দেশ পালন করে। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং তূর পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে যখন তাদেরকে মেঘ আচ্ছন্ন করে নেয়, তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সিজদায় রত হওয়ার হুকুম দান করেন। তিনি এ সময় আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেন। তারা তাঁর কথা শুনতে পায়। আল্লাহ তাআলার এ কালামের মধ্যে বনী ইসরাঈলের প্রতি আদেশ ও নিষেধ ছিল। এ সকল ব্যক্তি তাদের শ্রবণকৃত এসব কথা ভালভাবে উপলব্ধি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলের নিকট ফিরে যান। ফিরে আসার পর তাদের একটি দল আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত বিষয়কে পরিবর্তন করে দেয়। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এই কাজের হুকুম দিয়েছেন, তখন এ দলটি হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দেশিত হুকুমের বিপরীত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে বলে, আল্লাহ তো এই এই হুকুম দিয়েছেন। রবী' (র.) বলেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ের এ দলটির কথাই বলেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ দুটি তা'বীলের মধ্যে রবী' ইব্‌ন আনাস এবং ইব্‌ন ইসহাক বর্ণিত মতটি আয়াতের বাহ্যিক মর্মের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত ইব্‌ন ইসহাক (র.) কোন কোন 'আলিমের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক এ দল দ্বারা হযরত মূসা আ.)-এর সাথে গিয়ে আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণকারীদেরকে বুঝিয়েছেন। এরা আল্লাহ পাকের কথা শুনে, জেনে এবং বুঝে এর পরিবর্তন করেছে। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আল্লাহর কালামের পরিবর্তন বনী ইসরাঈলের এমন একটি দল থেকে সংঘটিত হয়েছে, যারা সরাসরি আল্লাহ পাকের কালাম শুনেছে। সুস্পষ্ট দলীল এবং প্রমাণ উপস্থাপনের পরও এরা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সুতরাং তাদের অবশিষ্ট বংশধরদের থেকে কি করে এ আশা পোষণ করা যেতে পারে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হক, নূর এবং হিদায়াতকে অনুসরণ করবে। এ জন্য আল্লাহ পাক ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, কি করে তোমরা এ আশা করছ যে, তোমাদের যুগের য়াহূদীরা তোমাদের দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা তাদেরকে এমন সব খবর দিচ্ছ যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে গায়বী বস্তু সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। এরা ঐ সব বস্তুকে সরাসরি দেখেনি এবং প্রত্যক্ষ করেনি। তাদের একটি দল আল্লাহ পাকের কালাম এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সরাসরি শ্রবণ করে তা পরির্তন করেছে, বিকৃত করেছে এবং অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের অবশিষ্ট বংশধর যারা তোমাদের এ যুগে রয়েছে, তাদের ব্যাপারে অধিক সম্ভাবনা এই যে, তারা তোমাদের পেশকৃত সত্যকে অস্বীকার করবে। আর এরাও এসব কথা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে শ্রবণ করছে না বরং তোমাদের নিকট থেকে শ্রবণ করছে। এদের বেলায় এও অধিক সম্ভাবনা যে, তারা তাদের গ্রন্থে উল্লিখিত তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলী ও প্রশংসাকে তাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় অধিক হারে বিকৃত করবে, জেনে-শুনে পরিবর্তন করবে এবং এ সবকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষরাও আল্লাহ পাকের কালাম সরাসরি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে শ্রবণ করেছে। এরপর তা অনুধাবন করার পর এবং ভালভাবে জানার পর ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃত করেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের তা'বীল যদি ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী হয়, যারা বলেন يسمعون كلام الله। এর অর্থ তারা তাওরাত শ্রবণ করত,

তবে "তারা আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত" এ কথা বলার কোন সঠিক যুক্তি থাকে না। কেননা, যারা তাওরাত বিকৃত করেছে আর যারা বিকৃত করেনি সব লোকেরাই তা শ্রবণ করত। অতএব, শুধু বিকৃতকারীরাই আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত এ কথা বলার কোন অর্থ থাকে না। কারণ, যারা বিকৃত করেনি, তারাও শ্রবণ করত। কোন ব্যক্তি যদি বিকৃতকারীদেরকে বিশেষ করে উল্লেখ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, তাদের কথা বিশেষ করে এজন্যই বলা হয়েছে, কারণ আয়াতে يحرفون (তারা বিকৃত করত) উল্লেখ আছে, তবে এ যুক্তি সঠিক হবে না। কারণ, যদি তাই হতো, তবে আয়াত নিম্নরূপ হতোঃ

افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ○

অর্থাৎ يسمعون كلام الله এ কথার উল্লেখ থাকত না। কিন্তু আল্লাহ পাক এখানে য়াহূদী জাতির এক বিশেষ দলের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি তাঁর কালাম শ্রবণ করার এমন এক বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন, যা তিনি নবী এবং রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কাউকে দান করেননি। অথচ এরপরও তারা তাদের শ্রবণকৃত বস্তুকে পরিবর্তন করেছে এবং বিকৃত করেছে। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক বিশেষভাবে এ দলটির নাফরমানির কথা উল্লেখ করেছেন। ثم يحرفون এর দ্বারা আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা আল্লাহ পাকের কালামের অর্থ এবং তা'বীলকে পরিবর্তন করত এবং বিগড়িয়ে দিত। التحريف শব্দের মূল অর্থ কোন বস্তুকে তার আসল ভাব থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। এ হিসেবে يحرفون-এর অর্থ তারা আল্লাহ পাকের কালামের সঠিক অর্থ না করে অন্য অর্থ করত এবং এর মূল ভাব থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিত। আল্লাহ পাক এ বিশেষ দল সম্পর্কে অবহিত করে বলছেন যে, এরা আয়াতের সঠিক অর্থ ও মূলভাব অনুধাবন করার পর তাকে পরিবর্তন করত এবং বিগড়িয়ে দিত। আর তারা এও জানত যে, তারা তাদের এ কাজে বাতিলপন্থী এবং মিথ্যাবাদী। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এ সংবাদ প্রদান করেন যে, ঐ সকল য়াহূদী আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং মিথ্যা আরোপ করে। অনুরূপভাবে তাদের অবশিষ্ট বংশধররাও হিংসা এবং শত্রুতা-বশত আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যেমন তাদের পূর্বপুরুষেরা হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও অনুরূপভাবে শত্রুতা করেছে।

(৭৬) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

(৭৬) এবং তারা যখন মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরাও ঈমান এনেছি, আবার যখন তারা নিভৃতে একত্র হয়, তখন বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা কি অনুধাবন কর না?

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের ঐ সকল য়াহূদীর কথা বর্ণনা করেছেন,
যারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীদেরকে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ করেছে।
এদেরই একটি দল আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করত, পরে তা ভালোভাবে অনুধাবন করে পরি-
বর্তন করত এবং তা তারা জেনেশুনেই করত। আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগের এ সকল
য়াহূদীরা যখন হযরত রাসূলের (স.) প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে আসে, তখন তারা বলে, আমরা
হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছি এবং তোমরা যে সব বস্তুকে সত্য বলে মেনে
নিয়েছ, সেগুলোকে আমরাও সত্য বলে স্বীকার করেছি। আল্লাহ পাক এদের এ আচরণ সম্পর্কে
সংবাদ দিয়ে বলছেন যে, তারা মুনাফিকদের চরিত্র গ্রহণ করেছে এবং তাদের পথ অবলম্বন করেছে।
এ প্রসংগে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,
একদল য়াহূদী হযরত মুহাম্মদ (স.)-র সাথে সাক্ষাত হলে বলত, আমরা আপনার প্রতি ঈমান
এনেছি আর যখন তারা পরস্পরে একত্র হতো, তখন তারা বলত ঃ তোমরা কি এদেরকে এমন সব
কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ পাক একমাত্র তোমাদের নিকট ব্যক্ত করেছেন? হযরত ইব্ন 'আব্বাস
(রা.) থেকে আর একটি সনদে বর্ণিত আছে, তিনি واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا-এর
তাফসীর প্রসংগে বলেন, এরা ছিল একদল য়াহূদী মুনাফিক। তারা যখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর
সাহাবায়ে কিরামের সামনে আসত, তখন বলত ঃ আমরা ঈমান এনেছি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)
থেকে আর একটি সূত্রে অন্য একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেন, য়াহূদীরা ঈমানদারদের সাথে মিলিত
হলে বলত ঃ আমরা তোমাদের সাথী রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তবে তিনি একমাত্র তোমাদের
প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,
এরা ছিল য়াহূদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক। তারা ঈমান এনেছিল অতঃপর মুনাফিক হয়ে গিয়েছে।

وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশের واذا خلا بعضهم الى بعض দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, আল্লাহ পাক এখানে
এমন য়াহূদীদের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা পরস্পর নির্জনে মিলিত হয় এবং তা এমন স্থান যেখানে

য়াহূদী ছাড়া অন্য আর কেউ থাকে না। এ নির্জনে তারা একে অপরকে বলে, তোমরা কি নির্বোধ? তোমরা তাদেরকে এমন সব কথা বলে দিচ্ছ যা আল্লাহ একমাত্র তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন? بما فتح الله عليكم আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এর অর্থ—আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, আমরা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছি। আর কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, আর একটি হাদীসে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, য়াহূদীরা সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হলে বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, তোমাদের সাথী আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তবে কি তিনি তোমাদেরই নিকট প্রেরিত হয়েছেন? এরা নিজেরা পরস্পর মিলিত হলে বলে, আরবদেরকে এ সব কথা বল না। কেননা, তোমরা তাদের নিকট তার রহস্য প্রকাশ করে দিচ্ছ। তাতে তারা তাঁর সাথী হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ পাক واذا لقوا الذين الاية নাযিল করেন। অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বলছে ঃ তোমরা স্বীকৃতি দিচ্ছ যে, তিনি একজন নবী। আর তোমরা জান যে, এই নবী (স.)-এর অনুসরণ করার জন্য তোমাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছে। তিনিও এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সেই নবী আমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলাম। আর আমরা আমাদের কিতাবে তাঁর বর্ণনা পাই। তারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না। আল্লাহ পাক তাদের এ কথোপকথনের প্রতি ইংগিত করেই বলছেন—

اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ○

অর্থাৎ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে? আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি اتحدثونهم بما فتح الله عليكم এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাওরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে এখানে তাই বুঝান হয়েছে। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক তোমাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যে সব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন যদি তোমরা সে সব তাদেরকে বলে দাও, তবে তারা তোমাদের এ বর্ণনা দ্বারাই তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল গ্রহণ করবে। তোমরা কি তা বুঝ না? কাতাদাহ (র.) থেকে অপর দুটি ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আর একদল 'আলিম এ আয়াতাংশের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তারা মুজাহিদ (র.)-এর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন। এ প্রসংগে মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তা বানু কুরায়জার য়াহূদীদের উক্তি। নবী করীম (স.) যখন তাদেরকে বানর এবং শূকরের ভাই বলে গালি দেন, তখন তারা এ উক্তি করে। মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (স.) যখন বনী ইসরাঈলের নিকট হযরত আলী (রা.)-কে পাঠান, তখন তারা এ উক্তি করে এবং নবী করীম (স.)-কে যাতনা দেয়। এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ হে বানর ও শূকরের বংশধররা, তোমরা ভয় কর। মুজাহিদ (র.) থেকে আর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরায়জার দিন নবী করীম (স.) তাদের দুর্গের নিচে দাঁড়িয়ে বলেন, হে শূকর ও বানরের ভাইয়েরা! হে তাগূতের পূজারীরা! তাঁর এ সম্বোধন শুনে তারা বলল, হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে এই তথ্য দিয়েছে কে? তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থেকে এ কথা বের হয়নি। তোমরা কি তাদের নিকট

এমন কথা প্রকাশ করছ, যা আল্লাহ তোমাদেরকে প্রকাশ করার হুকুম দিয়েছে। এ কাজ করলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের দলীল উপস্থাপন করার সুযোগ হবে। ইব্‌ন জুরায়জ মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, 'আলী (রা.)-কে যখন তাদের নিকট পাঠান হয়, তখন এ ঘটনা ঘটে। তারা তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে যন্ত্রণা দেয়।

অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, য়াহূদীরা পরস্পরকে বলে, আল্লাহ তোমাদের উপর যে শাস্তির বিধান করেছেন তোমরা কি ঈমানদারদের নিকট এ সব কথা প্রকাশ করছ। ফলে তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে বলবে যে, এ সকল য়াহূদীরা একবার ঈমান এনেছে অতঃপর মুনাফিকী করেছে। তারা আরো বলবে, আমরা আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং সম্মানিত।

আর কয়েকজন তাফসীরকার হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ঈমানদাররা যখন য়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কি জান যে, তাওরাতে এ সকল হুকুম আছে, তখন য়াহূদীরা হ্যাঁ-সূচক জবাব দেয়। অতঃপর এ সকল সাধারণ য়াহূদীরা যখন তাদের সর্দারের নিকট যায়, তখন তারা বলে, তোমরা কি তাদেরকে ঐ সকল কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ পাক তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, এরা তো তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এ সব কথা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করবে। তোমরা কি বুঝ না? হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) একবার নির্দেশ দেন যে, ঈমানদার ছাড়া কেউ মদীনা শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন য়াহূদী সম্প্রদায়ের কাফির এবং মুনাফিক সর্দাররা তাদের অনুসারীদেরকে বলে, তোমরা ঈমানদারদের নিকট গিয়ে বল যে, আমরা ঈমান এনেছি। এরপর ফিরে এসে কুফরী কর। হযরত রবী' (র.) বলেন, তারা সকাল বেলায় মদীনা শহরে আসত এবং বিকেল বেলায় ফিরে যেত। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ পাক বলেন—

وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذى انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ۝

অর্থাৎ কিতাবীদের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম ভাগে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত তারা বিশ্বাস থেকে ফিরতে পারে। (সূরা আল-ইমরান আয়াত-৭২)

য়াহূদীরা মদীনায় প্রবেশ করলে বলত আমরা মুসলমান। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর কার্যাবলীর খবর জানা। এরপর তারা যখন ফিরে যেত, তখন কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করত। আল্লাহ পাক তাঁর নবী (স.)-কে তাদের এ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত করার পর তারা এ কাজ বন্ধ করে দেয়। এবং তারা আর মদীনায় প্রবেশ করত না। মু'মিনরা এ সকল য়াহূদীকে ঈমানদার বলে মনে করত এবং তাদেরকে বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলত, আল্লাহ কি তোমাদেরকে অমুক অমুক কথা বলেন নি? তারা হ্যাঁ-সূচক জবাব দিত। এরা যখন নিজেদের দলে ফিরে যেত, তখন তাদের দলের লোকেরা বলত: তোমরা কি তাদের নিকট এমন কথা প্রকাশ কর যা আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন।

আরবদের ভাষায় الفتح শব্দের মূল অর্থ সাহায্য, ফয়সালা এবং আদেশ। এ প্রেক্ষিতেই বলা হয়ে থাকে: اللهم افتح بينى وبين فلان অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার এবং অমুকের মাঝে ফয়সালা করে দাও। আরবী ভাষার কবিদের কবিতায়ও এ শব্দটির অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—

الا ابلغ بنى عصم رسولا + بانى فتاحتكم غنى-

অর্থাৎ আমি কি বনী ইসামের নিকট কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করব না? এখন যে আমি তোমাদের সিদ্ধান্তসমূহের মুখাপেক্ষী নই। আর এজন্যই বিচারককে আল-ফাত্তাহ (الفتاح) বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনেও الفتح শব্দটি ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ۝

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও। এবং তুমিই মীমাংসাকারিগণের মধ্যে উত্তম। (আ'রাফ—আয়াত-৮৯)

الفتح শব্দের উল্লিখিত অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: তোমরা কি তাদেরকে এমন সব কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি হুকুম দিয়েছেন এবং তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে যে সকল হুকুম দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে: তাদের থেকে তিনি অংগীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনবে। তাওরাতের সকল হুকুম মেনে চলবে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের ফয়সালাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল: তাদের কিছু সংখ্যককে বানর এবং শূকরে রূপান্তরিত করা এবং এতদ্ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের যেসব আদেশ এবং সিদ্ধান্ত ছিল। আর এ সব কিছুই তাওরাতের হুকুম স্বীকারকারী মিথ্যাবাদী য়াহূদীদের বিরুদ্ধে হযরত রাসূল (স.) এবং ঈমানদারদের জন্য ছিল দলীল স্বরূপ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ বর্ণনা অনুসারে আমার মতে আয়াতের যে সকল ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি নবী করে পাঠিয়েছেন, এ কথা তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। তোমরা কি মু'মিনদের নিকট এ কথাটি বলে দিচ্ছ? ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যা উত্তম হওয়ার কারণ এই, আল্লাহ পাক আয়াতের শুরুতে য়াহূদীদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, তারা হযরত রাসূল (স.) এবং ঈমানদারদের নিকট এসে বলে, আমরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আয়াতের প্রথমে যে বিষয়ের সূচনা করা হয়েছে শেষাংশের বিষয়ও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আয়াতের এ ভাষ্য অনুযায়ী য়াহূদীদের পরস্পরকে ভর্ৎসনা করার কারণ ছিল এই, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবায়ে কিরামের নিকট প্রকাশ করেছে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এবং তিনি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সে সবের উপর ঈমান এনেছে। তাদের এ স্বীকৃতির কারণ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের কিতাব তাওরাতে এ নির্দেশ পেয়েছে। তারা রাসূলে পাকের সাহাবীদেরকেও তাদের কিতাবের এ নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর তারা যখন নির্জনে মিলিত হতো, তখন তারা পরস্পরকে এজন্যই ভর্ৎসনা করত, কারণ তারা মুসলমানদেরকে এমন কথা বলে দিয়েছে, যা তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট দলীল হিসেবে পেশ করবে। আর তা হচ্ছে এই: তারা বলেছে, তাদের

কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে, অথচ তারা তা অস্বীকার করে। আল্লাহ পাক য়াহূদীদের নিকট যে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন তা ছিল, হযরত মুহাম্মদ (স.) নবী হিসেবে প্রেরিত হলে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। এরপর তাঁকে যখন নবী করে পাঠান হয়েছে, তখন এ য়াহূদীরা তাঁর নবুওয়াতকে সত্য বলে জানার পরও তাঁকে অস্বীকার করে।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আয়াতের এ অংশ দ্বারা মহান আল্লাহ পাক ঐ সকল য়াহূদী সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যারা তাদের ভাইদেরকে ভর্ৎসনা করেছে রাসূলুল্লাহর (স.) সাহাবীদেরকে এমন খবর দেওয়ার কারণে যা আল্লাহ পাক তাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। তারা বলছে, হে আমাদের কাওমের লোকেরা! তোমরা কি অনুধাবন কর না, তোমরা কি বুঝ না যে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবীদেরকে তোমাদের খবর দেওয়া যে, "তিনি একজন প্রেরিত নবী" তাদের জন্য একটি দলীল স্বরূপ। তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের এ উক্তিকে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ—তোমরা এমন কাজ আর কর না। তাদের নিকট যে সকল কথা বলেছ, এমন কথা আর তাদেরকে বল না এবং তাদেরকে যে সব খবর দিয়েছ, এমন খবর আর প্রদান কর না। তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(৭৭) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

(৭৭) তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যে সকল য়াহূদী তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তিরস্কার করে এজন্যে যে, তারা মু'মিনদের সংগে সাক্ষাৎ হলে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যে সব গুণের কথা তাওরাতে স্থান পেয়েছে, সে সম্পর্কে মুমিনদেরকে অবগত করে। তারা বলে, তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করবে আল্লাহ পাক তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। তাদের গোপন বস্তুসমূহ ছিল এই ঃ তারা নির্জনে একত্রিত হলে কুফরী করত। রাসূলুল্লাহ (স.) এবং ঈমানদারদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করত। তাদের নিকট আল্লাহ পাক যে সকল কথা প্রকাশ করেছেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়াত ও তাঁর গুণাবলী সংক্রান্ত যে সব বিবরণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তা ঈমানদারদের নিকট প্রকাশ করতে তারা একে অপরকে নিষেধ করত। তারা যা প্রকাশ করত তা ছিল এই ঃ তারা রাসূলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হলে বলত, আমরা মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন, সে সবের প্রতি ঈমান এনেছি। তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে প্রতারিত করা এবং মুনাফিকী করার উদ্দেশ্যেই এসব কথা বলে থাকত।

হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কি জানে না যে, আল্লাহ পাক জানেন যা তারা গোপন করে। যেমন তারা পরস্পর মিলিত হলে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি কুফরী করে এবং তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করে? আর তারা যা প্রকাশ করে তাও আল্লাহ পাক জানেন। যেমন তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবা কিরামের সাথে মিলিত হলে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে, "আমরা নবীর প্রতি ঈমান এনেছি।" হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাদের গোপন বস্তু ছিল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি কুফরী করা, তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করা। অথচ তারা তাদের আসমানী কিতাবে নবীর নবুওয়াতের কথা উল্লেখ পেত। আর যে সব কথা প্রকাশ করত তা ছিল, মু'মিনদের নিকট তারা বলত ঃ "আমরা ঈমান এনেছি।"

(৭৮) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ◎

(৭৮) তাদের মধ্যে এমন কতক নিরপেক্ষ লোক আছে, যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ—এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক যে সকল য়াহূদীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে উম্মীদেরও একটি দল রয়েছে। রাসূলে পাক (স.)-এর সাহাবা কিরামকে আল্লাহ এদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ করে বলেন ঃ তোমরা কি আশা কর যে, তারা ঈমান আনবে! অথচ তাদের একটি দল আল্লাহ পাকের কথা শুনত এবং অনুধাবন করার পর তা পরিবর্তন করত। আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ উম্মী দলটি য়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত মুজাহিদ (র.) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, أناس من يهود অর্থাৎ এরা য়াহূদীদের কিছু লোক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উম্মী অর্থ এমন লোক যারা লিখতে এবং পড়তে জানে না। নবী করীম (স.)-এর হাদীসেও উম্মী শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন ঃ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب অর্থাৎ আমরা একটি উম্মী জাতি, আমরা লিখতে এবং হিসেব করতে জানি না। এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে, رجل أمي অর্থাৎ একজন উম্মী ব্যক্তি। হযরত ইবরাহীম (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা উত্তমভাবে লিখতে জানে না। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, তারা এমন য়াহূদী, যারা কিতাব পড়তে জানে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোল্লিখিত মতের বিপরীত একটি মত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উম্মী এমন একটি সম্প্রদায়ের নাম, যারা তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ পাকের রাসূল (স.)-কে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে আল্লাহ পাকের কিতাব বলে বিশ্বাস

করেনি। তারা নিজেরা একটি কিতাব রচনা করে, এরপর মূর্খ এবং নীচ বংশের লোকদের নিকট গিয়ে বলে, এটাই আল্লাহর কিতাব। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করত। অতঃপর তাদেরকে উম্মী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (স.)-কে অস্বীকার করত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যাটি আরবদের মাঝে উম্মী শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত। আরবদের নিকট এ শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি, যে লিখতে জানে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে যে ব্যক্তি লিখতে জানে না, তাকে 'উম্মী' নামে চিহ্নিত করে তার মায়ের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কেননা, পুরুষদের মধ্যে লেখার প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোকদের মাঝে লেখার প্রচলন ছিল না। এজন্য যে সকল পুরুষ ব্যক্তি লিখতে জানে না, তাদেরকে তাদের মায়ের প্রতি আরোপ করে উম্মী বলা হয়ে থাকে। তাদেরকে তাদের পিতার প্রতি আরোপ করা হয় না। হাদীসেও এ অর্থের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। হযরত নবী করীম (স.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা একটি উম্মী জাতি, আমরা লিখতে জানি না এবং অংক করতে পারি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃ هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم (তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। সূরা জুমুআ আয়াত -২)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'আরবরা উম্মীকে যে অর্থে ব্যবহার করে তা আমরা ইতি-পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর প্রেক্ষিতে আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তা, যা ইমাম নাসাঈ (র.) বলেছেন। তাঁর মতে, ومنهم اميون অর্থ তাদের এমন একটি দল, যারা উত্তমভাবে লিখতে জানে না।

لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِىَّ-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ—আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে কি আছে, তারা তা জানে না। আল্লাহ সে কিতাবে যে সকল শাস্তির বিধান রেখেছেন, যে সব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন এবং যে সব বস্তুকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন, তারা এসব কিছুই জানে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত। হযরত কাতাদাহ (র) থেকেও অনুরূপ অর্থের একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত, এরা কিছুই জানে না। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে অপর একটি ভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে, তারা কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কেও তাদের কোন জ্ঞান নেই।

لا يعلمون الكتاب-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে আবুল আলিয়াহ (র.) বলেন ঃ তারা জানে না, যা কিতাবের মধ্যে রয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তারা জানে না। হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেনঃ এর অর্থ তারা কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, এর অর্থ আল্লাহ পাক যে কিতাব নাযিল করেছেন তারা এ কিতাব বুঝে না এবং এর জ্ঞান রাখে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে আল-কিতাব অর্থ আত্‌-তাওরাত। এজন্য এর মধ্যে আলিফ এবং লাম আনা হয়েছে। কারণ, এ কিতাব দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ কিতাবকে বুঝান হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ, তাদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা লিখতে জানে না এবং তাদের নিকট যে কিতাব আছে বলে তোমরা জান, তারা সে কিতাবকে বুঝতে পারে না। তারা

মিথ্যাভাবে সে কিতাবকে নিজেদের প্রতি আরোপ করে এবং তাতে উল্লিখিত আল্লাহ পাকের আহকাম ফরয নির্দেশাবলী এবং দণ্ডবিধিসমূহকে স্বীকৃতি দেয় বলে দাবী করে।

الا امانى-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এমন কথা বলে, যা তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় মিথ্যাস্বরূপ। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তারা মিথ্যা কথা ছাড়া আল্লাহ পাকের কিতাবের কিছু জানে না। আর হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত ঃ তারা আল্লাহ পাকের কাছে এমন সব আশা-আকাংখা পোষণ করে, যা তাদের প্রাপ্য নয়। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ তারা আল্লাহ পাকের কাছে এমন অলীক আশা পোষণ করে, যা তারা পাবার যোগ্য নয়। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তারা শুধু নিজেদের মনগড়া কথা বলে থাকে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত ঃ য়াহূদী সম্প্রদায়ের এমন কিছু লোক ছিল, যারা আল্লাহ পাকের কিতাবের কিছুই জানত না। তারা ধারণা প্রসূতভাবে আল্লাহ তাআলার কিতাবের বহির্ভূত কথা বলত এবং তাকেই আল্লাহ তাআলার কিতাব বলে দাবী করত। এসব ছিল তাদের আশা-আকাংখা, যা তারা পোষণ করত। হযরত আবুল 'আলিয়াহ্ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা আল্লাহ তাআলার নিকট এমন আশা পোষণ করে যা তাদের প্রাপ্য নয়। হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত ঃ তারা আশা করে এবং বলে আমরা আহলে কিতাব। অথচ, তারা কিতাবধারী নয়। বিভিন্ন তাফসীরবিশারদের মতামত উল্লেখ করার পর ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ সকল মতামতের মধ্যে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এবং হযরত মুজাহিদের (র.) মত সর্বাধিক উত্তম এবং সঠিক। তাঁদের মত অনুসারে উম্মীরা এমন একদল ব্যক্তি, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব মোটেই বুঝত না। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা গড়ত এবং মিথ্যার আশ্রয়ে বাতিল ও অযথা কথা তৈরি করত। এখানে التمنى শব্দের অর্থ মিথ্যা তৈরি করা, মিথ্যা কথা আরোপ করা এবং মিথ্যা কথা গড়া। এ অর্থের প্রেক্ষিতেই কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যা গড়লে বলা হয়ে থাকে —تمنيت كذا। হযরত 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের অর্থও এইরূপ। তিনি বলেনঃ تغنيت ولا تمنيت তার উল্লিখিত تمنيت অর্থ, আমি বাতিল কথা তৈরি করিনি এবং মিথ্যা ও অপবাদ সৃষ্টি করিনি। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) তাঁর এ মতামত ব্যক্ত করার পর বলেনঃ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য যে সঠিক এবং الا امانى সম্পর্কে বর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে এ ব্যাখ্যা যে সর্বোত্তম এর প্রমাণ মহান আল্লাহ তাআলার পরবর্তী বাণীঃ وان هم الا يظنون (তাঁরা শুধুমাত্র ধারণা করে।) আল্লাহ তাআলা আয়াতের এ অংশে তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে ইরশাদ করেন। তারা কল্পনা করে এসব মিথ্যা রচনা করে। এতে তাদের কোন দৃঢ়তা এবং প্রত্যয় নেই। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ যদি আয়াতের অর্থ হয়, "তারা তা তিলাওয়াত করত", তবে এসব তিলাওয়াতকারীকে ধারণা পোষণকারী বলা যেতে পারে না। তিনি আরও বলেনঃ যদি এর অর্থ হয়, "তারা কামনা করত", তবুও তাদেরকে ধারণা পোষণকারী বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা, যে তিলাওয়াত করে, সে তাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তা বুঝতে পারে। কেউ যদি কোন কিতাব পাঠ করে তাতে গভীরভাবে চিন্তা না করে, তবে তার সম্পর্কে এ কথা বলা

যায় না যে, সে উক্ত কিতাবের ব্যাপারে কোন প্রকার ধারণা পোষণকারী। তবে সে যদি কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্দেহ করে যে, এটা হক না বাতিল, সে অবস্থায় তাকে ধারণা পোষণকারী বলা যেতে পারে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে যে সকল য়াহূদী তাওরাত পাঠ করত আমাদের জানা মতে তারা তাওরাত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কি না এ নিয়ে কোন সন্দেহ করত না। অনুরূপভাবে التمني শব্দকে المشتهي (বাসনাকারী) অর্থে ব্যবহার করা হলেও তাকে ধারণা পোষণকারী বলা যায় না। কেননা, বাসনাকারী যখন অস্তিত্বশীল বস্তুর আশা করে, তখন তাকে সন্দেহ পোষণকারী বলা যায় না। কারণ, তার ঐ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। আর জ্ঞান (العلم) এবং সন্দেহ (الشك) শব্দ দুটির পৃথক পৃথক অর্থ আছে। এ দুটিকে কোন একটি স্থানে একত্রিত করা জায়িয নয়। আশা পোষণকারীর আশা যখন অপূর্ণ থাকে, তখন এ কথা বলা জায়িয নেই যে, সে ধারণা করে। এখানে বলা হয়েছে, "তারা আশা-আকাংখা ছাড়া কিতাবের কিছু জ্ঞান রাখে না।" الا اماني (আশা-আকাংখা) الكتاب-এর অন্তর্ভুক্ত বা তার কোন প্রকার নয়। পবিত্র কুরআনের অপর আয়াত থেকেও তা বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ما لهم به من علم الا اتباع الظن

(অর্থাৎ ধারণার অনুসরণ ছাড়া তাদের সে বিষয়ে কোন 'ইলম বা জ্ঞান নেই। সূরা নিসা আয়াত-১৫৭) ظن (ধারণা) অপেক্ষা علم (সঠিক জ্ঞান) অনেক কম দৃঢ়তা-সূচক। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ۝

(এবং তাঁর প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তাঁর মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় সূরা আল-লায়ল, আয়াত ১৯-২০)। তাফসীরকারক নিচের পংক্তি থেকেও তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

ليس بيني وبين قيس عتاب + غير طعن الكلى وضرب الرقاب

(আমার ও কায়েসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, তবে শুধু পরস্পর তিরস্কার ও মারামারি মাত্র)। যেমন কবি নাবেগাহ বলেছেন:

حلفت يمينا غير ذى مثنوية + ولا علم الا حسن ظن بغائب

(অর্থাৎ আমি কঠিন শপথ করে বলছি যার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আর শুধুমাত্র অদৃশ্য সম্বন্ধে ভাল ধারণা ব্যতীত।) এরপর তিনি বলেন: এরূপ আরও উদাহরণ বর্ণনা করা হলে আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে বলে, তিনি আর উদাহরণ দেননি। الا শব্দ বাক্যের পরবর্তী অংশের অর্থকে পূর্ববর্তী অংশের অর্থ ও গুণাগুণ থেকে পৃথক করে দেয়, যদিও বাক্যের অংশদ্বয় পরস্পর পৃথক ও ভিন্নরূপ হয়।

কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ امانى কে تخفيف এর সাথে পড়ে থাকেন। তাঁরা এ শব্দকে নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বহুবচনের অনুরূপ ধরে تخفيف এর সাথে পড়েন। যেমন— مفتاح-এর বহুবচন مفاتح এবং قرقور-এর বহুবচন قراقر—امانى শব্দে বহুবচন-এর ياء-কে দূর করে মূল ياء-কে تخفيف করে পড়া হয়। যেমন—الاثفية-এর বহুবচন اثافى-এর ياء-কে تخفيف করে পড়া হয়ে থাকে। যেমন কবি যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা বলেন:

اثافى سفعا فى معرس مرجل + ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم

এখানে اثافى শব্দকে تخفيف করে পড়া হয়েছে।

অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ امانى শব্দকে تشديد-এর সাথে পড়েনি। তাঁরা এর উপমা হিসেবে নিম্নবর্ণিত শব্দসমূহকে উল্লেখ করেন: المفتاح এর বহুবচন مفاتيح এবং الزنبور ও القرقور-এর বহুবচন যথাক্রমে زنابير ও قراقير—افاعيل-এর ওযনে একটি ياء এবং كلمة-তে আর একটি ياء থাকার কারণে দুটি ياء একত্রিত হয়েছে। এরপর একটি ياء-কে অপর ياء এর মধ্যে ادغام করে تشديد এর সাথে পড়া হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন: আমার মতে الامانى এর ياء এর উপর تشديد ছাড়া تخفيف পড়া কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞের জন্য জায়িয নয়। কারণ, এ কিরাআতের উপর কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। পূর্বসূরী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দটিকে تشديد এর সাথে পাঠ করেছেন। এবং এ পাঠরীতিটিই তাঁদের মাঝে ব্যাপক। تخفيف (সহজ উচ্চারণ) এর সাথে পঠন পদ্ধতি অতি বিরল। এ পঠন পদ্ধতি ভুল হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝-এর ব্যাখ্যা:

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে ان هم ব্যবহৃত হয়েছে وما هم-এর অর্থ প্রদানের জন্য। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতেও এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم

(রাসূলগণ তাদেরকে বলেন, আমরা তো তোমাদের মতই মানুষ। সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১১) এ আয়াতে ان نحن - ما نحن অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। الا يظنون অর্থ তারা শুধু সন্দেহ করে, কিন্তু এর প্রকৃত ও বিশুদ্ধ অর্থ তারা জানে না। এখানে الظن শব্দের অর্থ الشك (সন্দেহ)। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা লিখতে জানে না, যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, এরা আল্লাহ পাকের কিতাব সম্পর্কে জানে না এবং তাতে কি আছে তাও জানে না। এরা আল্লাহ তাআলার উপর বাতিল পন্থায় মিথ্যা কথা রচনা করে এবং অমূলক কথা তৈরি করে। তারা ধারণা করে যে, এসব বাতিল রচনায় তারা সত্যপন্থী, অথচ তারা বাতিলের অনুসারী।

মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে এ বর্ণনা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন, এরা আল্লাহ সম্পর্কে বাতিল কথা রচনা করেও নিজেদেরকে সঠিক বলে ধারণা করে। কারণ, তারা তাদের ধর্মযাজক এবং নেতাদের নিকট থেকে এসব কথা শুনে এগুলোকে আল্লাহ পাকের কিতাবের কথা বলে ধারণা করে। অথচ এসব আল্লাহ তাআলার কিতাবের কথা নয়। তাদের এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, এরা এমন বস্তুকে সত্য বলে মেনে নেওয়াকে পরিত্যাগ করছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত। তারা এ ব্যাপারেও সুনিশ্চিত যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) যা বলছেন, তা তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই বলছেন। এরপরও তারা এমন সব কথার অনুসরণ করে, যে সব কথার যথার্থতা সম্পর্কে তারা নিজেরাই সন্দিহান এবং যেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কেও রয়েছে তাদের সন্দেহ। তাদের মহৎ ব্যক্তিরা, তাদের নেতারা এবং তাদের ধর্ম-যাজকরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এসব অমূলক কথা বলে থাকে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ পূর্বসূরী ব্যাখ্যাকারগণও আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ان هم الا يظنون এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ لا يكذبون। অর্থাৎ তারা শুধু মিথ্যা কথা বলে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অপর দুটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা জানে না এবং বুঝে না যে, এর মধ্যে কি আছে। তারা ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিতঃ তারা নাহক ভাবে ধারণা পোষণ করে থাকে। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিতঃ তারা নাহক ভাবে ধারণা পোষণ করে থাকে। আর হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

(৭৯) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ○

(৭৯) সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ প্রাপ্তির জন্য বলে, "এটি আল্লাহর নিকট থেকে।" তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে, তার জন্য শাস্তি তাদের।

فَوَيْلٌ-এর ব্যাখ্যাঃ

তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে একাধিক মত পেশ করেছেন। কয়েক জন মুফাস্সিরের মতে এর অর্থ, তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে। যেমন হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে

বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ এর অর্থ তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত আছে। আর কয়েকজন মুফাস্সির আবূ 'ইয়াদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ الويل। এমন এক প্রকার পুঁজ, যা জাহান্নামের মূলে প্রবাহিত হয়। আবূ 'ইয়াদ (র.) থেকে আর একটি সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ওয়ায়ল একটি হাউযের (চৌবাচ্চার) নাম। তা জাহান্নামের মূলে অবস্থিত।

জাহান্নামীদের দেহ থেকে প্রবাহিত পুঁজ এর মধ্যে গিয়ে পতিত হয়। আবূ 'ইয়াদ (র.) থেকে আর একটি সনদে বর্ণিত ঃ 'আল-ওয়ায়ল' জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি জায়গা, যেখানে পুঁজ রয়েছে। হযরত শাকীক (র.) থেকে বর্ণিতঃ জাহান্নামের তলদেশে একটি স্থান আছে, যেখান দিয়ে পুঁজ প্রবাহিত হয়। অপর কয়েকজন মুফাস্সির 'আল-ওয়ায়ল'-এর ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দেন। যেমন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'আল-ওয়ায়ল' জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। হযরত আবূ সাঈদ (র.) নবী করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'আল্-ওয়ায়ল' জাহান্নামের একটি প্রান্তর। এখানে কাফিররা চল্লিশ বছর থাকার পর জাহান্নামের তলদেশে পতিত হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ উপরোল্লিখিত তাফসীরকারগণের বর্ণনা অনুসারে আয়াতের অর্থ হলো, যে সব য়াহূদী নিজেদের পক্ষ থেকে বাতিল ও অমূলক কথা লিপিবদ্ধ করে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাদেরকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজ খেতে দেওয়া হবে।

لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط-এর ব্যাখ্যাঃ

হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহ পাকের কিতাবকে বনী ইসরাঈলের কিছু য়াহূদী পরিবর্তন করে। তারা এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া কথা লিপিবদ্ধ করে। এরপর তারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে এ কিতাবকে এমন সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রি করে, যাদের কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং তাওরাত সম্পর্কেও তারা জানে না। বরং তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ○

অর্থাৎ তাদের জন্য 'ওয়ায়ল', কারণ, তারা নিজের হাতে এমন কথা লেখে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। তাদের জন্য ওয়ায়ল, কারণ, তারা এর বিনিময়ে উপার্জন করে।

এ প্রসংগে হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিতঃ য়াহূদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক নিজেদের পক্ষ থেকে কিতাব রচনা করত। তারা এসব আরবদের নিকট সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করত এবং বলত, এগুলো আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ উম্মী এমন একটি সম্প্রদায়, যারা তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূলকে রাসূল বলে গ্রহণ করেনি এবং তাদের নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবকে কিতাব বলে মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের হাতে

কিতাব রচনা করে। অতঃপর মূর্খ এবং নির্বোধ লোকদের নিকট গিয়ে বলে, এটা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব তারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যেই করে থাকে। হযরত মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা উপলব্ধি করে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তবুও তারা তা পরিবর্তন করে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে এ বর্ণনায় উল্লেখ আছে, অতঃপর তারা তাকে পরিবর্তন করে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত ঃ যারা নিজেদের হাতে কিতাব রচনা করে, তারা য়াহূদী। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আর একটি সনদে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক নিজেদের হাতে কিতাব রচনা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকদের নিকট থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা। তারা বলত—এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ নয়।

হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাদের কিতাবে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যে সকল গুণাবলী অবতীর্ণ করেছেন, তারা সেগুলোকে ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করে দিত। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার কিছু স্বার্থ অন্বেষণ করা। আল্লাহ পাক তাদের এ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন—

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ○

হযরত উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ দোযখের একটি পাহাড়ের নাম 'আল-ওয়ায়ল'। এ আয়াত য়াহূদীদের প্রসংগে নাযিল হয়েছে। কারণ, তারা তাওরাতকে পরিবর্তন করেছে। তারা এতে তাদের পসন্দনীয় বিষয়কে যোগ করেছে এবং তাদের অপসন্দনীয় বিষয়কে বাদ দিয়েছে। তারা তাওরাত থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নাম উঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ জন্য তাদের উপর নারায হয়েছেন এবং তাওরাতের কিছু অংশ তুলে নিয়েছেন। এবং ইরশাদ করেন---

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ○

অর্থাৎ তাদের হাতের লিখনের কারণে তাদের জন্য ধ্বংস এবং এর সাহায্যে তারা যা কিছু অর্জন করে, তাও তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

হযরত 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র.) বলেন ঃ জাহান্নামের একটি ময়দানের নাম 'ওয়ায়ল'। এ ময়দানে যদি পাহাড়সমূহকেও নিক্ষেপ করা হয়, তবে এর তীব্র গরমে সেগুলো গলে যাবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ কেন বলেছেন যে, তারা তাদের হাত দিয়ে লেখে? তা হলে হাত ছাড়া কি লেখা যায়? যদি হাত ছাড়া লেখা যেতো, তবে এ কথার যথার্থতা থাকতো। এর জবাবে বলা যায়, বনী আদম যদিও তাদের হাত দ্বারা লেখে, কিন্তু কখনও কখনও এমন ব্যক্তির নির্দেশে লেখা হয়, যিনি স্বয়ং লিখেননি। তবে তার নির্দেশে লেখা হয়েছে। যেমন বলা হয় ঃ كتب فلان الى فلان (অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির নিকট লিখেছে।) অথচ তিনি নিজ হাতে লিখেননি, বরং তার হুকুমে লেখা হয়েছে। আল্লাহ এ আয়াত দ্বারা মু'মিনগণের উদ্দেশে ইরশাদ করেন فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم —য়াহূদী সম্প্রদায়ের 'আলিম ব্যক্তিরা আল্লাহর কিতাবকে পাঠ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিবর্তন করে।

অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা আল্লাহর কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আল্লাহ তাঁর বাণী يكتبون الكتاب بأيديهم দ্বারা এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, য়াহূদী সম্প্রদায়ের 'আলিম এবং ধর্মযাজকদের নির্দেশে জাহিলরা এ লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। 'আরবদের বাক্যে এর উপমা এরূপ ঃ باعنى فلان عبده كذا وكذا (অমুক ব্যক্তি স্বয়ং আমার কাছে এই এই বস্তু বিক্রি করেছে।) فاشترى فلان نفسه كذا (অমুক ব্যক্তি নিজে এই বস্তু ক্রয় করেছে।) এখানে বক্তা তার বাক্যে البيع এবং النفس উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি তাঁর শ্রোতাকে বুঝাতে চান যে, কেনা এবং বেচা এই কাজ স্বয়ং ক্রেতা এবং বিক্রেতার। তারা ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী করেননি। বরং কাজটি ঐ ব্যক্তির জন্যই অবধারিত, যার সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ সব লোকের জন্যই ধ্বংস অবধারিত, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে।

فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ○ -এর ব্যাখ্যা ঃ

বনী ইসরাঈলের যে সকল য়াহূদী আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করে, এরপর দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে বলে ঃ "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে," তাদের শাস্তি এই, তাদেরকে জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত এমন এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে জাহান্নামী ব্যক্তিদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজ প্রবাহিত হবে। مما كتبت أيديهم অর্থ এ 'আযাব এমন ব্যক্তিদের জন্য, যারা নিজ হাতে এ সব মিথ্যা রচনা করে থাকে। আর তারা যা উপার্জন করে এর পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে। অর্থাৎ তারা যে সব ভুল-ভ্রান্তি করে, পাপ কাজ করে এবং হারাম উপার্জন করে, এর জন্য তারা ধ্বংস হবে। কারণ, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতের বিপরীত আয়াত রচনা করে; এরপর লোকদের নিকট এগুলো বিক্রয় করে এর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করে। এ প্রসংগে আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে এ আয়াতাংশে বর্ণিত ঃ য়াহূদীরা যে সকল ভুল-ভ্রান্তি করে, তার জন্য তাদের ধ্বংস রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি فويل لهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা নিজ হাতে মিথ্যা রচনা করে, তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে। তিনি وويل لهم مما يكسبون-এর ব্যাখ্যায় বলেন, য়াহূদীরা নির্বোধ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে মিথ্যার বিনিময়ে যা ভোগ করত, এর জন্য তাদের ধ্বংস অবধারিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ الكسب শব্দের মূল অর্থ—কাজ। যেমন--- লবীদ ইব্‌ন রবীআহ তাঁর এই পংক্তিতে كواسب শব্দটি কাজ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

لمعفر قهد تنازع شلوه + غبس كواسب لا يمن طعامها

(৮০) وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

(৮০) তারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ য়াহূদীরা বলে ঃ আগুন আমাদের শরীরকে স্পর্শ করবে না এবং আমরা কখনও আগুনে প্রবেশ করব না, তবে হাতে গণা কয়েকটি দিন ব্যতীত। এ আয়াতে য়াহূদীদের আগুনে অবস্থান করার দিনগুলো বলে বুঝা গেলেও এই দিনগুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই দিনগুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যা য়াহূদীদের জ্ঞাত বলে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেননি। তারা জানত যে, তারা কত দিন জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ জন্যই আল্লাহ পাক দিনের সংখ্যা উল্লেখ না করে একে নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। এ দিনের সংখ্যা কত ছিল এ নিয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, এর পরিমাণ ৪০ দিন।

ইবন আব্বাস (রা.) وقالوا لن تمسنا النار الا ايـاما معدودة-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাকের দুশমন য়াহূদীরা বলত যে, শুধু তাঁর শপথকে বৈধ করার জন্য কয়েকটি দিন ব্যতীত আল্লাহ তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবেন না। আর এটা হচ্ছে সেই ৪০ দিন, যে দিনগুলোতে আমরা গো-বাছুর পূজা করেছি। যখন এই ৪০ দিন সমাপ্ত হবে, তখন আমাদের উপর থেকে 'আযাব বন্ধ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের শপথেরও সমাপ্তি ঘটবে। কাতাদাহ (র.) বলেন, য়াহূদীদের মতে, এ দিনগুলো হচ্ছে ঐ কয়েকটি দিন, যে সময়ে তারা গো-বাছুরকে পূজা করেছে। সুদ্দী (র.) বলেন ঃ য়াহূদীরা বলে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন। এতে আমরা চল্লিশ দিন থাকব। এরপর দোযখের অগ্নি আমাদের পাপাচারকে নির্মূল করবে এবং আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করবে। তখন একজন আহবানকারী বলবে ঃ বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক খাতনাকৃত ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আর এজন্যই আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা খাতনা করি। য়াহূদীরা বলে, এ আহ্বানের পর তাদের একজনকেও জাহান্নামে রাখা হবে না, বরং প্রত্যেককে বের করে আনা হবে।

হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) বলেন ঃ য়াহূদীরা বলে, আমাদের কাজের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন। এরপর তিনি আমাদেরকে ৪০ দিন 'আযাব দেবেন বলে শপথ করেছেন। আযাবের পর তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, য়াহূদীরা বলে, আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করব না, তবে আল্লাহর কসমকে বৈধ করার জন্য তত দিন জাহান্নামে অবস্থান করব, যত দিন আমরা বাছুরকে পূজা করেছি। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) تمسنا النار الا ايـاما معدودة الا يـة এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ য়াহূদীরা তাদের কিতাবে লিখিত পেয়েছে যে, জাহান্নামের দুই প্রান্ত থেকে 'যাক্কুম' বৃক্ষ পর্যন্ত দূরত্ব চল্লিশ বছরের রাস্তা। এ বৃক্ষটি জাহান্নামের কেন্দ্রে অঙ্কুরোদগম হবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে আরো উল্লেখ আছে যে, জাহীম হচ্ছে দোযখ। সেখানে যাক্কুম নামক একটি বৃক্ষ আছে। আল্লাহর দুশমনদের ধারণা যে, তারা তাদের কিতাবে যে পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের কথা পেয়েছে, জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে সে পরিমাণ সময় লাগবে। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কোন 'আযাব থাকবে না; বরং তখন জাহান্নাম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী لن تمسنا النار الا ايا ما معدودة দ্বারা তারা এই নির্দিষ্ট সময়কেই বুঝিয়ে থাকে। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এ সব লোককে জাহান্নামের দরজা দিয়ে জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে, অতঃপর তারা আযাবগ্রস্ত থাকবে। পরিশেষে এ নির্দিষ্ট সময়ের সর্বশেষ দিনে যখন তারা যাক্কুম বৃক্ষের নিকট গিয়ে পৌঁছবে, তখন জাহান্নামের প্রহরী ও রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা বলতে যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন ব্যতীত তোমাদেরকে আগুন কখনও স্পর্শ করবে না, এ নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন তোমরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের উপরের দিকে উঠানো হবে এবং তারা 'আযাবে পতিত হবে। আর একটি সূত্রে হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে الا ايـاما معدودة-এর ব্যাখ্যা হলো ৪০ দিন। হযরত ইকরামাহ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ একদা য়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা বলে ঃ আমরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করব না, তবে মাত্র ৪০ রাত। এরপর তথায় আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে অপর একটি কাওম। এ কাওম দ্বারা তারা হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবা কিরামকে বুঝিয়েছে। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে বলেন ঃ বরং তোমরাই চিরকালের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে। সেখানে অন্য কেউ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন ঃ

لن تمسنا النار الا ايـاما معدودة

আর একটি সূত্রে 'ইকরামাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন য়াহূদীরা সমবেত হয়ে নবী করীম (স.)-এর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তারা বলে ঃ আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না, তবে নির্দিষ্ট কিছু দিন ব্যতীত। এ নির্দিষ্ট সময় হলো ৪০ দিন। এরপর অন্য লোকেরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, অথবা আমাদের সাথে 'আযাবে মিলিত হবে। এ কথার দ্বারা তারা নবী করীম (স.) এবং তাঁর সাহাবা কিরামের প্রতি ইংগিত করেছে। তখন হযরত নবী করীম (স.) বলেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছ; বরং তোমরাই তথায় চিরদিন এবং অনন্ত কালব্যাপী অবস্থান করবে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কখনও তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না এবং তোমাদের সাথে মিলিতও হব না। হযরত যাহ্হাক (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, য়াহূদীরা বলে, কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে দোযখের আগুনে 'আযাব দেওয়া হবে না, তবে মাত্র ৪০ দিন ব্যতীত, যে ক'দিন আমরা বাছুরের পূজা করেছি।

হযরত ইবন যায়দ (র.) বলেন ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদা নবী করীম (স) য়াহূদীদের উদ্দেশে বলেন, আমি আল্লাহ্র নামে এবং সেই তাওরাতের নামে, যা তূর-এ-সীনা দিবসে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে, তার শপথ করে বলছি, আল্লাহর অবতীর্ণ তাওরাত অনুসারে দোযখের অধিকারী কারা? তারা এর জবাবে বলে ঃ আল্লাহ আমাদের

উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হন, এ জন্য আমরা ৪০ রাত পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান করব। এরপর আমাদেরকে বের করে আনা হবে এবং তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। হযরত নবী করীম (স.) তখন বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! আল্লাহর শপথ! আমাদেরকে দোযখে কখনও তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে না। অতঃপর হযরত নবী করীম (স.)-এর বাণীর যথার্থতা প্রমাণ করে এবং তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াত দুটি নাযিল করেন---

(٨٠) وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة ط قل اتخذتم عند الله

عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ○ (٨١) بلى من كسب

سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحب النار ج هم فيها خلدون ○

অর্থাৎ তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। হে নবী আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে অংগীকার আদায় করেছ, তাই আল্লাহ তাঁর অংগীকার ভংগ করবেন না? কিংবা আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের ঘিরে রেখেছে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (বাকারা ৮০-৮১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আর এক দল তত্ত্বজ্ঞানী বলেন ঃ তাদেরকে জাহান্নামে সাত দিনের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এ প্রসংগে বলেন ঃ য়াহূদীরা বলে, দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর। আল্লাহ পাক মানুষকে পরকালে দুনিয়ার প্রতি হাযার বছরের পরিবর্তে আখিরাতের দিনের হিসাবে এক দিন করে 'আযাব দিবেন। সুতরাং এ হিসাবে আখিরাতের ৭ দিন পরিমাণ সময় আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক য়াহূদীদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, তারা বলে ঃ গণা কয়েকটি দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর একটি সূত্রে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় আগমন করেন। এ সময় য়াহূদীরা বলত, দুনিয়ার বয়স ৭ হাযার বছর। আল্লাহ তাআলা মানুষকে আখিরাতে দুনিয়ার প্রতি হাযারের পরিবর্তে আখিরাতের দিনের হিসাবে এক দিন করে 'আযাব দিবেন। এতে সাত দিন মাত্র 'আযাব দেওয়া হবে। এরপর 'আযাব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ পাক এ প্রসংগে অবতীর্ণ করেন, وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة—তারা বলে ঃ আমাদের 'আযাব স্পর্শ করবে না, তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মাত্র। মুজাহিদ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ য়াহূদীরা বলত, দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর। আর আমাদেরকে প্রত্যেক হাযারের স্থলে এক দিন করে শাস্তি দেওয়া হবে। মুজাহিদ (র.) থেকে আরও একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে এ বর্ণনায় "তারা বলত"-এর স্থলে "য়াহূদীরা বলত" বলে উল্লেখ আছে। মুজাহিদ (র.) থেকে আর একটি সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, য়াহূদীরা বলে, দোযখের

আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তবে যুগের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়। তারা যুগকে সাত হাযার বছর বলে উল্লেখ করে। প্রত্যেক বছরের বিনিময়ে এক দিন করে।

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى

اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ যখন য়াহূদীরা তাদের কথা বলল যে, তাদেরকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন ছাড়া জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, তখন আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি য়াহূদী সম্প্রদায়কে বলুন যে, তোমরা যে সকল কথা বলছ, এ ব্যাপারে কি তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন অংগীকার গ্রহণ করেছ যে, আল্লাহ তাঁর এ অংগীকার ভংগ করবেন না এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির কোন পরিবর্তন করবেন না। অথবা তোমরা মূর্খতা এবং বেপরোয়া হয়ে আল্লাহ্‌র উপর বাতিল এবং মিথ্যা চাপিয়ে দিচ্ছ। যেমন হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আয়াতের অর্থ, তোমরা কি তোমাদের এ কথার পক্ষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যে, বিষয়টি তদ্রূপ যেমন তোমরা বলছ। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ য়াহূদীরা বলে যে, আমরা আগুনে কখনও প্রবেশ করব না, তবে (আল্লাহ্‌র) কসমকে হালাল করার জন্য মাত্র সেই কয় দিনই জাহান্নামের আগুনে জ্বলব, যে কয় দিন আমরা গো-বাছুর পূজা করেছি। আল্লাহ পাক তাদের এ কথার প্রেক্ষাপটে বলেন, তোমরা যা বলছ, এ ব্যাপারে কি তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ? তোমাদের এ দাবীর পক্ষে কি তোমাদের কোন দলীল-প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ হাকীম তাঁর এ ওয়াদাকে কখনও ভংগ করবেন না। তোমাদের নিকট যদি এ ধরনের কোন প্রমাণাদি থাকে, তবে তা পেশ কর। অথবা তোমরা আল্লাহ পাকের উপর এমন কথা চাপিয়ে দিচ্ছ যা তোমরা জান না। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন য়াহূদীরা তাদের কথা বলল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বললেন, আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা কি আল্লাহ তাআলার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি জমা রেখেছ? তোমরা কি এ কথা বলেছ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, আর তোমরা তাঁর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করনি এবং কুফরি করনি। তোমরা যদি এরূপ কথা বলে থাক, তবে আমি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে পাওয়ার আশা রাখি। আর যদি তোমরা এ সব কথা না বলে থাক, তবে কেন আল্লাহ্ তাআলার উপর এমন কথা চাপিয়ে দিচ্ছ, যা তোমরা জান না। কেননা, তোমরা যদি বলে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কোন বস্তুকে শরীক না কর আর এ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ তোমাদের এসব কথা আমার নিকট সঞ্চিত আছে। আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি তার আমি খেলাফ করব না এবং আমি তোমাদেরকে বিনিময় দান করব। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, য়াহূদীরা যখন তাদের এসব কথা বলল, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে নবী!

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছ এবং আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করবেন না? আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون (বস্তুত তাদের মনগড়া 'আকীদাহ্ তাদেরকে তাদের দীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ৩ঃ২৪) অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন بلى من كسب سيئة (বস্তুত যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, সে-ই জাহান্নামী। (বাকারা---৮১)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ আমরা আয়াতটির যে ব্যাখ্যা করেছি, তা হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.), হযরত মুজাহিদ (র.) এবং হযরত কাতাদাহ (র.)-এর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর হুকুমের অনুসরণ করবে, তিনি কিয়ামত দিবসে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হলো এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বান্দাদেরকে দেওয়া আরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, যারা কিয়ামতের দিনে এমন প্রমাণ নিয়ে হাযির হবে, যা তাদের নাজাতের পক্ষে দলীল বহন করে, তাদেরকে তিনি দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। উপরোল্লিখিত মুফাসসিরগণের বক্তব্যে শব্দ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকলেও অর্থগত দিক থেকে আমাদের বক্তব্যের সাথে তাঁদের মতামতের সাদৃশ্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলাই বিষয়টি ভাল জানেন।

(৮১) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْٓئَتُهُ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(৮১) হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে, তারাই দোযখবাসী—সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক ওই সকল য়াহূদীর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন, যারা বলে, "আমাদেরকে দোযখের আগুন কখনই স্পর্শ করতে পারবে না, তবে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য।" আল্লাহ পাক এ সকল য়াহূদীকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন যে, তিনি ঐ সব লোককে শাস্তি দিবেন, যারা তাঁর সাথে শিরক করবে এবং তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করবে। আর এ সব ব্যক্তির পাপ তাদেরকে পেয়ে বসবে। ফলে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকবে, কেননা, জান্নাতে তো একমাত্র তারাই বাস করবে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর অনুগত হয়েছে এবং তাঁর দেওয়া সীমারেখার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যারা য়াহূদীদের কাজের মত কাজ করবে এবং তারা যে সব বস্তুকে অস্বীকার করে, সে সব বস্তুকে অস্বীকার করবে, তাদের এ অস্বীকার তাদের নেক কর্ম ধ্বংস করে দেবে এবং এরা হবে জাহান্নামী

এবং তথায় চিরদিনের জন্যে অবস্থান করবে। যে সকল বাক্যের প্রথমাংশে অস্বীকারসূচক বক্তব্য রয়েছে, সেখানে بلى শব্দটি স্বীকৃতি প্রদানের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন যেসব প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্যে অস্বীকারসূচক বক্তব্য নেই, সেখানে نعم শব্দ স্বীকৃতির অর্থ বহন করে। بلى শব্দের মূল হচ্ছে بل, একে অস্বীকৃতি থেকে স্বীকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয়, ما قام عمرو بل زيد অর্থাৎ 'আমর দাঁড়ায়নি বরং যায়দ দাঁড়িয়েছে'। অতঃপর بل শব্দের শেষে একটি ياء যোগ করা হয়েছে, যাতে এর উপর ওয়াকফ (থামা) বিধিসম্মত হয়। কেননা, بل শব্দের উপর ওয়াকফ করা বিধিসম্মত নয়। কারণ, এটিকে 'আতফ এবং অস্বীকৃতি থেকে স্বীকৃতির দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে যে কাজ বা যে বস্তুকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেখানে بلى ব্যবহার করে সে কাজ বা বস্তুর প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সুতরাং বাড়ানো ياء অক্ষরটি সুস্পষ্টভাবে এ স্বীকৃতির অর্থ বুঝিয়ে থাকে। আর بل শব্দটি শুধুমাত্র অস্বীকৃতি থেকে প্রত্যাবর্তন অর্থ বুঝায়। এ আয়াতে ব্যবহৃত السيئة। অর্থ আল্লাহর সাথে শিরক করা। যেমন— আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত, আছে, তিনি বলেনঃ بلى من كسب سيئة অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এর অর্থ শিরক করা। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর একটি সূত্রেও এরূপ বর্ণনা আছে। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি سيئة শব্দের অর্থ শিরক বলে উল্লেখ করেছেন। কাতাদাহ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও এরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ سيئة এমন গুনাহকে বলা হয়, যার সমাপ্তি জাহান্নাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেনঃ আমি 'আতাকে سيئة শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এর অর্থ শিরক করা। ইব্ন জুরায়জ (র.) অন্য এক সূত্রে বলেনঃ মুজাহিদ (র.) سيئة শব্দের অর্থ শিরক বলে উল্লেখ করেন। রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি سيئة শব্দের অর্থ শিরক বলে ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, এ আয়াতে উল্লিখিত سيئة অর্থ পাপে যারা বিজড়িত হয়ে পড়ে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। কারণ এখানে আল্লাহ سيئة বলতে বিশেষ রকমের গুনাহকে বুঝিয়েছেন। আয়াতের বাহ্যিক তিলাওয়াত যদিও সাধারণ অর্থ-জ্ঞাপক, কিন্তু এখানে এ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, এ পাপাচারীদের জন্য আল্লাহ চিরস্থায়ী জাহান্নামের ফয়সালা করেছেন। আর চিরস্থায়ী জাহান্নাম একমাত্র এমন লোকদের জন্য অবধারিত, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী পাপীদের জন্য নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে যে, ঈমানদার পাপীরা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে না। শুধুমাত্র এমন সব ব্যক্তিই চিরদিনের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করবে, যারা আল্লাহর প্রতি কুফরী করে। আল্লাহর উপর যাদের ঈমান আছে, তাদের এ শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণ, আল্লাহ তাঁর বাণীঃ

بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ○

-এর সাথে পরবর্তী আয়াত و الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ○ -কে সংযুক্ত করেছেন। এ আয়াত দুটির পাশাপাশি উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে, যে সকল পাপীর জন্য চিরকালীন জাহান্নাম অবধারিত, তারা ঐ সকল ঈমানদার থেকে ভিন্ন, যাদের জন্য চিরদিনের জান্নাত রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, যাদের জন্য চিরকালীন

জান্নাত নির্ধারিত, তারা শুধুমাত্র ঐ সকল ঈমানদার হবে, যারা জীবনে কেবলমাত্র নেক কাজ
করেছে—কোন সময় পাপ কাজ করেনি, তবে এ প্রকারের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ
পাক এ কথা বলেছেন যে, তাঁর বান্দারা নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে তিনি তাদের
অন্যান্য পাপ মিটিয়ে দেবেন এবং তিনি তাঁদের সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাবেন। এ আলোচনা
থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমরা উপরে بلى من كسب سيئة এর যে ব্যাখ্যা
করেছি তা সঠিক। কারণ, এখানে سيئة বলতে বিশেষ ধরনের পাপ কাজ বুঝান হয়েছে,
সাধারণ পাপ কাজ নয়। (মুফাসসির আরও বলেন,) কোন ব্যক্তি যদি এ কথা বলে যে, কবীরা
গুনাহ থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ আমাদের অন্যান্য পাপ মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন,
কিন্তু নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ بلى من كسب سيئة-এর এ আয়াতাংশে যে অন্তর্ভুক্ত নয়,
এর কি প্রমাণ আছে ? এর জবাবে বলা যায় যে, যখন এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সগীরা গুনাহ
بلى من كسب الاية-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আয়াতটি বিশেষ অর্থবহ— সাধারণ অর্থ-জ্ঞাপক
নয়, তখন এ থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, এ আয়াত সম্পর্কে কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিই ফয়সালা
গ্রহণ করতে পারবেন, যাকে আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করেছেন। আর উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই
যে, আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা মুশরিক এবং কাফিরদের বুঝিয়েছেন। আর সহীহ হাদীস দ্বারা
প্রমাণিত যে, কবীরা গুনাহ এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠিত সত্য অস্বীকার
করে, সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত, যারা মশহূর হাদীসসমূহ এবং সুস্পষ্ট খবরসমূহের বিরোধিতা
করে। অতএব, তার একান্ত কর্তব্য, সে এ আয়াত এবং অনুরূপ আয়াত দ্বারা এ সাক্ষ্য দেওয়া
বর্জন করবে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে। কারণ, কুরআন করীমের
ব্যাখ্যা সকলের বোধগম্য নয়। তবে আল্লাহ পাক যাকে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষমতা দান করেছেন,
তার বর্ণনা দ্বারা এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করা যায়। আবার প্রকাশ্যে যা অর্থ করা হয়, ক্ষেত্র
বিশেষে তার অন্তর্নিহিত বিশেষ অর্থ বহন করে।

وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এর অর্থ তার পাপসমূহ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসা ও তওবাহ
করার আগেই সে মৃত্যুবরণ করেছে। কোন বস্তুকে একত্র করার মূল অর্থ তা ঘিরে নেওয়া। যেমন
পাঁচিল ঘরকে ঘিরে রাখে। পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতেও احاط শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, نارا احاط بهم سرادقها অর্থাৎ
আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে (সূরা কাহাফ ঃ ২৯)। সুতরাং
আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত হবে
এবং তওবাহ করার আগেই মৃত্যুবরণ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা
জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আমরা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও
অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন হযরত যাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি احاطت به خطيئته
-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। হযরত রবী' ইব্ন খায়ছাম (র.) বলেন,
এর অর্থ সে গুনাহ্র উপর থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,
তিনি বলেন ঃ তার কুফরী তার নেক আমলকে ঘিরে ফেলেছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে

বর্ণিত আছে যে, তাকে এমন গুনাহ ঘিরে ফেলেছে, যে গুনাহর জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম ওয়াজিব
করেছেন। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ خطيئة এমন কবীরাহ্ গুনাহ, যা
শাস্তিকে ওয়াজিব করে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে আর একটি সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ
خطيئة শব্দের অর্থ কবীরাহ্ গুনাহ। হযরত সাল্লাম ইব্ন মিসকীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন ঃ এক ব্যক্তি হাসানকে احاطت به خطيئته সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন,
খাতীয়াহ কি ধরনের গুনাহ তা আমরা জানি না। তবে হে বৎস! তুমি পাক কুরআন তিলাওয়াত
করতে থাক, দেখবে, যে গুনাহর কারণে আল্লাহ দোযখের আগুনে শাস্তি দেবেন বলে ধমক দিয়েছেন
সেটাই খাতীয়াহ্। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এমন গুনাহ পরিবেষ্টনকারী,
যা করলে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন বলে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হযরত আবূ
রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি واحاطت به خطيئته-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ সে গুনাহ নিয়ে
মারা গিয়েছে। আর হযরত রবী' 'ইব্ন খায়ছাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ واحاطت
به خطيئته অর্থ এমন ব্যক্তি, যে তওবাহ করার আগেই গুনাহ্র মধ্যে লিপ্ত থাকা অবস্থায়
মারা যায়। হযরত ওয়াকী' (র.) বলেন, আমি আ'মাশকে বলতে শুনেছি, আয়াতের এ অংশের
ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ এ এমন ব্যক্তি, যে গুনাহ নিয়ে মারা গিয়েছে। হযরত রবী' (র.) থেকে
বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা এমন কবীরাহ্ গুনাহ্, যার জন্য শাস্তি অবধারিত। হযরত সুদ্দী
(র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থে বলেন, এ এমন ব্যক্তি, যে তওবাহ্ না করে মারা গিয়েছে। হযরত
ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি 'আতাকে واحاطت به خطيئته
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেনঃ এর অর্থ শিরক। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار অর্থাৎ আর যে খারাপ 'আমল নিয়ে আসবে এ
ধরনের সব লোকই উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (আন-নামল ঃ ৯০)

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ এ সব লোক যারা পাপ কাজ করেছে এবং যাদের পাপসমূহ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তারা
দোযখের অধিবাসী এবং তারা তাতে চিরদিনের জন্য থাকবে। اصحاب النار অর্থ اهل النار
অর্থাৎ দোযখের অধিবাসী। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দোযখের অধিবাসীদেরকে দোযখের
'সহচর' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা তাদের দুনিয়ার জীবনে জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী
কাজগুলোর পরিবর্তে এমন সব কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যে সব কাজ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ
করবে। এ ধরনের অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণেই আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের সহচর বলে
উল্লেখ করেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তির সুহবত (صحبة) অন্যদের সুহবতের উপর প্রাধান্য
দিলে তাকে ঐ বিশেষ ব্যক্তির সাথে চিহ্নিত করার জন্য তার সহচর বলে উল্লেখ করা হয়।
هم فيها خالدون অর্থ তারা জাহান্নামের মধ্যে চিরদিন অবস্থান করবে। হাদীস থেকেও অনুরূপ
বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি هم فيها خالدون
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে,
তিনি বলেনঃ তাদেরকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না।

(৮২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(৮২) আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

والذين امنوا-এর দ্বারা তাদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা হযরত মুহাম্মদ (স.) যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য বলে গ্রহণ করেছে এবং وعملوا الصالحات-এর অর্থ– তারা আল্লাহ্‌র অনুগত হয়েছে, তাঁর নির্দেশসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাঁর ফরযসমূহ আদায় করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ থেকে বিরত রয়েছে। اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون-এর অর্থ—তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং তারা চিরদিনের জন্য জান্নাতে অবস্থান করবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াত আল্লাহ্ পাকের বান্দাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করে যে, জাহান্নামে জাহান্নামের অধিবাসীরা এবং জান্নাতে জান্নাতের অধিবাসীরা চিরস্থায়ী হবে। এ দুটির প্রত্যেকটিতে তাদের জন্য যে সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে, তাও চিরকাল থাকবে। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের ঐ য়াহূদীদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যারা বলে, জাহান্নামের আগুন নির্দিষ্ট কয়েক দিন ছাড়া তাদের স্পর্শ করবে না এবং এ কয়েক দিন পর তারা জান্নাতে যাবে। এখানে আল্লাহ্ পাক তাদের সংবাদ দিয়ে বলেন, তাদের মধ্যে কাফিররা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে এবং মু'মিনরা থাকবে জান্নাতে।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে য়াহূদীদের জানিয়ে দেন যে, তোমরা যে সব বিষয় অস্বীকার করলেও তারা ঐ সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে এবং তোমরা দীনের যে সব বিষয়ের 'আমল ত্যাগ করলেও তারা ঐগুলো আমল করে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আর তাদের কাজের ভাল ও মন্দ অনুসারে তারা চিরদিন এর প্রতিফল পাবে। তা কোন দিন তাদের থেকে বন্ধ হবে না।

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত আছে—والذين امنوا وعملوا الصالحات—এ আয়াতাংশ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবা কিরাম (রা.)-কে বুঝান হয়েছে। এবং তাঁরাই জান্নাতের অধিবাসী, তাঁরা সেখানে চিরস্থায়ী হবেন।

(৮৩) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۣ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

(৮৩) স্মরণ করো যখন ইসরাঈল বংশীয়দের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা এ কিতাবে উল্লেখ করেছি, ميثاق শব্দ مفعال-এর অনুকরণে গঠিত। এর অর্থ শপথ ও এজাতীয় শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া। এ হিসেবে আয়াতের অর্থঃ হে বনী ইসরাঈল জাতি! তোমরা আরও স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করবে না। এর সমর্থনে হযরত ইবুন 'আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা রয়েছে। তিনি واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ হে বনী ইসরাঈল! যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করবে না। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ لا تعبدون-এর পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ একে تاء দিয়ে পড়েছেন, আর কেউ কেউ ياء দিয়ে পড়েছেন। উভয় অবস্থায়ই আয়াতের অর্থ এক ও অভিন্ন। অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ياء এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের বেলায় تاء দিয়ে পড়া হয় অর্থাৎ لا تعبدون এবং لا يعبدون উভয় পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা যায়। কারণ, ميثاق গ্রহণ করার অর্থ শপথ গ্রহণ করা। যেমন বক্তার নিকট অনুপস্থিত থাকার কারণে বক্তা বলে, استحلفت اخاك ليقومن (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের নিকট থেকে শপথ নিয়েছি যে, সে অবশ্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবে।) এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে তাকে অনুপস্থিত রেখেই খবর দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপস্থিত ধরে বলা হয়, استحلفته لتقومن (অর্থাৎ আমি তার থেকে শপথ নিয়েছি যে, তুমি অবশ্যই এটা প্রতিষ্ঠিত করবে।) কারণ তার সাথে এভাবে কথা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে لا تعبدون এবং لا يعبدون উভয় পঠন পদ্ধতিই বৈধ। যাঁরা تاء দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা এটাকে সম্বোধন অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেননা, তাদের এভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল। আর যাঁরা ياء দিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মতে এ খবর দেওয়ার সময় তারা উপস্থিত ছিল না। لا تعبدون কে رفع-এর স্থলে রাখা হয়েছে, কারণ এখানে تا অক্ষরটি ভবিষ্যত কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটির পূর্বে ان শব্দ বসিয়ে যবর বিশিষ্ট করা হয়নি, যদিও তাই ছিল নিয়ম। যেহেতু ان নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়নি, তাই শব্দটি পেশবিশিষ্ট হবে। যেমন পাক কুরআনের অপর আয়াতেও এভাবে পেশ পড়া হয়েছে। আয়াতটি এই—قل افغير الله تامرونى اعبد ايها الجاهلون (বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ? সূরা যুমার, আয়াত ৬৪) এখানে اعبد শব্দে الف ভবিষ্যত অর্থ প্রকাশ করে। এ কারণে اعبد-এর পূর্বে ان প্রবেশ করানো হয়নি। 'আরব কাব্যেও এরূপ উপমা পাওয়া যায়—

الا ايهذا الزاجرى احضر الوغى + وان اشهد اللذات هل انت مخلدى

শ্লোকে احضر কে এ পশ-এর সাথে পড়া হয়েছে, যদিও এখানে ان প্রবেশ করিয়ে যবর পড়া যেতো। احضر এর الف ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এ অর্থে ان উহ্য রাখা হয়েছে।

আয়াতে لا تعبدون-এর পূর্বে ان শব্দ حذف করা হয়েছে, কারণ আয়াতের বাহ্যিক মর্ম ان-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এ বাহ্যিক দিকের উপর নির্ভর করেই বাক্য থেকে ان বাদ দেওয়া হয়েছে। বসরার কোন কোন বৈয়াকরণের মতে, এ আয়াতে অতীত ঘটনার বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহর শপথ তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদত কর না। ইমাম তাবারী (র) বলেন, এ বক্তব্যের অর্থ আমাদের উল্লিখিত অর্থের কাছাকাছি। এ ছাড়া অন্যান্য তাফসীরকারের বক্তব্যও আমাদের বক্তব্যের অনুরূপ। যেমন 'আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। আর রবী' (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আয়াতের অর্থ, আল্লাহ তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হবে এবং একমাত্র তাঁর 'ইবাদত করবে। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ এ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, তা ঐ প্রতিশ্রুতি, যার উল্লেখ সূরা আল-মায়িদায় রয়েছে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

আয়াতের এ অংশ لا تعبدون-এর সংলগ্ন হযফকৃত ان-এর স্থানের উপর عطف হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, আমরা যখন বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় হবে। এখানে প্রথমে ان-কে উহ্য রেখে لا تعبدون-কে رفع-এর স্থান দেওয়া হয়েছে, অতঃপর بالوالدين-কে তার স্থানের উপর عطف করা হয়েছে। الاحسان শব্দ একটি উহ্য فعل-এর مفعول হিসেবে منصوب — بالوالدين শব্দ এ فعل-এর অর্থ প্রকাশ করে বলে فعل-কে উহ্য রাখা হয়েছে। উহ্য এ فعل (ক্রিয়া)কে বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে, আমরা যখন বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদয় হওয়ার মত সদয় হবে। بالوالدين শব্দ تحسنوا-এর অর্থ প্রকাশ করে বলে তাকে হযফ করা হয়েছে। কোন কোন 'আরবী ভাষাবিদের মতে احسنوا فعل—فاحسنوا-টি بالوالدين-এর পর উহ্য রয়েছে। এ মত অনুসারে بالوالدين-এর باء—احسان-এর صلة হিসেবে কাজ করবে, যা তার পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অপর এক দল ভাষাবিদ باء-কে احسنوا-এর صلة হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁদের এ মত অনুসারে দুটি বাক্য হবে। অর্থাৎ একটি বাক্য ان لا تعبدوا الا الله এবং দ্বিতীয় বাক্য واحسنوا بالوالدين احسانا —।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে, এ অভিমত যুক্তিসংগত নয়। কারণ, যদি একটি বাক্যে ভাব ও উদ্দেশ্য সুসমঞ্জসরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, তবে একটি বাক্যকে ভেংগে দুটি বাক্য করা ঠিক এবং যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, এ মত সঠিক হলে الى الوالدين احسانا বলা হতো। কারণ, 'আরবী ভাষা অনুসারে এ ধরনের স্থানে باء ব্যবহার না করে الى ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় ঃ احسن فلان الى والديه (অমুক নিজের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করেছে।) কিন্তু احسن بوالديه বলা হয় না। এ ধরনের বাক্য 'আরবী ভাষাভাষীদের নিকট অপসন্দনীয়। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাই সঠিক। আর এ অবস্থায় احسانا—مصدر হবে। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, আল্লাহ তাদের থেকে মাতা-

পিতার প্রতি কি ধরনের ইহ্‌সান করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। এর জবাব এই—আল্লাহ্ পাক অন্যত্র মাতা-পিতার প্রতি যে ধরনের কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এ অংগীকারও সেরূপ। যেমন—তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং তাঁদের সাথে এ ধরনের অন্যান্য সদ্ব্যবহার করা, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন।

وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ذى القربى। ذى অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। قربى শব্দ فعلى-এর ওযনে مصدر — قربى এবং قرابا সমার্থবোধক। يتامى বহুবচন। এর একবচন يتيم যেমন اسير। শব্দের বহুবচন اسارى — يتامى শব্দ য়াতীম ছেলেমেয়ে উভয়কেই বুঝায়। আল্লাহ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, যখন আমি বনী ইসরাঈল থেকে অংগীকার নিলাম, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। তাদের হক এবং অধিকার রক্ষা করবে। য়াতীমদের প্রতি দয়া এবং করুণার দৃষ্টি দেবে। তোমাদের মালে মিসকীনদের যে হক আছে তা আদায় করবে। مسكين এমন ব্যক্তি, যে ভুখাফাকা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব। এ শব্দটি مفعيل-এর ওযনে গঠিত এবং المسكنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অনাহার এবং চাহিদায় জড়সড় হয়ে পড়া।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কারো পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ আয়াতাংশে নির্দেশমূলক বাক্য (امر) কিরূপে ব্যবহৃত হলো, অথচ এ আয়াতে নির্দেশমূলক কোন বাক্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং এ আয়াতের শুরুতে বাক্যগুলো ছিল সংবাদ প্রদানমূলক। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, যদিও বাক্য এ স্থানে খবরসূচক কিন্তু এ স্থলে বাক্যটি মূলত আদেশ এবং নিষেধের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ لا تعبدون الا الله না বলে لا تعبدوا الا الله (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত কর না।) বললেও একই অর্থ হতো। এ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) অনুরূপ ভাবে পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত উবাই (রা.)-এর পাঠরীতি অনুসারে আয়াতটি পড়া হলেও বৈধ হতো। কেননা, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ একটি বক্তব্য, এটি খবর নয়। হযরত উবাই (র)-এর পাঠরীতি অনুসারে পড়া হলে আয়াতের অর্থ হতো, যখন আমরা বনী ইসরাঈলদের বললাম, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো 'ইবাদত কর না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধে স্থাপন করেছিলাম, বলেছিলাম—যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর। (বাকারা-২/৯৩)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যখন لا تعبدون الا الله-এর স্থলে আদেশ এবং নিষেধের রূপ (امر এবং نهى) ব্যবহার করা উত্তম, তখন এর উপর وقولوا للناس حسنا কে عطف করা ঠিক হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এখানে عطف করা বৈধ হয়েছে। কারণ لا تعبدون-এর স্থলে امر এবং نهى দ্বারা সম্বোধন করা বৈধ, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আয়াতটি যেন এরকম ঃ

واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدوا الا الله وقولوا للناس حسنا

এছাড়া আমরা উপরে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছি যে, আরবী ভাষাবিদগণ কোন কিছুর বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনও বাক্যের শুরুতে ব্যক্তিকে অনুপস্থিত রাখে। অতঃপর বাক্যের মাঝে তাকে সম্বোধন করে কথা বলে থাকে। আবার কখনও বাক্যের শুরুতে ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলে অতঃপর তাকে অনুপস্থিত রাখে। যেমন কবি বলেছেন ঃ

اسيئى بنا او احسنى لا ملومة + لدينا ولا مقلية ان تقلت

حسنا-এর পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত কারী 'আসিম (র.) ব্যতীত কুফার অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ حسنا-এর حاء এবং سين-এর উপর যবর দিয়ে পড়েন। সাধারণত মদীনা তায়্যিবার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ حاء-এর উপর পেশ এবং سين-এর উপর সাকিন দিয়ে পড়েন। আবার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ فعلى-এর ওযনে এখানে حسنى পড়েন। حَسَنًا এবং حُسْنًا এ দুটি পঠন পদ্ধতির মধ্যে অর্থগত দিক থেকে কোন পার্থক্য আছে কিনা এ নিয়ে 'আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। বসরার এক দল কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মতে এ দুটি সমার্থবোধক। যেমন بَخَل এবং بُخْل সমার্থবোধক। অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে حَسَن সাধারণ অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ। তা حُسْن-এর সকল প্রকার অর্থ বুঝায়। حُسْن দ্বারা সুন্দরের কিছু কিছু অর্থ বুঝায়। সকল অর্থ বুঝায় না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিতে গিয়ে حسنا শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন ঃ ووصينا الانسان بوالديه حسنا অর্থাৎ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। (আনকাবুত---২৯।৮) পক্ষান্তরে তিনি মাতা-পিতার প্রতি যে সকল বিষয়ে ভাল ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছেন, অন্যান্যের প্রতিও অনুরূপ ব্যবহার করার হুকুম দিয়ে বলেছেন ঃ وقولوا للناس حسنا ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ মতটি মোটামুটি ভাবে যথার্থ। আর حسن শব্দ যে অর্থ বহন করে অন্য কোন শব্দ তা বহন করে না। حسن শব্দ গুণবাচক। এটা সেই ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে গুণ আছে এবং এটা ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যবহার হয়, কোন শ্রেণীর জন্যে নয়। এ আয়াতে حسن শব্দ দ্বারা উত্তম কথা বুঝান হয়েছে, অন্য কোন অর্থ বুঝান হয়নি।

এ কারণে حاء ও سين-এর উপর যবরযুক্ত (حَسَن) পঠন পদ্ধতিই এখানে সঠিক। حاء-এর উপর পেশ এবং سين-এর উপর سكون যুক্ত পঠন পদ্ধতি (حُسْن) এখানে সঠিক নয়। অনুরূপ ভাবে حسنى পঠন পদ্ধতিও ঠিক নয়। কারণ এটা সকল কিরাআত বিশেষজ্ঞের পঠন পদ্ধতির বিপরীত। আর তাদের সকলের পঠন পদ্ধতির বিপরীত হওয়াই এ কিরাআত ভুল বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। এ ছাড়া এ পঠন পদ্ধতি আরবী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ শব্দ গঠন প্রণালীর পরিপন্থী। কারণ, আরবরা فعلى এবং افعل-এর ওযনে গঠিত শব্দ الف এবং لام ছাড়া অথবা اضافت ব্যতীত উচ্চারণ করে না। আরবরা جاءنى احسن না বলে الاحسن বলে থাকে। অনুরূপ ভাবে তারা اجمل না বলে الاجمل বলে থাকে। কেননা, الافعل এবং الفعلى-এর ওযনে গঠিত শব্দ কোন নির্দিষ্ট বস্তুর صفت ছাড়া পাওয়াই দুষ্কর। যেমন আরবরা বলে থাকে اخوك الاحسن এবং اختك الحسنى —। আরবী ভাষার রীতি অনুসারে امرأة حسنى এবং رجل احسن ব্যবহার করা বৈধ নয়।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ যে উত্তম কথা বলার হুকুম দিয়েছেন, তা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়। যাহ্হাক ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে য়াহূদীদের চরিত্র উল্লেখ করার পর তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা নিজেরা যেমন কালেমা لا اله الا الله-এর প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছ, অনুরূপ ভাবে যারা এখনও এর স্বীকৃতি দেয়নি অথবা স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত রয়েছে, তাদেরকে তোমরা এ কালেমার প্রতি আহবান জানাতে থাক। কেননা, এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন---তোমরা লোকদের সাথে ভাল কথা বলো।

ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন ঃ এর অর্থ তোমরা লোকদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সত্য কথা বলো।

য়াযীদ ইব্‌ন হারুন থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ প্রসংগে বলেন, তোমরা লোকদের ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর।

আবদুল মালিক ইব্‌ন আবী সুলায়মান (র.) বলেন, আমি 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি বলেন ঃ তোমার সাথে যে মানুষেরই সাক্ষাৎ হবে, তাকে সুন্দর কথা বলবে।

আবূ সুলায়মান (র.) বলেন, আমি আবূ জা'ফরকেও এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনিও অনুরূপ জবাব দেন। আবদুল মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবূ জা'ফর (র.) এবং 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন ঃ এ আয়াতে সকল মানুষের সাথে উত্তম কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর একটি সূত্রে আবদুল মালিক 'আতা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এর অর্থ সালাতের যে সব হক আদায় করা তোমাদের উপর ওয়াজিব, সে সব হক পুরা করে সালাত আদায় কর। যেমন ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে

যে, সালাত কায়েমের অর্থ রুকূ' এবং সিজদা পূর্ণ ভাবে আদায় করা, ঠিক ভাবে কিরাআত পাঠ করা এবং খুশূ বা বিনয়ের সাথে নামাযে রত থাকা।

وَآتُوا الزَّكَاةَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আমরা ইতিপূর্বে যাকাতের অর্থ এবং তার মূল রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ যাকাত আদায়ের যে হুকুম দিয়েছেন, তা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এখানে যাকাত দেওয়ার অর্থ আল্লাহ পাক তাদের মালের উপর যে যাকাত ফরয করেছেন, সে যাকাত আদায় করা। তাদের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শরীআতের পদ্ধতি থেকে ভিন্নরূপ ছিল। তারা যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল একটি স্থানে রেখে দিত এবং গায়েবী আগুন তা জ্বালিয়ে ফেলত। এটা ছিল যাকাত কবুল হওয়ার প্রমাণ। আর যার যাকাতের মাল আগুন এসে জ্বালাত না, সেটা অগ্রহণীয় বলে প্রমাণিত হতো। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ যথা অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত মাল, অথবা প্রতারণার মাধ্যমে গনীমতের মাল, অথবা আল্লাহ এবং রাসূলের পথ ব্যতীত অন্য পথে উপার্জিত মাল কবুল হতো না। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ যাকাত আদায় কর আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও আন্তরিকতার সাথে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ۝-এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলী য়াহূদীদের সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা তাঁর সাথে সম্পাদিত অংগীকার পূরা করবে, কিন্তু তারা তা ভংগ করে। অংগীকারগুলো ছিল—(১) তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করবে না। (২) পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (৩) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। (৪) য়াতীমদের প্রতি দয়াশীল হবে। (৫) মিসকীনদের হক আদায় করবে। (৬) আল্লাহ তাদের যেসব কাজ করার হুকুম দিয়েছেন তারাও আল্লাহর বান্দাদের সেসব কাজ করার হুকুম করবে। (৭) আল্লাহ পাকের আনুগত্যের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করবে। (৮) ফরয ও আহকামসহ সালাত কায়েম করবে। এবং (৯) অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করবে। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের এ সব নির্দেশ অমান্য করে এবং তাঁর হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকে। তবে এদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাদের হিদায়াত করেন, তারা আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে। যেমন— হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যেসব বনী ইসরাঈলের বর্ণনা করেছেন, তাদের উপর যখন তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সেগুলো পালন করার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, তখন তারা এগুলো কঠিন মনে করে এবং কষ্টকর মনে করে এসব হুকুম পালন থেকে বিরত থাকে এবং তাদের নিজেদের

জন্য যেটা হাল্কা এবং সহজ, সেটাই অন্বেষণ করে; তবে মুষ্টিমেয় লোক আল্লাহ পাকের দেওয়া হুকুম পালন করে। এ স্বল্প সংখ্যক লোককে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ লোকদের থেকে ভিন্ন করে দিয়ে বলেন ঃ তোমরা আমার আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছ, তবে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ব্যতীত। আমার আনুগত্য করার জন্যে আমি তাদের গ্রহণ করেছি। যারা আমার আনুগত্য থেকে বিরত হয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতিসত্বর তাদের প্রতি আমার 'আযাব আসবে।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের বাণী ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, تركتم ذلك كله (তোমরা এসব কিছুই ত্যাগ করেছ)। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ কোন কোন মুফাস্সিরের মতে وانتم معرضون দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগের য়াহূদীদের বুঝান হয়েছে। আর আয়াতের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের য়াহূদীদের বুঝান হয়েছে। এ মতানুসারে আয়াতের অর্থ হবে, হে য়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্বসূরীদের স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে এখানে পূর্ববর্তী য়াহূদীদের অবশিষ্ট বংশধরদের সম্বোধন করা হয়েছে। অতঃপর انتم। দ্বারা আল্লাহ পাক বলেন ঃ হে অবশিষ্ট য়াহূদী বংশধরেরা! তোমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে, তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমরাও তা অগ্রাহ্য করছ।

অপর কয়েকজন মুফাস্সিরের মতে ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের থেকে তাওরাত গ্রন্থে যে অংগীকার নেওয়া হয়েছে, সে অংগীকার ভংগ করার জন্য, আল্লাহ পাকের হুকুম পরিবর্তন করার এবং তাঁর নাফরমানী করার কারণে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।

(৮৪) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

(৮৪) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না, অতঃপর তোমরা স্বীকার করেছিলে আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের এ অংশ এবং পূর্বে উল্লিখিত وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ আয়াতাংশের অর্থ ও ই'রাব (اعراب) অভিন্ন। سفك الدم-এর অর্থ হলো—রক্ত প্রবাহিত করা। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে,

لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم-এর অর্থ কি? আর যদি এ প্রশ্নও করে যে, তারা কি নিজেদের মধ্যে আপন লোকেদের হত্যা করত এবং তাদের আপন লোকদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করত এবং সে জন্যেই কি এ নিষেধাজ্ঞা? এর জবাবে বলা যায়, তুমি যা ধারণা করেছ আসলে ব্যাপারটি তা নয়। তাদের আদেশ করা হয়েছে তারা যেন পরস্পর পরস্পরকে হত্যা না করে। কেননা, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কতল করা নিজকে কতল করার সমতুল্য। কারণ, সমাজের সকল মানুষ একটি দেহের মতো। যেমন, হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন: সকল মু'মিন পরস্পরের প্রতি করুণা ও দয়াশীল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো। দেহের একটি অংশ অসুস্থবোধ করলে সমস্ত শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সে ব্যক্তি বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তোমরা একে অপরকে কতল কর না। কারণ, এতে হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ কতল করা হবে, আর এ ভাবে সে নিজেই নিজের হত্যার কারণ ঘটাবে। এখানে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস কতল করলেও যেহেতু সে নিজেই তার নিজের হত্যার কারণ ঘটিয়েছে এ জন্য এ হত্যাকে তার নিজের প্রতিই আরোপ করা হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি শাস্তির উপযোগী কোন কাজ করার ফলে তাকে শাস্তি দিয়ে বলা হয়, তুমিই তোমার নিজের আত্মার উপর যুলুম করেছ।

অপরাপর তাফসীরকারগণও আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন— হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন: لا تسفكون دماءكم অর্থ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা কর না।

وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ-এর ব্যাখ্যা:

হযরত আবুল 'আলিয়াহ্ (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন: তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর না এবং পরস্পরকে দেশান্তর কর না। হযরত কাতাদাহ্ (র.) থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে যেন অন্যায় ভাবে হত্যা এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত না করে। অর্থাৎ হে বনী আদম! তোমরা তোমাদের নিজ সম্প্রদায় এবং নিজ ধর্মাবলম্বীদের হত্যা কর না।

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ-এর ব্যাখ্যা:

এর ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না, তোমাদের আপন লোকদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করবে না।

হযরত আবুল আলিয়াহ্ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ثم اقررتم-এর অর্থ প্রসংগে বলেন: তোমরা অংগীকার পালনের নিশ্চয়তা বিধান করেছ। হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○-এর ব্যাখ্যা:

এখানে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের সময় মদীনায়

যে সকল য়াহূদী ছিল তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের সময়কার তাওরাতকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাওরাতের হুকুম অমান্য করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদের বলেন: ثم اقررتم —। এখানে ইকরার বা স্বীকৃতি দ্বারা তাদের পূর্বপুরুষদের স্বীকৃতিকে বুঝান হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন: তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে তোমরা তার সাক্ষী। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা পরস্পরে রক্তপাত করবে না, পরস্পরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) অথবা 'ইকরামা ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত বিষয়-গুলো পালন করার জন্য আল্লাহ য়াহূদীদের থেকে অংগীকার নিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন: তোমরা সাক্ষী রয়েছ যে, তাদের নিকট থেকে আমার গ্রহণ করা এ অংগীকার সত্য।

অপর একদল তাফসীরকারের মতে وانتم تشهدون দ্বারা আল্লাহ্ তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তবে মহান আল্লাহ তাঁর এ খবরটিকে সম্বোধনের আকারে বর্ণনা করেছেন। মুফাস্সিরগণ وانتم تشهدون-এর অর্থ করেন وانتم شهود অর্থাৎ তোমরা সাক্ষী আছ। যে সকল মুফাস্সির এ অর্থ করেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) অন্যতম।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন: আমার মতে এ আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যে সকল বংশধর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগ পেয়েছে, তারাও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— واذ اخذنا ميثاقكم দ্বারা বনী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা ঐ সব য়াহূদীকে খিতাব করা হয়েছে, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগকে পেয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক মূসা (আ.) এর যুগের বনী ইসরাঈলদের থেকে তাওরাতের হুকুম পালনের অংগীকার নিয়েছেন। সুতরাং এদের অধঃস্তন সন্তানদের প্রতিও তাওরাতের হুকুম পালন করা তেমন কর্তব্য, যেমন মূসা (আ.)-এর যুগের লোকদের উপর তাওরাতের হুকুম পালন করা কর্তব্য ছিল। অতঃপর তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের এ প্রতিশ্রুতি ভংগ করার এবং নিজেদের কৃত ওয়াদা পালন না করার কারণে তাদের সম্বোধন করে বলা হয়: ثم اقررتم وانتم تشهدون অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা সাক্ষী রয়েছ। এ আয়াত দ্বারা যদি নবী করীম (স.)-এর যুগের য়াহূদীদের সম্বোধন করা হয়, তবে মূসা (আ.)-এর যুগে যে সকল লোক অংগীকার করেছে অথবা তাঁর পরবর্তী যুগে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে অথবা তাওরাত গ্রন্থের সত্যতার প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা সবাই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, আল্লাহ ثم اقررتم وانتم تشهدون এবং এ ধরনের অপরাপর আয়াত দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বাদ দিয়ে অপর কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেন নি। এ ছাড়া আয়াতটিও সকল লোককে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা বহন করে। বিষয়টি এরূপ হলে কারো পক্ষে এ দাবী করা সঠিক নয় যে, এর দ্বারা বিশেষ কিছু লোককে বুঝান হয়েছে—সকলকে বুঝান হয়নি। পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم-এর হুকুমও অনুরূপ। কারণ, আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তীরা এ সকল কাজ করত এবং তাদের পরবর্তী যে সকল লোক হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগ পেয়েছে, তারাও এসব কাজ করত।

(৮৫) ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ زتَظٰهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسٰرٰى تُفٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ط أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

(৮৫) তোমরাই তারা যারা একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বের করে দিচ্ছ। তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমা লংঘন দ্বারা পরস্পর পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও অথচ তাদের বের করে দেওয়াই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর। সুতরাং তোমাদের যারা একাজ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ ثم انتم هؤلاء-এর দুটি বিশ্লেষণ হতে পারে। প্রথমত, এখানে حرف ندا—يا-টি উহ্য আছে। বাক্যটি يا هؤلاء অর্থ বুঝায় বলে يا আহবানসূচক অক্ষরকে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন অপর একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ يوسف اعرض عن هذا (হে য়ুসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর। সূরা য়ুসুফ, আয়াত ২৯)। এখানে يوسف শব্দের পূর্বে يا আহবানসূচক অক্ষর উহ্য রয়েছে। এ বিশ্লেষণ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, হে বনী ইসরাঈলের য়াহূদী সম্প্রদায়! আমি তোমাদের থেকে অংগীকার নিয়েছি যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না, পরস্পর পরস্পরকে ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করবে না। তোমরা এ কথাগুলো মেনে চলার স্বীকৃতি দিয়েছ এবং তোমরা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছ যে, এ ওয়াদা

পালন করা তোমাদের কর্তব্য। অথচ এর পর তোমরা পরস্পরকে কতল করেছ এবং একদল অপর দলকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছ।

এ অন্যায় ও বাড়াবাড়ির কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ। تظاهر অর্থ تعاون বা পরস্পরকে সাহায্য করা। تظاهر শব্দ ظهر থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ পিঠ। সাহায্য দ্বারা একজন অন্য জনের পৃষ্ঠপোষকতা করে বলে একে আরবীতে تظاهر বলা হয়। এটি باب تفاعل-এর صيغه। অর্থাৎ এক জনের পিঠ অপর জনের পিঠের সাথে হেলান দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, আয়াতের অর্থ, তোমরা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করছ। এখানে انتم ও تقتلون-এর মাঝে هؤلاء শব্দকে আনা হয়েছে। 'আরবী ভাষায় এ ধরনের বাক্য বিশুদ্ধ। যেমন আরবরা বলে থাকে انا ذا اقوم এবং انا هذا اجلس—। যখন انا هذا اجلس বাক্য বিশুদ্ধ, তখন انت ذاك تقوم বাক্যও বিশুদ্ধ হবে।

কোন কোন বসরাবাসী বিশেষজ্ঞের মতে, এখানে هؤلاء শব্দকে انتم-এর অর্থকে জোরদার এবং সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা বলেন ঃ انتم সর্বনামটি যদিও সম্বোধিত একটি দলের প্রতি ইংগিত বহন করে, তবুও هؤلاء এবং اولى দ্বারা তাকে জোরদার করা বৈধ। 'আরবী কবিতায় এর উপমা পাওয়া যায়। যেমন কবি খুফাফ বিন নুদ্বাহ্ লিখেছেন—

اقول له والرمح يأطر متنه + تبين خفافا انني انا ذالكا

পবিত্র কুরআনের আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ্ ইরশাদ করেন— حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم

এ আয়াতে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ নিয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে وانتم تشهدون-এ কাদের সম্বোধন করা হয়েছে তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, য়াহূদীরা মুশরিকদের সাথে মিলে তাদের ভাই-স্বজনদের হত্যা করত, ঘর-বাড়ী থেকে তাদের নির্বাসিত করত। অথচ তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ্ পাক এভাবে রক্তপাত করা হারাম করেছেন এবং নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা তাদের উপর ফরয করেছেন। য়াহূদীরা মদীনায় দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বানূ কায়নুকা গোত্র খাযরাজ গোত্রের সাথে আঁতাত করে। অপর পক্ষে বানূ নাযীর ও কুরায়জাহ আউস গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব করে। আউস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হলে বানূ কায়নুকা খাযরাজ গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করে এবং নাযীর ও কুরায়জাহ আউস গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। এ যুদ্ধে তারা নিজেদের বন্ধু গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে নিজেদের ভাইদের রক্তপাত করত। আউস এবং খাযরাজ গোত্র ছিল মুশরিক। তারা মূর্তিপূজা করত। তারা জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান, কিয়ামত, কিতাব, হারাম এবং হালাল সম্পর্কে জানত না। যুদ্ধ অবসানের পর তাওরাতের নির্দেশ অনুসারে তারা নিজেদের গোত্রীয় লোকদের বিপক্ষ দল থেকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনত। বানূ কায়নুকা তাদের যে সব লোক আউস

গোত্রের হাতে বন্দী হতো, তাদের মুক্তিপণ দিত আর নাযীর এবং কুরায়জাহ গোত্র তাদের যে সব লোক খাযরাজ গোত্রের হাতে বন্দী হতো, তাদের ফিদিয়া দিত। মহান আল্লাহ্ পাক তাদের এ কর্মের প্রতি সতর্ক করে বলেনঃ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض। (তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনছ এবং অপর কিছু অংশকে অস্বীকার করছ?)। অর্থাৎ তাওরাতের নির্দেশ অনুসারে একবার ফিদিয়া দিচ্ছ, আবার তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের লোকদের হত্যা করছ। তাওরাতে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা হত্যা কর না, কাউকে ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত কর না। আর এ সব কাজে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের মতলবে মুশরিক এবং মূর্তিপূজকদের সাহায্য কর না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ আমার পাওয়া তথ্য অনুসারে আউস এবং খাযরাজের সাথে য়াহূদীদের উপরোল্লিখিত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (র.) وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون.... تشهدون-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ্ পাক তাওরাত গ্রন্থে বনী ইসরাঈলদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করবে না এবং বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে গোলাম অথবা দাসী অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে ক্রয় করে আযাদ করেদেবে। কুরায়জাহ গোত্র ছিল আউস গোত্রের বন্ধু এবং বনী নাযীর ছিল খাযরাজ গোত্রের বন্ধু। অতঃপর তারা সামীর (سمير) যুদ্ধে পরস্পর লড়াই করে। বানূ কুরায়জাহ তাদের বন্ধু গোত্রের সমন্বয়ে বানূ নাযীর এবং তাদের বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আর নাযীর গোত্র কুরায়জাহ এবং তাদের বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করে তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে এবং তাদের নির্বাসিত করে। অতঃপর তারা (বানূ কুরায়জাহ ও বানূ নাযীর) সম্মিলিত হয়ে উভয় গোত্রের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই করে। তাদের এ কার্যকলাপে 'আরবরা তাদের তিরস্কার করে বলেঃ "তোমরা কি ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই কর, অতঃপর মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই কর?" এতে তারা জবাব দেয়, আমাদেরকে মুক্তিপণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং লড়াইকেও হারাম করা হয়েছে। তাদের তখন আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তোমরা কেন লড়াই করছ? তারা বলেঃ "আমাদের বন্ধুরা লাঞ্ছিত হোক, এতে আমরা লজ্জা বোধ করি।" তাদের এ ধরনের আচরণের প্রতি তিরস্কার করে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ط

(অতঃপর তোমরাই নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোককে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করছ, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে দল পাকাচ্ছ।)

হযরত ইবন যায়দ (র.) বলেন, কুরায়জাহ এবং নাযীর ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি গোত্র ছিল। তারা ছিল কিতাবধারী। আউস এবং খাযরাজও ছিল দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম গোত্র। অতঃপর তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। এতে কুরায়জাহ এবং নাযীর গোত্রদ্বয় এ ভাবে বিভক্ত হয়। বানূ নাযীর খাযরাজ গোত্রের পক্ষ

অবলম্বন করে এবং কুরায়জাহ আউস গোত্রের সাথে আঁতাত করে। এরপর তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং একে অপরকে হত্যা করে। এ প্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

অপর কয়েকজন তত্ত্বজ্ঞানী আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেমন, হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ বনী ইসরাঈলের কোন গোত্র দুর্বল হলে অন্যরা তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করত। অথচ, তাদের থেকে অংগীকার নেওয়া হয়েছে যে, তারা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করবে না। عدوان শব্দ فعلان-এর ওযনে গঠিত। এটি تعدى থেকে উদ্ভূত। কোন ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করলে বলা হয় عدا فلان। تظاهرون-এর পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মত-পার্থক্য রয়েছে। কয়েকজন কিরাআত বিশেষজ্ঞ تفاعلون-এর ওযন অনুসারে تظاهرون পাঠ করেন। এ পঠন পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় تاء কে বিলোপ করা হয়েছে। অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ظاء-এর উপর تشديد সহকারে تظّاهرون পাঠ করেন। কারণ, এটা মূলে تتظاهرون ছিল। تاء এবং ظاء-এর مخرج কাছাকাছি হওয়ায় দ্বিতীয় تاء কে ظاء দ্বারা পরিবর্তন করে ظاء কে ظاء-এর মধ্যে ادغام (যুক্ত) করা হয়। এ দুটি পঠন পদ্ধতিতে শব্দের মধ্যে কিছু তারতম্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে এক এবং এ দুটি পঠন পদ্ধতি ইসলামী জগতে অতি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত। অর্থের দিক থেকে অভিন্ন হওয়ায় একটি পাঠ পদ্ধতির উপর আর একটির কোন প্রাধান্য নেই। তবে শব্দকে পূর্ণ রূপ দানের উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছা করলে تشديد যুক্ত পাঠপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ط

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ج -এর ব্যাখ্যাঃ

"তোমাদের নিকট তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসলে তোমরা তাদের মুক্তিপণ প্রদান কর"—এ কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা য়াহূদী জাতিকে সম্বোধন করেছেন। তিনি এ কথা বলে তাদের ধমক দিয়েছেন এবং তাদের কার্যকলাপ যে নিন্দনীয় তা তাদের নিকট পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। তিনি তাদের বলেনঃ তোমাদের থেকে আমরা যে অংগীকার নিয়েছি তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকদের রক্তপাত করবে না, তাদের ঘর-বাড়ী থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করবে না, এরপরও তোমরা একে অপরকে কতল করছ, আবার যাদের কতল করছ, তাদের কেউ তোমাদের শত্রুর হাতে বন্দী হলে বিনিময় দিয়ে তাদের তোমরা মুক্ত করছ। তোমরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছ। অথচ এ তিনটি কাজই অর্থাৎ কতল করা, ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করা এবং নিজেদের লোকদের শত্রুদের হাতে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় ছেড়ে রাখা তোমাদের জন্য হারাম। সুতরাং তোমরা কিভাবে তাদের হত্যা করা বৈধ মনে করছ, অথচ মুক্তিপণ না দিয়ে শত্রুর হাতে ছেড়ে রাখা জায়িয মনে করছ না। প্রকৃতপক্ষে এ সব হুকুম সমভাবে পালন করা তোমাদের

কর্তব্য। কারণ, যেমন তোমাদের ভাইদের শত্রুর হাতে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় ছেড়ে রাখা হারাম, অনুরূপভাবে তাদের কতল করা এবং নির্বাসিত করাও হারাম। তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান গ্রহণ কর? যে কিতাবে আমি তোমাদের উপর বিভিন্ন বস্তু ফরয করেছি, আমার বিধান-সমূহ বর্ণনা করেছি এবং তাতে যে সব বিষয় রয়েছে সেগুলো পালন করার এবং সত্য বলে মেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। পরিণামে, শত্রুর হাতে তোমাদের যে সব লোক বন্দী হয়, তাদের তোমরা বিনিময় দিয়ে মুক্ত করছ। আবার তোমরা এ কিতাবের অপর অংশকে অবিশ্বাস করছ। যেমন তোমরা তোমাদের স্বগোত্রীর এবং স্বধর্মাবলম্বী লোকদের কতল করছ, তাদের বাস-স্থান থেকে তাদেরকে বের করে দিচ্ছ, অথচ এসব তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা এটাও জান যে, কিতাবের কিছু অংশ অবিশ্বাস করার অর্থ আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার ভংগ করা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (র.) বলেনঃ তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান আনছ এবং অপর অংশকে অস্বীকার করছ? যেমন যুদ্ধবন্দীদের ফিদিয়া দিচ্ছ। আর তাদের ফিদিয়া দেওয়া অবশ্যই ঈমান। অপরদিকে তাদের বের করে দেওয়া কুফরী। এরা তাদের ভাইদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিত এবং যখন তাদের শত্রুদের হাতে বন্দী অবস্থায় পেত তখন ফিদিয়া দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করত। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ পাক য়াহূদীদের বলেন যে, তোমাদের কেউ যুদ্ধবন্দী হলে তোমরা তাদের বিনিময় প্রদান কর, আর তোমরা জানো যে, ধর্মীয় দিক থেকে এটা তোমাদের কর্তব্য কাজ। অনুরূপভাবে তাদের নির্বাসিত করাও তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তোমরা কি কিতাবের একাংশের উপর ঈমান আনো এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস কর? অর্থাৎ তোমরা কি কিতাবের উপর ঈমান এনে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করছ এবং কিতাব অস্বীকার করে তাদের নির্বাসিত করছ?

হযরত মুজাহিদ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ তুমি তোমার গোত্রীয় ব্যক্তিকে অপরের হাতে বন্দী অবস্থায় পেলে ফিদিয়া দিয়ে তাকে মুক্ত করছ আর নিজ হাতে তাকে হত্যা করছ। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেনঃ হযরত কাতাদাহ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ গোত্রীয় লোকদের তাদের বাসস্থান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের প্রতি তাদের কুফরী এবং ফিদিয়া দিয়ে তাদের মুক্ত করা তার প্রতি তাদের ঈমানের পরিচায়ক।

হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ বনী ইসরাঈলের কোন গোত্র দুর্বল হলে সবলরা তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিত, অথচ আল্লাহ পাক তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা তাদের রক্তপাত করবে না, তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে নির্বাসিত করবে না। আল্লাহ পাক তাদের থেকে আরও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাদের কোন লোক বন্দী হলে তারা বিনিময় প্রদান করবে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা নিজেদের গোত্রীয় লোকদের তাদের বাড়ী থেকে বের করে দেয়, অতঃপর বন্দী হলে তাদের বিনিময় প্রদান করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা কিতাবের একাংশের উপর ঈমান আনে এবং অপরাংশকে অস্বীকার করে। তারা ফিদিয়ার হুকুম মেনে নেয় এবং ফিদিয়া দান করে। ঘর-বাড়ী থেকে নিজেদের লোকদের বের না করার হুকুম তারা অস্বীকার করে এবং তাদের বের করে। হযরত আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম

(রা) কূফায় জালূতের নিকট গমন করেন। তিনি তখন এমন সব স্ত্রীলোকের বিনিময় মূল্য প্রদান করছিলেন, যাদের নিকট 'আববরা গমন করেনি এবং এমন সব স্ত্রীলোকের বিনিময় প্রদান করেননি, যাদের নিকট 'আরবরা গমন করেছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) তখন তাঁকে বলেনঃ আপনার ধর্মীয় গ্রন্থে কি একথা লিপিবদ্ধ নেই যে, সকল বন্দিনী স্ত্রীলোকের বিনিময় মূল্যই প্রদান করতে হবে? হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ এর অর্থ, যখন তারা তোমাদের নিকট থাকে, তখন তোমরা তাদের হত্যা কর এবং তাদের বাসস্থান থেকে বের করে দাও, আর যখন তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসে, তখন তোমরা তাদের বিনিময় মূল্য প্রদান করে থাক। হযরত 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) থেকে বনী ইসরাঈলের ঘটনায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ বনী ইসরাঈল জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন এ কথা দ্বারা তোমাদেরকেই বুঝান হয়েছে।

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم-এর পঠন পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের কয়েকজন পড়েনঃ أسرى تفدوهم। আর কেউ কেউ পড়েনঃ أسارى تفادوهم। অপর কয়েকজন পড়েনঃ أسارى تفدوهم। অন্যান্য কয়েক জন পড়েনঃ أسرى تفادوهم। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ যিনি أسرى পড়েন, তিনি أسير-এর جمع হিসেবেই এরূপ পড়ে থাকেন। কেননা, যে সব শব্দের একবচন فعيل-এর ওযনে আসে, সেগুলোর বহুবচন এরূপ হয়। যেমন—مريض-এর বহুবচন مرضى, كسير-এর বহুবচন كسرى এবং جريح-এর বহুবচন جرحى আসে। আর যাঁরা أسارى পড়েন তারা فعلان এর বহুবচনের রূপ অনুসারেই এরূপ পড়েন। কেননা, যে فعلان-এর বহুবচন فعالى আসে তার বহুবচন কখনও فعيل-এর বহুবচনের অনুরূপ হয়ে থাকে। যেমন سكران এর বহু বচন سكارى এবং سكرى এবং كسلان এর বহুবচন كسالى এবং كسلى ব্যবহার করা হয়। এ কারণে أسير কে فعلان এর অনুরূপ বিবেচনা করে এর বহুবচন কখনও أسارى এবং কখনও أسرى করা হয়। কারো কারো মতে الأسرى এর অর্থ الأسارى এর অর্থের বিপরীত। তাঁদের মতে الأسرى অর্থ কোন সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছায় অন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা, আর الأسارى অর্থ কোন সম্প্রদায় অন্যের হাতে বন্দী হওয়া, যারা তাদের বন্দী করেছে তারা জোরপূর্বকই তাদের বন্দী করেছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেনঃ আরবদের কারো কারো ভাষার রীতি অনুসারে উপরোক্ত পার্থক্য বোধগম্য নয়। তবে এটা একমাত্র সে ব্যাখ্যা অনুসারেই সম্ভব, যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি অর্থাৎ أسير-এর বহুবচন কখনও فعلى এবং কখনও فعالى-এর ওযন অনুসারে এসে থাকে। কেননা, ভাষাবিদরা سكران এবং كسلان-এর বহুবচনের সাথে أسير এর বহুবচনের সামঞ্জস্যের বিধান করে থাকেন। অতএব, أسرى পড়াই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, 'আরবদের বাক্যে فعيل-এর বহুবচন فعالى প্রসিদ্ধ নয়। তাদের বরং فعيل-এর বহুবচন فعلى-এর ওযনে হওয়াই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। تفادوهم পড়া হলে এর অর্থ হবে, তোমাদের যে সব লোক তাদের নিকট বন্দী হয়, তোমরা তাদের বিনিময় মূল্য প্রদান কর। আর তাদের যে সব লোক তোমাদের নিকট বন্দী হয়ে আসে, তারা তোমাদেরকে তাদের বিনিময় মূল্য প্রদান করে। تفدوهم পড়া হলে এর অর্থ হবে, হে য়াহূদী সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের যে সব লোককে তাদের ঘর-বাড়ী

থেকে বের করে দিয়েছ, তারা যদি যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাদের বিনিময় মূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত কর। অতএব, প্রথমটির তুলনায় এ পাঠ পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ اسرى تفدوهم পাঠ করা। কেননা, য়াহূদীদের শরীআত অনুসারে তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করা তাদের উপর ফরয ছিল। তাদের শত্রুরা তাদের নিকট থেকে ওদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় য়াহূদীদের নিজেদের যুদ্ধবন্দী মুক্ত করতে হতো।

وهو محرم عليكم اخراجهم আয়াতাংশের هو শব্দের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক هو দ্বারা এর পূর্বে উল্লিখিত اخراج এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের একটি দলকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করে থাক, অথচ তাদের নির্বাসিত করা তোমাদের জন্য হারাম। অতঃপর هو محرم عليكم-এর পর পুনরায় اخراج শব্দকে هو-এর তাবীদের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাঃ هو - اسم কে তার নিকটস্থ واو-এর বাহন হিসেবে আনা হয়েছে। কেননা, واو তার নিকট একটি اسم চায়। এ اسم-এর পূর্বে فعل-কে আনার কারণেই 'هو' কে এখানে আনা হয়েছে। কারণ, هو একটি اسم—যেমন ব্যবহার হয়ে থাকেঃ اتيتك اسم টি فعل। চায়। واو একটি اسم কেননা, وابوك قائم -এর অর্থ وهو قائم ابوك -এর পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় واو তার বাহন হিসেবে একটি اسم চায়, তাহলে বাক্য শুদ্ধ হবে। যেমন কোন আরবী কবি বলেন,

فابلغ ابا يحيى اذا ما لقيته + على العيس فى آباطها عرق يبس
بان السلامى الذى بضرية + امير الحمى قد باع حقى بنى عبس
بثوب ودينار وشاة ودرهم + فهل هو مرفوع بما ههنا راس

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যাঃ

তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ আচরণ করবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে? এর অর্থ কেউ কোন ব্যক্তিকে কতল করলে সে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ এবং তাওরাতের হুকুম অমান্য করার কারণে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি অন্যায় ও বাড়াবাড়ি সহকারে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরাতের হুকুম অমান্য করে মুশরিক শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে নিজেদের লোকদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে নির্বাসিত করে, সেও কুফরী করল। جزاء শব্দের অর্থ ছাওয়াব। ছাওয়াব অর্থ নিজস্ব কর্মের বিনিময় এবং প্রতিদান। الخزى। অর্থ লাঞ্ছনা এবং অপমান। فى الحياة الدنيا অর্থ, ইহজগতে এবং আখিরাতের পূর্বে।

য়াহূদীদের নাফরমানির কারণে তাদের কি লাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরকার-গণের একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে এটি হচ্ছে কিসাসের নির্দেশ যা আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার বিনিময়ে কতল করা হবে এবং যালিম থেকে যুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে য়াহূদী জাতি যতদিন তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনবে না, ততদিন তাদের জিয্ইয়াহ্, (جزيه) কর দিতে হবে। এটা তাদের জন্য একটি লাঞ্ছনা। অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, তাদের ইহজগতের লাঞ্ছনা হচ্ছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বানূ নাযীর গোত্রকে প্রথম বারের মত মদীনা থেকে নির্বাসিত করা এবং কুরায়জাহ গোত্রের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা ও তাদের সন্তানদের বন্দী করা। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ-এর ব্যাখ্যাঃ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক নাফরমানদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করবেন, যা তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের অর্থ প্রসংগে বলেনঃ কিয়ামতের দিন তাদেরকে দুনিয়ার 'আযাবের তুলনায় অধিক কঠিন 'আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ এ মত সঠিক হতে পারে না। কেননা, এটা হতে পারে না যে, আল্লাহ পাক তাদের এ খবর দিবেন যে, তাদের দুনিয়ায় প্রদত্ত আযাবের অনুরূপ কঠিন 'আযাব দেওয়া হবে। এ কারণেই العذاب এর মধ্যে الف ও لام আনা হয়েছে। এ الف ও لام—جنس (জাতি) অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ 'আযাবের একটি নির্দিষ্ট প্রকার নয়, বরং সকল প্রকার আযাবই বুঝিয়ে থাকে।

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ০-এর ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াতের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে নানা মত রয়েছে। কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ ياء সহকারে عما يعملون পড়েন। এ কিরাআত অনুসারে এটি সংবাদ প্রদানকারী একটি বাক্য। অর্থাৎ এ খারাব কাজের বিনিময়ে তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই পাবে না। অতঃপর আখিরাতে তাদের কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ تاء সহকারে عما تعملون পড়েন। এ অবস্থায় এটি সম্বোধনকারী বাক্য হবে। এ পঠন পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা কি কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান আন এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর? হে য়াহূদী জাতি! তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। উক্ত দুটি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে আমার নিকট يعملون পাঠ করা অধিক পসন্দনীয়। কারণ, এতে এর পূর্ববর্তী অংশের সাথে অধিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে। পূর্ববর্তী অংশ হচ্ছেঃ فما جزاء من يفعل ذالك منكم এবং ويوم القيمة يردون — এ অবস্থায় সকল فعل-ই غائب-এর রূপ হবে। আর افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض — عما تعملون থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে তার সাথে সামঞ্জস্য থাকার চেয়ে নিকটবর্তী অংশের সাথে সামঞ্জস্য থাকাই উত্তম। দ্বিতীয় পাঠ পদ্ধতিটিকে বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে।

وما الله بغافل....-এর অর্থ আল্লাহ তাদের সকল অপকর্মের সংরক্ষণ ও হিফাযত করেন এবং সে অনুযায়ী তিনি তাদের আখিরাতে শাস্তি দেবেন এবং দুনিয়াতেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন।

(৮৬) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○

(৮৬) তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

এখানে اولئك দ্বারা এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কিতাবের একাংশের উপর ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী তারা তাদের য়াহূদী যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্ত করে। তারা কিতাবের অপর অংশ অস্বীকার করে। ফলে, তাদের ধর্মাবলম্বী এমন লোকদের তারা হত্যা করে, যাদেরকে হত্যা করা তাদের জন্য হারাম এবং তারা এমন লোকদের তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়, যাদের বের করা আল্লাহ পাক তাদের উপর হারাম করেছেন। তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ হাকীম তাদের থেকে যে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা ভংগ করেই তারা এসব কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে বলেন যে, এরা তাদের স্বধর্মীয় দুর্বল মূর্খ এবং বোকা লোকদের উপর ইহকালীন নেতৃত্বকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তারা তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ঈমানের বদলে ক্রয় করেছে। তারা এ কুফরীর স্থলে যদি ঈমান আনত, তবে স্থায়ীভাবে জান্নাত লাভ করত। আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেনঃ "তারা পরকাল বিক্রি করে দুনিয়ার জীবন খরীদ করে নিয়েছে," কারণ, তারা দুনিয়ায় আল্লাহ্ পাকের সাথে কুফরী করে আখিরাতের এমন নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন গ্রহণ করেছে যা তিনি ঈমানদারদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করে তাদের পরকালীন নিয়ামতের অংশের বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ জীবন খরীদ করেছে। এ প্রসংগে হযরত কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ তারা আখিরাতের অনেক বস্তুর বিনিময়ে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুকে পসন্দ করেছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ অতঃপর আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, যেহেতু তারা আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য ত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের সাথে কুফরী করাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং দুনিয়ার সামান্য বস্তুর পরিবর্তে পরকালীন নিয়ামতের অংশ বিক্রয় করেছে, সুতরাং আখিরাতের নিয়ামতে তাদের কোন অংশই নেই এবং তাদের আখিরাতের শাস্তি কিছু মাত্র হ্রাস করা হবে না। কারণ, আখেরাতে এমন ব্যক্তির শাস্তিই হ্রাস করা হবে, যার আখিরাতের নিয়ামতে অংশ রয়েছে।

আখিরাতের নিয়ামতে এ সব ব্যক্তির কোন প্রকার অংশ নেই। কারণ, তারা দুনিয়ার সামগ্রীকে আখিরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছে।

ولا هم ينصرون অর্থ আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কেউ নিজের শক্তি-সামর্থ, সুপারিশ বা অন্যকিছু দিয়ে সাহায্য করবে না।

(৮৭) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ○

(৮৭) এবং নিশ্চয়ই মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপর পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ ?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ-এর ব্যাখ্যাঃ

اتينا موسى الكتاب। অর্থ, আমরা মূসা (আ.)-এর নিকট কিতাব নাযিল করেছি। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেনঃ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, الايتاء শব্দের অর্থ الاعطاء। অর্থাৎ দান করা। মূসা (আ.)-কে আল্লাহ যে কিতাব দিয়েছেন, তার নাম 'তাওরাত'।

قفينا শব্দের অর্থ, আমরা একজনকে আর একজনের পিছনে পাঠিয়েছি। যেমন একজন আর একজনের পিছনে তার পদাংকানুসরণ করে চললে বলা হয়ঃ قفوت الرجل — يقفوا শব্দ القفا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গ্রীবা। এ কারণেই কারো ঘাড়ের পশ্চাতে দাঁড়ালে বলা হয়ঃ قفوت فلانا —। যেমন কারো পিছনে পিছনে গেলে বলা হয় د برته —।

من بعده অর্থ, মূসা (আ.)-এর পর। بالرسل অর্থ আম্বিয়া। এ শব্দ দ্বারা রাসূলদের একটি জামাতকে বুঝায়। যেমন এক হলে বলা হয়ঃ هو رسول এবং অনেকজন হলে বলা হয়ঃ هم رسل —। অনুরূপভাবে একজন ধৈর্য ধারণকারী হলে বলা হয়, هو صبور —। একটি দল হলে বলা হয় هم قوم صبر —। এ ভাবে একজন শুক্‌রগুযারের ক্ষেত্রে বলা হয় هو رجل شكور এবং একটি দলের ক্ষেত্রে বলা হয়, هم قوم شكر —।

وقفينا من بعده بالرسل অর্থ, একই শরীঅত, একই ধর্মীয় বিধান ও পদ্ধতির উপর আমি ক্রমাগত রাসূল পাঠিয়েছি। কেননা, হযরত মূসা (আ.)-এর পর থেকে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যত রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি নির্দেশ ছিল যে,

তারা যেন বনী ইসরাঈলকে তাওরাত কায়েম করার, তাওরাতের উপর 'আমল করার হুকুম দেয় এবং তাওরাতের যাবতীয় আহকাম মেনে চলার জন্য আহবান করে। আর এ জন্যই বলা হয়েছে, আমি মূসার পর ক্রমাগত রাসূলগণকে তাদের স্ব স্ব পদ্ধতির উপর পাঠিয়েছি।

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে البينات বলতে এমন সব দলীল-প্রমাণকে বুঝান হয়েছে, যা মহান আল্লাহ 'ঈসা (আ.)-কে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ দান করেছেন। যেমন—মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য নিদর্শন, যা আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর মর্যাদার কথা প্রকাশ করে এবং তাঁর সত্যবাদিতা ও নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করে।

এ প্রসংগে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা 'ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ.)-কে যে [illegible] দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ মৃতকে জীবিত করা, কাদা দিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে ফুঁ দেওয়া এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে সে পাখির উড়ে যাওয়া, রোগ মুক্ত করা, তাঁর উম্মতরা তাদের ঘরে যে সব বস্তু গোপনভাবে জমা করে রাখত, এমন অনেক অজানা ও গোপন বস্তুর খবর দেওয়া এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রেরিত ইনজীল গ্রন্থের মাধ্যমে তাওরাতের যে সব বিষয় রদ করেছেন, তা প্রকাশ করা।

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ايدناه অর্থ, আমি তাকে শক্তিশালী করেছি, অতঃপর সাহায্য করেছি। হযরত দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ايدناه অর্থ, আমি তাকে সাহায্য করেছি। এ থেকে বলা হয় ايدك الله অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন ও শক্তিশালী করুন। শক্তিধর ব্যক্তিকে বলা হয়ঃ هو رجل ذو ايد و ذو آد। এর দ্বারা শক্তিশালী বুঝানো হয়েছে। কবি আজ্জাজ লিখেছেনঃ من ان تبدلت بادى ادا অর্থাৎ আলোচ্য পংক্তিতে ايد শক্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক কবিও লিখেছেন ঃ

ان القداح اذا اجتمعن فرامها + بالكسر ذو جلد و بطش ايد

এখানেও ايد শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

روح القدس-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কয়েকজন তাফসীরকারের মতে এখানে روح القدس শব্দদ্বয় দ্বারা জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। অপরাপর তাফসীরকারগণের বক্তব্য হলো ঃ

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা 'ঈসা (আ.)-কে যে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)। হযরত সুদ্দী (র.) বলেছেন, তিনি হলেন জিবরাঈল (আ.)। হযরত দাহ্‌হাক (র.) বলেছেন ঃ রূহুল কুদুস দ্বারা জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত রবী (র.) বলেছেন, 'ঈসা (আ.)-কে জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং তিনিই রূহুল কুদুস। হযরত শাহার ইবন হাওশাব আল-আশ'আরী (রা.) বলেছেন, একদা এক দল য়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স.)-কে রূহুল কুদুস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং বলে ঃ "আপনি আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে খবর দিন।" হযরত নবী করীম (স.) তখন তাদের বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নামে এবং বনী ইসরাঈলের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের নামে তোমাদের শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান যে, এ পবিত্র আত্মা হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)? এবং তিনিই আমার নিকট এসে থাকেন? এর উত্তরে তারা বলে, হ্যাঁ।

অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে আল্লাহ তাআলা হযরত 'ঈসা (আ.)-কে যে রূহ দ্বারা সাহায্য করেন, তা হলো ইনজীল কিতাব। যেমন হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) وايدناه بروح القدس এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত 'ঈসা (আ.)-কে রূহ অর্থাৎ ইনজীল দ্বারা সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা অনুরূপভাবে আল-কুরআনকেও রূহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন এবং ইনজীল উভয়টাই আল্লাহ তাআলার রূহ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا (আমি এ ভাবে তোমার নিকট প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। সূরা শূরা, আয়াত ৫২)।

অন্য কয়েকজন তাফসীরকারের মতে রূহ এমন একটি নাম, যে নামের বরকতে হযরত 'ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতেন। যেমন হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রূহুল কুদুস এমন একটি নাম, যে নামের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতেন। এ সব ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, যাতে বলা হয়েছে যে, এখানে রূহ অর্থ জিবরাঈল (আ.)। কারণ, মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি হযরত 'ঈসা (আ.)-কে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছেন। যেমন, তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتورة والانجيل -

(আল্লাহ বলবেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম! তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে কথা বলার সামর্থ দিয়েছি। আর স্মরণ কর ঐ মুহূর্তকে, যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত এবং ইনজীল শিক্ষা দিয়েছি। সূরা মায়িদা, আয়াত ১১০)। আল্লাহ তাআলা 'ঈসা (আ.)-কে যে রূহ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তা যদি ইনজীল কিতাব হয়, তবে আল্লাহ তাআলার কালাম اذ ايدتك بروح القدس এবং واذ علمتك الكتاب والحكمة والتورة والانجيل অর্থহীন দ্বিরুক্তিসূচক বাক্যে পরিণত হবে। কেননা, তখন এর অর্থ হবে,

যখন আমি তোমাকে ইনজীল দ্বারা সাহায্য করেছি এবং যখন আমি তোমাকে ইনজীল কিতাব শিক্ষা দিয়েছি। ইনজীল কিতাব শিক্ষা দেওয়া না হলে তা সাহায্যের বস্তু হতে পারে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদান ছাড়াই একটি বাক্যের পুনরুক্তি ঘট্ছে। আল্লাহ পাকের কালামে এরূপ অর্থহীন বাক্য থাকতে পারে না। কেননা, তিনি তাঁর বান্দাকে অর্থহীনভাবে কোন সম্বোধন করেন না। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে রূহ দ্বারা ইনজীল কিতাবকে বুঝান হয়নি, যদিও রাসূলগণের নিকট পাঠান আল্লাহ তা'আলার সকল কিতাবই তাঁর পক্ষ থেকে রূহ স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবকে রূহ এজন্যই বলা হয় যে, এগুলো মৃত অন্তরসমূহ সঞ্জীবিত করে, পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত আত্মা ও জ্ঞানসমূহকে সত্যের পথ দেখায়। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর পক্ষ থেকে সরাসরি রূহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কোন পিতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন নি। এ জন্য তাঁকে আল্লাহ পাক রূহ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, হযরত 'ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ.)-কে বিনা পিতায় সরাসরি রূহ দ্বারা সৃষ্টি করার কারণে তাঁকে রূহুল্লাহ বলা হয়েছে। 'কুদ্স্' শব্দের অর্থ পবিত্র।

হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কি অর্থে পবিত্র বা কুদ্স্ বলা হয় এ নিয়ে তাফসীরকারগণ নানা মত পোষণ করেছেন। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্-কুদ্স্ অর্থ বরকত। ইব্ন আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্-কুদ্স্ অর্থ, মহান প্রতিপালক। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) বলেনঃ 'আল-কুদ্স্' দ্বারা এখানে আল্লাহ পাককে বুঝান হয়েছে। আর আল্লাহ স্বীয় 'রূহ' দ্বারা হযরত 'ঈসা (আ.)-কে সাহায্য করেছেন। তিনি আরও বলেনঃ আল্-কুদ্স্ আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি আল্লাহ পাকের কালাম উল্লেখ করেন, هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি মালিক, অতীব মহান পবিত্র। হযরত ইব্ন যায়দ (র.)-এর মতে القدس এবং القدوس সমার্থবোধক শব্দ। হযরত কা'আব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আল-কুদ্স্' আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম।

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا

◎ تَقْتُلُونَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের সম্বোধন করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের বলেন, হে য়াহূদী সম্প্রদায়! আমি মূসাকে তাওরাত দিয়েছি। তার পরে আমি পর্যায়ক্রমে তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। 'ঈসা ইব্ন মারয়ামকে আমি যখন নবী করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি, তখন আমি তাঁকে তাঁর নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণসহ পাঠিয়েছি। আমরা তাঁকে রূহুল কুদ্দুস দ্বারাও শক্তিশালী করেছি। কিন্তু তোমাদের অবস্থা তো এই, যখনই আমার কোন রাসূল তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোন কিছু নিয়ে এসেছেন, তখনই তোমরা নিজেদের বড় মনে করে তাদের বিরোধিতা করেছ। তোমরা তাদের কাউকে অস্বীকার করেছ এবং কাউকে

কতল করেছ। আমার রাসূলগণের সাথে তোমাদের সকল সময়ের আচরণ এ রকমই ছিল। أفكلما শব্দটি যদিও সম্বোধিত বাক্যে تقرير (সুদৃঢ়করণ, সাব্যস্তকরণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে তা খবর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৮৮) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ○

(৮৮) তারা বলেছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত বরং তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাক তাদের লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ-এর ব্যাখ্যা ঃ

غلف-এর পঠন পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এখতিলাফ আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ 'লাম'-এর উপর 'জযম' দিয়ে পাঠ করেন। এটাই সকল এলাকার সাধারণ লোকদের পঠন-রীতি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ 'লাম'-এর উপর 'পেশ' দিয়ে পাঠ করে থাকেন। 'জযম'-এর অবস্থায় এর অর্থ হবে আমাদের অন্তরের উপর আবরণ রয়েছে। এ পাঠ পদ্ধতি অনুসারে غلف হবে أغلف এর বহুবচন। কোন বস্তু আবৃত থাকলে তাকে أغلف বলা হয়। এমনিভাবে গিলাফের অভ্যন্তরে রাখা তরবারিকে বলা হয় سيف أغلف এবং আবরণের মধ্যে রাখা ধনুককে বলা হয় — قوس غلفاء।

হাদীছে এ ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মানুষের অন্তর চার প্রকার। এর মধ্যে তিনি এক প্রকার অন্তরের কথা উল্লেখ করে বলেন— وقلب أغلف معصوب عليه فذلك قلب الكافر অর্থাৎ আর এক প্রকার অন্তর এমন যা আবৃত আর এটা কাফিরের অন্তর।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে قلوبنا غلف অর্থ انها في أغطية। অর্থাৎ, তাদের অন্তর-সমূহ পর্দার মধ্যে আছে। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قلوبنا غلف অর্থ في أكنة অর্থাৎ, আমাদের অন্তরসমূহ পর্দার অন্তরালে রয়েছে। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) কখনো কখনো في أكنة শব্দের পরিবর্তে في غطاء (আবৃত) এবং المطبوع عليها। (মোহরাংকিত) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, عليها غشاوة অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

হযরত আ'মাশ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قلوبنا غلف অর্থ هي في غلف অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহ পর্দার অন্তরালে রয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قلوبنا غلف অর্থ لا تفقه অর্থাৎ তারা নির্বোধ, তাদের অন্তরসমূহ অনুধাবন করতে পারে না। তাঁর থেকে আর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির অনুরূপ,— قلوبنا في أكنة অর্থাৎ কাফিররা বলেঃ আমাদের অন্তরসমূহ পর্দার অন্তরালে রয়েছে। তিনি আরও বলেনঃ এর অর্থ এবং قلوبنا في أكنة সমার্থবোধক।

হযরত আবুল 'আলিয়াহ্ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতাংশের অর্থ, তাদের অন্তরসমূহ বুঝতে পারে না। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 'আরবদের ব্যবহার উল্লেখ করে বলেন যে, তারা বলে الغطاء وهو غلاف عليها অর্থাৎ, কোন বস্তুর উপর ঢাক্না থাকার অর্থ হলো—এর উপর গিলাফ রয়েছে।

হযরত ইব্‌ন যায়দ (রা.) বলেন যে, কোন ব্যক্তির অন্তরে আহবানকারীর আহবান প্রবেশ না করলে সে বলে থাকেঃ قلبي في غلاف فلا يخلص اليه مما تقول অর্থাৎ আমার অন্তর গিলাফে ঢাকা। তাই তোমার কথা সে পর্যন্ত পৌঁছে না। অতঃপর হযরত ইব্‌ন যায়দ (রা.) তাঁর ব্যাখ্যার পক্ষে দলীল স্বরূপ তিলাওয়াত করেনঃ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه (তারা বলে, আমাদের অন্তরসমূহ গিলাফে ঢাকা, সে বস্তু থেকে যেদিকে তোমরা আমাদের আহবান করছ। সূরা হা-মীম আস্‌-সাজদা, আয়াত ৫)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ যে সকল কিরাআত বিশেষজ্ঞ غلف-এর 'লাম'-এ পেশ দিয়ে পাঠ করেন, তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ তারা বলে আমাদের অন্তরসমূহ জ্ঞানের আধার স্বরূপ। তিনি আরও বলেনঃ এদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী غلف হচ্ছে غلاف-এর বহুবচন। যেমন كتاب-এর বহুবচন كتب, حجاب-এর বহুবচন حجب এবং شهاب-এর বহুবচন شهب হয়ে থাকে। এই পঠন পদ্ধতি অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, "আমাদের অন্তরসমূহ জ্ঞানের জন্য সুরক্ষিত এবং জ্ঞানের আধার স্বরূপ।"

অন্যান্য যে সকল মুফাস্‌সির আয়াতের এ অর্থ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফাস্‌সির-গণের মতামত নিম্নরূপঃ

হযরত আতিয়্যাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি قلوبنا غلف-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ قال اوعية للذكر অর্থাৎ তাদের অন্তরসমূহ যিকর-এর জন্য আধার স্বরূপ। অন্য বর্ণনা মতে তিনি للذكر শব্দের পরিবর্তে للعلم শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, مملوءة علما لا تحتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলে যে, তাদের অন্তরসমূহ জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ। তাদের অন্তর মুহাম্মদ (স.) অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেনঃ غلف-এর 'লাম' -এ 'জযম' ছাড়া অন্য কোন পাঠ পদ্ধতি জায়িয হবে না। এর অর্থ হবে, তাদের অন্তরসমূহ পর্দা বা আবরণের অন্তরালে রয়েছে। অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাখ্যাকার এ পাঠ পদ্ধতি বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষেই মত পোষণ করেছেন। এ পাঠ পদ্ধতির বিপক্ষে অর্থাৎ 'লাম' -এর উপর 'পেশ' দিয়ে পাঠকারীদের সংখ্যা অতি সামান্য। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আরও বলেনঃ আমরা অন্য স্থানে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন ও হাদীছের দলীল এবং অভিজ্ঞ তাফসীরকারগণের মতামতের প্রেক্ষিতে যে বিষয়ে তাফসীরকারগণের ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন একক ব্যক্তির ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ বিষয়টি এখানে আর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ-এর ব্যাখ্যাঃ

এ সকল লোকের কুফরী করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করা এবং রাসূলদের আনীত বিষয়সমূহের অস্বীকার ও নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তাদের বিদূরিত, বিতাড়িত, অসম্মানিত এবং ধ্বংস করেছেন। সুতরাং আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন, তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই তোমাদেরকে রহমত থেকে বিদূরিত করা হয়েছে। اللعن। শব্দের মূল অর্থ ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া, অনেক দূরে নিক্ষেপ করা। বলা হয়ে থাকেঃ لعن الله فلانا' يلعنه لعنا وهو ملعون অর্থাৎ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করেছেন, তিনি তাকে লা'নত দেন। সুতরাং সে অভিশপ্ত ব্যক্তি। এ শব্দকে فعول-এর রূপেও বলা হয়। যেমন هو لعين অর্থাৎ সে অভিশপ্ত। 'আরবী কবি শিমাখ ইবন দরার-এর কবিতায় এ শব্দটি مفعول এর রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন—

ذعرت به القطا و نفيت عنه + مكان الذئب كالرجل اللعين -

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেনঃ যে সকল য়াহূদী বলে যে, আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু بل لعنهم الله بكفرهم দ্বারা তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ, بل শব্দ তাদের দাবীকে অস্বীকার করার অর্থ প্রদান করে। কেননা, بل শব্দ বাক্যে একমাত্র অস্বীকারসূচক অর্থে এবং প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। بل -এর এ অর্থ প্রদানের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে য়াহূদীরা বলে, "হে মুহাম্মদ (স.)! তুমি আমাদের যে বিষয়ের দিকে আহবান করছ, তা গ্রহণ করা থেকে আমাদের অন্তর সুরক্ষিত।" আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন যে, বিষয়টি তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নয়, বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের অস্বীকার ও অবমাননার কারণেই তিনি তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদেরকে অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। আর তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ০-এর ব্যাখ্যাঃ

তাফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কারো কারো মতে, এর অর্থ তাদের মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনে থাকে। যেমন হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

فلعمري لمن رجع من اهل الشرك اكثر ممن رجع من اهل الكتاب انما امن من اهل الكتاب رهط يسير -

অর্থাৎ আমার জীবনের শপথ, কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের তুলনায় এমন লোকদের সংখ্যা অনেক বেশী, যারা শিরকের দিক থেকে ঈমানের দিকে ফিরে এসেছে। আর একটি

সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে অতি নগণ্য সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছে।

অপর একদল তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ لا يؤمنون الا بقليل مما في ايديهم অর্থাৎ তাদের নিকট যে গ্রন্থ রয়েছে এ গ্রন্থের অতি অল্প বিধানের প্রতিই তারা ঈমান এনে থাকে। যেমন একটি সূত্রের মাধ্যমে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের মধ্য থেকে নগণ্য সংখ্যক লোকই ঈমান এনে থাকে। হযরত কাতাদাহ (র.) এমত ব্যক্ত করার পর বলেনঃ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন যে, তাদের নিকট যে সকল বিধান রয়েছে, এর সামান্য অংশের প্রতিই তারা ঈমান এনে থাকে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ তাঁর মতে فقليلا ما يؤمنون-এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে কিছু সংখ্যক লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তাদের অভিশপ্ত করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন যে, নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। এ কারণেই قليلا শব্দকে نصب বা যবর দেওয়া হয়েছে। কেননা, তা উহ্য مصدر-এর نعت হয়েছে। মূল বাক্যটি এরূপ হবেঃ بل لعنهم الله بكفرهم فايمانا قليلا ما يؤمنون অর্থাৎ তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিদূরিত করেছেন। তারা অতি কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনে থাকে। তিনি বলেন, আমাদের এ বক্তব্য থেকে এখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। কেননা, তাঁর বক্তব্য অনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হলো—তাদের মধ্য থেকে অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না অথবা তাদের অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান গ্রহণ করে। এ অর্থ অনুসারে قليل শব্দ رفع বা পেশযুক্ত হবে—نصب বা যবরযুক্ত হবে না। কেননা, এ অর্থ অনুযায়ী قليل শব্দ رفع-এর স্থানে অবস্থান করবে। আর যদি قليل শব্দকে نصب দেওয়া হয় এবং ما-এর অর্থ من অথবা الذى হয়, তখন ما কে رفع দেওয়ার মত কোন অবস্থা অবশিষ্ট থাকবে না। আর 'আরবী ভাষার ব্যাকরণ-রীতি অনুসারে এটা জায়িয নেই।

'আরবী ভাষাবিদরা فقليلا ما يؤمنون-এর ما-এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের কারো কারো মতে, এখানে ما অব্যয়ের কোন অর্থ নেই, বাক্যের মধ্যে তা অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যের অর্থ হবে, অতি অল্প বিষয়ের উপর তারা ঈমান আনে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও অনুরূপভাবে ما কে অতিরিক্ত অব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার কোন অর্থ নেই। যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, فبما رحمة من الله لنت لهم (আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)। এ আয়াতে ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। আরবী কবিদের কবিতায়ও ما অব্যয়ের এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন কবি 'মুহালহাল' বলেনঃ

او بابا نين جاء يخطبها + خضب ما انف خاطب بدم

এ পংক্তিতে শেষ অংশের ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। অপর কয়েক জন তত্ত্বজ্ঞানী আয়াতে এবং এ কবিতায় ما অব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে, বক্তার

বক্তব্যের শুরুতে সকল বস্তুকে সাধারণভাবে বুঝাবার উদ্দেশ্যেই এ ما অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, ما এমন একটি কালিমাহ বা শব্দ যা সকল বস্তুকে শামিল করে। এবং এর পরে উল্লিখিত শব্দ দ্বারা বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট করা হয়। এ মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, মহান আল্লাহ তাআলার কালামে এমন কোন শব্দ নেই, যা অর্থবোধক নয়। সুতরাং অর্থবহ নয় এমন শব্দ আল্লাহ তাআলার কালামে থাকা বৈধ নয়।

এখানে কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যে সকল লোক সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেছেন যে, তারা খুব কমই ঈমান আনে, তাদের কি অল্প বা অধিক ঈমান আছে? এর জবাবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা খুব কমই ঈমান আনে। কারো কারো মতে, ঈমান শব্দের অর্থ التصديق অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল য়াহূদ, যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ উপরোল্লিখিত তথ্য পেশ করেছেন, তারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, পুনরুত্থান, ভালো কাজের জন্য আখিরাতে প্রতিদান এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তি ভোগকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নবুওয়াতকে তারা অস্বীকার করে। অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়াতসহ সব কিছুর উপর ঈমান গ্রহণ করা তাদের উপর ফরয ছিল। কারণ, তা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যেও এ কথার উল্লেখ রয়েছে। আর তাই হলো তাদের ঈমান কম আনার বর্ণনা। তারা এর কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে। এগুলো ছিল অধিক। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কেই বলেছেন যে, তারা এর প্রতি কুফরী করে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে, সামান্যতম নির্দেশের প্রতিও তাদের ঈমান ছিল না। এ কারণেই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে قليلا ما يؤمنون অর্থাৎ তারা অল্পই ঈমান আনে। তাদের সম্পর্কে যদিও এ মন্তব্য করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল সমগ্র নির্দেশের প্রতিই অস্বীকারকারী। 'আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারেই তাদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন অতি বিরল বস্তু সম্পর্কে তারা বলে থাকেঃ قلما رايت مثل هذا অর্থাৎ আমি খুব কমই এরূপ দেখেছি। আরবে আর একটি জনশ্রুত প্রবাদ বাক্য হলোঃ مررت ببلاد قلما تنبت الا الكراث و البصل অর্থাৎ আমি এমন শহরে গমন করেছি যেখানে পেঁয়াজ এবং রসুনের ন্যায় গন্ধযুক্ত এক প্রকার সবজি ছাড়া অন্য কিছু খুব কমই উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে যে সকল বাক্যে قلة (স্বল্পতা) দ্বারা কোন বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয় সাধারণত তার অর্থ হয় এর অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুকে নিষেধ করা।

(৮৯) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

(৮৯) আর তাদের নিকট যা আছে, আল্লাহ্‌র নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব আসল যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এ সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জানত তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ-এর ব্যাখ্যা :

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী—ولما جاءهم كتب من عند الله مصدق لما معهم দ্বারা উদ্দেশ করেছেন যে, যখন বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব নাযিল হয়েছে, যে য়াহূদীদের পরিচয় মহান আল্লাহ্ তাআলা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছেন। আর কিতাব দ্বারা কুরআন শরীফ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের নিকট যা রয়েছে, তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী। অর্থাৎ তাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাবের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। যেমন—

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর যখন তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কিতাব আগমন করেছে, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর সে কিতাব হলো কুরআন মজীদ, যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তা তাদের তাওরাত ও ইন্‌জীল যা তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী।

হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আর সে কিতাব হলো কুরআন মজীদ, যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তা তাদের নিকট তাওরাত ও ইন্‌জীলে যা রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী।

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِۦ-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার বাণী "আর তারা ইতিপূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে এরই মাধ্যমে বিজয় কামনা করত"—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, য়াহূদীরা যখন তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কিতাব নাযিল হয়েছে, যা পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী, তারা সে পবিত্র কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ

আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে বিজয় কামনা করত। আর বিজয় কামনার অর্থ হলো, সাহায্য প্রার্থনা করা। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে এরই সাহায্যে আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁরই ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করত। অর্থাৎ তাঁকে নবী রূপে প্রেরণ করার পূর্বে। যেমন, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদাহ আনসারী (র.) শায়খগণ হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের ও তাদের মধ্যে অর্থাৎ আনসার ও য়াহূদীগণ প্রসঙ্গে যারা তাঁদের প্রতিবেশী ছিল, এ ঘটনাটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ "আর যখন তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কিতাব নাযিল হয়েছে, যা তাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী, আর তারা ইতিপূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে এরই সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত" —এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁরা বলেছেন, আমরা বর্বরতার যুগে তাদের উপর বিজয়ী ছিলাম। আমরা ছিলাম পৌত্তলিক এবং তারা ছিল আহলে কিতাব। তখন তারা বলে বেড়াত, অদূর ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে, তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে আ'দ ও ইরাম জাতির লোকদের ন্যায় হত্যা করবেন। অতঃপর যখন মহান আল্লাহ তাআলা কুরায়শ বংশে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন আর আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম, তখন তারা তাঁর অবাধ্য হলো। এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন فلما جاءهم ما عرفوا و كفروا به (অনন্তর যখন তাদের নিকট যে কিতাব কিম্বা যে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগমন করল, যা তারা জ্ঞাত ছিল, তখন তারা তৎসঙ্গে অবাধ্যাচরণ করে)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন য়াহূদীরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর মাধ্যমে আউস ও খাজরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। তারপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরবদের মধ্যে আবির্ভূত করেন, তখন তাঁর সাথে নাফরমানী করে এবং তাঁর সম্পর্কে তারা যা বলেছিল, তা অস্বীকার করে। তখন তাদেরকে হযরত মাআয ইব্‌ন জাবাল রাযিয়াল্লাহ আনহু ও বনী সালমার ভাই বাশার বিন বারা রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন, হে য়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। তোমরাই তো আমাদের বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বিজয় প্রার্থনা করতে। আর আমরা ছিলাম মুশরিক। আর তোমরা আমাদেরকে সংবাদ দান করতে যে, তিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন এবং তোমরা আমাদের নিকট তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে। তদুত্তরে বানূ নযীরের ভাই সালাম বিন মেশকাম বলে, আমাদের নিকট এমন কিছু আগমন করেনি, যা আমরা জ্ঞাত আছি। আর আমরা তোমাদের নিকট যার আলোচনা করতাম, ইনি তিনি নন। তখন আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে তাদের উক্তির জবাবে নাযিল করেন :

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به فلعنة الله على الكافرين ○

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত। আর এর দ্বারা য়াহূদী-দেরকে উদ্দেশ করা হয়েছে। অনন্তর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ

আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন, তখন তারা তাঁকে নিজেদের মধ্য থেকে না পেয়ে তাঁকে অস্বীকার করে ও হিংসা করে।

হযরত আলী আল-আযদী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী— وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, য়াহূদীরা আল্লাহ তাআলার নিকট মোনাজাত করে বলত, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ প্রতিশ্রুত নবীকে প্রেরণ করুন। যাতে তিনি আমাদের ও মানুষের মধ্যে ফায়সালা দান করেন। তারা তাঁর সাহায্যে মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের নিকট বিজয় কামনা করত।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) কর্তৃক আলী আল-আযদী (র.) হতে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا (আর তারা ইতিপূর্বে এরই মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, য়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বিজয় কামনা করত। আর তারা বলত, হে আল্লাহ! এই প্রতিশ্রুত নবীকে প্রেরণ করুন। যাঁর আলোচনা আমরা তাওরাতে দেখতে পাই, যেন তিনি তাদেরকে শাস্তি দান করেন এবং হত্যা করেন। তারপর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন, তখন তারা দেখতে পেল যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে প্রেরিত হননি। তখন তারা আরবদের প্রতি বিদ্বেষ বশে তাঁর অবাধ্যাচরণ করে। অথচ তারা জানে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তারা তাঁকে তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাতে লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به (যখন তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর পরিচয় পেলো, কিন্তু তাঁকে অবিশ্বাস করল)।

আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, য়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করত। তারা বলত, হে আল্লাহ! ঐ নবীকে প্রেরণ করুন, যাঁকে আমরা আমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতে লিপিবদ্ধ পাই, যাতে তিনি মুশরিকদের শাস্তি দান করেন এবং হত্যা করেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন, আর তারা দেখল যে, তিনি তাদের অপর গোত্রের মধ্য হতে এসেছেন, তখন তারা আরবদের প্রতি বিদ্বেষ বশে তাঁর সঙ্গে অবাধ্যাচরণ করে। অথচ তারা যথার্থই জানে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাই আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত—

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به -

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আরবগণ য়াহূদীদের নিকট আসা-যাওয়া করত, তখন তারা এদেরকে কষ্ট দিত। য়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাদের কিতাব

তাওরাতের মধ্যে দেখতে পেতো। আর তারা আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁকে প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করত। যেন তারা তাঁর সঙ্গে আরবদের সহিত যুদ্ধ করতে পারে। তারপর যখন তাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর সাথে অবাধ্যাচরণ করল, যখন তারা দেখল যে, তিনি বনী ইসরাঈলীদের মধ্য হতে নন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আতা (র.)-কে আল্লাহ তাআলার বাণী—وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, য়াহূদীরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে আরবদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত এবং তারা এ আশা পোষণ করত যে, তিনি তাদের মধ্য হতে প্রেরিত হবেন। অনন্তর যখন তাঁর আবির্ভাব হলো, আর তারা দেখল যে, তিনি তাদের মধ্য হতে নন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল। অথচ তারা জানত যে, তিনি সত্য এবং তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ○

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বিজয় কামনা করত। তারা বলে বেড়াত, অচিরেই তাঁর আবির্ভাব হবে। তারপর যখন তাদের নিকট তিনি আগমন করলেন, যা তারা জ্ঞাত ছিল, আর তিনি তাদের অপর দলের মধ্য হতে ছিলেন, তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, তারা ছিলো য়াহূদী। তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল যে, তিনি সত্য নবী এবং তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, তারা তাঁর আবির্ভাব কামনা করত এবং বলত আমরা আরবদের বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করব। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা জ্ঞান করেছে।

ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব (র.) বলেন, আমি ইব্‌ন যায়দ (র.)-কে আল্লাহ তাআলার বাণী—

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, য়াহূদীরা আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত এবং তাদেরকে বলত যে, আল্লাহর শপথ, যদি সেই নবী আগমন করতেন, যাঁর নাম আহমদ, যাঁর সম্পর্কে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালাম সুসংবাদ দান করেছেন, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যকারী হতেন। আর তারা ধারণা করত যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে আগমন করবেন। আর আরবগণ তাদের পার্শ্বে অবস্থান করত। আর তারা তাঁর মাধ্যমে তাদের উপর বিজয় কামনা করত এবং তাঁর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করত। তারপর যখন তাদের নিকট

তিনি আগমন করলেন, যা তারা আগে থেকেই জানত, তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং হিংসা করল। অতঃপর তিনি অর্থাৎ ইব্ন যায়দ (র.) আল্লাহ তাআলার বাণী—

كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

(ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে ফিরে পাওয়ার আশায়। সূরা বাকারা, আয়াত ১০৯) পাঠ করেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গেল, আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় নবী (স.)-এর আগমন সম্পর্কে যা শুনে আসছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের সুযোগ করে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন করে যে, তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণী ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم এর জবাব কোথায়?

এর উত্তরে আরবী ভাষাবিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, এর জবাব নিষ্প্রয়োজনীয়। কেননা, যাদেরকে এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এর অর্থ সুস্পষ্ট। আর কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। আরবগণ যখন তাদের কথা সুদীর্ঘ হয়, তখন তারা এমন বিষয়ের অবতারণা করেন, যার অনেক জবাব থাকে। কিন্তু শ্রোতাদের প্রয়োজন না থাকার কারণে তার উল্লেখ করা হয় না। সে কারণে এর জবাব উল্লেখ করা হয় না। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে এর দৃষ্টান্ত ঃ

ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا

(যদি কোন কুরআন এমন হতো, যদ্দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত, কিংবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত, অথবা তদ্দ্বারা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না, বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ তাআলার অধিকারে রয়েছে। সূরা আর-রাআদ, আয়াত—৩১)

লক্ষণীয় যে, এখানে (لو) শর্তের জবাব উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতের অর্থ হলো—যদি এ কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হতো। আর এভাবে জবাব উল্লেখ না করার কারণ হলো, শ্রোতাগণ তার অর্থ জ্ঞাত। আর এ আলোচ্য আয়াতখানিও এ ধরনের। আর অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী ولما جاءهم كتاب من عند الله-এর জবাব পরবর্তী فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به-এর মধ্যস্থিত ফা (فا)-এর মধ্যে নিহিত। আর উভয় কথার জবাব كفروا به এর মধ্যে নিহিত। এর উদাহরণ যেমন, তোমার কথা لما قمت فلما جئتنا احسنت (আমি যখন দাঁড়িয়েছি, তুমি আমার নিকট এসেছ, ভালোই করেছ।) এর অর্থ তাই যা لما جئتنا اذ قمت احسنت (তুমি যখন আমার নিকট এসেছ যে সময় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তা তুমি ভালোই করেছ।)

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইতিপূর্বে আমরা লানত ও কুফর-এর অর্থ বর্ণনা করেছি, যা বুঝার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াতের সত্যতা তাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সত্যতাও বুঝতে

পেরেছে, এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর সত্যতা অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী— فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به-এর মাধ্যমে য়াহূদীদের প্রসঙ্গে যে সংবাদ দান করেছেন, তাতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অবাধ্যাচরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় ওযর-আপত্তি খণ্ডন করার পরও তারা তাঁর নবুওয়াতে অবিশ্বাস করে।

(৯০) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ০

(৯০) তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, হিংসার কারণে তারা তার প্রতি অবাধ্যাচারণ করেছে। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা গযবের উপর গযবের পাত্র হলো আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী— بئس ما اشتروا به انفسهم-এর অর্থ, তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ। بئس শব্দটি ساء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بِئْسَ মূলত بَئِسَ ছিল, যা بؤس হতে নিষ্পন্ন। আরবী ভাষাবিদগণ بئسما-এর মধ্যকার ما অব্যয়টির অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। কোন কোন বসরী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, তা একাই ইস্ম্ আর পরবর্তী ان يكفروا তার ব্যাখ্যা। যেমন, বলা হয় نعم رجلا زيد—যায়দ উত্তম ব্যক্তি। ان ينزل الله বক্তব্যটি انزل الله-এর পরিবর্তে বর্ণিত হয়েছে। আর কোনো কোনো কূফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, এর অর্থ, بئس الشئ اشتروا به انفسهم ان يكفروا (যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা খুবই নিকৃষ্ট বস্তু। আর তা হলো, তারা কুফর অবলম্বন করেছে।) সুতরাং ما হলো بئس এর ইসম, ان يكفروا তার দ্বিতীয় ইস্ম্। আর তারা ধারণা করেছে যে, ان ينزل الله من فضله-এর মধ্যস্থিত ان কে ইচ্ছা করলে 'পেশ' বিশিষ্ট গণ্য করা যেতে পারে।

অথবা যবর-এর স্থলে গণ্য করা যায়। 'পেশ' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে فبئس الشيء هذا ان يفعلوه (তারা যা করেছে, তা খুবই মন্দ।) আর 'যবর' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা হলো, তারা হিংসার কারণে আল্লাহ পাকের প্রেরিতকে অস্বীকার করেছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم (তাদের আত্মাসমূহ তাদের জন্য যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, তা অতিশয় নিকৃষ্ট। একারণে যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি তাদের জন্য অবধারিত। সূরা মায়িদাহ—৫/৮০) এরই অনুরূপ উক্তি। আরবগণ এরূপ ক্ষেত্রে ما অব্যয়কে একাকী ইসমে তাম-এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করেন। যেমন—فنعما هي ও بئسما انت —। আর তিনি তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে জনৈক কবির একটি পংক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

لا تعجلا في السير وادلوها + لبئسما بطء ولا نرعاها

"ভ্রমণে তাড়াহুড়া কর না, আর তাকে ধীরস্থির কর। অবশ্যই মন্থরতা অতিশয় মন্দ, আমরা তা অনুসরণ করি না।"

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আরবগণ বলে থাকে, بئسما تزويج ولا مهر অর্থঃ মোহরবিহীনবিবাহ অতিশয় নিকৃষ্ট। সুতরাং ما অব্যয়টি صلة সেলা (সম্বন্ধবাচক) ব্যতীত নিজেই ইস্‌ম রূপে গণ্য হয়। এমত পোষণকারী বৈধ মনে করেন না যে, بئس শব্দটির সাথে যুক্ত অব্যয়টি বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট (معرفة موقتة) হবে এবং তার খবর (বিধেয়) ও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। আবার কেউ কেউ এ ধারণা করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত بئسما শব্দটি بئس الشيء اشتروا به انفسهم (যদ্দারা তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা অতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু)-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসাবে ما অব্যয়টি তার صلة-এর সাথে ইসমে মুয়াক্কাত (اسم موقتة) বিশেষ নামবাচক হয়েছে। অর্থাৎ معرفة مؤقتة হয়েছে। কেননা, اشتروا পদটি فعل ماضى (অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়া), যা এ মত পোষণকারীর বর্ণনা মতে ما অব্যয়টির صلة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন তা সুবিদিত অস্থায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুজ্ঞাপক পদ (معرفة مو قتة معلومة) হয়েছে। সুতরাং এ কথার ব্যাখ্যা হবে بئس شراؤهم كفرهم (তারা যে কুফরী ক্রয় করেছে, তা কতই না মন্দ)। আর তা তার মতে অবৈধ। কাজেই তার এই বক্তব্যের অশুদ্ধতা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তাদের মধ্যে অপর কেউ কেউ এ ধারণা করেছেন যে, ان ينزل الله মধ্যস্থিত ان অব্যয়টিকে যের দিয়ে অথবা পেশ দিয়ে পড়া যায়।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী اشتروا به انفسهم-এর দ্বারা এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে যে, باعوا انفسهم (তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে।) অর্থাৎ এখানে اشتراء পদটি بيع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, এ অর্থ পরিগ্রহণ করার সমর্থনে সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি اشتروا به انفسهم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, باعوا انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, এ হিসাবে যে, তারা কুফরী করেছে, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন তার সাথে, আর তা তাদের হিংসার কারণে। আর হযরত মুঁজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি بئسما اشتروا به انفسهم-এর ব্যাখ্যা এ রূপে করেছেন يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بان يبينوه (য়াহূদীরা হককে বাতিলের বিনিময়ে এবং রাসূলুল্লাহ (স.) যা আনয়ন করেছেন, তা বিবৃত করার পরিবর্তে গোপন করার বিনিময়ে বিক্রয় করেছে)। আর আরবগণের মধ্যে এরূপ দস্তুর রয়েছে যে, তারা بعته (আমি তা

বিক্রয় করেছি) অর্থে شريته শব্দ ব্যবহার করে থাকে। আর এখানে اشتروا শব্দটি شريت এর বাবে افتعال হতে রূপান্তরিত। আর আমাদের নিকট আরবদের এরূপ বলার উপমা অনেক আছে যে, তারা بعت (আমি বিক্রয় করেছি) অর্থে شريت। এবং ابتعت। (ক্রয় করেছি) অর্থে اشتريت বলে থাকে।

বলা হয়ে থাকে যে, شارى (সাধক)-কে এজন্য شارى নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু সে তার নিজের জীবন ও জগতকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে। য়াযীদ বিন মাফরাগ আল হুমাইরী তাঁর কবিতায় এ শব্দটি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন—

وشريت بردا ليتني + من قبل برد كنت هامه

আলোচ্য কবিতায় কবি شريت-কে بعت অর্থে ব্যবহার করেছেন।

আর মুসাইয়াব ইব্‌ন আলাস তার কবিতা يعطى بها ثمنا فيمنعها + ويقول صاحبها الا تشترى এখানেও تشترى শব্দটিকে تبيع অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় اشتريت শব্দটি بعت অর্থে এবং شريت শব্দটি ابتعت অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তাদের অর্থাৎ আরবদের মধ্যে বহুল প্রচলিত বাক্য হলো তাই, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর আয়াতে উল্লিখিত بغيا শব্দটির অর্থ হলো تعديا و حسدا -সীমালংঘন ও হিংসার কারণে। যেমন, সাঈদ কর্তৃক হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি بغيا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, حسدا—হিংসার কারণে। তারা হলো য়াহূদী। আর আসবাত কর্তৃক হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি بغيا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

بغوا على محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوه وقالوا انما كانت الرسل من بنى اسرائيل فما بال هذا من بنى اسما عيل فحسدوه ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده-

(তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছে এবং তাঁকে হিংসা করেছে। তারা এরূপ মন্তব্য করেছে, রাসূলগণ তো বনী ইসরাঈল থেকে আগমন করেছেন। এর কি হলো যে ইনি বনী ইসমাঈল থেকে?—তাই তারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে যাঁকে ইচ্ছা নবুওয়াত দান করেছেন। হযরত রবী (র.) কর্তৃক আবুল আলিয়াহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি بغيا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—

يعنى حسدا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده

অর্থাৎ হিংসার কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে যাঁর প্রতি ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ তথা নবুওয়াত দান করেছেন। আর তারা হচ্ছে য়াহূদী, যারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ দীনের সাথে কুফরী করেছে। হযরত রবী (র.) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো—

তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট বস্তু। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত,

www.eelm.weebly.com

তাঁকে সত্যরূপে স্বীকৃতি দান ও তাঁর অনুসরণের আদেশ ইত্যাদি যা কিছু নাযিল করেছেন, সে সবের প্রতি তাদের অবাধ্যাচারিতা। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেছেন। আর তাঁর অনুগ্রহ হলো তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিদর্শনাবলী ও নবুওয়াত। তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেছেন। আর এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তাদের কর্মনীতির কারণ হলো হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি তাদের সীমালংঘন ও বিদ্বেষ, এ জন্য যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে ছিলেন না। এক্ষেত্রে কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, কিরূপে য়াহূদীরা কুফরের বিনিময়ে তাদের নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে? সে কারণেই তাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله

তবে কি কুফরের বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করা যেতে পারে? তদুত্তরে বলা হবে যে, আরবদের পরিভাষায় شراء (ক্রয়) ও بيع (বিক্রয়) হলো মালিক কর্তৃক তাঁর মালিকানাকে অন্যের কাছে প্রদান করা, তার প্রতিপক্ষ থেকে যোগ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। অতঃপর আরবগণ শব্দ দু'টিকে প্রত্যেক বিনিময়-যোগ্য ক্ষেত্র চাই তা মন্দ কিংবা মঙ্গলজনক হোক, সে অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন। যেমন বলা হয়ে থাকে, نعم ما باع به فلان نفسه (অমুক যে বস্তুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করেছে, তা অতি উত্তম বস্তু।) আর بئس ما باع به فلان نفسه (যে বস্তুর বিনিময়ে অমুক তার নিজেকে বিক্রয় করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট বস্তু।) আর এর অর্থ হলো نعم الكسب اكسبها (কতই না উত্তম যা সে উপার্জন করেছে) এবং و بئس الكسب اكسبها (কতো নিকৃষ্ট যা সে উপার্জন করেছে।) যখন সে তা তার চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করেছে। তা মন্দ হোক বা ভালো হোক। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার বাণী بئس ما اشتروا به انفسهم দ্বারা এরূপ অর্থই উদ্দেশ্য। যেহেতু তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার করে নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তাদের পরিচিত ভাষায় সম্বোধন করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন بئس ما اشتروا به انفسهم—যার অর্থ হলো, তারা তাদের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা তাদের আত্মার জন্য যা উপার্জন করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট উপার্জন। আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী আচরণ করে যে বিনিময় গ্রহণ করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট ও মন্দ বিনিময়। যেহেতু তারা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নবীগণের উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি ঈমান আনয়নের যে সাওয়াব লাভ করত, তার বিনিময়ে তারা জাহান্নামের শাস্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছে, যা তাদের জন্য কুফরীর কারণে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

উধৃত এ আয়াতে মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সমগোত্রীয় আরবগণের প্রতি য়াহূদীদের বিদ্বেষ পোষণ করার বিষয়ে আল্লাহ পাক সংবাদ প্রদান করেছেন। যার মূল কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁদের মধ্যে দান করেছেন, য়াহূদীগণের মধ্যে দান করেননি। এ কারণে তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছে। অথচ তারা ভাল ভাবেই জানত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য নবী ও শরীঅত প্রবর্তক রূপে আবির্ভূত একজন রাসূল। সূরা নিসায় এ আয়াতের ন্যায় অপর একটি আয়াত রয়েছে আর তা হচ্ছে ঃ

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ○ اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيرا ○ ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ○ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتينا هم ملكا عظيما - (النساء ٥٤-٥١)

(আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা মূর্তি ও দেবতার প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা পথপ্রাপ্তিতে মু'মিনদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত। এরাই সে সকল লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, আপনি তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না। তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কোন মানুষকে এক কপর্দকও দিবে না। কিংবা আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, তজ্জন্য তারা কি তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে? বস্তুত আমি তো ইবরাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত (নবুওয়াত) দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছি। নিসা ঃ ৫১—৫৪)

أَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইতিপূর্বে আমি আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছি এবং তার অর্থ বর্ণনা করেছি। এখন আমার বক্তব্যের সমর্থনে রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করব। হযরত আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদাহ্ আল-আনসারী বর্ণিত, আয়াতাংশের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে নবুওয়াত দান করেন, এজন্য তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের ব্যতীত অন্যদের মধ্য থেকে নবী করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তারা হলো য়াহূদী। আর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন, তখন তারা দেখল যে, তিনি তাদের ব্যতীত অন্য সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে আরবদের প্রতি হিংসার কারণে। অথচ তারা যথার্থই জানে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল। এবং তারা তা তাওরাত কিতাবে লিখিত দেখেছে। আবুল আলিয়াহ্ (র.) হতে এবং রবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আর হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, য়াহূদী বলত, রাসূলগণ তো বনী ইসরাঈল থেকে আগমন করেন। এখন কি হলো যে, এ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হতে। আর ইবন আবু নাজীহ্ আলী আল-আযদী হতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতখানি য়াহূদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী فباءو بغضب على غضب (সুতরাং তারা গযবের পর গযবের পাত্র হয়েছে)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে য়াহূদী সম্প্রদায় যারা ইতিপূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর ওয়াসীলাহ দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করত এবং তার মধ্যে বিজয় প্রত্যাশা করত। আর তিনি যে আল্লাহ তাআলার নবী হিসেবে আগমন করবেন, সে সংবাদ মানুষকে জানিয়ে দিত। এরপর আল্লাহ যখন তাঁকে নবী-রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তাই তারা আল্লাহ তাআলার গযবের পাত্র হলো। হযরত নবী করীম (স.)-এর প্রতি অবিশ্বাস এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, তাদের কিতাবে তাঁর যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে এ কথা গোপন করা এবং তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করার কারণে তাদের এ শোচনীয় পরিণাম। আর য়াহূদীদের প্রতি ইতিপূর্বেও আল্লাহ পাকের গযব নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার এই ক্রোধ সে ক্রোধের পর পুনরায় তাদের প্রতি নাযিত হলো। পূর্বের গযবটি বিভিন্ন কারণে ছিল, যথা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ.)-কে অস্বীকার করার কারণে অথবা গরুর বাছুর পুজার কারণে অথবা অন্য কোনো পাপাচারের কারণে, যা তারা ইতিপূর্বে করেছে এবং যে জন্য তারা আল্লাহ তাআলার গযবে পতিত হয়েছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি فباءو بغضب على غضب-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, গযবের উপর গযব পতিত হওয়ার কারণ হলো তারা তাওরাতকে বিনষ্ট করেছে, যা তাদের নিকট ছিল। তদুপরি তাদের প্রতি প্রেরিত নবী (স.)-কে তারা অস্বীকার করেছে, সে কারণেও তারা আল্লাহ পাকের গযবে পতিত হয়েছে।

হযরত ইকরামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, "তারা গযবের উপর গযবের পাত্র হয়েছে" এ কথার তাৎপর্য হলো, তারা হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার করেছে।

শা'বী (র.) হতে বর্ণিত যে, মানুষ কিয়ামতের কঠিন দিনে চার স্তরে বিভক্ত হবে ঃ (১) যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (২) যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-কে অবিশ্বাস করেছে কিন্তু মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে। (৩) যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরী করেছে এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিও অবিশ্বাস করেছে। সে গযবের উপর গযবের পাত্র হয়েছে। (৪) আরব মুশরিকগণের মধ্য হতে যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরী করেছে এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সেই কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করেছে, সে একটি গযবের পাত্র হয়েছে।

কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী فباءو بغضب على غضب অর্থ হলো ইনজীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি য়াহূদীদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর গযব এবং কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণেও তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার গযব।

আর হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাওরাতে যে বিকৃতি সাধন করেছে, তজ্জন্য তারা আল্লাহ তাআলার গযবের পাত্র হয়েছে, তদুপরি তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে অস্বীকার করা ও তাঁর আনীত শরীআতের অবাধ্যাচরণ করায় তারা গযবের পাত্র হয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা ইনজীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরী করার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার গযব নিপতিত হয়েছে। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের কুফরীর পরিণতিতে পুনরায় তারা তাঁর কোপগ্রস্ত হয়েছে।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রথম গযব হলো, যখন তারা গোবৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের প্রতি দ্বিতীয় বার আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়েছে, যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে কুফরী করেছে। আর ইব্‌ন জুরায়জ, আতা ও উবায়দ ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণিত, তাঁরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রথমত, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা দীনের বিকৃতি সাধন ও কুফরী আচরণ ইত্যাদি যে কর্মনীতির উপর ছিল তজ্জনিত কারণে। দ্বিতীয়ত, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কারণে। যখন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তারা তাঁর সাথে কুফরী করেছে।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি অত্র কিতাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে গযব অর্থ বর্ণনা করেছি, তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যাদের প্রতি তিনি গযব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে বিরোধকারীদের মতপার্থক্যও বর্ণনা করেছি, যা এখানে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আর আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী وللكافرين عذاب مهين এর অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার শাস্তি অবধারিত। চাই তা আখিরাতে হোক অথবা দুনিয়া ও আখিরাতে। আর مهين 'অপমানকর' শব্দের অর্থ হলো, যাঁর প্রতি এ শাস্তি পতিত হয়, সে লজ্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে যদি কেউ বলে, কোন্ শাস্তি এমন আছে যা অপমানকর নয়? অপমানকর শাস্তি তা, যা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপমানিত ও লজ্জিত করে এবং স্থায়ীভাবে শাস্তিতে রাখে। কখনো তারা অপমান থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানের অধিকারী হয় না। যে অপমানের মধ্যে সে ডুবে আছে, তা থেকে সে এগিয়ে কখনো মর্যাদা ও সম্মানের পথে যেতে পারবে না। আর তা হলো সে শাস্তি, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর যে শাস্তি স্থায়ীভাবে অপমানজনক নয়, তা হলো সেই শাস্তি, যা সংশোধনের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, কোনো মুসলমান চুরি করলে শরীঅতের বিধান মতে তার হাত কেটে দেওয়া হয়। আর তাদের মধ্যে যেমন কেউ যিনা করলে শরীঅতের বিধান মতে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের শাস্তি যা আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের গুনাহের কাফ্‌ফারাহ স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। আর যেমন মুসলমানদের মধ্য হতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আখিরাতে তার অপরাধ অনুযায়ী যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাদেরকে গুনাহের কালিমামুক্ত করার উদ্দেশ্যে। এরপর তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। যদিও উল্লিখিত

প্রক্রিয়াও একটা শাস্তি বিশেষ। কিন্তু তা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে অপমানজনক নয়। কেননা, আল্লাহ পাক তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্যে এ শাস্তি দিয়েছেন। তারপর তাকে উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদায় আসীন করা হবে এবং সে বেহেশতের নিয়ামতরাজির মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

(৯১) وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ۗ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ○

(৯১) এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো তার প্রতি যা আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন। তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করি তার উপর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। অথচ তারা অবিশ্বাস করে তা ব্যতীত অন্য সব কিছুকে। অথচ তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা বর্ণনাকারী। হে রাসূল, আপনি বলুন, তবে তোমরা কেনো ইতিপূর্বে নবীগণকে হত্যা করতে যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে।

وإذا قيل لهم آمنوا .... أنزل علينا-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার বাণী— وإذا قيل لهم (যখন তাদেরকে বলা হয়) এর অর্থ হলো, যখন বনী ইসরাঈল গোত্রীয় য়াহূদীদের উদ্দেশ করে বলা হয়, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হিজরতের সময় বর্তমান ছিল, সে য়াহূদীদেরকে যখন বলা হলো তোমরা ঈমান আনো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি সে কিতাবের প্রতি, যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতের প্রতি, যা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে।

ويكفرون بما وراءه-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার বাণী— ويكفرون بما وراءه-এর অর্থ হচ্ছে ويجحدون بما وراءه এতদ্ভিন্ন অন্য সব কিছুকে তারা অস্বীকার করে। অর্থাৎ তাওরাত ব্যতীত অন্য সব আসমানী কিতাবকে। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে وراء-এর অর্থ হলো, سوى (ব্যতীত)। যেমন উত্তম বক্তব্য দানকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয় ما وراء هذا الكلام شيء (এ কথা ব্যতীত আর

কোন কিছু নেই)। যদ্দ্বারা এ উদ্দেশ্য করা হয় যে, বক্তার নিকট এ কথা ছাড়া তার কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলার বাণী ويكفرون بما وراءه-এর অর্থও অনুরূপ। অর্থাৎ তাওরাত ব্যতীত অন্য কিতাবের সহিত তারা কুফরী করে এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহকেও তারা অস্বীকার করে যেমন, কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ويكفرون بما وراءه-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তৎপরবর্তী কিতাবসমূহের সহিত তারা কুফরী করে। আর আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ويكفرون بما وراءه-এর অর্থ, তৎপরবর্তী কিতাবের সহিত তারা কুফরী করে। অর্থাৎ তাওরাতের পরবর্তী কিতাবের সহিত।

আর রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তৎপরবর্তী কিতাবের সহিত তারা কুফরী করে।

وهو الحق مصدقا لما معهم ط-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার বাণী وهو الحق مصدقا لما معهم (অথচ তা সত্য এবং তাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী)-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য যে সকল কিতাব আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তা সত্য। আর এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর উপদেশবাণী কুরআন মজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন, যা মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।

যেমন সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়াত وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আর তা সত্য এবং তাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী।" এখানে আল্লাহ তাআলা مصدقا لما معهم (তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী) এজন্য বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ তাআলার এক কিতাব অন্য কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করে। তাই ইনজীল ও কুরআন মজীদে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা আর তিনি যে শরীঅত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ রয়েছে। একই ভাবে এ সকল বিষয় সংক্রান্ত আদেশ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল তাওরাতের মধ্যেও উল্লিখিত হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা য়াহূদীদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, যখন তিনি তাদেরকে তাওরাত কিতাব যা মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল এবং অন্য নবীগণের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তা সত্য ও তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী অর্থাৎ সে কিতাব এ কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে ব্যাপারে য়াহূদীগণ মিথ্যারোপ করে থাকে। (তিনি বলেন), আর এ হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, ইনজীল কিতাব ও কুরআন মজীদের প্রতি মিথ্যারোপ করার প্রশ্নে তারা যে অবস্থানে আছে তাওরাতের প্রতি মিথ্যারোপ করার প্রশ্নেও তারা ঠিক একই অবস্থানে রয়েছে। আর তা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি শত্রুতারই সাক্ষ্য বহন করে।

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ০ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তাআলার বাণী قل فلم تقتلون انبياء الله-এর অর্থ হলো, হে মুহাম্মদ (স.)। বনী ইসরাঈল গোত্রীয় য়াহূদীদেরকে বলুন, যখন আপনি তাদেরকে বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তাআলা যা নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনি।' হে য়াহূদীরা ! যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি যা নাযিল করেছেন, তার প্রতি ঈমানদার হও, তবে কেন তোমরা তাঁর নবীগণকে হত্যা করলে? অথচ আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে তাঁদেরকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন। বরং তাতে তোমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করা, অনুগত হওয়া ও তাঁদের প্রতি আস্থা স্থাপনের আদেশ করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে "আমরা ঈমান আনব" তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী রূপে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। যেমন, সুদ্দী(র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অর্থাৎ য়াহূদীদেরকে লজ্জা দিয়ে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরা কেন ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলার নবীগণকে হত্যা করলে? কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে কিরূপে এরূপ বলা হয়েছে فلم تقتلون انبياء الله من قبل কেননা, এ আয়াতাংশে খবরের সূচনা করা হয়েছে (مستقبل) ভবিষ্যত ক্রিয়া বাচক শব্দ দ্বারা অথচ অতঃপর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তদুত্তরে বলা যায় যে, আরবী ভাষাবিদগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বসরার অধিবাসী কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, فلم تقتلون انبياء الله من قبل (তবে কেন তোমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলার নবীগণকে হত্যা করেছিলে?) যেমন, আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন واتبعوا ما تتلوا الشياطين-এর অর্থ হয়েছে واتبعوا ما تلت الشياطين (শয়তানেরা যা আবৃত্তি করেছে, তারা তা অনুসরণ করেছে।) আর যেমন কবি বলেছেন—

ولقد أمر على اللئيم يسبني + فمضيت عنه وقلت لا يعنيني

"আমি সে নিকৃষ্ট লোকটির সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করি, যে আমাকে গালি দেয়। আমি তাকে অতিক্রম করে গিয়েছি এবং বলেছি, আমাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।" এখানে ولقد أمر দ্বারা ولقد مررت অর্থ পরিগ্রহণ করা হয়েছে। আর পরবর্তী উল্লিখিত فمضيت শব্দ দ্বারা তৎপ্রতি ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। কেননা, সে امضى عنه বলে নাই।

আর কেউ কেউ এরূপ ধারণা করেছেন যে, يفعل ও فعل কখনো কখনো বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা তাদের এ মতের সমর্থনে কবির কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। কবি বলেন—

وإني لآتيكم بشكري ما مضى + من الأمر واستيجاب ما كان في غد

উল্লেখ্য যে, এখানে كان في غد বাক্যাংশটি ما يكون في غد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ তারা কবি হুতাইয়্যাঃ-এর নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه + أن الوليد أحق بالعذر

এখানে شهد শব্দটি يشهد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ অন্য এক কবি বলেছেন ঃ

فما أضحى ولا أمسيت إلا + أراني منكم في كوفان

লক্ষণীয় যে, কবি এখানে প্রথমে اضحى তথা ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, অথচ এরপর امسيت বলে অতীত কালজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আর কিছু সংখ্যক কূফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতে فلم تقتلون انبياء الله من قبل। তাদেরকে ভবিষ্যত কাল (مستقبل) জ্ঞাপক ক্রিয়া দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ অতীতকাল (ماضى) বুঝান হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার অতীত কোন কর্মের জন্য কঠোর সমালোচনা করে বলে ঃ ويحك لم تكذب ولم تبغض نفسك الى الناس (তোমার প্রতি পরিতাপ, তুমি কেন মিথ্যা বলেছ এবং মানুষের নিকট নিজেকে হিংসার পাত্রে পরিণত করেছ)। লক্ষণীয় যে, এখানে تكذب ও تبغض শব্দ দুটি যথাক্রমে كذبت ও بغضت অর্থাৎ অতীত কালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة + ولم تجدي من أن تقري به بدا

এখানের لم تلدنى শব্দটি যদিও ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক, কিন্তু তার অতীত কালের অর্থই ধরা হয়েছে। আর জন্মলাভ করা সম্পূর্ণরূপে অতীতকালীন ক্রিয়া। তা এজন্য যে, এর অর্থ সুবিদিত তাই এরূপ ব্যবহার বৈধ হয়েছে। এরূপ ব্যবহার তুমি উমর(রা.)-এর জীবনীতে লক্ষ্য করে থাকবে لم تجده يبقى বাক্যে। যার অর্থ হলো لم تجده ابقاه। যেহেতু উমর (রা.)-এর বিষয় অতীতকালীন হওয়ার প্রশ্নে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না এবং কারো ধারণায় তা ভবিষ্যত কালীন বিষয় হিসাবে বুঝায় না, সেহেতু فلم تقتلون انبياء الله من قبل-এর মধ্যে من قبل-এর সাথে تقتلون-এর ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

যাদেরকে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা হত্যাকারী নয়। তাদের পূর্বপুরুষরাই নবীগণকে হত্যা করেছে, যারা অতীত হয়ে গেছে। এরা সে হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট রয়েছে। তাই তাদের প্রতি হত্যাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

আর আমাদের মতে, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলী ঐসব য়াহূদীকে সম্বোধন করেছেন, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগ পেয়েছে। এ কারণে তিনি তাদেরকে সূরা বাকারা ও অন্যান্য সূরাসমূহে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধন ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহরাজি প্রসঙ্গে এবং তাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক তাঁর অনুগ্রহরাজির অকৃতজ্ঞতা, তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া ও তাদের দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতায় দুঃসাহস দেখান প্রসঙ্গে। আর সে সম্বোধনকে বর্তমানে এ সব ব্যক্তির প্রতিও সম্পর্কিত করেছেন। এর উদাহরণ যেমন আরবদের এক দল অন্য দলকে সম্বোধন করে বলে থাকে, فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذا (আমরা অমুক সময় তোমাদের সাথে এই এই করেছি)। তার فعلتم بنا يوم كذا كذا وكذا (তোমরা অমুক সময় আমাদের সাথে এই এই করেছ।)। যেমন আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, আমি আমার এ কিতাবে এ প্রসঙ্গে একাধিক স্থানে আলোচনা করেছি। এর দ্বারা তারা এখন মনে করে থাকে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের

পূর্বপুরুষের সাথে এসব করেছেন, আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে এরূপ করেছেন। তদ্রূপ এখানেও আল্লাহ তাআলার বাণী فلم تقتلون انبياء الله من قبل-এর অর্থ হলো, "তবে তোমাদের পূর্বপুরুষরা কেন আল্লাহ পাকের নবীগণকে হত্যা করেছিল?" যদিও বক্তব্যটি সম্বোধন-কারিগণকে অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদদানমূলক শব্দ যোগে প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ দানই উদ্দেশ্য। যেমন, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তৎসঙ্গে من قبل শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ হয়েছে। যেহেতু এর অর্থ হচ্ছে قل فلم يقتل اسلافكم انبياء الله من قبل—বলুন, তা হলে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহর নবীগণকে ইতিপূর্বে কেন হত্যা করেছিল? যেহেতু এটা সুবিদিত যে, فلم تقتلون انبياء الله من قبل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওদের পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ দান করা। আর من قبل ইতিপূর্বে শব্দের ব্যাখ্যা হলো من قبل هذا اليوم (আজকের পূর্বে)। অর্থাৎ অতীত কালে। আর আল্লাহ তাআলার বাণী ان كنتم مؤمنين-এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের ধারণা মত তোমরা যদি সত্যাই তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ঈমান রাখ। আর এর দ্বারা য়াহূদীদের মধ্য হতে যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ পেয়েছে, তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে য়াহূদী! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষগণ মু'মিন হয়ে থাকে এবং তোমরা নিজেরা মু'মিন হও, যেমন তোমাদের ধারণা, (তবে কেন তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করেছে?) তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল, امنوا بما انزل الله (আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ঈমান আনয়ন কর।) তখন তারা যেই বলেছে نؤمن بما انزل علينا (আমরা আমাদের উপর অবতীর্ণ শরীঅত বা কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করেছি), ঠিক সে মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক তাঁর নবীগণকে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে তাদেরকে লজ্জা দান করেছেন। কেননা, তারা তাদের পূর্বপুরুষগণের অনুসারী ছিল, যারা নবীগণের হত্যায় জড়িত ছিল। তারা বলেছে যে نؤمن بما انزل علينا (আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করেছি।) আর তারা তাদের কার্যকলাপের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, যদি তোমরা তোমাদের যেমন ধারণা সত্যাই মু'মিন হও, তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করাকে পসন্দ কর? অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষদের হত্যাকার্যে সন্তুষ্ট থাক?

(৯২) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ○

(৯২) এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছেন। তার অবর্তমানে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। তোমরা ছিলে যালিম।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ و لقد جاءكم موسى بالبينات অর্থ, হযরত মূসা (আ.) তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছেন, যা তাঁর সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করে। যেমন তাঁর লাঠি যা মস্ত অজগর সর্পে পরিণত হয়েছে, তাঁর হাত যাকে তিনি প্রত্যক্ষকারীদের জন্য শ্বেতশুভ্র রূপে বের করেছেন, সমুদ্রকে বিভক্ত করা এবং তাঁর যমীনকে শুষ্ক জনপথে পরিণত করা, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদি নিদর্শনাবলী যা তাঁর সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। আর এ সকল মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাকে بينات (স্পষ্ট নিদর্শনাবলী) বলার কারণ, এগুলি তৎপ্রতি দৃষ্টিদানকারীর জন্য এ কথা স্পষ্ট বিবৃত করে দিয়েছে যে, এগুলো মু'জিযা। আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দান না করলে কারো পক্ষে এসব ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। আর البينات শব্দটি بينة-এর বহুবচন যেমন, طيبة-এর বহুবচন طيبات —। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এর মতে আয়াতাংশের অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট হে বনী ইসরাঈল গোত্রীয় য়াহূদীগণ! স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ হযরত মূসা (আ.) তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। যা তার বিষয়সমূহ, তাঁর সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণকারী।

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আর আল্লাহ তাআলার বাণী—ثم اتخذتم العجل من بعده এখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা মূসার পরে গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ। এ অর্থ তখন হবে, যখন من بعده-এর মধ্যকার ه সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝান হয়। আর হযরত মূসা (আ.)-এর পরে এজন্য বলা হয়েছে, যেহেতু হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণে অগ্রসর হয়েছেন, তখনই তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। যেমন, ইতিপূর্বে আমিও এ কিতাবে তার আলোচনা করেছি। আর এও বৈধ হতে পারে যে, من بعده-এর মধ্যকার ه সর্বনামটি দ্বারা তাঁর আগমনকে বুঝান হবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে, নিশ্চয় তোমাদের নিকট হযরত মূসা (আ.) স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ আগমন করার পরেও তোমরা বাছুরের পূজা করেছ। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ جئتني فكرهته যার অর্থ হচ্ছে كرهت مجيئك (আমি তোমার আগমনকে অপসন্দ করেছি।)

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

তোমরা যে গোবৎস পূজা করেছ, তা ছিল অন্যায় কাজ, যা তোমাদের জন্য অনুচিত ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা সমীচীন নয়। আর এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে য়াহূদীদের প্রতি ভৎর্সনা ও তাদেরকে লজ্জা দান করা হয়েছে। আর এতে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে যা করেছে, তা তাদের ক্ষতি বা উপকারের ক্ষমতা

রাখে না। তারা এ কাজ করেছে এমন অবস্থায়, যখন তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন ও দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদন করেন, যা মূসা (আ.)-এর হস্তদ্বয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন। সেগুলি এমন কাজ, যা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে কেউই করতে সক্ষম নয়। আর যা ফিরআউন ও তার সৈন্যদল তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও এবং তার অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও করতে সক্ষম হয়নি। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে এ সংবাদ দান করা যে, তাদের যুগ তার নিকটতম যুগ যখন তারা আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর হুকুমের মধ্য হতে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। আর তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে মিথ্যারোপ করেছে এবং তাদের কিতাবে তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসায় যা উল্লেখ রয়েছে, তা অস্বীকার করা তাদের জন্য পরবর্তী ব্যাপার ছিল হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের শিক্ষাকে অস্বীকার করার তুলনায়।

(৯৩) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৯৩) আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর (পাহাড়)-কে তোমাদের উপরে তুলে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তারা বলল, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। আর তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরসমূহে গরুর বাছুরের প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলুন, যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমাদের ঈমান যা নির্দেশ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার বাণী واذ اخذنا ميثاقكم এর অর্থ, واذكروا (আর স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, خذوا ما اتيناكم —আমি আমার নাযিলকৃত তাওরাতের মাধ্যমে যা নাযিল করেছি, তা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি তোমাদের

নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি তা স্মরণ কর। এ জন্য যে, তাতে আমার যে আদেশ রয়েছে তোমরা সেমত আমল করবে এবং আমি যে সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা হতে বিরত থাকবে। তোমরা দৃঢ়তা ও আগ্রহ সহকারে আমল করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছ। আর তা হলো আমি তোমাদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম।

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী واسمعوا এর অর্থঃ আর তোমরা শোন, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি, আর তা আনুগত্যের সাথে গ্রহণ কর। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ হিসেবে কিছু বললে তার উত্তরে বলে سمعت واطعت —এর অর্থ আমি তোমার নির্দেশ শুনলাম এবং পালন করলাম। যেমন কবি রাজিয বলেছেন—

والسمع والطاعة والتسليم + خير واعفى لبنى تميم

"শুনা, পালন করা ও স্বীকার করে লওয়া বনী তামীমের জন্য উত্তম ও নিরাপদ।" এখানে السمع (শ্রবণ করা) দ্বারা শ্রুত বস্তু গ্রহণ করা এবং যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা উদ্দেশ্য। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার বাণী واسمعوا এর অর্থ যা তোমরা শুনেছ, তা গ্রহণ কর এবং তদুপরি আমল কর।

(আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী বলেন,) সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছি, তাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করবে। আর তোমরা যা শ্রবণ করেছ, তদনুযায়ী আমল করবে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে। আর একারণেই আমি তোমাদের মাথার উপর তূর পর্বতকে উত্থিত করেছি।

আল্লাহ তাআলার বাণী قالوا سمعنا এখানে বক্তব্যটি غائب বা নাম পুরুষের পক্ষ হতে সংবাদদান রূপে উক্ত হয়েছে, অথচ বক্তব্যের সূচনা خطاب বা মধ্যম পুরুষের মাধ্যমে হয়েছিল। এটা তারই আওতাভুক্ত যে সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বক্তব্যের সূচনা যদি ঘটনা বর্ণনা হিসাবে হয়, আরবগণ তাতে خطاب বা মধ্যম পুরুষ যোগে বক্তব্য দান করে অতঃপর তা হতে غائب তথা নাম পুরুষ সম্পর্কে সংবাদদানমূলক বক্তব্যে ফিরে আসে, অতঃপর خطاب বা মধ্যম পুরুষের প্রতি সম্বোধনরূপে বক্তব্য পেশ করে, যেমন ইতিপূর্বে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে ইলতিফাত (التفات) বা বক্তব্যের গতি পরিবর্তন বলা হয়। তদ্রূপ এ আয়াতেও তাই করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলার বাণী واذ اخذنا ميثاقكم এর অর্থ قلنا لكم فاجبتموا (আমি তোমাদেরকে বলেছি, অতঃপর তোমরা উত্তর দিয়েছ)। আর আল্লাহ তাআলার বাণী قالوا سمعنا (তারা বলেছে, আমরা শ্রবণ করেছি) অর্থ আল্লাহ তাআলার তাওরাতে যা আছে তদনুযায়ী আমল করা ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য য়াহূদীদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে খবর দেওয়া। আর খবরটি হলো, যখন তাদেরকে এ আদেশ করা হয়েছে, তখন তারা বলেছে যে, আমরা আপনার কথা শুনেছি এবং আপনার আদেশ অমান্য করেছি।

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم (আর তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরসমূহে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে) এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এর অর্থ, واشربوا في قلوبهم حب العجل (তাদের অন্তরসমূহে গোবৎসের প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে)। অর্থাৎ العجل (গোবৎস) শব্দ দ্বারা حب العجل (গোবৎসপ্রীতির) অর্থ পরিগ্রহণ করা হয়েছে। যাঁরা এ বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীলঃ হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি واشربوا في قلوبهم العجل এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اشربوا حبه حتى خلص ذالك الى قلوبهم--তার আকর্ষণ তাদের অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছেছে। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اشربوا حب العجل بكفرهم তাদের কুফরীর কারণে তারা গরুর বাছুরের প্রীতিতে মত্ত হয়ে গেছে। হযরত রবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اشربوا حب العجل في قلوبهم --তাদের অন্তরসমূহে তারা গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করেছে। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ, তারা সেই পানি পান করেছে, যাতে বাছুরের ছাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যাঁরা এমত পোষণ করেন তাদের কথাঃ হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসেন, তখন তিনি সে বাছুরটিকে ধরলেন, যার নিকট তারা উপাসনারত ছিল এবং তিনি সেটাকে যবাহ করে পুড়িয়ে ফেললেন। অতঃপর ছাইগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। ফলে সমুদ্রের কোন অংশ বাকী রইল না যাতে ছাই পৌঁছায়নি। তারপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, সমুদ্রের পানি হতে পান কর। তখন তারা পান করল। যে উক্ত বাছুরকে ভালবাসত, তার বেলায় সে পানি স্বর্ণের রূপ ধারণ করল। এমর্মেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন واشربوا في قلوبهم حب العجل بكفرهم--তাদের অন্তরসমূহে তাদের কুফরীর কারণে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ হতে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন বাছুর ভস্ম করে ফেলা হয়েছে, তখন সেগুলোকে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর তারা পানির প্রবাহের দিকে অগ্রসর হয়ে পেট ভরে পানি পান করেছে। এতে তার প্রতিক্রিয়ায় তাদের মধ্যে কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম হলো যাঁরা এর ব্যাখ্যায় واشربوا في قلوبهم حب العجل (তাদের অন্তরসমূহে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করেছে।) এই বক্তব্য দান করেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যা। কেননা, পানি সম্পর্কে এরূপ বলা হয় না যে اشرب فلان في قلبه (অমুক তার অন্তরে পানি সিঞ্চিত করেছে।) বরং প্রীতি বা ভালবাসা সম্পর্কেই এরূপ বলা হয় যে, اشرب قلب فلان حب كذا (অমুকের অন্তর অমুকের ভালবাসা সিঞ্চিত করেছে।) এ অর্থে যে, সে তার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছে এমন কি তা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তার অন্তরের সাথে মিশে গেছে। যেমন কবি যুহায়র বলেছেন —

فصحوت عنها بعد حب داخل + والحب يشربه فؤادك داء

(আমি প্রগাঢ় ভালবাসার পর তা হতে সুস্থ হয়েছি। আর ভালবাসা এমন নিরাময়ী ওষুধ, যা তোমার অন্তর পান করে—

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিন্তু আয়াতে الحب (ভালবাসা) শব্দটি এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, শ্রোতার বোধশক্তিই বক্তব্যের অর্থ বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু একথা সুবিদিত যে, অন্তর গরুর বাছুর পান করে না। আর অন্তর তা থেকে যা পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করে তা হলো, তার প্রীতি ও ভালবাসা, যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر

"আর তাদেরকে সেই জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, যারা সমুদ্রের তীরে বসবাস করত।" (সূরা আ'রাফ ৭/১৬৩)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها

"যে জনপদে আমরা ছিলাম, তার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও।" (সূরা য়ূসুফ ২২/৮২)

অর্থাৎ আয়াত দুটিতে اهل القرية এর স্থলে শুধু قرية উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রোতার বোধশক্তি এতটুকু বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলেই اهل শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও حب العجل এর স্থলে শুধু العجل উল্লেখ করে শ্রোতার বোধশক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আর যেমন কোন কবি বলেছেন—

الا انني سقيت اسود حالكا + الا بجلي من الشراب الا بجل

লক্ষণীয় যে, এখানে اسود দ্বারা سم اسود উদ্দেশ্য। আর سم اسود এর স্থলে শুধু اسود উল্লেখ করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু শ্রোতা এটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, কবি سقيت اسود বলে কি উদ্দেশ্য করেছেন। আর কবিতাটিকে কোন কোন সংস্করণে الا انني سقيت اسود سالخا রূপেও উধৃত করা হয়েছে।

আর আরবদের মধ্যে এরূপ বলার প্রচলন রয়েছে যে, তারা বলে থাকে اذا سرك ان تنظر الى السخاء فانظر الى هرم او الى حاتم

"তুমি যদি দানশীলতা দেখতে চাও, তবে হারম নামক ব্যক্তি অথবা হাতিম তাঈর প্রতি লক্ষ্য কর।" এভাবে তারা فعل (ক্রিয়ার) উল্লেখ না করে اسم এর (বিশেষ্যের) উল্লেখ যথেষ্ট মনে করেছেন। আর যখন সে বিশেষ্যটি বীরত্ব বা দানশীলতায় কিম্বা এতদ্‌সদৃশ গুণের সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর এ প্রসঙ্গে যেমন কোন কবি বলেছেন—

يقولون جاهد يا جميل بغزوة + وان جهادا طيىء وقتالها

লক্ষণীয় যে, এখানে غزوة طيىء-এর স্থলে শুধু طيىء-এর উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অর্থ হলো, হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি বনী ইসরাঈল গোত্রীয় য়াহূদীদেরকে বলুন, তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে সম্পর্কে আদেশ করে, তা কতই না খারাপ!

আর তা হলো, যদি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নবী-রাসূলগণকে হত্যা করতে, তাঁর কিতাবের প্রতি মিথ্যারোপ করতে, তাঁর পক্ষ হতে নবী-রাসূলগণ যে সকল বিধান আনয়ন করেছেন, তা অস্বীকার করতে আদেশ করে। আর এখানে তাদের ঈমান দ্বারা তাদের বিশ্বাস উদ্দেশ্য, কেননা, তারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী। যেহেতু যখন তাদের বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে যে, আমরা আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছি

আর আল্লাহ তাআলার বাণী ان كنتم مؤمنين। (যদি তোমরা ঈমানদার হও)-এর অর্থ হলো, তোমাদের ধারণানুযায়ী আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি বিশ্বাসী হও। আর এ বাণী দ্বারা মূলত আল্লাহ তাআলা তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, তাওরাত এ সকল কাজ হতে নিষেধ করে এবং তার বিপরীত আদেশ করে। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, যদি তাওরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস তাদেরকে এসকল কাজের আদেশ করে, তবে তা হবে নিকৃষ্ট বস্তু। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাওরাতে অপসন্দনীয় কোন কাজের আদেশ করেছেন, এমন ব্যাপার নয়। আল্লাহ তাআলার অপসন্দনীয় বিষয়ের আদেশ তাওরাতে আছে বলে বিশ্বাস করা, তাঁর আদেশের বিপরীত কাজ বুঝায়। আর তা তাঁর পক্ষ হতে তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, যা তাদেরকে এসকল কাজের আদেশ করে, তা হলো তাদের কুপ্রবৃত্তি। আর যা তাদেরকে এসকল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলো তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘন।

(৯৪) قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(৯৪) আপনি বলুন, যদি আল্লাহ তাআলার নিকট পরকালের নিবাস অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যেই অবধারিত হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ○

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতখানা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে য়াহূদীদের মুকাবিলায় প্রমাণ দান করেছেন, যে য়াহূদীরা তাঁর মুহাজির সাহাবীগণের সাথে অবস্থান করছিল। এর দ্বারা তাদের ধর্মযাজক তাদের আলিমদেরকে লজ্জিত করেছেন। আর তা হলো আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর ও তাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী একটি বিষয়ের প্রতি আহবান করার আদেশ করেন। তাঁর ও তাদের মধ্যে যে বিষয়ে বিরোধ চলছিল সে ব্যাপারে। যেমন তিনি তাঁকে অন্যত্র খৃস্টানদেরকে অনুরূপ ভাবে তাঁর ও তাদের মধ্যে ফয়সালাকারী "মুবাহালা"-এর প্রতি আহবান করার আদেশ করেছিলেন। যখন তারা তাঁর

সাথে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ করেছিল। আর তিনি য়াহূদী পক্ষকে বলেন যে, তোমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। আর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হবে না, যদি তোমরা ঈমান ও আল্লাহর যে নৈকট্যের দাবী কর, তাতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। তদুপরি যদি তোমাদের মৃত্যুর আকাংখা পূরণ করে দেওয়া হয়, তবে পার্থিব ঝঞ্ঝাট, দুঃখ-কষ্ট এবং তাতে জীবন যাপনের গ্লানি হতে শান্তি লাভ, বেহেশতসমূহের মধ্যে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের সাফল্য অর্জিত হবে। যদি ব্যাপারটি তোমাদের ধারণার অনুরূপ হয় যে, পরকালে নিবাস আমরা ব্যতীত বিশেষ ভাবে তোমাদেরই জন্য। আর যদি তোমরা তা না কর, তবে মানুষেরা তাতে একথাই জানবে যে, তোমরা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের দাবীই সঠিক। আর এর দ্বারা আমাদের ও তোমাদের বিষয়টি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। য়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এ আহবানে সাড়াদান হতে বিরত থাকে। যেহেতু তারা জানত যে, যদি তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে তারা দুনিয়াও হারাবে এবং আখিরাতের চির গ্লানিতে প্রবেশ করবে। যেমন খৃস্টান পক্ষ যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেছিল, তারাও মুবাহালা করা হতে বিরত ছিল, যখন তাদেরকে তৎপ্রতি আহবান করা হয়েছিল। তারপর আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, যদি য়াহূদী-গণ মৃত্যু কামনা করত, তবে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতো এবং দেখতে পেতো যে, তাদের ঠিকানা জাহান্নামে। আর যদি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে খৃস্টানগণ মুবাহালা করার উদ্দেশ্যে বের হতো, তবে তারা ফিরে এসে দেখতে পেতো যে, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।

একথার সমর্থনে ইকরামাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) হতে একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন। আর আ'মাশ ইব্ন আব্বাস হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি فتمنوا الموت ان كنتم صادقين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা মৃত্যু কামনা করত, তবে তাদের প্রত্যেকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করত।

আর আবদুল করীম আল-জাযরী ইকরামাহ হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি فتمنوا الموت ان كنتم صادقين-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যদি য়াহূদীরা মৃত্যু কামনা করত, তবে তারা অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হতো। আর সুদ্দী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, যে দিন তাদেরকে একথা বলা হয়েছিল, সে দিন যদি তারা মৃত্যু কামনা করত, তবে ধরাপৃষ্ঠে কোন য়াহূদী পাওয়া যেত না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি য়াহূদীদের মিথ্যা দাবী, অপবাদ ও শত্রুতার বিষয়টি যা অস্পষ্ট ছিল, তা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে এই সত্যতা সর্বদাই তাদের নিকট ও পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকট দেদীপ্যমান। আর রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে বলা হয় তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা কর। কেননা তারা বলেছিল, (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর বন্ধু (না'উযু বিল্লাহ)। আর তারা আরও বলেছিল যে, বেহেশতে য়াহূদী এবং নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না। তাই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলেছেন, হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও,

তবে নিজেদের মৃত্যু কামনা কর। এরপর আল্লাহ পাক তাঁদের মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে দিয়েছেন মৃত্যু থেকে তাঁদের বিরত থাকার মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সত্যতার দলীলকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, কি কারণে আল্লাহ পাক প্রিয় নবী (স.)-কে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি য়াহূদীদেরকে তাদের মৃত্যু কামনার জন্য আহবান জানান। আর কি ভাবে তারা এই আদেশের প্রেক্ষিতে মৃত্যু কামনা করবে। কেউ কেউ বলেন, উভয় দলের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে মৃত্যুর দুআ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যাঁরা এমত পোষণ করেন, তাদের মতের সমর্থনে দলীল এই যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন—

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ○

অর্থঃ বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (বাকারা ২/৯৪) অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে কে অধিকতর মিথ্যাবাদী তার ব্যাপারে মৃত্যুর বদদুআ কর।

আর অন্যরা বলেছেন, তাদেরকে সরাসরি মৃত্যু কামনা করার আহবান জানান হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেছেনঃ কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়ঃ য়াহূদী ও নাসারা ব্যতীত জান্নাতে আর কেউ প্রবেশ করবে না, তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি আখিরাত একমাত্র তোমাদের জন্যই হয়, আর কারোর জন্য না হয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। এতদ্ব্যতীত য়াহূদীরা আরও বলেছে আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর বন্ধু। তখন তাদেরকে বলা হয়, যদি তোমরা তোমাদের এ দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে তোমরা নিজেদের মৃত্যু কামনা কর। আবুল আলিয়াহ (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, য়াহূদীরা দাবী করেছিল, য়াহূদী-নাসারা ছাড়া জান্নাতে কেউ প্রবেশ করবে না। আর তারা এ মিথ্যা আস্ফালনও করেছিল যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু (নাউযু বিল্লাহ)! এর জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, (হে রাসূল!) আপনি বলুন, যদি আখিরাত শুধু তোমাদের জন্যই হয়, অন্য কারোর নয়, তবে তোমরা তোমাদের মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তা করেনি।

আবূ জা'ফর রবী (র.) হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি আয়াত قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة الآية এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর তা এজন্য যে, তারা বলেছে, য়াহূদী বা খৃস্টান ব্যতীত অন্য কেউ বেহেশতে কখনো প্রবেশ করবে না। তারা আরও বলেছে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর বন্ধু। তাই তাদের উদ্দেশে এ আদেশ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة-এর ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (স.) আপনি বলুন, যদি আখিরাতের নিয়ামতসমূহ শুধু তোমাদের জন্য হয়। এ আয়াতে শুধু আখিরাতের উল্লেখ যথেষ্ট মনে করা হয়েছে— নিয়ামতের

উল্লেখ করা হয় নাই। কেননা, যাদেরকে এই আয়াতের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট। আর ইতিপূর্বে আমরা দারুল আখিরাত-এর ব্যাখ্যা করেছি, যার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আর خالصة (একান্ত ও নির্ভেজালভাবে)-এর ব্যাখ্যা এই যে, এটি صافية (নিষ্কলুষ)-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, خلص لي فلان অর্থাৎ সে একান্ত ভাবে আমারই হয়েছে। এ অর্থেই বলা হয় (خلص لي هذا الشئ এ বস্তুটি একান্তভাবে আমার হয়ে গিয়েছে)। আর তা (خلص) يخلص خلوصا وخالصة হিসাবেই রূপান্তরিত হয়ে থাকে। আর خالصة শব্দটি عافية-এর ন্যায় একটি মাসদার (শব্দমূল)। আর কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়ঃ هذا خالصة لي অর্থাৎ خالصي من دون اصحابي (এটি আমার জন্য একান্তভাবে —আমার সঙ্গীদের জন্য নয়)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে এরূপ একটি বর্ণনাও উধৃত হয়েছে যে, তিনি خالصة-এর ব্যাখ্যা خاصة দ্বারা করেছেন। আর তাঁর এ ব্যাখ্যাটি এ ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার খুবই কাছাকাছি। ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, قل إن كانت لكم الدار الآخرة-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! তাদেরকে অর্থাৎ য়াহূদীদেরকে বলে দিন যে, যদি পরকালীন নিবাস তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে নিরঙ্কুশ ভাবে কল্যাণবহ হয়।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী—من دون الناس-এর ব্যাখ্যায় যা কুরআনের বাহ্যিক শব্দাবলী নির্দেশ করে তা হচ্ছে এই যে, তারা বলেছে অন্য সকল মানুষ ব্যতীত একান্তভাবে আমাদেরই জন্য আখিরাতের নিবাস আল্লাহ পাকের নিকট সুনির্ধারিত। তাদের কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়েছে যে, বনী আদমের মধ্য হতে কেবলমাত্র তাদের জন্যই পরকালের আবাস নির্দিষ্ট। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তারা ধারণা করে যে, لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى (য়াহূদী অথবা নাসারা ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বাকারা ২/১১১) কিন্তু হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে এর বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি من دون الناس-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণকে বুঝান হয়েছে। যাদের সাথে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে চলেছ। আর তোমাদের ধারণা যে, তোমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরকালের সুখের জীবন তাঁদের ব্যতীত তোমাদের জন্যই। فتمنوا الموت (তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ তোমরা মৃত্যুর আগ্রহ ও ইচ্ছে প্রকাশ কর। তিনি বলেন, এখানে فتمنوا الموت এর অর্থ হলো فسلوا الموت অর্থাৎ তোমরা মৃত্যু প্রার্থনা কর। আরবদের ব্যবহারে التمنى শব্দ প্রার্থনা অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, التمنى বলতে অন্তরের ভালবাসা ও কামনাকে বুঝায়। একারণেই আমার মনে হয় ইব্ন আব্বাস (রা.) এর অর্থ "আগ্রহ ও চাওয়া" বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা, প্রার্থনা করাই হচ্ছে প্রার্থনাকারী কর্তৃক আল্লাহ তাআলার সমীপে প্রার্থিত বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করা। ইব্ন আব্বাস (রা.) فتمنوا الموت-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, فسلوا الموت ان كنتم صادقين (তবে তোমরা মৃত্যুর প্রার্থনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও)।

(৯৫) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

(৯৫) কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনও তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে অবহিত।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

আর তা হলো য়াহূদীদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের দেওয়া সংবাদ যে, তারা মৃত্যুকে অপসন্দ করে। যেহেতু তারা জানত যে, যদি তারা তা করে, তবে তাদের প্রতি খোদায়ী গযব অবতীর্ণ হবে, তাদের উপর মৃত্যু নেমে আসবে। আর যেহেতু তারা মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে যথার্থই জানত যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, অথচ তারা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করছে। আর তারা এও জানত যে, তিনি তাদেরকে এমন সংবাদই প্রদান করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে সত্য। তাই তারা মৃত্যু কামনা করা হতে সভয়ে বিরত রয়েছে। তাদের পাপকর্মের কারণে আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার আশংকায় তারা মৃত্যু কামনা থেকে বিরত রয়েছে। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে দলীল এই যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াত قل ان كانت لكم الدار الاخرة الاية-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা উভয় পক্ষের মধ্য হতে যে পক্ষ মিথ্যার উপর তার জন্য মৃত্যু প্রার্থনা কর। যারা সেই মিথ্যাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট ব্যক্ত করেছে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-কে সংবাদ দিয়ে বলেন, তারা তা কখনো কামনা করবে না। কারণ, তারা পূর্বে পাপকর্ম করেছে। অর্থাৎ তাদের নিকট আপনি সত্য নবী হওয়া সম্পর্কিত যে ইলম রয়েছে, আর তারা তা অস্বীকার করেছে, সে কারণেই তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না।

আর অপর এক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়াতাংশ ولن يتمنوه ابدا এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মদ (স.)! তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, তারা জানে যে, তারা মিথ্যাবাদী। আর তারা যদি সত্যবাদী হতো, তবে তারা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করত। আর আমার পক্ষ হতে মর্যাদা লাভে দ্রুততায় আগ্রহী হতো। বস্তুত তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না।

আর ইব্‌ন জুরায়জ হতে বর্ণিত যে, তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আর য়াহূদীরাই ছিল মৃত্যু হতে সর্বাপেক্ষা অধিক পলায়নকারী। আর তারা তা কামনা করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না।

بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ-এর ব্যাখ্যা ঃ

بما قدمت ايديهم-এর অর্থ হচ্ছে, যা তাদের হস্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে সে কারণে। এটি একটি প্রবাদ, যা আরবগণ তাদের কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকে। যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে

লক্ষ্য করে বলে থাকে, যাকে তার কৃত পাপের অথবা তার কৃত অপরাধের জন্য পাকড়াও করা হয়েছে, এবং সে জন্য তাকে শাস্তি প্রদত্ত হয়েছে, لك هذا بما جنت يداك (তোমার এ শাস্তি তোমার হস্ত যে অপরাধ করেছে তার কারণে), وبما كسبت يداك (তোমার হস্তযুগল যা উপার্জন করেছে, তার কারণে), وبما قدمت يداك (তোমার হস্তযুগল যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, তার কারণে)। তারা এ কর্মকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করে। অথচ এমনও হতে পারে যে, যেই অপরাধটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং যে জন্য সে শাস্তির যোগ্য হয়েছে, তা মুখ কিম্বা যৌনাঙ্গ অথবা হাত ব্যতীত তার দেহের অপর কোন অঙ্গের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাখ্যাকার বলেন, এভাবে অপরাধকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করে বলার কারণ হলো, যেহেতু মানুষের অধিকাংশ অপরাধ তার হাত দ্বারাই সংঘটিত হয়, এজন্যই মানুষ যে সকল অপরাধ করে থাকে, তাকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করে কথা বলার প্রচলন রয়েছে। এমনকি মানুষ তার দেহের সমুদয় অঙ্গের সাহায্যে যে সকল অপরাধ করে এবং তজ্জন্য তাকে যে শাস্তি প্রদত্ত হয়, তাকেও তার হাতের দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয় যে, এটা তার হস্তকৃত অপরাধের শাস্তি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আরবদের উদ্দেশে ইরশাদ করেন ঃ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم—এর অর্থ হচ্ছে এই যে, য়াহূদীগণ তাদের জীবনে যা কিছু অগ্রে প্রেরণ করেছে, সে জন্য তারা মৃত্যু কামনা করবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কুফরী করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণ ও তিনি যা কিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিয়ে এসেছেন তা পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যবিরোধী যে ভূমিকা পালন করেছে, সে কারণে তারা মৃত্যু কামনা করবে না। অথচ তারা তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ দেখতে পাচ্ছে। আর তারা জানে যে, তিনি (হযরত মুহাম্মদ (স.)) প্রেরিত রাসূল। বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহ যা কিছু গোপন করেছে, তাদের আত্মা যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে আর তাদের মুখ যা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈর্ষা, তাঁর বিরোধিতা, তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করা ইত্যাদি অপরাধকে তাদের হাতের দিকে সম্পর্ক করেছেন। আর একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলিই তাদের হস্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনকে তাদের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। যেহেতু আরবগণ তাদের কথোপকথন ও তাদের কথাবার্তায় এর অর্থ অবগত আছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি بما قدمت ايديهم এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, بما اسلفت ايديهم (যা তাদের হস্তযুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে সে কারণে)।

ইব্‌ন জুরায়জ (র.) بما قدمت ايديهم এর ব্যাখ্যায় বলেন, য়াহূদীরা জানত যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী। কিন্তু তারা এই সত্যটি গোপন করে রেখেছিল।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ পাক বনী আদম হতে য়াহূদী, নাসারা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যুলুম সম্পর্কে অবহিত। বিশেষত য়াহূদীদের যুলুম হলো, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণের যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা অমান্য করা। ইতিপূর্বে তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে নিজেদের বিজয় কামনা করত। পরবর্তীকালে

তারাই তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। অথচ তারা জানে যে, তিনি আল্লাহ পাকের সত্য নবী এবং তাদের নিকট প্রেরিত। আর আমরা ইতিপূর্বে যুলুম' শব্দটির অর্থ বর্ণনা করেছি। এই পর্যায়ে এ পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○ (৯৬)

(৯৬) তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবনের প্রতি সকল মানুষ, এমন কি মুশরিকদের অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তারা প্রত্যেকে আকাংখা করে যদি তাদেরকে হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনি য়াহূদীদেরকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী পাবেন। তাদের নিকট মৃত্যু অতীব অপ্রিয়। যেমন এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতে য়াহূদীদেরকে উদ্দেশ করা হয়েছে আর একথা আবুল 'আলিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত আছে। রবী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ (র.)-ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, য়াহূদীদের মৃত্যুকে অপসন্দ করার কারণ হচ্ছে তারা জানে যে, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক কঠোর শাস্তি।

আর আবূ জা'ফর আবুল আলিয়াহ (র.) হতে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ য়াহূদীগণ। আর আবূ জা'ফর তাঁর পিতা হতে, তিনি রবী (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা উধৃত করেছেন। আর আবূ নাজীহ (র.) মুজাহিদ (র) হতে একইরূপ বর্ণনা উধৃত করেছেন। আর তাদের মৃত্যুকে অপসন্দ করার কারণ এই যে, তারা জানত তাদের জন্য আখিরাতে অপমান ও দীর্ঘ ভোগান্তি রয়েছে।

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী وأحرص الناس ومن الذين أشركوا-এর অর্থ হচ্ছে ومن الذين أشركوا على الحياة অর্থাৎ আর তারা জীবনের প্রতি মুশরিকদের তুলনায় অধিক

লোভী। যেমন বলা হয়, هو أشجع الناس ومن عنترة—সে সর্বাধিক বীর পুরুষ ও বীর যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক বীরত্বের অধিকারী– এর অর্থ হচ্ছে, সে সকল মানুষ অপেক্ষা এবং বীর যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক বীর পুরুষ। এখানে ومن الذين أشركوا-এর অর্থও অনুরূপ। যেহেতু বক্তব্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদেরকে মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সর্বাধিক এবং মুশরিকদের তুলনায়ও সর্বাধিক লোভী হিসাবে দেখতে পাবেন। আর এতে সংযোগকারী অক্ষরের পর আমি যে, من অব্যয় প্রকাশ করেছি তার ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে। আর তা ঐ ব্যাখ্যার প্রতিবাদে যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তা'আলা য়াহূদীদেরকে মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী বিশেষণ দ্বারা এজন্য বিশেষিত করেছেন, যেহেতু তাদের জন্য আখিরাতে তাদের কুফরীর কারণে যা তৈরি করে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা অবহিত আছে। আর তা এমন বিষয়, যা মুশরিকগণ স্বীকার করে না। সুতরাং এই য়াহূদীরা মৃত্যুকে সেই মুশরিকগণ অপেক্ষা অধিক অপসন্দ করে, যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না। কেননা, তারা (য়াহূদীরা) পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে এবং তথায় তাদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে, তাও তারা অবগত আছে। আর মুশরিকরা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং পরকালীন শাস্তিও বিশ্বাস করে না। কাজেই য়াহূদীরাই জীবনের প্রতি অধিক লোভী এবং মৃত্যুকে অধিক অপসন্দ করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে সকল মুশরিক সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন য়াহূদীরা যাদের অপেক্ষা পার্থিব জীবনের প্রতি অধিক লোভী, আর তারা হলো সেই সকল অগ্নিপূজক, যারা কিয়ামতে আস্থা রাখে না।

যারা তাদেরকে আগুন পূজারী বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের আলোচনা ঃ হযরত রবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে সকল মুশরিক হলো অগ্নিপূজক। হযরত ইব্‌ন ওয়াহহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) ومن الذين أشركوا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদীরা তাদের সবার তুলনায় জীবনের প্রতি অধিক লোভী।

কিয়ামতে অবিশ্বাসী মুশরিক বলে যাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাদের আলোচনা ঃ হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) অথবা ইকরামাহ (রা) কর্তৃক হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আর তা এজন্য যে, মুশরিকরা মৃত্যুর পরে কিয়ামতে আশাবাদী নয়, কাজেই তারা দীর্ঘ জীবন পসন্দ করে। আর য়াহূদীরা তাদের নিকট যে ইলম গচ্ছিত ছিল, তা ধ্বংস করার কারণে তাদের জন্য আখিরাতে যে অপমান-লাঞ্ছনা রয়েছে, তা অবহিত। তাই তারা মৃত্যুকে অপসন্দ করে এবং মুশরিকদের অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী।

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে عن الذين أشركوا-এর মাধ্যমে দেওয়া খবর। যাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে, য়াহূদীরা তাদের অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, এ সকল মুশরিকের প্রত্যেকে ভালবাসে যে, তারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের আয়ু

নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরও যেন তাদের জন্য অতঃপর পুনরুত্থান অথবা জীবন কিংবা আনন্দ ও খুশী লাভ হয়। যদিও তাকে হাজার বছর জীবন দান করা হয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ অন্যকে দশ সহস্র বৎসর জীবন লাভের দুআ করেছে। বিষয়টি জীবনের প্রতি তাদের লোভেরই পরিচায়ক। যেমন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি يود احدهم لو يعمر الف سنة এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ সব আজমী (অনারবদের) কথা। سال زه نوروز مهرجان حر বছরের প্রতিটি দিন তোমার জন্য আনন্দদায়ক হোক। হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো মুশরিকদের বক্তব্য, যা তারা একে অপরকে হাঁচি দেওয়ার প্রত্যুত্তরে বলে থাকে, زه هزار سال—হাজার বছর বেঁচে থাক।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يود احدهم لو يعمر الف سنة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের পাপাচার— তাদের নিকট দীর্ঘ জীবনকে প্রিয় করে দিয়েছে। হযরত ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনিও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত ইবন যায়দ (রা) ولتجدنهم احرص الناس على حياة আয়াতখানি لو يعمر الف سنة পর্যন্ত পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদীরা তাদের সকলের অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী। আর তারা প্রত্যেকে হাজার বছর জীবন লাভ করা কামনা করত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি يود احدهم لو يعمر الف سنة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো তাদের উক্তি। যখন তাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন অপর ব্যক্তি বলেঃ হাজার বৎসর বেঁচে থাক (زه هزار سال)। তিনি বলেন, এর অর্থ দশ সহস্র বৎসর বেঁচে থাক।

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ -এর ব্যাখ্যাঃ

জীবন দান করা অর্থ দীর্ঘ দিন স্থিতিশীল থাকা আল্লাহ তাআলার শাস্তি হতে অব্যাহতি লাভের মাধ্যমে। আর هو সর্বনামটি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, ما অব্যয়টি فعل-এর তুলনায় اسم। কেই অধিক পরিমাণে কামনা করে থাকে। যেমন, একজন আরব কবি বলেছেন, فهل هو مرفوع بما ههنا راس (এখানে ما অব্যয়টির পরে ههنا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।)

আর ان يعمر এর মধ্যে যে ان অব্যয়টি بمزحزحه কে পেশ দান করেছে, কিংবা ما অব্যয়টির সহিত যে هو সর্বনামটি পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে, তা فعل (ক্রিয়া)-এর উপর ভিত্তি করে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আরবগণ নির্দিষ্ট করার পূর্বে অনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করাকে অপসন্দ করে থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন, ما অব্যয়টির পর যে هو সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা عمر-এর উল্লেখের ইঙ্গিতস্বরূপ। আয়াতটিতে যেন এরূপ বলা হয়েছে, يود احدهم لو يعمر الف سنة وما ذالك العمر بمزحزحه من العذاب (তাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর জীবন লাভ করার প্রত্যাশা করে কিন্তু এই দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দেবে না)।

আর ان يعمر বাক্যাংশটি هو সর্বনাম-এর ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, تعمير বা দীর্ঘায়ু লাভ করা, তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দান করা নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ঠিক তদ্রূপ, যেমন কেউ বলল, ما زيد بمزحزحه ان يعمر (দীর্ঘ জীবন লাভ করা সত্ত্বেও যায়দ তা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়)।

উল্লিখিত মতামতসমূহের মধ্যে নির্ভুল ও সঠিক মত হলো যা আমি উল্লেখ করেছি। আর তা হলো هو সর্বনামটি নির্ভরস্থল রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, انه قائم عمرو। হযরত রবী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্ন যায়দ (রা) ان يعمر-এর ব্যাখ্যা لو عمر দ্বারা করেছেন।

আর بمزحزحه-এর ব্যাখ্যা, بمبعده و منحيه (তাকে দূরত্ব দানকারী ও পৃথককারী) অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—কবি হাতিয়্যাহ নিম্নোক্ত কবিতায় শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি এই—

وقالوا تزحزح ما بنا فضل حاجة + اليك وما منا لو هيك راقع

এখানে কবি تزحزح শব্দটি تباعد অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ অর্থেই— زحزحه يزحزحه زحزحة و زحزاحا বলার প্রচলন রয়েছে এবং এ অর্থেই বলা হয়, وهو عنك بمزحزح অর্থাৎ متباعد দূরত্বদানকারী। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো وما طول العمر بمبعده من عذاب الله ولا منحيه منه (কারো দীর্ঘ জীবন তাকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না)। কেননা, জীবন যতো সুদীর্ঘই হোক, তা অবশেষে নিঃশেষ হবেই। আর তাকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবেই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اى ما هو بمنجيه من العذاب অর্থাৎ সে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না। হযরত আবুল আলিয়াহ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, وان عمر فما ذالك بمغيثه من العذاب و لا منجيه—যদিও তাকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, তথাপি তা তাকে শাস্তি হতে রক্ষাকারী হবে না এবং শাস্তি থেকে পৃথককারী হবে না। হযরত রবী (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) আয়াত يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সে সকল লোক, যারা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

হযরত ইব্ন যায়দ (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর জীবন লাভের প্রত্যাশা করে, কিন্তু তা তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দানকারী নয়। যদিও সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে। য়াহূদীরা তাদের অপেক্ষা জীবনের প্রতি অধিক লোভী। আর তারা প্রত্যেকে সহস্র বৎসর জীবন লাভের প্রত্যাশা করে। যদিও তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, তথাপি তা তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না। যেমন ইবলীসকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছে, কিন্তু তা তার কোনো উপকারে আসেনি। সে কাফির ছিল বিধায় দীর্ঘ জীবন তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দিতে পারবে না।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ০ -এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী والله بصير بما يعملون দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সবই দেখেন। কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। বরং সব কিছুই তাঁর আয়ত্তাধীনে এবং সব কিছুই তিনি সংরক্ষণ করেন। কিছুই তাঁর হিসাবের বাইরে নয়। আর তিনি

২৫ —

তাদেরকে এ সবের পরিণামে শাস্তি আস্বাদন করাবেন। بصير শব্দটির মূল مبصر যেমন, কোন বক্তা বলে থাকে যে, بصرت فانا مبصر —আমি দেখেছি, সুতরাং আমি দ্রষ্টা। কিন্তু তাকে فعيل-এর ওযনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন مسمع কে سميع রূপে রূপান্তরিত করা হয়। আর عذاب مؤلم কে عذاب اليم রূপে পরিবর্তিত করা হয় এবং مبدع السماوات কে بديع السماوات রূপে রূপান্তরিত করা হয়, ইত্যাদি।

(৯৭) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ◎

(৯৭) বলুন, যে কেউ জিবরাঈল (আ.)-এর শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর আদেশে আপনার হৃদয়ে কুরআনকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

কুরআন মজীদের তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ সকলে এমর্মে একমত যে, এ আয়াতখানি য়াহূদীদের কথার জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তারা ধারণা করত যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের শত্রু এবং হযরত মীকাঈল (আ.) তাদের বন্ধু। অতঃপর তাঁরা য়াহূদীদের এরূপ বলার কারণ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তাদের এরূপ বলার কারণ ছিল, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়াত প্রসঙ্গে তার ও কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত বিতর্ক। যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, য়াহূদীদের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিন, যা নবী ব্যতীত অন্যরা জানে না। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করলেন, তোমরা যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। তবে তোমরা আমার জন্য আল্লাহ পাকের যিম্মায় থাকবে যেমন হযরত য়াকূব (আ.) তাঁর সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আমি যদি তোমাদের নিকট কোন কথা বলি, যার সত্যতা তোমরা উপলব্ধি কর, তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার অনুসরণ করবে। তখন তারা বলল, আপনার জন্য একথা রইল। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করলেন, তোমরা আমাকে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। তখন তারা বলল, আমরা আপনাকে চারটি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দান করুন। (১) আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করুন যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে য়াহূদীরা নিজেদের জন্য কোন্ খাদ্য হারাম করে নিয়েছিল? (২) আমাদেরকে বলুন, নারীর শুক্র ও পুরুষের শুক্র কিরূপ? আর তা থেকে কিরূপে ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তান জন্মলাভ করে? (৩) আমাদেরকে এ উম্মী নবীর নিদ্রারত অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ

দিন। (৪) আর ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁর বন্ধু কে? তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করলেন, তোমাদের উপর রয়েছে আল্লাহ পাকের নামে কৃত অঙ্গীকার। যদি আমি তোমাদের এ সকল প্রশ্নের জবাব দিই, তবে তোমরা অবশ্যই আমার অনুসরণ করবে। তখন তারা তাঁর সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই মহাসত্তার নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করছি, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। তোমরা কি জান যে, হযরত য়াকূব (আ.) একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন? সে রোগে তিনি দীর্ঘ দিন ভুগেছিলেন। তখন তিনি মানত করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ তাআলা তাঁকে সে রোগ হতে আরোগ্য দান করেন, তবে তিনি তাঁর প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয়কে নিজের জন্য হারাম করে নিবেন, আর তাঁর প্রিয়তম খাদ্য ছিল উটের গোশত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আর তাঁর প্রিয়তম পানীয় ছিল উষ্ট্রের দুগ্ধ। এতদশ্রবণে তারা বলল, হ্যাঁ এটা সত্য। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি আল্লাহ পাককে সাক্ষ্য রাখছি। আর তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তাআলার নামে শপথ দান করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং যিনি মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্র গাঢ় সাদা বর্ণের হয়ে থাকে এবং স্ত্রীলোকের শুক্র পাতলা হরিদ্রা বর্ণের হয়ে থাকে, অনন্তর এতদুভয় শুক্রের মধ্য হতে যেটি প্রাধান্য বিস্তার করবে, তার জন্য তৎসদৃশ সন্তান আল্লাহর ইচ্ছায় জন্মলাভ করবে। সুতরাং যদি পুরুষের শুক্র স্ত্রীলোকের শুক্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে তার গর্ভে আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। আর যদি স্ত্রীলোকের শুক্র পুরুষের শুক্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তার গর্ভে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তখন তারা বলল, আয় আল্লাহ! হ্যাঁ, এটা সত্য। নবী (স.) বললেন, আয় আল্লাহ আপনি সাক্ষ্য থাকুন। তিনি আরও বলেন, আমি তোমাদেরকে সেই মহাসত্তার শপথ দান করছি, যিনি মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা কি জান যে, এই উম্মী নবীর চক্ষুযুগল নিদ্রা যায়, কিন্তু তাঁর অন্তর নিদ্রা যায় না? তারা বলল, আয় আল্লাহ এটা সত্য। নবী (স.) বললেন, হে আল্লাহ পাক! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বলল, এক্ষণে আপনি আমাদেরকে বলুন যে, ফেরেশতাগণের মধ্যে কে আপনার বন্ধু? এর উপরই আমরা হয়ত আপনার অনুসরণ করব কিম্বা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমার বন্ধু হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)। আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি জিবরাঈল (আ.) যাঁর বন্ধু নন। তখন তারা বলল, তবে এ কথার উপর আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। যদি জিবরাঈল ব্যতীত অন্য কোন ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম এবং আপনাকে সত্য রূপে গ্রহণ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আচ্ছা কোন্ বস্তু জিবরাঈল (আ.)-কে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? তারা বলল, তিনি অবশ্যই আমাদের শত্রু। তখন মহান আল্লাহ من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله .... كانهم لا يعلمون অবতীর্ণ করেন। এ ভাবে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো।

হযরত শাহর ইব্ন হাওশাব আল-আশআরী হতে বর্ণিত যে, একদল য়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ (স.)! আমরা আপনাকে চারটি প্রশ্ন করব, আপনি আমাদেরকে তার উত্তর প্রদান করুন। যদি আপনি তা করেন, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনাকে সত্যরূপে গ্রহণ করব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করব। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এ বিষয়ে

তোমাদের উপর আল্লাহর অঙ্গীকার ও তাঁর প্রতিজ্ঞা। আমি যদি তোমাদেরকে এ সব বিষয়ে সংবাদ দান করি, তবে তোমরা আমাকে সত্যরূপে গ্রহণ করবে? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা তা করব। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমাদের অন্তরে উদিত প্রশ্নসমূহ আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর। তারা বলল, আমাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করুন যে, কিরূপে সন্তান মায়ের সদৃশ হয়। অথচ শুক্র তো পুরুষ হতেই অর্জিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ও বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর শপথসমূহ দ্বারা শপথ দান করছি। তোমরা কি জান যে, পুরুষের শুক্র গাঢ় সাদা হয়ে থাকে, আর স্ত্রীলোকের শুক্র পাতলা হরিদ্রা বর্ণের হয়ে থাকে? তবে এর মধ্যে যেটি তার প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ করে, সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে। তারা বলল, হ্যাঁ এটা সত্য। তারা বলল, আমাদেরকে আপনার নিদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ও বনী ইসরাঈলের নিকট তাঁর শপথসমূহের মাধ্যমে শপথ দান করছি। তোমরা কি জান যে, এই উম্মী নবীর চক্ষু যুগল ঘুমায়, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না? তারা বলল, আয় আল্লাহ। হ্যাঁ তা সত্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বলল, আমাদেরকে এ বিষয় অবহিত করুন যে, য়াকূব (আ.) তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য কোন্ খাদ্যটিকে হারাম করে নিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমরা কি জান যে, তাঁর নিকট প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয় ছিল উষ্ট্রের গোশত ও তার দুগ্ধ? আর তিনি একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা থেকে আরোগ্য দান করেছিলেন। তাই তিনি আল্লাহর শুকুর আদায়কল্পে তাঁর নিজের উপর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় হারাম করে নেন। তাই তিনি তাঁর নিজের উপর উষ্ট্রের গোশত ও দুগ্ধ হারাম করলেন। তারা বলল, হায় আল্লাহ! তা সত্য। তারা তখন বলল, আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নামে এবং বনী ইসরাঈলের নিকট তাঁর শপথসমূহের মাধ্যমে শপথ দান করছি। তোমরা কি জান যে, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)। আর তিনিই আমার নিকট এসে থাকেন। তারা বলল, হ্যাঁ, তবে তিনি আমাদের শত্রু। আর তিনি হচ্ছেন এমন এক ফেরেশতা, যিনি কঠোরতা ও রক্তপাত নিয়ে আসেন। যদি এরূপ না হতো, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে قل من كان عدوا لجبريل فانه نزلـــه على قلبك . . . كانهم لا يعلمون আয়াত ক'টি অবতীর্ণ করেন।

হযরত কাসিম ইব্ন আবী বাযযাহ (র.) হতে বর্ণিত যে, য়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর সঙ্গী সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যিনি তাঁর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)। তারা বলল, তিনি তো আমাদের শত্রু। তিনি যুদ্ধ, কঠোরতা ও হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে অবতীর্ণ হন না। তখন আয়াত من كان عدوا لجبريل الاية অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, য়াহূদীরা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে মুহাম্মদ (স.)! জিবরাঈল কঠোরতা ও যুদ্ধ ব্যতীত অবতীর্ণ হন না। তারা আরো বলে, তিনি আমাদের শত্রু। তখন আয়াত من كان عدوا لجبريل الاية অবতীর্ণ হয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, বরং তাদের এরূপ বলার কারণ তাদের ও হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়েছিল তার কারণে। যাঁরা এরূপ

অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ . শা'বী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) রাওহা নামক স্থানে অবতরণ করে দেখতে পেলেন যে, তথায় একদল লোক কতগুলো প্রস্তরের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দ্রুত গমন করে সেখানে নামায আদায় করছে। তখন উমর (রা.) বললেন, এগুলো কি? তখন তারা বলল যে, তাদের ধারণায় হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এখানে নামায আদায় করেছেন। হযরত উমর (রা.) তাদের এ কাজকে অপসন্দ করেন এবং বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এই অবস্থা ছিল যে, যখন কোন উপত্যকায় নামাযের সময় হতো, তখন তিনি সেখানে নামায আদায় করতেন। তারপর তাঁর সফর অব্যাহত থাকত। তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করতেন। অতঃপর উমর (রা.) তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি য়াহূদীদের তাওরাত পাঠের দিন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তাওরাতের একটি বিষয়ে লক্ষ্য করে বিস্মিত হই যে, তা কিভাবে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণনা করছে। আর পবিত্র কুরআন সম্পর্কেও আশ্চর্যান্বিত হই যে, কি ভাবে পবিত্র কুরআন তাওরাতের সত্যতা প্রমাণ করে। একদিন আমি তাদের নিকট ছিলাম। এসময় তারা আমাকে বলল, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার সাথীদের মধ্যে কেউ আমাদের নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় নেই। আমি বললাম, তা কেন? তারা বলল, যেহেতু তুমি আমাদের নিকট আসা-যাওয়া কর। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তোমাদের নিকট আসা-যাওয়া করি। তখন আমি কুরআন পাক সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করি, কি ভাবে তা তাওরাতের সত্যতা বর্ণনা করে। আর তাওরাত সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করি, কিভাবে তা পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমান করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আর তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তখন তারা বলল, হে ইবনুল খাত্তাব! ইনি তোমার সাথী। তাঁর সাথে মিলিত হও। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি এ সময় তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ দান করছি, যিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই। কোন্ বস্তু তোমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে বিমুখ রেখেছে এবং তার কিতাব হতে বিরত রেখেছে? তোমরা কি জান যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল? হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন তারা নীরব হয়ে যায়। এরপর তাদের মধ্যে যিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তিনি বললেন, ইবনুল খাত্তাব তোমাদেরকে একটি জটিল প্রশ্ন করেছেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বলল, আপনি আমাদের নেতা। আপনিই এর জবাব দিন। তখন তিনি বললেন, যেহেতু আপনি (উমর (রা.)) আমাদেরকে শপথ দিয়েছেন, তাই বলছি। আমরা নিশ্চিত রূপেই জানি যে, তিনি আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমাদের জন্য আক্ষেপ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা বলল, আমরা ধ্বংস হব না। হযরত উমর (রা.) বললেন---তা কি করে হতে পারে? কেননা, তোমরা জান যে, তিনি আল্লাহ পাকের রাসূল, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁর অনুসরণ কর না, তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস কর না। তারা বলল, ফেরেশতাগণের মধ্যে আমাদের একজন [illegible] একজন মিত্র রয়েছেন। আর তাঁর সাথে ফেরেশতাগণের মধ্য হতে যিনি আমাদের শত্রু তিনি যুক্ত হয়েছেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমাদের শত্রু কে আর মিত্র কে? তারা বলল, আমাদের শত্রু জিবরাঈল (আ.) আর আমাদের মিত্র মীকাঈল (আ.)। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি বললাম, কি ব্যাপারে তোমরা জিবরাঈল (আ.)-কে শত্রু বলে মনে কর এবং কি কারণে মীকাঈল (আ.)-কে মিত্র রূপে বরণ কর? তারা বলল, হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন রুক্ষতা, কঠোরতা ও শাস্তি ইত্যাদির ফেরেশতা। আর হযরত মীকাঈল (আ.) হলেন, দয়া, অনুগ্রহ ও নম্রতা ইত্যাদির ফেরেশতা। হযরত উমর (রা.) বললেন, তাঁদের দু'জনের প্রতিপালকের নিকট উভয়ের মর্তবা কি? তারা বলল, তাঁদের একজন আল্লাহ

তাআল্লার ডানদিকে ও অপরজন বামদিকে। হযরত উমর (রা.) বললেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাঁরা দু'জন এবং যিনি তাঁদের মধ্যবর্তী রয়েছেন তারা সকলেই সেই ব্যক্তির শত্রু, যে ব্যক্তি তাদের দু'জনকে শত্রু রূপে গণ্য করে এবং সেই ব্যক্তির মিত্র যে তাঁদেরকে মিত্র রূপে বরণ করে। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি মীকাঈলের দুশমনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। আর মীকাঈল (আ.)-এর জন্য উচিত নয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, অতঃপর আমি তাদের নিকট হতে উঠে দাঁড়ালাম এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। আর তখন তিনি কোন এক গোত্রের বাগানের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! আমি কি তোমার নিকট সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করব না, যা এক্ষণি অবতীর্ণ হয়েছে! তখন তিনি আমাকে পাঠ করে শুনালেন---

قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه الاية

এভাবে ঐ আয়াতসমূহ তিনি পাঠ করলেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আমি সেই আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি এবং ইচ্ছে করছি আপনাকে একটি বিষয়ে খবর দিব, অথচ আমি লক্ষ্য করছি, যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বকর্তা, সেই মহান আল্লাহ আমার পূর্বেই আপনাকে সে সম্পর্কে খবর দিয়েছেন।

শা'বী থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, উমর (রা.) একবার য়াহূদীদের নিকট যান, তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে স্বাগত জানায়। তখন উমর (রা.) তাদের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের ভালবাসার জন্য আসিনি, কিংবা তোমাদের প্রতি আকর্ষণের কারণেও আসিনি। বরং আমি তোমাদের নিকট হতে শুনার জন্য এসেছি। তারপর হযরত উমর (রা.) ও য়াহূদীদের মধ্যে প্রশ্ন বিনিময় হলো। তারা বলল, আপনার পথ-প্রদর্শকের সাথী কে? তখন হযরত উমর (রা.) তাদের বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার পথ-প্রদর্শকের সাথী। তারা বলল, তিনি তো আসমানবাসীদের মধ্যে আমাদের শত্রু। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে আমাদের গোপন বিষয় জানিয়ে দেন এবং তিনি যখন আগমন করেন, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু আমাদের সাথীর সাথী হলেন মীকাঈল (আ.)। তিনি যখন আসতেন, তখন উর্বরতা ও মৈত্রী নিয়ে আগমন করতেন। হযরত উমর (রা.) তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা কি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে চেনা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার কর। এ বলে তিনি চলে আসলেন এবং এ বিষয়টি জানানোর জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আর তিনি তাঁকে এরূপ অবস্থায় পেলেন যে, তাঁর উপর قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অনুরূপ আরেকখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি قل من كان عدوا لجبريل الاية প্রসঙ্গে বলেন, য়াহূদীরা বলেছিল যে, জিবরাঈল

আমাদের শত্রু। যেহেতু তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ, কঠোরতা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে অবতরণ করেন। আর মীকাঈল কোমলতা, শান্তি ও উর্বরতা নিয়ে অবতরণ করেন। সুতরাং জিবরাঈল আমাদের শত্রু। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কথার প্রতিবাদে ইরশাদ করেন--- من كان عدوا لجبريل الاية

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه প্রসঙ্গে বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মালিকানায় মদীনা মুনাওয়ারার উঁচু এলাকায় একখণ্ড যমীন ছিল। তিনি তথায় যাতায়াত করতেন। আর সেখানে যাতায়াতের পথটি য়াহূদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথেই ছিল। আর তিনি যখনই তাদের নিকট গমন করতেন, তাদের নিকট হতে তাওরাতের বাণী শ্রবণ করতেন। একদিন তিনি তাদের নিকট গমন করলেন। তখন য়াহূদীরা তাঁকে বলল, হে উমর! মুহাম্মদ (স.)-এর সঙ্গীগণের মধ্যে তোমার চেয়ে প্রিয় আমাদের নিকট আর কেউ নেই। তারা আমাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে যায় এবং আমাদেরকে কষ্ট দেয় আর তুমি আমাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে যাও এবং আমাদেরকে কষ্ট দাও না। আমরা তোমার ব্যাপারে আশাবাদী। তখন হযরত উমর (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শপথ কি? তখন তারা বলল, রহমানের শপথ, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তূর পর্বতে তাওরাত নাযিল করেছেন। তখন হযরত উমর (রা.) তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই রহমানের নামে শপথ দিলাম, যিনি তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন। তোমরা কি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আলোচনা তোমাদের কিতাবে পাও? তখন তারা নীরব হয়ে গেল। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.) বললেন, কথা বল, তোমাদের কি হলো? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার দীন সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের কারণে প্রশ্ন করিনি। তখন তারা একে অন্যের প্রতি দেখতে লাগল। তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা কি তার জবাব দিবে, না আমি তাকে জবাব দিব? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা তাঁকে আমাদের গ্রন্থে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ পেয়েছি। কিন্তু ফেরেশতাগণের মধ্যে যিনি তাঁর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন, তিনি হলেন জিবরাঈল (আ.)। আর জিবরাঈল (আ.) আমাদের শত্রু। কেননা, তিনি সকল প্রকার শাস্তি বা যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা অপমান-লাঞ্ছনার আদেশবাহক। যদি তার স্থলে মীকাঈল (আ.) হতেন, তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম। কেননা, মীকাঈল (আ.) হলেন সকল প্রকার দয়া, অনুগ্রহ ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপক। তখন উমর (রা.) তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে রহমানের নামে শপথ দান করছি, যিনি তূর পাহাড়ে মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। বল, আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে জিবরাঈল (আ.)-এর অবস্থান কোথায়? তারা বলল, জিবরাঈল (আ.)-এর স্থান আল্লাহ তাআলার ডান পার্শ্বে আর মীকাঈল (আ.)-এর স্থান আল্লাহ তাআলার বাম পার্শ্বে। তখন উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যিনি আল্লাহ তা'আলার ডান পার্শ্বে অবস্থানকারীর শত্রু, তিনি তাঁর বামপার্শ্বে অবস্থানকারীরও শত্রু। আর যে তাঁর বাম পার্শ্বে অবস্থানকারীর শত্রু, সে তাঁর ডান পার্শ্বে অবস্থানকারীরও শত্রু। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের শত্রু, সে আল্লাহ তাআলারও শত্রু। এরপর হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এ সংবাদ দেওয়ার জন্যে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, জিবরাঈল (আ.) পূর্বাহ্নেই ওয়াহী নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ডাক দিলেন এবং ঐ আয়াত পাঠ করে শুনালেন। তখন উমর (রা.) বললেন,

সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আপনার নিকট শুধু এখবরটি দেওয়ার জন্যই হাযির হয়েছি।

হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রা.) য়াহূদীদের নিকট গমন করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সেই মহান আল্লাহর শপথ দিয়ে বললেন, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাব তাওরাতের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আলোচনা পেয়েছ ? তারা বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কোথায়? তারা বলল, আল্লাহ্ তাআলা কোন রাসূলকেই ফেরেশতাগণের মধ্য হতে একজন সহযোগী ব্যতীত প্রেরণ করেন নাই। আর হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহযোগী। অথচ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে তিনি আমাদের শত্রু আর হযরত মীকাঈল (আ.) আমাদের মিত্র। যদি মীকাঈল (আ.) তাঁর নিকট আগমন করতেন, তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। বল তো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট উভয়ের মর্যাদা কি? তারা বলল, জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তাআলার ডান পার্শ্বে আর মীকাঈল (আ.) তাঁর অপর পার্শ্বে। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিই যে, তাঁরা উভয়ে আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কিছু বলেন না। আর হযরত মীকাঈল (আ.)-এর জন্য সমীচীন হতে পারে না যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মিত্রদের সাথে শত্রুতা করবেন। আর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্য সমীচীন হতে পারে না যে, তিনি হযরত মীকাঈল (আ.)-এর শত্রুদের সাথে মিত্রতা করবেন। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) সে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা বলল, ইনি তোমার পথ-প্রদর্শক, হে ইবনুল খাত্তাব! তখন হযরত উমর (রা.) হযরত রাসূলে করীম (স.)-এর নিকটে যেয়ে দাঁড়ালেন। আর তখনি নাযিল হয় من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله। আয়াতখানি فان الله عدو للكافرين পর্যন্ত।

হযরত ইব্ন আবী লায়লা (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি من كان عدوا لجبريل প্রসঙ্গে বলেন, য়াহূদীরা মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিল, যদি মীকাঈল (আ.) তোমাদের নিকট ওয়াহী নিয়ে আসতেন, তবে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। কেননা, তিনি রহমত ও বৃষ্টিপাতের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আর জিবরাঈল (আ.) শাস্তি এবং দুঃখ-কষ্ট নিয়ে অবতরণ করেন। তিনি আমাদের শত্রু। ইব্ন আবী লায়লা (র.) বলেন, তখন এ আয়াত من كان عدوا لجبريل নাযিল হয়। হযরত আবদুল মালিক (র.)-এর সূত্রে হযরত আতা (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াত قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেনঃ হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি য়াহূদীদের বলুন, যারা ধারণা করে যে, জিবরাঈল তাদের শত্রু এজন্য যে, তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ, আযাব ও শাস্তির দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি ওয়াহী ও রহমত বহনকারী নন, আর সে জন্য তারা আপনার অনুসরণকে অস্বীকার করেছে, আপনার নবুওয়াতকে অমান্য করেছে, আপনি আমার আয়াত ও প্রকাশ্য যে সকল হুকুমসহ তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সে সবকে অস্বীকার করেছে একারণে যে, জিবরাঈল আপনার বন্ধু ও আপনার প্রতি ওয়াহী বহনকারী, আর তারা ধারণা করেছে যে, তিনি তাদের শত্রু, মানুষের মধ্যে যে জিবরাঈলের শত্রু হবে, আর জিবরাঈল আল্লাহ্র আমবিয়া কিরামের নিকট আল্লাহর ওয়াহীর বাহক ও রহমতের ধারক, একথা যারা

অস্বীকার করে, তাদের জানা উচিত যে, আমি (মুহাম্মদ (স.)) জিবরাঈলের বন্ধু এবং আমি একথা ঘোষণা করি যে, জিবরাঈল আল্লাহ্ পাকের নবী ও রাসূলগণের নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন। আর জিবরাঈলই আল্লাহ পাকের ওয়াহী আমার অন্তরে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি আমার অন্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আমার অন্তরকে সুদৃঢ় করেন।

এ ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ এই যে, ইবুন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, য়াহূদীরা যখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, আর তিনি তাদেরকে সে সকল বিষয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাদের নিকট যে জ্ঞান ছিল, তারই অনুরূপ ছিল। তখন তারা বলেছিল যে, য়াহূদীদের ধারণা, জিবরাঈল (আ.) ছিলেন শাস্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি ওয়াহী বহনকারী তথা আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তাঁর রাসূলগণের নিকট ওয়াহী আনয়নকারী ছিলেন না এবং তিনি রহমত বহনকারীও ছিলেন না। তখন তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন আল্লাহ্ পাকের ওয়াহীর বাহক। তিনি আল্লাহ্ তাআলার আযাব ও রহমতেরও বাহক। য়াহূদীরা বলল: জিবরাঈল (আ.) ওয়াহীর ও রহমতের বাহক নন। তিনি আমাদের শত্রু। তখন আল্লাহ্ পাক য়াহূদীদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি বলুন, যে জিবরাঈলের শত্রু হবে (তার জানা উচিত) জিবরাঈলই আপনার অন্তরে পবিত্র কুরআন অবতরণ করেছে। যা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করেছে এবং আপনার অন্তরের সাথে যোগাযোগকে মযবুত করেছে। অর্থাৎ আমার ওয়াহী দ্বারা যা আপনার অন্তরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। আর জিবরাঈল আপনার পূর্বেও এ দায়িত্ব অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ব্যাপারেও পালন করে এসেছে।

কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তিনি আপনার অন্তরে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন।

রবী (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি فانه نزله على قلبك-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জিবরাঈল (আ.) আপনার অন্তরে কুরআন পাক অবতীর্ণ করেছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, فانه نزله على قلبك আর তা দ্বারা তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অন্তরকে বুঝিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাআলা আয়াতের শুরুতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নিজ হতে য়াহূদীদেরকে এ সংবাদ দানের আদেশ করেছেন। কিন্তু এরূপ বলা হয়নি যে, فانه نزله على قلبي—নিশ্চয় তিনি তা আমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন। অথচ যদি على قلبي (আমার অন্তরে) বলা হতো, তবে তা সঠিক বক্তব্যের মধ্যেই গণ্য হতো। কেননা, আরবদের মধ্যে রেওয়াজ রয়েছে যে, যদি কাউকে বলা কথা নিজ হতে বর্ণনা করার আদেশ করা হয়, তখন সে একবার আদিষ্ট কাজটিকে যার পক্ষ হতে সংবাদ দান করা হয়, তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে প্রকাশ করে। যখন সে নিজের পক্ষ হতে সংবাদ দানকারী হয়, তখন সরাসরি তার নামের প্রতি সম্বন্ধ করে প্রকাশ করে থাকে, যার প্রতি সম্বোধন করা হয়,

তার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হবে قل للقوم ان الخير عندى كثير (লোকদের বল, আমার নিকট অনেক সম্পদ রয়েছে)। এখানে যার পক্ষ হতে সংবাদ দান করা হয়েছে, তার নামের প্রতি ঈঙ্গিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, সে এ বিষয়ে নিজের পক্ষ হতে সংবাদ দানে আদিষ্ট। তদ্রূপ এভাবেও কথাটিকে বলা যায় যে, قل للقوم ان الخير عندك كثير (লোকদের বল যে, তোমার নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে)। এখানে আদিষ্ট ব্যক্তির নিজের প্রতি বিষয়টিকে ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করে প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, সে যদিও একথা বলায় আদিষ্ট, তবে সেই সম্বোধিত ব্যক্তি এবং তাকে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করায় আদিষ্টও বটে। অনুরূপভাবে ولا تقل للقوم انك قائم এবং لا تقل للقوم انى قائم উভয় রূপেই বক্তব্যটিকে প্রকাশ করা যায়। انى। এর মধ্যকার ياء টি এখানে আদিষ্ট ব্যক্তির নাম-নির্দেশক। যেমন, আমরা বিবৃত করেছি। আর আল্লাহ তাআলার বাণী قل للذين كفروا سيغلبون-এর মধ্যকার سيغلبون শব্দটি ياء ও تاء যোগে উভয় পাঠরীতিতে পঠিত হিসেবে এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

আর 'জিবরাঈল' শব্দটিতে আরবদের মধ্যে একাধিক পাঠ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। হিজাযবাসিগণ جبريل (জিবরীল) ও ميكال (মীকাল) রূপে হামযাহ ব্যতীত জিবরীলের جيم ও راء-এর মধ্যে যের যোগে সহজভাবে পাঠ করেন। সাধারণভাবে মদীনা ও বসরাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আর বনী তামীম, বনী কায়স ও কতিপয় নজদবাসী শব্দ দুটিকে جبرئيل ও ميكائيل রূপে جبرعيل ও ميكاعيل-এর ন্যায় جيم ও راء-এর মধ্যে যবর যোগে হামযার সাথে এবং সে হামযার পর ياء অতিরিক্ত যোগ করে জাবরাঈল ও মীকাঈল উচ্চারণ করেন। সাধারণভাবে কূফাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ কিরাআত অনুসরণ করেন। যেমন, জারীর ইব্‌ন আতিয়্যাহ বলেছেন ঃ

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد + وبجبرئيل وكذبوا ميكالا

(তারা ক্রুশের পূজা করেছে এবং মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। আর জিবরাঈল (আ.) মীকাঈল (আ.)-কে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে)। এখানে جبرئيل শব্দটি হামযাহ ও ইয়া যোগে পাঠ করা হয়েছে। আর হাসান বসরী (র.) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর (র.) তাঁরা উভয়েই جبريل শব্দটির জীম বর্ণে যবর দিয়ে হামযাহ বর্ণটি পরিহার করে জাবরীল (جَبْرِيل) হিসেবে পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ পঠন পদ্ধতিটি জায়িয নয়। কেননা, আরবী ভাষায় فعليل ওযনে কোন শব্দের ব্যবহার নেই। কেউ কেউ এ পঠন রীতিটি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন - জাবরীল আরবী ভাষা বহির্ভূত একটি নামবাচক শব্দ। যেমন— سمويل —। নিচের পংক্তিতে এ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে ঃ

بحيث لو وزنت لخم باجمعها + ما وازنت ريشة من ريش سمويلا

(যদি তুমি সমুদয় গোশতকে ওযন দাও, তথাপি সামবীল পাখির একটি পালক পরিমাণও ওযন হবে না)।

আর বানূ আসাদ গোত্রের লোকজন জিবরাঈল শব্দটিকে জিবরীন (جبرين) হিসেবে উচ্চারণ করেন। আর কোন কোন আরবী ভাষাভাষী জিবরা-ঈল (جبرائيل), মীকা-ঈল (ميكائيل) আলিফসহ উচ্চারণ করে থাকেন। আর ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার (র.) জাবরায়াল্লু (جَبْرَئِلّ) লাম-এর تشديد সহ পাঠ করতেন বলে বর্ণিত আছে। আর جبر ও همزه-তে যবর দিয়ে جيم

ও ميكا শব্দ দুটি ইসম, যার একটির অর্থ عبد (বান্দাহ) এবং অপরটির অর্থ عبيد (ছোট বান্দাহ)। আর ايل অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা। এ অর্থের সমর্থনে দলীলঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, জিবরাঈল ও মীকাঈল অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—جبريل (জিবরীল) হলো عبد الله—আল্লাহর বান্দাহ। আর ميكائيل (মীকাঈল) হলো عبيد الله-ছোট বান্দাহ। আর ايل শব্দটি আল্লাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ক্রীতদাস উমায়র বলেছেন—اسرائيل (ইসরাঈল), ميكائيل (মীকাঈল), جبريل (জীবরীল) ও اسرافيل (ইসরাফীল) শব্দসমূহের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। আবদুল্লাহ ইবনুল হারস (র) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় ايل অর্থ আল্লাহ। আসিম (র.) ইকরামাহ (রা) হতে বলেছেন —جبريل (জিবরীল)-এর নাম হচ্ছে عبد الله (আবদুল্লাহ), আর ميكائيل (মীকাঈল)-এর নাম হচ্ছে عبيد الله (উবায়দুল্লাহ)। ايل (ঈল) শব্দটি আল্লাহ অর্থে ব্যবহৃত।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) বলেছেন, جبريل-এর নাম عبد الله (আবদুল্লাহ) এবং ميكائيل (মীকাঈল) এর নাম عبيد الله (উবায়দুল্লাহ), اسرافيل (ইসরাফীল)-এর নাম عبد الرحمن (আবদুর রহমান)। عبد শব্দটি ايل (ঈল)-এর সাথে যুক্ত হলে তার অর্থ হয় عبد الله (আবদুল্লাহ)।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) হতে আরো বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তোমাদের নামসমূহের মধ্যে জিবরীলকে কি অর্থে গণ্য কর? তিনি বলেন, জিবরীল (جبريل)-এর অর্থ হলো আবদুল্লাহ (عبد الله)। আর মীকাঈল (ميكائيل)-এর অর্থ (عبيد الله) (উবায়দুল্লাহ)। আর যে সকল নাম ايل (ঈল) যোগে ব্যবহৃত, সেগুলো হলো عبد الله (আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী)।

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা' হযরত আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, তোমরা জিবরীল নামটি কি অর্থে ব্যবহার কর? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, জিবরীলের নাম আবদুল্লাহ। তিনি আরও প্রশ্ন করেন, তোমরা মীকাঈল নামের কি অর্থ কর তা জান কি? তিনি বললেন, না, জানি না। তিনি বললেন, মীকাঈলের নাম উবায়দুল্লাহ। আর আমার নাম এ ধরনের নামে ইসরাঈল রাখা হয়েছিল। অতঃপর আমি তা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, তবে এতটুকু স্মরণ আছে যে, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যে সকল নামের সাথে ايل যুক্ত রয়েছে, সেগুলো আল্লাহর ইবাদতকারী অর্থে ব্যবহৃত?

হযরত ইকরামাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি جبريل প্রসঙ্গে বলেছেন, جبر হলো عبد (বান্দাহ), আর ايل হলো الله। সুতরাং جبريل হলো عبد الله (আবদুল্লাহ)। আর ميكا হলো عبد এবং ايل হলো الله। সুতরাং ميكائيل (মীকাঈল) হলো عبد الله (আবদুল্লাহ)।

হযরত ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা جبرئيل (জাবরাঈল) পড়েন, তাদের অভিমত ঃ তারা جبريم এর মধ্যে যবর এবং হামযাহ ও মদ (দীর্ঘস্বর) সহকারে পড়েন। جبريم-এর মধ্যে যারা যের সহকারে হামযাহ ব্যতীত পাঠ করেন, তাদের উচ্চারণেরও একই অর্থ।

আর যিনি শব্দটিকে হামযাহসহ মদ ব্যতীত লামকে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেন, তাঁর কিরাআত সম্পর্কিত ব্যাখ্যা হলো, তিনি তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা সে অর্থই গ্রহণ করেছেন, যা جبر ও ميكا-কে الله শব্দটির সাথে সংযুক্ত করায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে নাম আরবদের ভাষায় প্রচলিত- সিরীয়

ও হিব্রু ভাষায় নয়। আর তা এজন্য যে, إل শব্দটি আরবদের ভাষায় الله অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে—لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة সুতরাং একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, إل শব্দটি হলো আল্লাহ (الله)। আর এ অর্থেই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এ উক্তি, যা তিনি বনী হানীফার প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, যখন তাঁরা তাঁকে মুসায়লামা কাযযাব যা বলে বেড়ায়, তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করেছিলেন তখন তিনি তাদের বলেন: ويحكم اين ذهب بكم والله ان هذا الكلام ما خرج من ال ولا بر (হায় আক্ষেপ! সে তোমাদের কোথায় নিয়ে গেছে! আল্লাহর শপথ, এ কথাটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও নয় এবং কল্যাণকরও নয়। আর তিনি আল্ (إل) দ্বারা আল্লাহ উদ্দেশ্য করেছেন।

আবূ মাজলিয হতে বর্ণিত, তিনি لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ.)-এর কথা, যেন তিনি একথাই বলেছেন যে, যখন جبر ও ميكا এবং اسرا শব্দগুলো ايل শব্দের সাথে সম্বন্ধ করা হয়, তখন তার অর্থ عبد الله (আবদুল্লাহ) হয়। لا يرقبون في مؤمن الا যেন এরূপ বলা হয়েছে, لا يرقبون الله عز وجل।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ-এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী مصدقا لما بين يديه (তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী) দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝিয়েছেন। অতএব, আয়াতাংশের অর্থ হলো, হে রাসূল! আপনার অন্তরে জিবরাঈল কুরআন অবতরণ করেছে, যা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বক্তব্যের সাথে কুরআন মজীদের বক্তব্যের মিল রয়েছে। আর তা হলো, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে—তথা পবিত্র কুরআন, তার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি مصدقا لما بين يديه-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহ, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, আর আয়াত বা নিদর্শনসমূহ এবং রাসূলগণ যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছেন — যেমন হযরত মূসা (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত হূদ (আ.), হযরত শুআয়ব (আ.), হযরত সালিহ (আ.) এবং অন্যান্য রাসূলগণ।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি مصدقا لما بين يديه এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাওরাত ও ইনজীল কিতাবের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। হযরত রবী' (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা উধৃত আছে।

وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○-এর ব্যাখ্যা:

আর মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী هدى দ্বারা দলীল-প্রমাণ উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এজন্য হিদায়াত দানকারী আখ্যায়িত করেছেন, যেহেতু

মু'মিনগণ এর মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনের হিদায়াতের তাৎপর্য হলো, পবিত্র কুরআনকে পথ-প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা এবং পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুকরণ করা, তথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং তাতে ঘোষিত হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন করা। প্রত্যেক বস্তুর هادى (পথ-প্রদর্শক) তাই, যা তার সম্মুখ ভাগে থাকে। আর এ অর্থেই অশ্ব পালের অগ্রবর্তীকে তার হাদী বলা হয়। কেননা, সে তার সম্মুখ ভাগের অগ্রবর্তী অশ্বটি। অনুরূপভাবে মানবদেহে ঘাড়কে হাদী বলা হয়। কেননা, তা সমগ্র দেহের অগ্রবর্তী অঙ্গ। আর بشرى অর্থ সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাহগণকে সুসংবাদ দান করেছেন যে, কুরআন তাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সুসংবাদ। তাই তাদেরকে সে সকল উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যা তিনি তাদের জন্য তাঁর বেহেশতে প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যার দ্বারা তাঁর পুরস্কার হিসাবে তাদের নিবাসস্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। আর এ হলো, আল্লাহ তাআলার দেওয়া সুসংবাদ, যা তিনি তাঁর কিতাবের মাধ্যমে মু'মিনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, আরবদের ভাষায় بشارة (সুসংবাদ) হলো অন্যের নিকট হতে শুনার পূর্বে কিংবা অন্যের পক্ষ হতে জানার পূর্বে এমন বিষয়ে সংবাদ দান করা যা সে জানে না এবং যে সংবাদ তাকে আনন্দ ও পুলক দান করে। এ প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (র.) হতে আমাদের কৃত ব্যাখ্যার নিকটতম একটি ব্যাখ্যা উধৃত হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি هدى وبشرى للمؤمنين এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, কেননা, মু'মিন যখন কুরআন করীম শ্রবণ করে, তা মুখস্থ করে ও সংরক্ষণ করে। তদ্দ্বারা উপকৃত হয়। তাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, সে সবকে সত্য জ্ঞান করে এবং সে বিষয়ে সে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়।

(৯৮) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

(৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ, জিবরাঈল ও মীকাঈল-এর শত্রু (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরগণের শত্রু।

এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ মর্মে সংবাদ দান করা যে, সে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে এবং তাঁর সমস্ত ফেরেশতা ও রাসূলগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আর তাঁর পক্ষ হতে একথা জানিয়ে দেয়া যে, যে ব্যক্তি জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে শত্রুতা করেছে, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে, মীকাঈল (আ.)-এর সঙ্গে এবং সকল ফেরেশতা ও সকল রাসূলের সঙ্গেও শত্রুতা করেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সবাই আল্লাহ পাকের ওয়ালী এবং অনুগত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ওয়ালীর সঙ্গে শত্রুতা করে, সে আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করে এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শত্রুতা করে, সে তাঁর সকল অনুগত বান্দাহ ও তাঁর ওয়ালীগণের সঙ্গে শত্রুতা করে। কেননা, যে আল্লাহ পাকের শত্রু সে তাঁর ওয়ালীগণের শত্রু। আর যে তাঁর ওয়ালীগণের শত্রু হবে, সে আল্লাহ তাআলারও শত্রু। একই ভাবে যে য়াহূদীরা বলে, ফেরেশতাদের মধ্যে আমাদের শত্রু হলো জিবরাঈল আর তাঁদের মধ্যে আমাদের বন্ধু হলো মীকাঈল, আল্লাহ

পাক তাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ্ পাকের দুশমন হবে এবং ফেরেশতাদের, রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈল-এর শত্রু হবে (তাদের জানা উচিত যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক কাফিরদের শত্রু। এজন্য যে, যে জিবরাঈল (আ.)-এর শত্রু হবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সকল ওয়ালীর শত্রু হবে। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এমর্মে সংবাদ দান করেন যে, যে ব্যক্তি জিবরাঈল (আ.)-এর শত্রু, সে সকল ফেরেশতা ও রাসূলগণ এবং মীকাঈলেরও শত্রু। অনুরূপভাবে যে আল্লাহ্ পাকের কোন রাসূলের শত্রু হবে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের এবং তাঁর সকল ওয়ালীরও শত্রু হবে।

এ ব্যাখ্যার সমর্থনে দলীল এই যে, উবায়দুল্লাহ আতাকী (র.) জনৈক কুরায়শ বংশোদ্ভূত ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) য়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি তোমাদেরকে তোমাদের কিতাব সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, যা তোমরা পাঠ করে থাক, তোমরা কি তাতে লিখিত পেয়েছ যে, ঈসা ইব্ন মারয়াম আমার সম্পর্কে সুসংবাদ দান করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমাদের নিকট 'আহমদ' নামে একজন রাসূল আগমন করবেন? তখন তারা বলে, আয় আল্লাহ্! আমরা আপনাকে আমাদের কিতাবে উল্লেখ পেয়েছি, কিন্তু আমরা আপনাকে এজন্য অপসন্দ করি যে, আপনি সম্পদ আহরণকে হালাল জানেন এবং রক্ত ঝরানকেও। তখন এ আয়াত من كان عدوا لله وملائكته الاية অবতীর্ণ হয়।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) হতে বর্ণিত, একজন য়াহূদী হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে এবং সে য়াহূদী তাঁকে উদ্দেশ করে বলে, যে জিবরাঈলের কথা তোমাদের সাথী উল্লেখ করে থাকেন, সে তো আমাদের শত্রু। তখন হযরত উমর (রা.) তার জবাবে বলেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার শত্রু এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মীকাঈল-এরও শত্রু, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের জন্য শত্রু। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ঠিক হযরত উমর (রা.)-এর জবানে উচ্চারিত কথার প্রতিধ্বনি করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর এ হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতখানি য়াহূদীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভয় প্রদর্শনার্থ অবতীর্ণ করেছেন। আর তা এ মর্মে সতর্ক করা যে, যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শত্রু আল্লাহ্ তাআলাও তার শত্রু। মানুষের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শত্রু, তারা সকলেই আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যাচারী ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকারকারী।

যদি কেউ বলে জিবরাঈল ও মীকাঈল কি ফেরেশতা নন? তাদের উত্তরে বলা হবে, হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁরা ফেরেশতা। তারপর সে যদি বলে যে, তবে তাঁদের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে কেন? তদুত্তরে বলা হবে যে, তাঁদের আলোচনা পৃথকভাবে করার তাৎপর্য এই যে, য়াহূদীরা যখন বলেছে, জিবরাঈল (আ.) আমাদের শত্রু, মীকাঈল (আ.) আমাদের মিত্র, আর তারা ধারণা করেছে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এজন্য কুফরী করেছে, যেহেতু জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মদ (স.)-এর সাথী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জিবরাঈল (আ.)-এর শত্রু আল্লাহ্ তাআলাও তার শত্রু এবং সে কাফিরদের দলভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর নামকে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন এবং মীকাঈল (আ.)-এর নামকেও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। যাতে য়াহূদীদের মধ্য হতে কেউ একথা বলতে না পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা তো বলেছেন, যে আল্লাহ্ তাআলার শত্রু, সে তাঁর ফেরেশতাগণ ও তাঁর রাসূলগণের শত্রু। আর আমরা আল্লাহ্‌রও শত্রু নই এবং ফেরেশতা ও

রাসূলগণেরও শত্রু নই। কেননা, মালাইকাহ বা ফেরেশতাগণ একটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক নাম, যা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। আর জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। আর এভাবে আল্লাহ্ পাকের কালামে 'রাসূল' শব্দটিও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, হে মুহাম্মদ! আপনি তাতে অন্তর্ভুক্ত নন। এজন্য আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে য়াহূদীরা শত্রু বলে ধারণা করে, তাঁদের নাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। যদ্দ্বারা তাদের মধ্য হতে দুর্বলদেরকে তাদের বিভ্রান্ত করার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের ব্যাপারসমূহে তাদের সত্যের অপলাপ করা মুনাফিকদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। فان الله عدو للكافرين-এর মধ্যে আল্লাহকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা এবং তাতে তাঁকে পুনরুল্লেখ করা অথচ সংবাদের সূচনা তাঁর উল্লেখের মাধ্যমেই হয়েছে এবং বলা হয়েছে من كان عدوا لله وملائكته সে হিসাবে তাঁর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। যাতে বিষয়টি সংশয়যুক্ত হয়ে না পড়ে। কারণ, যদি তাঁর প্রতি ইঙ্গিতকারী সর্বনাম ব্যবহার করে فانه عدو للكافرين বলা হতো, তখন শ্রোতার নিকট فانه-এর মধ্যকার 'হ' সম্পর্কে দ্বন্দ্ব দেখা দিত যে, এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি, না আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি, না জিবরাঈল (আ.) কিংবা মীকাঈল (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? যদি ইঙ্গিতজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা এ বক্তব্যটি দেওয়া হতো, যেমন আমি এখনই উল্লেখ করেছি, তবে এর অর্থ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এর অর্থ সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ত। যেহেতু আমি যেরূপ এক্ষণে উল্লেখ করেছি, বাক্যটি সে অর্থেরও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং অস্পষ্টতা পরিহার করার জন্য সরাসরি আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ তাকে কবির নিম্নোক্ত পংক্তির ন্যায় বাক্যের সাথে তুলনা করেছেন। কবিতাটি এই—

ليت الغراب غداة ينعب دائبا + كان الغراب مقطع الاوداج

এখানে সেই ইসম বা নামকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার জন্য ইঙ্গিতকারী সর্বনাম ব্যবহারই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উল্লিখিত পংক্তিতে غراب (গুরাব) শব্দটিকে দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে, فان الله عدو للكافرين-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাম সরাসরি এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে নামের পরিবর্তে যদি তাঁর প্রতি ইঙ্গিতজ্ঞাপক সর্বনাম ব্যবহার করা হতো, তবে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা কি বুঝান হয়েছে, তা প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হতো। সুতরাং আয়াত ও কবিতার বিষয়টি ভিন্ন।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ○ (৯৯)

(৯৯) এবং নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ -এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বাণী ولقد انزلنا اليك ايات (এবং নিশ্চয় আমি আয়াতসমূহ নাযিল করেছি আপনার প্রতি) দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, হে মুহাম্মদ (স.) আমি আপনার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ নাযিল করেছি, যা আপনার নবুওয়াতের সুস্পষ্ট দলীল। আর সে সকল আয়াত হলো, যা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার কিতাবের (কুরআনের) মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। যেমন, য়াহূদীদের গুপ্ত বিদ্যা, তাদের সম্পর্কিত গোপন রহস্যের সংবাদ, বনী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের সংবাদ, আর তাদের কিতাবের মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্পর্কিত সংবাদ যা তাদের ধর্মযাজক ব্যতীত অন্য কেউ জানত না এবং তাওরাতের বিধানসমূহে তারা যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে এ ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। আর এতেই তাঁর স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিহিত রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য, যে নিজের উপর সুবিচার করেছে এবং বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ তাকে তার ধ্বংসের দিকে আহবান করেনি। কেননা, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্যরূপে মেনে নেওয়ার প্রেরণা রয়েছে। কেননা, হযরত মুহাম্মদ (স.) যা পেশ করেছেন, তা তিনি কোনো মানুষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে এখানে যা ব্যক্ত করা হয়েছে, ইব্ন আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ولقد انزلنا اليك ايات بينات-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আর আপনি তা তাদের সামনে পাঠ করে শুনাচ্ছেন, আর সকাল-সন্ধ্যায় ও তম্মধ্যবর্তী সময়ে আপনি তাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করছেন। অথচ, আপনি তাদের সামনে উম্মী, কোন কিতাব পড়েন নি, আপনি তাদেরকে সে সকল বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন, যা তাদের নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এতে তাদের জন্য উপদেশ, স্পষ্ট বিবৃতি ও তাদের বিরুদ্ধে দলীল হয়েছে। যদি তারা জানতে পারত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, ইব্ন সূরীয়া আল-কাতয়ুনী রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি আমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে আগমন করেননি, যা আমরা জানি। আর আল্লাহ তাআলাও আপনার প্রতি কোন স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেন নি যে, আমরা সে কারণে আপনার অনুসরণ করব। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون নাযিল করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে।

وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ০ -এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বাণী وما يكفر بها الا الفاسقون (আর ফাসিকগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না) দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তা অস্বীকার করে না। ইতিপূর্বেও আমি এ কিতাবে প্রমাণ করেছি যে كفر (কুফর) শব্দের অর্থ অস্বীকার করা। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ করা

নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আমি فسق (ফিস্ক)-এর অর্থও বর্ণনা করেছি। আর তা হলো এক বস্তু হতে অন্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আর আমি আপনার প্রতি ওয়াহীকৃত কিতাবের মাধ্যমে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যা বনী ইসরাঈলের ধর্মযাজক যারা আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করে ও আপনার রিসালাত মিথ্যা জ্ঞান করে, তাদের নিকট এ কথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, আপনি তাদের প্রতি প্রেরিত আমার রাসূল এবং প্রেরিত নবী। আর এ সকল নিদর্শনাবলী যা আপনার ও আপনার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণকারী, যা আমি আমার কিতাবের মাধ্যমে আপনার প্রতি নাযিল করেছি, এগুলোকে তাদের মধ্য হতে ধর্মত্যাগিগণ ব্যতীত অপর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর তারা সে সকল লোক তাদের মধ্য হতে যারা আমার ফরযসমূহ বর্জন করেছে, যা আমি তাদের উপর সে কিতাবের মাধ্যমে ফরয করেছি, যে কিতাব এগুলোর সমর্থক। বস্তুত তাদের মধ্যে সে সকল লোকই প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসী ও ধর্মীয় কিতাবের অনুসারী, যারা আপনার প্রতি আমি যা নাযিল করেছি, তার সমর্থক আর তারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত য়াহূদীদের মধ্য হতে সে সকল লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যতা স্বীকার করেছে।

(১০০) أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ০

(১০০) তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

আরবী ভাষাবিদগণ اوكلما عاهدوا عهدا। মধ্যস্থিত ওয়াও (واو) বর্ণটি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তা হচ্ছে সেই ওয়াও (واو) যা প্রশ্নবোধক বর্ণের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তা افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم-এর মধ্যকার ফা (فاء) বর্ণটির অনুরূপ এবং তাঁরা বলেছেন, এ হিসাবে এ দুটো বর্ণই অতিরিক্ত। আর তা সেই فاء বর্ণের ন্যায় যা فالله لتصنعن كذا وكذا বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্যে ব্যবহৃত হয়। আর যেমন কাউকেও উদ্দেশ করে বলা افلا تقوم —। আর ইচ্ছে করলে এখানে فاء ও واو বর্ণ দুটিকে সংযোগকারী বর্ণরূপেও গণ্য করা যেতে পারে। আর কোন কোন কূফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, এটি সংযোগকারী বর্ণ, তার উপর প্রশ্নবোধক বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার মতে তা হলো সংযোগকারী বর্ণ। তার উপর প্রশ্নবোধক الف ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وكلما عاهدوا عهدا অতঃপর وكلما-এর উপর প্রশ্নবোধক الف ব্যবহার করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, قالوا سمعنا وعصينا اوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم আর আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলার কিতাব কুরআন মজীদে অর্থহীন কোনো অক্ষরের অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। সুতরাং যারা ধারণা করেছে যে, واو এবং فاء দুটো অতিরিক্ত, তাদের ধারণাকে অশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য সে আলোচনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর عهد (ওয়াদা) হলো, সেই অঙ্গীকার, যা বনী ইসরাঈলরা

তাদের প্রতিপালককে দিয়েছে—এমর্মে যে, তারা তাওরাতের সকল বিধানকে একের পর এক পালন করে যাবে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে একদল সেই অঙ্গীকারকে একের পর এক ভঙ্গ করেছে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং তার দ্বারা তাদের বংশধরদেরকে লজ্জা দান করেছেন। যেহেতু তারা আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, সে প্রশ্নে তাদেরই কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে। আর তারা তাওরাতে তাঁর পরিচয় ও প্রশংসা সম্পর্কে যা রয়েছে, তা অস্বীকার করে কুফরী করেছে। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তবে কি যখনই বনী ইসরাঈলের য়াহূদীরা তাদের প্রতিপালকের সাথে কোন ওয়াদা করেছে এবং তারা তাঁর সঙ্গে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের একদল তা বর্জন করেছে ও ভঙ্গ করেছে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে দলীলঃ হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে এবং য়াহূদীদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের প্রতি আল্লাহর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে বিষয় উল্লেখ করেন, তখন মালিক ইবন সায়ফ নামক য়াহূদী বলে, আল্লাহর শপথ! হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারে আমাদের প্রতি আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই, আর তাঁর ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন অঙ্গীকারও গ্রহণ করা হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত اوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون নাযিল করেন আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উধৃত রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আর النبذ। মূলত আরবদের ভাষায় নিক্ষেপ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্যই اللقطة বা পথে পাওয়া বস্তুকে منبوذ (নিক্ষিপ্ত বস্তু) বলা হয়, যেহেতু তা নিক্ষিপ্ত ও ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন বস্তু। আর এ অর্থেই খেজুরের তৈরী মাদকদ্রব্যকে نبيذ বলা হয়। যেহেতু তা হলো সেই মোনাক্কা বা খেজুর যা পাত্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর তাকে পানি মিশ্রিত করা হয়েছে। আর তা মূলত مفعول ওযনে منبوذ পরবর্তী পর্যায়ে তাকে فعيل ওযনে نبيذ রূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে। অর্থাৎ نبيذ শব্দটি মূলত منبوذ ছিল, অতঃপর فعيل ওযনে রূপান্তরিত করে نبيذ (নবীয) করা হয়েছে। যেমন আবুল আসওয়াদ দায়লী বলেছেন—

نظرت الى عنوانه فنبذته + كنبذك نعلا اخلقت من نعالكا

(আমি তার লেখার শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য করেছি এবং তাকে ছুঁড়ে ফেলেছি, তোমার পুরানো জুতা নিক্ষেপ করার ন্যায়।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী نبذه فريق منهم-এর অর্থ হলো طرحه فريق منهم (তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলেছে।) সুতরাং তারা তা বর্জন করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে ও ভঙ্গ করেছে। যেমন, হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি نبذه فريق منهم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ نقضه فريق منهم (তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে।) হযরত ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি نبذه فريق منهم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন ওয়াদা নেই, যা তারা করেছিল এবং তা ভঙ্গ করে নাই। তারা আজ যে ওয়াদা করে, আগামী দিন সে ওয়াদা ভঙ্গ করে। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (র.)-এর পাঠরীতি মতে আয়াতাংশখানি হলো نقضه فريق منهم (তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে।) فريق-এর অর্থ হলো, জামাআত বা দল। এর কোন বহুবচন নেই। যেমন جيش ও رهط

শব্দগুলোরও কোন বহুবচন নেই। আর فريق منهم এর মধ্যে যে ها ও ميم (هم) রয়েছে, তা হলো বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের প্রতি ইঙ্গিতবাহী।

আল্লাহ তাআলার বাণী بل اكثرهم لا يؤمنون (বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।) এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোককে উদ্দেশ্য করেছেন, যারা যখনই আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদা করেছে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে, মু'মিন হয়নি। একারণেই এ আয়াতাংশের দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একঃ আয়াতাংশের অর্থ হলো, যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহর রাসূল (স.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করে তাদের সংখ্যা অনেক। আলোচ্য আয়াতাংশে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হবে য়াহূদীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করেছে, তখনই তাদের একটি দল তা ভঙ্গ করেছে। তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে। এ নাফরমানদের সংখ্যা অনেক। আদৌ কম নয়। দুইঃ আয়াতের অর্থ হলো, যখনই য়াহূদীরা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করেছে, তখনই তাদের একটি দল তা ভেঙ্গে দিয়েছে। শুধু যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তা নয়, বরং য়াহূদীদের অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের সত্যতায় বিশ্বাসই করে না। আল্লাহ পাকের কোনো ওয়াদা ও সতর্কবাণীর প্রতি তাদের কোনো আস্থাও নেই। মূলত ঈমান ও তাসদীকের ব্যাখ্যায় আমার এ কিতাবে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(১০১) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(১০১) যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এমন কোন রাসূল আগমন করলেন, যিনি তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক, তখন কিতাবধারীদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর কিতাবকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল। যেন তারা জানে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী ولما جاءهم দ্বারা বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের ধর্মযাজক ও জ্ঞানী লোকদের নিকট রাসূল এসেছেন, এ উদ্দেশ্য করেছেন। আর রাসূল শব্দ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বুঝান হয়েছে। যেমন হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ولما جاءهم رسول-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) আগমন করেছেন। আর আল্লাহ তাআলার বাণী مصدق لما معهم-এর ব্যাখ্যা হলো, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাওরাতকে সত্য বলে স্বীকার করেন, আর তাওরাত তাঁর সত্যতা ঘোষণা করে যে, তিনি আল্লাহর নবী। প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি।

لما معهم-এর অর্থ, য়াহূদীদের নিকট যা আছে। আর তা হচ্ছে তাওরাত কিতাব। আল্লাহ তাআলা সংবাদ দান করেন যে, য়াহূদীদের নিকট যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) আগমন করেন, তখন তাদের নিকট আল্লাহ পাকের কিতাব তাওরাত ছিল। আর তাওরাত কিতাবে উল্লিখিত ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর সত্য নবী। তাদের একদল তাঁকে স্বীকার করার পর বিদ্বেষ ও অবাধ্যতার কারণে তাঁকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী من الذين اوتوا الكتاب-এর অর্থ, তারা য়াহূদীদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণী, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাওরাত এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার বাণী كتاب الله দ্বারা তাওরাত বুঝান হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার বাণী نبذوه وراء ظهورهم-এর অর্থ, তারা তাকে তাদের পিছনে ফেলে রেখেছে। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যাখ্যানকারী সম্বন্ধে বলা হয় قد جعل فلان هذا الامر منه بظهر (অমুক এই বিষয়টিকে তার পৃষ্ঠ পশ্চাতে রেখেছে)। যেমন, হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) আগমন করেছেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাওরাত নিয়ে মুকাবিলা করেছে এবং তারা তদ্দ্বারা তাঁর সাথে বিরোধ করেছে। আর তাওরাত ও কুরআন এ বিষয়ে অভিন্ন ঘোষণা দিয়েছে। তখন তারা তাওরাতকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তারা আসিফের কিতাব ও হারূত-মারূতের জাদুকে গ্রহণ করে।

আল্লাহ্র বাণী كانهم لا يعلمون (যেন তারা জানে না)-এর ব্যাখ্যা হলো, য়াহূদীদের মধ্য হতে শিক্ষিত শ্রেণী আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করেছে এবং তারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদাকৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছে। তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার উপর আমল না করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ সম্পর্কিত আদেশ ও তার সত্যতা স্বীকার করা প্রসঙ্গে তাওরাতে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে, তারা যেন তা জানে না। আর এ হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, তারা জেনে-শুনেই সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং তারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করেছে, তাদের একথা জানা সত্ত্বেও যে, তা তাদের উপর মান্য করা ওয়াযিব। যেমন, হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিতাব দান করেছেন, তারা আল্লাহ্ তাআলার কিতাবকে অমান্য করেছে এবং পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যেন জানে না। অর্থাৎ এ সম্প্রদায় এগুলো জানত। কিন্তু তারা তাদের ইল্‌মকে বিনষ্ট করে দিয়েছে, অস্বীকার করেছে, কুফরী করেছে এবং গোপন করেছে।

(১০২) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ

وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

(১০২) এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নাই, কিন্তু শয়তানরাই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, "আমরা পরীক্ষা স্বরূপ; সুতরাং তোমরা কুফরী কর না! তারা তাদের নিকট হতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিখত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিখত, তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজ আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِينُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশে য়াহূদীদের ধর্মযাজক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সেই দলকে বুঝান হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তারা তাঁর কিতাবকে যা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা পিছনে ফেলে দিয়েছে। তাদের মূর্খতাবশত এবং তারা যা জানত, তা অস্বীকার করার কারণে। যেন তারা জানত না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন যে, তারা তাঁর সেই কিতাবকেও পরিত্যাগ করেছে, যার সম্পর্কে তারা জানত যে, তা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে তাঁর নবী (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। আর তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে যা সে কিতাবের প্রতি আমল করার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আর তারা জাদুকে

প্রাধান্য দিয়েছিল, যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যামানার শয়তানরা শিক্ষা দিয়েছিল। আর তাই হলো তাদের চরম ক্ষতি ও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মতামত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ সেই য়াহূদীদের কথা বলেছেন, যারা নবী (স.)-এর হিজরতের সময় বর্তমান ছিল। কেননা, তারা হযরত (স.)-এর সাথে তাওরাতকে নিয়ে ঝগড়া করেছিল। তারা তাওরাতকে পবিত্র কুরআনের সমর্থক পেয়েছিল। তাও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ ও তাঁকে সত্য রূপে গ্রহণ করার আদেশ করে, যদ্রূপ কুরআন তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়। তারপর তারা তাঁর সঙ্গে সেই সকল কিতাবের মাধ্যমে কলহ করে, যেগুলো হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে গণকরা লিখেছিল।

যাঁরা এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ সুলায়মান (আ.)-এর যুগে। তিনি বলেন, শয়তানরা আকাশে আরোহণ করত এবং এমন স্থানে বসত, যেখান থেকে কিছু শোনা যায়। তারা ফেরেশতাগণের কথাবার্তা কান পেতে শুনত। যখন তাঁরা পৃথিবীতে সংঘটিত মৃত্যু বা বৃষ্টিপাত কিংবা কোন ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করতেন। অতঃপর তারা গণকদের নিকট এসে তাদেরকে সে সকল বিষয়ে সংবাদ প্রদান করত। আর গণকরা সে সকল বিষয় লোকদের কাছে বলত, আর তারা বাস্তবেও তাদের কথার অনুরূপ দেখতে পেত। এমনকি যখন তাদেরকে গণকরাও নিশ্চয়তা দান করল, তারা তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং তারা তাতে বিপরীত কথাবার্তা যোগ করল। প্রত্যেক কথার সঙ্গে তারা সত্তর কথা জুড়ে দিল। আর লোকেরা এসকল কথাই গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করে এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে, জিনরা গায়েব জানে। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) মানুষের নিকট তাঁর দূত প্রেরণ করে সে সকল গ্রন্থ একত্র করেন এবং সেগুলোকে সিন্দুকে ভর্তি করেন। অতঃপর সেটিকে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখেন। শয়তানদের মধ্য হতে কেউই তাঁর সিংহাসনের নিকট যেতে পারত না, তাহলে সে জ্বলে ছাই হয়ে যেত। আর হযরত সুলায়মান (আ.) ঘোষণা করলেন, আমি যেন কারো মুখে এ কথা শুনতে না পাই যে, শয়তান গায়েব সম্পর্কে ইল্‌ম রাখে। তাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করে ফেলব।

এরপর যখন সুলায়মান (আ.) মৃত্যুবরণ করেন এবং সে সকল 'আলিম অতীত হয়ে যান, যারা সুলায়মান (আ.)-এর ব্যাপার জানতেন আর তারপর সমাজে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে বনী ইসরাঈলের একদল লোকের নিকট উপস্থিত হয়। সে তাদেরকে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক গুপ্তধনের সন্ধান দিব, যা তোমরা কখনো উপভোগ করনি। তারা বলল, হ্যাঁ বল। তখন সে বলল, তোমরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচ খনন কর। আর সে তাদের সঙ্গে গমন করে তাদেরকে স্থানটি দেখিয়ে দিল। আর স্বয়ং এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকেরা তাকে বলল, নিকটে আসুন। সে বলল, না আমি তো এখানে তোমাদের নিকটেই আছি। যদি তোমরা সেটি না পাও, তবে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেল। তখন তারা খনন করে সেই সব গ্রন্থ গেল। যখন তারা ঐ সব বাইর করল, তখন শয়তান

বলল, সুলায়মান (আ.) এ জাদু দ্বারাই মানুষ, জিন ও পাখী বশে রাখতেন। তারপর সে উড়ে চলে যায়। আর জনগণের নিকট ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলায়মান (আ.) জাদুকর ছিলেন। আর বনী ইসরাঈলরা সে গ্রন্থগুলো গ্রহণ করে। অবশেষে যখন তাদের নিকট মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তারা তদ্দ্বারা তাঁর সঙ্গে বিরোধ করে। আর এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ হয়েছে—

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, য়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে তাওরাতের বিষয়সমূহের সময়কাল সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে। তারা তাঁকে এমন কোন প্রশ্ন করেনি, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেননি। আর তিনি তাদের সহিত তদ্দ্বারা মুকাবিলা করেন। যখন তারা এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন তারা বলল, ইনি তো আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তদ্বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। আর তারা তাঁকে জাদু সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং তারা তাঁর সঙ্গে সে বিষয়ে বিরোধ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر অবতীর্ণ করেন। আর শয়তানরা একটি গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করে এবং তারা তাতে জাদু, জ্যোতিষ শাস্ত্র আরও কিছু লিপিবদ্ধ করে। তারপর তারা তা সুলায়মান (আ.)-এর আসনের নীচে পুঁতে রাখে। হযরত সুলায়মান (আ.) গায়েব জানতেন না। অবশেষে যখন সুলায়মান (আ.) ইনতিকাল করেন, তারা সেই জাদুগুলা বের করে নিয়ে তদ্দ্বারা মানুষকে প্রতারণা করতে থাকে। আর তারা বলল, এ হলো এমন এক বিদ্যা, যা সুলায়মান (আ.) গোপন করতেন এবং তদ্বিষয়ে মানুষের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন, তখন তারা তাঁর নিকট হতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল। আর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রমাণাদিকে বাতিল করে দিলেন।

ইব্‌ন যায়দ (রা.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স.) য়াহূদীদের সম্মুখীন হলেন, তাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সমর্থক হিসাবে, তখন তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পৃষ্ঠ পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে। তিনি বলেন, তারা জাদুর অনুসরণ করে। আর তারা হচ্ছে আহলে কিতাব। আর তিনি আয়াতটিকে ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر তিলাওয়াত করেন। আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে যে সকল য়াহূদী ছিল, তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ ইব্‌ন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা য়াহূদীদের নিকট জাদু আবৃত্তি করত। সে যুগের য়াহূদীরা ঐসব জাদুর অনুসরণ করত।

ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শয়তানরা যখন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত হয়, তখন তারা সংকল্প গ্রহণ করে এবং বিবিধ জাদু লিপিবদ্ধ করে। যে জাদু

বিদ্যা শিখতে চায়, সে যেন তাঁর এরূপ এরূপ করে। এমনকি যখন তাঁরা বিবিধ জাদু প্রস্তুত করে, তখন তারা ঐগুলোকে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে। তারপর তারা তার উপর সুলায়মান (আ.)-এর মোহরের নমুনায় মোহর দ্বারা অঙ্কিত করে দেয়। আর তারা তার উপর লিখে দেয়ঃ "এটা সেই গ্রন্থ, যা বাদশাহ সুলায়মান (আ.)-এর বিশ্বস্ত বন্ধু আসিফ ইব্‌ন বরখিয়া জ্ঞান ভাণ্ডার হতে সংগ্রহ করে লিখেছেন।" তারপর তারা তা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। এরপর বনী ইসরাঈলের বংশধররা তা বাইর করল ও কুসংস্কার আবিষ্কার করল এবং বলল, হযরত সুলায়মান (আ.) যে সফলতা লাভ করেছেন, তা এ সবের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তখন তারা মানুষের মধ্যে জাদু ছড়িয়ে দিল। আর তারা তা শিক্ষা গ্রহণ করল এবং অন্যকেও শিক্ষা দিল। ফলে, অন্যদের তুলনায় য়াহূদীদের নিকটই তা অধিক পরিমাণে ছিল।

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ.) সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয়, তা আলোচনা করেন এবং তাঁকে রাসূলগণের মধ্যে গণ্য করেন, তখন মদীনায় যে সব য়াহূদী ছিল, তারা বলে উঠল, তোমরা কি মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে বিস্মিত হও না! সে মনে করে যে, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ একজন নবী ছিলেন। আল্লাহর শপথ! সে তো জাদুকর ভিন্ন কিছুই ছিল না! তখন আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে তারা মুহাম্মদ (স.)-কে যা বলেছে তার প্রত্যুত্তরে আয়াত واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব চলে যায়, তখন জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে। তারপর যখন আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আ.)-কে তাঁর রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন, তখন লোকেরা আবার দীনের উপর পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর সুলায়মান (আ.) ইতিমধ্যে তাদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে অবহিত হলেন। তিনি সেগুলোকে তাঁর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখেন। আর এ উভয় ঘটনার পর সুলায়মান (আ.) ইন্তিকাল করেন। আর সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকালের পর জিন ও মানুষেরা এ সব গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হয়ে বলল, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব যা সুলায়মান (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তিনি তা আমাদের হতে গোপন রেখেছিলেন। সুতরাং তোমরা এটা গ্রহণ কর এবং এটাকেই দীনরূপে বরণ কর। তখন আল্লাহ তাআলা ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ٥ واتبعوا ما تتلوا الشياطين .. .. এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। আর শয়তান যা আবৃত্তি করত তা হচ্ছে, বাদ্য, বাজনা ও খেলাধুলা এবং সে বস্তু, যা আল্লাহ তাআলার স্মরণ হতে বিরত রাখে।

আর واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان এ আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সেই সকল য়াহূদী ধর্মযাজকের প্রতি ভয় প্রদর্শন করা, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জীবিত ছিল এবং যারা তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করত। অথচ তারা যথার্থই জানত যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তাআলার প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূলকে অস্বীকার ও তাঁর অবতীর্ণ কিতাবকে অমান্য করা এবং সে মোতাবেক আমল না করার কারণে তা তাদের প্রতি ধমক। কেননা, তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, তা আল্লাহ

পাকের কিতাব। তারা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অনুসরণ যা করছে তা হলো হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যমানায় শয়তানদের শিক্ষা। কি কারণে আমি তাদের সাথে তাদের পূর্বপুরুষদের শামিল করেছি, তা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। যা এখানে পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

আমরা এ ব্যাখ্যাকে এজন্য গ্রহণ করেছি যে, পরবর্তীরা তাই অনুসরণ করত, যা সুলায়মান (আ.)-এর যুগে এবং তৎপরবর্তী সময় শয়তানরা শিক্ষা দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট সত্যসহ নবী (স.)-কে প্রেরণ করা অবধি য়াহূদীদের মধ্যে জাদুর চর্চা সর্বদাই প্রচলিত ছিল। আল্লাহ পাকের কালাম واتبعوا দ্বারা একথা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের কয়েকজনকে বুঝান হয়েছে। কেননা, আরবদের ভাষায় পূর্ববর্তীদের কাজের সাথে পরবর্তীদের কাজের বর্ণনা দেওয়া নীতিশুদ্ধ। এ হিসাবে যে, তারা পূর্বসূরীদেরই পদাঙ্ক অনুসারী। সেই হিসাবে واتبعوا ما تتلوا الشياطين কে তাদের পরবর্তী বংশধরদের প্রতি শয়তান যা আবৃত্তি করত তা অনুসরণ করাকে সম্বন্ধ করা ঠিকই হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (স.) হতে এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। অন্য কোন দলীল দ্বারাও তা বুঝা যায় না। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলাই অপরিহার্য যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তান যা শিক্ষা দিত তার অনুসরণকারীদের প্রত্যেকেই এ আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত, যদ্রূপ আমরা উল্লেখ করেছি।

مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ-এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী ما تتلوا الشياطين আয়াতাংশে ما শব্দটি الذى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, واتبعوا الذى تتلوا الشياطين (তারা ঐ বস্তুরই অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা তাদেরকে শিক্ষা দিত।) তাফসীরকারগণ تتلوا শব্দের একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, تتلوا শব্দটি تحدث (বর্ণনা করা) تروى (রিওয়ায়াত করা) تكلم به (কোন বিষয়ে কথা বলা) تخبر (সংবাদ দেওয়া) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তির কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে তা পাঠ করা বুঝায়। তারা এ মতের সমর্থনে বলেন যে, শয়তানরাই তাদেরকে জাদু শিক্ষা দিত এবং তাদের নিকট এ শিক্ষা বর্ণনা করত। এ মতের সমর্থনে বর্ণনাঃ

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা ওয়াহী শুনত। তারা একটি কথা শুনলে এর সাথে আরো দু'শ' কথা যোগ করত। লোকেরা এ বিষয়ে যা লিখেছে হযরত সুলায়মান (আ.) তা সংগ্রহ করেন। সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা তা পেয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। আর এগুলোই হচ্ছে জাদু।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে জাদু ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক যে সকল শ্লোক আবৃত্তি করত, তাই তারা অনুসরণ করত। তিনি আমাদেরকে বললেন, আল্লাহর শপথ! জেনে রেখ, শয়তানরা এমন একটি গ্রন্থ উদ্ভাবন করে যাতে জাদু ও এক জঘন্য বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল।

অতঃপর তারা তাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদেরকে সে গ্রন্থটি শিক্ষা দেয়। ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আতা (র.) واتبعوا ما تتلوا الشياطين-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমার মতে ما تتلوا-এর অর্থ ما تحدث—তারা যা বলত।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সময় হযরত সুলায়মান (আ.) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন শয়তানরা মুক্ত হয়ে কতকগুলো লেখা প্রস্তুত করে যাতে জাদু ও কুফরী ছিল। অতঃপর তারা যে গ্রন্থটিকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে, পরবর্তী সময় তারা তা বের করে মানুষকে পড়ে শোনায়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার বাণী ما تتلوا-এর অর্থ, ما تتبعه (যা তারা অনুসরণ করত) تروونه (বর্ণনা করত) وتعملون به (সে মতে আমল করত)। যাঁরা এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের সমর্থনে আলোচনা ঃ

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি تتلوا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, تتبع (অনুসরণ করত)।

মানসুর (র.) আবূ রাযীন (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, শয়তানরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে যা পাঠ করত তারা তার অনুসরণ করত। যদি কেউ প্রশ্ন করে, هو يتلو كذا একথার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, اتباع অর্থ অনুসরণ করা। যেমন, বলা হয়ে থাকে, تلوت فلانا اذا اتبعت خلفه তুমি যখন কারো পিছনে চল এবং তার পদচিহ্নের অনুসরণ কর—তখন তুমি বল ঃ تلوت فلانا اذا مشيت خلفه واتبعت اثره। দুই, قراءة (পাঠ করা), دراسة (অধ্যয়ন করা)। যেমন বলা হয়, فلان يتلو القران—অমুক কুরআন তিলাওয়াত করে। এ অর্থে যে, সে তা পাঠ করে ও অধ্যয়ন করে।

যেমন হযরত হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তাঁর কবিতায় বলেছেন—

نبی یری ما لا یری الناس حوله + ویتلو کتاب الله فی کل مشهد

(এমন নবী, যিনি তাঁর চারিপার্শ্বে তাই প্রত্যক্ষ করেন, যা লোকেরা দেখে না। আর তিনি সকল মজলিসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন।)

আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানের তিলাওয়াতের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে সংবাদ দেননি, যদ্দ্বারা সংশয় নিরসন হতে পারে। হতে পারে যে, শয়তানরা পূর্ব বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থে তিলাওয়াত করেছে, তথা অধ্যয়ন করা, বর্ণনা করা ও আমল করা অর্থে। এমতাবস্থায় তার অর্থ হবে, তারা আমলের মাধ্যমে তার অনুসারী, আর বর্ণনা করার মাধ্যমে অধ্যয়নকারী ছিল। আর য়াহূদীগণ এক্ষেত্রে যে কর্মনীতি অনুসরণ করেছে, তার উপর আমল করেছে ও তা বর্ণনা করেছে।

عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী على الملك سليمان এর মধ্যে على অব্যয়টি في অব্যয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। এমনকি পাক কুরআনেও এমন ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—ولا صلبنكم في

جذوع النخل-এর মধ্যে في-কে على-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে فعلت كذا على عهد كذا কিংবা فعلت كذا في عهد كذا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবন জুরায়জ (র.) ও ইবন ইসহাক (র.) আমাদের ব্যাখ্যার অনুরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ইবন জুরায়জ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি على ملك سليمان-এর ব্যাখ্যায় বলেন, في ملك سليمان আর একই মন্তব্য করেছেন হযরত ইবন ইসহাক (র.)।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

যদি কেউ প্রশ্ন করে এ বক্তব্যটি واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان-এর অন্তর্গত নয়। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে কুফরীর সম্পর্ক আছে, এমন কোনো দলীলও আমাদের কাছে নেই। বরং উল্লিখিত হয়েছে য়াহূদীদের মধ্যে যারা শয়তানের অনুসরণ করেছে তাদের কথা। হযরত সুলায়মান (আ.) কুফরী করেননি একথার কারণ কি? উত্তরে বলা যেতে পারে, এর কারণ হলো, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা যে জাদু এবং কুফরী কথা শিক্ষা দিত, য়াহূদীরা তা অনুসরণ করত। তারা সেসব কিছুর সম্পর্ক আরোপ করত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি। তারা মনে করত, শয়তানরা যা করছে তা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জ্ঞাতসারেই করছে। তারা এ কথাও মনে করত তিনি যে মানুষ, জিন, শয়তান তথা আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টিকে অনুগত করে রাখতেন, তা এ জাদুর দ্বারাই করতেন। আল্লাহ পাক যে জাদুকে তাদের প্রতি হারাম করেছেন, তারা তাতে লিপ্ত হওয়াকে শোভনীয় করে পেশ করেছে। বিশেষত তারা এমন লোকদেরকে এর দ্বারা আকৃষ্ট করেছে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ছিল মূর্খ এবং আল্লাহ পাক তাওরাতে যা নাযিল করেছেন, সে সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ। এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.) কুফরী করেননি একথা বলে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তিনি আল্লাহর নবী। য়াহূদীরা একথা অস্বীকার করে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আর তারা বলত, বরং তিনি ছিলেন একজন জাদুকর। তাই আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জাদু ও কুফর থেকে পবিত্র থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। হযরত সুলায়মান (আ.) জাদুকর কিংবা কাফির ছিলেন, তাদের এ দাবীকে আল্লাহ তাআলা বাতিল করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তান যে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, তারা তাতে আমল করেছে। তা ছিল, আল্লাহ পাকের অনুসরণের জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) যে আদেশ করতেন, তার বিপরীত আমল। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ পাক যে কিতাব নাযিল করেছেন, সে কিতাবের নির্দেশেরও বিপরীত।

সা'ঈদ ইবন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান (আ.) শয়তানদের নিকট যেসকল জাদু ছিল তা অনুসন্ধান করতেন। সেগুলোকে সংগ্রহ করে তাঁর খাযাঞ্চীখানায় নিজ সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখতেন। শয়তানরা তার নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষমতা রাখত না। তখন তারা মানুষের নিকট গিয়ে তাদেরকে বলল। তোমরা কি এমন বিদ্যা লাভ করতে চাও, যার দ্বারা সুলায়মান (আ.) শয়তান ও বায়ু ইত্যাদিকে আয়ত্তাধীন রাখতেন। তখন তারা বলল, হাঁ, আমরা শিক্ষা করতে চাই। শয়তানরা তখন বলল, তা হচ্ছে তাঁর খাযাঞ্চীখানায় তাঁর সিংহাসনের নীচে। তারা মানুষকে এ বিষয়ে

উৎসাহিত করল। মানুষ তা বের করল। আর তারা তাতে আমল করতে লাগল। হিজাযবাসীরা বলত, সুলায়মান (আ.) এই জাদু দিয়ে শাসন করতেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-এর ভাষায় হযরত সুলায়মান (আ.)-কে নির্দোষ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন, واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان الاية ।—।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল জুরাদাহ্। আর তিনিই ছিলেন, স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁর নিকট অধিক সম্মানিত ও বিশ্বস্ত। তাঁর বাসনা ছিল, যেন হক জুরাদাহর সন্তানগণের পক্ষেই থাকে। তাই তিনি তাদের পক্ষেই ফায়সালা করতেন। এই সময় তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, সুলায়মান (আ.)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন কিংবা তাঁর স্ত্রীগণের কারো নিকট গমন করতেন, তখন তিনি তাঁর আংটিটি জুরাদাহর হাতে দিতেন। তারপর যখন আল্লাহ্ তাআলা সুলায়মান (আ.)-কে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এমন সময় একদিনের ঘটনাঃ তিনি জুরাদাহকে তাঁর আংটিটি দিলেন। তখন শয়তান হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বলল, আমার আংটিটি আমাকে দাও। তখন সে তাঁর নিকট হতে আংটিটি নিয়ে পরিধান করে। তখন অন্যান্য শয়তান, জিন ও মানুষেরা তার কাছে এসে জড়ো হয়। এরপর সুলায়মান (আ.) স্বয়ং জুরাদাহর কাছে এসে বললেন, আমার আংটিটি আমাকে দাও। তখন জুরাদাহ বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি সুলায়মান নও। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন সুলায়মান (আ.) উপলব্ধি করলেন যে, তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন শয়তানরা মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা সেদিনগুলোতে একটি গ্রন্থ রচনা করে। যাতে জাদু ও কুফর ছিল। তারপর তারা ঐ গ্রন্থটি সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখে। পরবর্তীতে তারা তা বের করে মানুষকে পড়ে শুনায়। তারা মন্তব্য করল যে, সুলায়মান এই গ্রন্থের দ্বারাই শাসন করত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মানুষ সুলায়মান (আ.)-এর নিকট হতে সরে গেল। এমনকি অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তাআলা এই মর্মে আয়াত واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان নাযিল করেন। অর্থাৎ শয়তানরা যেসব জাদু ও কুফরী বিদ্যা লিখেছিল, তা তারা অনুসরণ করত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا (সুলায়মান কুফরী করেনি, কুফরী করেছে শয়তানরা।) এভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

আবু মুজলিয (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান (আ.) প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তারপর যখন কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হতো, তখন তাকে সেই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো। অবশেষে সে দায়মুক্ত হতো। তারপর লোকেরা ছন্দবদ্ধ মন্ত্র ও জাদু দেখতে পেল। তারা বলল, এই জাদু দ্বারাই সুলায়মান শাসন করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر (সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরা কুফরী করেছে, তারাই মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।)

ইমরান ইব্নুল হারছ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট বসেছিলাম, তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। তাকে ইব্ন আব্বাস (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ। লোকটি বললঃ ইরাক হতে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ শহর হতে? সে উত্তর দিল কুফা হতে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, খবর কি? সে বলল, আমি তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তারা বলাবলি করে যে, আলী (রা.) তাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি কি বলছ? তুমি পিতৃহীন! আমি যদি উপলব্ধি করতাম, তবে আমি তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ দিতাম না। তার মীরাছকে বণ্টন করতাম না। তবে আমি তোমাদেরকে এ প্রসঙ্গে বলছি যে, শয়তানরা আকাশের দিকে কান পেতে কথা শুনত। তখন তাদের কেউ যে সত্য কথা শ্রবণ করত, তা নিয়ে হাযির হতো। অতঃপর যখন সে বিষয়ে কথা বলত, তখন সে তার একটি সত্য কথার সাথে সত্তরটি মিথ্যা যোগ করত। তিনি বলেন, অতঃপর মানুষ সরল বিশ্বাসে তা গ্রহণ করত। আল্লাহ্ তাআলা তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি তাকে তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন। অতঃপর তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকাল হয়, তখন শয়তান রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলল, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে তাঁর সে নিষিদ্ধ গুপ্তধন সম্পর্কে সংবাদ দিব, যার তুল্য গুপ্তধন নাই! যা তাঁর সিংহাসনের নীচে রয়েছে। তখন তারা তা বের করল এবং বলল, এতো জাদু! আর সমগ্র জাতি এমন কি তাদের বংশধরগণও তার অনুলিপি তৈরি করে রাখল। সে প্রসঙ্গে ইরাকবাসিগণ বলাবলি করত। বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে নির্দোষ ঘোষণা করে এ আয়াত নাযিল করেছেনঃ

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر -

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, আমাদের নিকট উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলাই সর্বজ্ঞ। শয়তানরা একটি গ্রন্থ উদ্ভাবন করে, যাতে জাদু এবং একটি জঘন্য বিষয় ছিল। অতঃপর তারা তা মানুষের নিকট ছড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে তা শিক্ষা দেয়। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান (আ.) যখন এ সম্পর্কে শুনতে পান, তখন তিনি সে সকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করেন এবং তা তাঁর নিকট নিয়ে আসা হয়। জনগণের তা শিক্ষা করা তিনি অপসন্দ করে সেগুলোকে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত হয়, শয়তানরা সেগুলো সে স্থান থেকে বের করে আনে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। মানুষকে তারা এ সংবাদ দেয় যে, এ হলো সেই ইল্ম্ যা হযরত সুলায়মান (আ.) গোপন রাখতেন এবং তার দ্বারা ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে এ আয়াত নাযিল করেন— وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا —।

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শয়তানরা কতকগুলো লেখা প্রস্তুত করে, যাতে জাদু ও শিরক ছিল। অতঃপর সেগুলো হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখা

হয়। যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকাল হয়, মানুষেরা তা বের করে আনে। তারা বলে যে, এগুলো সেই ইলম যা হযরত সুলায়মান (আ.) আমাদের নিকট হতে গোপন করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,- وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان প্রসঙ্গে বলেন, শয়তানরা আসমান হতে ওয়াহী কান পেতে শুনত। আর তারা যে বাক্য শ্রবণ করত, তার সঙ্গে অনুরূপ আরো অধিক কথা যোগ করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তারা এ সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছে, তা হস্তগত করেন এবং তা তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখেন। অতঃপর যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়, শয়তানরা তা বের করে আনে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করে।

শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র.) হতে বর্ণিত ঃ যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব হাতছাড়া হয়েছিল, তখন শয়তানরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অবর্তমানে জাদু লিপিবদ্ধ করত। তারা লিখে, কোন ব্যক্তি তার কাজ সমাধা করতে চাইলে সূর্যের দিকেমুখ করে এ মন্ত্র পড়বে। আর যেব্যক্তি বিপরীত কিছু চায়, সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ করে এ সব মন্ত্র পড়ে। তারা যা লিখেছে তার শিরোনামা এরূপ ঃ এ জাদুবিদ্যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আসিফ ইব্‌ন বরখিয়া বিশেষ জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে লিখেছে। পরে তা সুলায়মান (আ.)-এর কুরসীর নীচে পুঁতে রাখা হয়। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকালের পর ইবলিস জনগণকে লক্ষ্য করে বলে, সুলায়মান নবী ছিলেন না, বরং তিনি জাদুকর ছিলেন। তোমরা তার ভাণ্ডার ঘরের নীচে তাঁর সে জাদু অনুসন্ধান কর। আর সে তার গুপ্ত স্থানও দেখিয়ে দেয়। তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ। সুলায়মান (আ.) জাদুকর ছিলেন। এ সবই তাঁর এমন জাদু যার দ্বারা তিনি আমাদেরকে বশীভূত করে রাখতেন। তখন মু'মিনগণ বলেন, বরং তিনি একজন মু'মিন নবী ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন। তখন তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের আলোচনা করেন। আর দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর উল্লেখ করেন। অথচ য়াহূদীরা বলল, দেখ মুহাম্মদ (স.) সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে ফেলছে সুলায়মান কে নবীগণের সহিত উল্লেখ করে। তখন তিনি ছিলেন একজন জাদুকর। আর এর বলেই তিনি বাতাসে আরোহণ করতেন। তখন আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আ.)-এর নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আয়াত وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر প্রসঙ্গে বলেন, আর তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (স.) রাসূলগণের সাথে যখন সুলায়মান (আ.)-এর নাম উল্লেখ করেন, তখন কোন কোন য়াহূদী ধর্মযাজক বলে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারে বিস্মিত হচ্ছ। তিনি মনে করেন দাউদ (আ.)-এর পুত্র সুলায়মান (আঃ) নবী ছিল। আল্লাহর শপথ! সে ত শুধু জাদুকরই ছিল। তখন আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যখন বিষয়টি এই দাঁড়াল, যা আমরা বিবৃত করেছি, এতে একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে এমন কথা আছে যা উল্লেখ করা হয় নি। আর ঐ কথার অর্থ হলো এই শয়তানরা জাদুর ব্যাপারে যা পাঠ করত, তা এই য়াহূদীরা অনুসরণ করত। আর সে কথাটির সম্পর্ক করত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে। অথচ সুলায়মান (আঃ) কখনও কুফরী করেননি এবং জাদুতে আমল

করেননি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, শয়তানরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে এবং মানুষকে জাদুগিরি শিক্ষা দিয়েছে। ইমাম কাতাদাহ (র.) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আয়াতের অর্থ হলো শয়তানরা যে জাদুগিরি করেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরং তারা এমন একটি কাজ করেছে যার সাথে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। আর এ সম্পর্কে আমরা অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি। বিশেষত تتلوا শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ হয়ত বলতে পারে যে, জাদু কি সুলায়মান (আ.)-এর যুগ ছাড়া অন্য যুগেও প্রচলিত ছিল? তদুত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁর পূর্বেও এর প্রচলন ছিল। আল্লাহ পাক স্বয়ং ফির'আওনের যুগের জাদুগরদের খবর দিয়েছেন। আর তা ছিল সুলায়মান (আ.)-এর বহু পূর্বের যুগ। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই খবর দিয়েছেন যে, তারাও বলেছিল যে, নূহ (আ.) ছিল জাদুকর। তা হলে য়াহূদীদের সম্পর্কে এই খবর কি করে দেওয়া হয় যে, সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তান যে জাদুমন্ত্র পাঠ করেছে য়াহূদীরা তার অনুসরণ করেছে। এর উত্তরে বলা যায়, যেহেতু য়াহূদীরা জাদুকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে যার কারণ আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি, তাই আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পবিত্রতা এই আয়াতে ঘোষণা করেছেন। আর যেহেতু য়াহূদীরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের নীচে এসব জাদুমন্ত্র পেয়েছে, তাই তারা তাঁর সাথে এই সব জাদুমন্ত্রের সম্পর্ক আছে বলে জানিয়েছে।

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

তত্ত্বজ্ঞানিগণ وما انزل على الملكين-এর মধ্যকার ما অব্যয়টির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন।

তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ অস্বীকার করা। এখানে 'মা' (ما) অব্যয়টি লাম (لم)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা জাদু অবতীর্ণ করেন নাই।

রবী' ইব্‌ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি وما انزل على الملكين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি জাদু অবতীর্ণ করেন নাই। সুতরাং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও রবী' (র.)-এর উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ وما انزل على الملكين-এর অর্থ, وما ينزل على الملكين (ফেরেশতাদ্বয়ের উপর আল্লাহ তাআলা জাদু অবতীর্ণ করেন নাই)। আর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা জাদুমন্ত্র যা কিছু আবৃত্তি করত, তারা তার অনুসরণ করত। সুলায়মান (আ.) কুফরী করেন নাই এবং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতিও জাদু-বিদ্যা অবতীর্ণ করেন নাই। বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা

দিয়েছে। ফেরেশতাদ্বয় হলেন বাবিল নগরীতে অবস্থানকারী হারূত ও মারূত। এ আয়াতে ببابل هاروت وماروت শব্দদ্বয়কে পরে উল্লেখ করা হলেও, অর্থের দিক থেকে তা পূর্বে হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিরূপে তা অর্থের দিক থেকে পূর্বে হবে? উত্তরে বলা যায় যে, واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما انزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت (শয়তানরা সুলায়মান (আ.)-এর যুগে যা পাঠ করত তারা তার অনুসরণ করত। ফেরেশতাদ্বয়ের উপর জাদু অবতীর্ণ করা হয় নাই। কিন্তু শয়তানরা কুফর করেছে। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত বাবিল শহরে, যেখানে হারূত ও মারূত অবস্থান করত।) এমতাবস্থায় ফেরেশতাদ্বয়ের অর্থ হবে জিবরীল ও মীকাঈল (আ.)। যেহেতু য়াহূদী জাদুকররা ধারণা করত আল্লাহ তাআলা জিবরীল (আ.) ও মীকাঈল (আ.)-এর ভাষায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি জাদু অবতীর্ণ করতেন। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সংবাদ দান করেন যে, জিবরীল ও মীকাঈল কখনো জাদু বহন করেনি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নির্দোষ হবার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জাদু হলো শয়তানী কাজ। বাবিল শহরে মানুষকে তারা জাদু শিক্ষা দিত। যারা তা শিক্ষা দিত, তারা দুই ব্যক্তি হারূত ও মারূত। এ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে হারূত-মারূত হবে মানব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তা হবে তাদের উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ।

আর অন্যরা বলেছেন, وما انزل على الملكين-এর মধ্যকার ما অব্যয়টির অর্থ الذى (যা)। যাঁরা ঐ ব্যাখ্যা দান করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

হযরত কাতাদাহ (র.) ও হযরত যুহরী (র.) কর্তৃক আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হারূত ও মারূত ফেরেশতাগণের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতা। তারা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য নীচে নেমে এসেছিলেন। আর তা এজন্য যে, ফেরেশতাগণ মানুষের আমল সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছিল। এক মহিলা তাদের নিকট মুকাদ্দামা দায়ের করল। তখন তারা উভয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। অতঃপর তারা উভয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে চাইল কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হলো। তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় আযাবের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলো। তারা দুনিয়ার আযাব পসন্দ করল। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, তারা উভয়ে মানুষকে শুধু এ বলে জাদু শিক্ষা দিত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ এসেছি। কাজেই তোমরা এ কুফরী কর না।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এটি আরেক জাদু। য়াহূদীরা তদ্দ্বারাও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে বিরোধ করে। তিনি বলেন, য়াহূদীরা নবী (স.)-এর সঙ্গে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তদ্দ্বারাও ঝগড়া করে। আর ফেরেশতারা যা শিক্ষা দিত, তা শিখে প্রয়োগ করলেই জাদুতে পরিণত হয়।

কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাদু হচ্ছে দু' প্রকার। এক ঃ শয়তানরা যে জাদু শেখাত। দুই ঃ যা হারূত ও মারূত শিক্ষা দিত।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান।

ইব্ন যায়দ হতে বর্ণিত, তিনি ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين আয়াতটিকে فلا تكفر পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, শয়তানরা ও ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে জাদু শেখাত।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা যা শিক্ষা দিত য়াহূদীরা তার অনুসরণ করত। তারা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাও অনুসরণ করত। আর তাঁরা আল্লাহ তাআলার দু'জন ফেরেশতা ছিলেন। আমরা ইনশাআল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা করব। যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, জাদু কি আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন? আর ফেরেশতাদের পক্ষে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়া বৈধ হয়েছে কি? আমরা তার উত্তরে বলব, আল্লাহ তাআলা ভাল-মন্দ সবই অবতীর্ণ করেছেন। আর সবই তাঁর বান্দাগণের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর তা তাঁর রাসূলগণের নিকট ওয়াহী করেছেন। আর ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা যেন মানুষকে হালাল-হারামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি পাপাচার সম্পর্কে মানুষের নিকট পরিচয় দিয়ে এগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। জাদু করা এমন একটি পাপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। প্রশ্নকারীরা বলেছে, তাহলে জাদুবিদ্যা অর্জনে পাপ নেই। যেমন মদ তৈরি, মূর্তি বানাম, গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জাম ও খেলাধুলার সামগ্রী তৈরি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে গুনাহ নেই। বরং গুনাহ হলো এগুলোর ব্যবহারে। ঠিক এমনিভাবে জাদুবিদ্যা অর্জনে গুনাহ নেই। কিন্তু জাদু করাতে গুনাহ আছে। আর জাদু দ্বারা এমন লোকের ক্ষতি করার গুনাহ রয়েছে, যার ক্ষতি করা বৈধ নয়। তারা বলেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদ্বয়ের উপর জাদু অবতীর্ণ করা এবং ফেরেশতাদ্বয়ের মানুষকে তা শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। আর ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিতেন এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর যে, "আমরা উভয় ফেরেশতা পরীক্ষা স্বরূপ এসেছি।" এ ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে জাদু থেকে ও জাদু সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রম থেকে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন। বস্তুত এ পর্যায়ে গুনাহ হলো তাদের, যারা ফেরেশতাদের থেকে জাদু শিখেছে ও আমল করেছে। কেননা, আল্লাহ পাক তাদেরকে নিষেধ করেছেন জাদুবিদ্যা শিক্ষা থেকে এবং কার্যকর করা থেকে। তারা বলল ঃ যদি আল্লাহ পাক বনী আদমের জন্য জাদুবিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ করে থাকেন, তবে তা শিখতে ক্ষতি কি? যেমন ফেরেশতাদের নিকট জাদুবিদ্যা নাযিল করা নিষিদ্ধ ছিল না।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত 'মা' (ما) অব্যয়টির অর্থ আল্লাযী (الذى) আর তা প্রথমোক্ত 'মা' (ما)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া প্রথম 'মা' (ما)-টি জাদু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর দ্বিতীয় 'মা' (ما)-টি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ মতের আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, য়াহূদীরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা যা পাঠ

করত, তার অনুসরণ করত এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর মন্ত্র, যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের উগর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারও অনুসরণ করত।

এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতারা এমন বিষয় শিক্ষা দিতেন যদ্দারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান যেত। আর এটাই আল্লাহ তাআলার বাণী وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا -এর মর্মার্থ। বর্ণনাকারী আরও বলেন, জাদু তো শয়তানরা শিক্ষা দান করত। আর ফেরেশতাদ্বয় যা শিক্ষা দান করতেন তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান। যেমন আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন।

আর অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ما অব্যয়টি الذى (যা) এবং لم (না) উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়।

এমতের সমর্থকদের বর্ণনা ঃ কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বাণী يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে শিক্ষা দিত যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা? না কি যা নাযিল হয়নি তা? কাসিম বললেন, দু'টির যে কোন একটিই হোক না কেন। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র.)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং বলা হয় যে, ফেরেশতারা যা শিক্ষা দিতেন তা কি তাদের প্রতি নাযিল হয়েছিল? না কি হয় নি? তিনি বললেন, হোক বা না হোক, আমি আল্লাহ পাকের কালামের প্রতি বিশ্বাস করি।

আমার মতে, এই সব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বোত্তম বক্তব্য হলো ما অব্যয়টিকে الذى অর্থে ব্যবহার করা। এখানে ما অব্যয়টি অস্বীকারের অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আর আমি এ অর্থ এজন্য পসন্দ করেছি যে, যদি অস্বীকার অর্থে তা গ্রহণ করা হয়, তবে ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট তাঁদের উপর অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করা হবে। আর ملكين শব্দ দ্বারা হারূত-মারূতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা বুঝা যাবে না। যদি তা করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মেও জটিলতা দেখা দিবে।

ফেরেশতাদ্বয়ের নাম আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদেরকে মানব জাতির জন্য পরীক্ষামূলক পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ আআলা তাঁদের সম্পর্কে একথা ইরশাদ করেছেন যে, জাদু শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তারা বলত পবিত্র কুরআনের ভাষায় انما نحن فتنة فلا تكفر। অর্থাৎ আমরা মূলত পরীক্ষা। অতএব, তোমরা কুফরী কর না। যেন আল্লাহ পাকের বান্দাদেরকে সতর্ক করা হয় সেই জাদু থেকে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর যারা মু'মিন, তারা জাদু পরিত্যাগের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেন আর কাফিররা তা শিখে অপমানিত হয়। আর উভয় ফেরেশতা আল্লাহ পাকের অনুগত থাকে। কেননা, তারা আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই তা শিক্ষা দিচ্ছিল। আমরা অনেক ওয়ালী আল্লাহকে দেখি যাঁদেরকে মানুষ পূজা করে। অথচ এই কাজটি তাঁদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা, যাঁরা তাদের পূজা করে, তারা তাঁদের আদেশক্রমে করেনি। বরং কিছু লোক তাদের স্ব-ইচ্ছায় ওয়ালীদের পূজা করেছে। অনুরূপভাবে হারূত-মারূত ফেরেশতা যখনই জাদু শিক্ষা দিয়েছেন, তখন সে সম্পর্কে মানুষকে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যারা শিখেছে, তারা নিজেদের দায়িত্বেই শিখেছে।

হাসান হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت এ আয়াতটিকে فلا تكفر পর্যন্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁদের উপর এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

ফেরেশতাদ্বয়ের বিবরণ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বর্ণনা ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাগণের জন্য আকাশকে উন্মুক্ত করে দিলেন, যাতে তাঁরা বনী আদমের আমলের প্রতি নযর রাখতে পারেন। যখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, বনী আদম ভুল করছে, তখন তাঁরা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক। এরা সেই আদম সন্তান, যাদেরকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আর আপনার ফেরেশতাগণের দ্বারা তাদেরকে সিজদা করিয়েছেন, আর তাদেরকে প্রত্যেক বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। তারা ভুল কাজে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বললেন, তোমরা যদি তাদের স্থানে অবস্থান করতে, তবে তোমরাও তাদের ন্যায় কাজ করতে। তাঁরা বললেন, পবিত্রতা আপনারই জন্য। তবে এই ধরনের কাজ আমরা করতাম না। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন তাঁদেরকে সেই ফেরেশতাকে মনোনীত করার আদেশ করা হয়, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর তাঁরা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করেন। তখন তাঁরা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করা, চুরি, ব্যভিচার, মদ্য পান ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ব্যতীত পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁদের উভয়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর বেশী দিন যায়নি, তাদের উভয়ের সম্মুখে এমন এক মহিলাকে পেশ করা হয়, যাকে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে। যার নাম ছিল বায়যাখত। যখন তারা উভয়ে তাকে দেখতে পেলেন এবং তার সাথে ব্যভিচারের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন মহিলাটি বলল, তা হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা উভয়ে তোমাদের আল্লাহর সাথে শিরক করবে, মদ্যপান করবে, কোন মানুষকে হত্যা করবে এবং এই মূর্তিকে সিজদা করবে। তখন তারা উভয়ে বললেন, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করতে পারি না। এরপর তাদের একজন অন্যজনকে বললেন, মহিলাটির কাছে ফিরে চল। তখন সে মহিলাটি বলল, না, তোমরা মদ্যপান করা ব্যতীত তা হবে না। তখন তারা মদ্যপান করলেন এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁদের নিকট একজন ভিক্ষুক প্রবেশ করল, তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাগণের জন্য আকাশকে উন্মুক্ত করে দিলেন। তখন তাঁরা বলে উঠলেন, আপনার জন্যই পবিত্রতা, আপনিই সর্বজ্ঞ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আ.)-এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলেন যেন তাদেরকে দুনিয়া বা আখিরাতের যে কোন একটি আযাব বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। তখন তারা দুনিয়ার শাস্তি বেছে নেন। তারপর তাঁদের উভয়কে পায়ের গোড়ালি হতে ঘাড় পর্যন্ত জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। বাখতের ঘাড়ের অনুরূপ এবং তাদেরকে বাবিল শহরে স্থাপন করা হয়।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন বনী আদমের সংখ্যা অধিক হয়ে গেল এবং তারা পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন ফেরেশতাগণ, আসমান, যমীন ও পাহাড় তাদের প্রতি বদ দু'আ করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কি তাদের

ধ্বংস করবেন না? তখন আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাগণের প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন যে, আমি যদি তোমাদের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিতাম এবং তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ করতে, তবে তোমরাও তদ্রূপ কাজ করতে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাঁরা মনে মনে বললেন যে, তাঁরা যদি এর সম্মুখীন হতেন, তবে তাঁরা পাপমুক্ত থাকতেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন উত্তম ফেরেশতা নির্বাচন কর। তখন তারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করেন। এরপর তাঁরা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর যোহরা পারস্যবাসী এক মহিলার আকৃতিতে তাঁদের উভয়ের নিকট নেমে আসল। পারস্যবাসিগণ তাকে বায়যাখত নামে ডাকত। তখন তারা উভয়ে তার সাথে পাপে লিপ্ত হলো। আর ফেরেশতাগণ ঈমানদারগণের জন্য ইসতিগফার করতেন। ربنا وسعت كل شئ رحمة و علما فاغفر للذين تابوا (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে তাদের ক্ষমা করুন। সূরা মু'মিন ঃ ৪০/৭) আর যখন ফেরেশতাদ্বয় পাপ কাজে লিপ্ত হলো, তখন তাঁরা জগদ্বাসীর জন্য ইসতিগফার করেন। الا ان الله هو الغفور الرحيم (আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান)। তারপর ফেরেশতাদ্বয়কে দুনিয়া বা আখিরাত-এর মধ্যে যে কোন একটি শাস্তি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। তখন তারা দুনিয়ার শাস্তি বেছে নেয়।

আমর ইব্ন সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, পারস্যে যুহরাহ্ নাম্নী অতি সুন্দরী এক মহিলা ছিল। সে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট মুকাদ্দমা নিয়ে হাযির হয়। ফেরেশতারা তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু সে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। যে পর্যন্ত না তারা যুহরাহ্‌কে সেই বাক্যটি শিক্ষা দেয়, যা পাঠ করার মাধ্যমে আকাশে উড়া যায়। এরপর ফেরেশতারা তাকে সে বাক্যটি শিক্ষা দেয়। আর সে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে এবং আসমানের দিকে উঠে যায়। তখন তাকে তারায় রূপান্তরিত করা হয়।

ইব্ন উমর (রা.) কা'ব (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাদের মধ্যে মানুষের কার্য-কলাপ সম্পর্কে তথা মানুষের পাপাচার নিয়ে আলোচনা হয়। তখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতা নির্বাচন কর। তারা হারূত ও মারূতকে নির্বাচন করে। তখন তাদেরকে বলা হলো, আমি তোমাদেরকে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করছি। আমার এবং তোমাদের মধ্যে কোন রাসূল নেই। তোমরা দুনিয়াতে অবতরণ কর। তবে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না বা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! যেদিন তারা পৃথিবীতে এসেছেন সেদিনটিও পূর্ণ হতে দেননি। তাঁরা এমন কাজ করে বসেছেন, যা থেকে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

কা'বিল আহ্‌বার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেরেশতারা মানব জাতির কার্যক্রম তথা পাপাচারের সমালোচনা করলেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে বললেন—যদি তোমরা তাদের জায়গায় হতে, তবে তোমরাও তাদের ন্যায় মন্দ কাজে লিপ্ত হতে। যা হোক, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন ফেরেশতা নির্বাচন কর। তাঁরা হারূত-মারূতকে নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের উভয়কে বললেন, আমি মানুষের প্রতি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করি, কিন্তু আমার ও তোমাদের উভয়ের মাঝে কোন রাসূল নাই। তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ কর, আর তোমরা আমার সাথে

কাউকেও শরীক কর না, ব্যভিচার কর না। হযরত কা'বুল আহ্‌বার (র.) বলেন, সেই আল্লাহ পাকের শপথ, যাঁর হাতে কা'বের জীবন! যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা তা পূর্ণ করেননি। বরং যে কাজ আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন, সে কাজই তাঁরা করে বসলেন।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, হারূত ও মারূতের ব্যাপারটি এই ছিল যে, তাঁরা পৃথিবীবাসীর প্রতি তাঁদের ফায়সালা সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন। তখন তাঁদেরকে বলা হয়, আমি মানুষকে দশ প্রকার কুপ্রবৃত্তি দান করেছি। যদ্দ্বারা তারা আমার অবাধ্যাচরণ করে। তখন হারূত ও মারূত বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদেরকে সে সকল কুপ্রবৃত্তির সব কয়টি দান করেন, তারপর আমরা পৃথিবীতে অবতরণ করি, তবে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফায়সালা করব। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে বলেন, তোমরা অবতরণ কর। আমি তোমাদেরকে সেই দশটি কুপ্রবৃত্তি দান করলাম। আর তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য চালাও। তখন তাঁরা বাবিল শহরের দামবাওয়ান্দে পৌঁছলেন এবং যথারীতি তাঁরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য চালাতে থাকেন। সন্ধ্যা বেলায় তাঁরা আকাশে উঠে যেতেন। সকাল হলে পৃথিবীতে নেমে আসতেন। এভাবে তাঁরা বিচারকার্য চালাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একদিন তাঁদের নিকট এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা পেশ করতে আসে। তখন তার সৌন্দর্য তাঁদের উভয়কে মোহিত করে। আরবীতে তার নাম যুহরাঃ নাবাতী ভাষায় বায়যাখ্‌ত। ফার্সী ভাষায় আনাহীয। তাঁদের একজন তাঁর সাথীকে বললেন, আমি তোমাকে একথা বলতে চেয়েছিলাম। তবে আমি তোমার কাছে লজ্জা বোধ করছি। অপরজন তখন বললেন, তোমার মত কি, আমি কি তার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমরা কিরূপে আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করব? অপর জন বললেন, আমরা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করব। অতঃপর যখন মহিলাটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা নিয়ে আসল, তখন তাঁরা উভয়ে তার নিকট তাঁদের উদ্দেশ্য তুলে ধরলেন। মহিলা বলল, তা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা উভয়ে আমার স্বামীর বিষয়ে আমার পক্ষে ফায়সালা করে দিবে। তাঁরা উভয়ে তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে মহিলা তাঁদের উভয়কে একটি মন্দ কাজের আশ্বাস দিল। তাঁরা তখন সে কাজে লিপ্ত হতে এগিয়ে আসলেন। এরপর তাঁদের মধ্য হতে যিনি তার সাথে মিলিত হতে চাইলেন তাঁকে সে মহিলা বলল, আমি এ কাজ করার নই। যাবত না আমাকে তুমি এ সংবাদ দিবে যে, তোমরা উভয়ে কোন্ কালামের বলে আকাশে আরোহণ কর এবং কোন্ কালামের বলে নেমে আসতে সক্ষম হও। তাঁরা উভয়ে তাকে সে সংবাদ দান করেন। আর সে উক্ত কালাম উচ্চারণ করে আকাশ পানে আরোহণ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাকে অবতরণ করার কালামটি ভুলিয়ে দেন। ফলে সে উক্ত স্থানে রয়ে গেল। আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে একটি নক্ষত্রে পরিণত করেন। এজন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) যখনই উক্ত নক্ষত্রটিকে দেখতেন, তাকে লা'নত করতেন। আর বলতেন, এটাই সেই হারূত ও মারূতকে ফিতনায় ফেলেছিল। অতঃপর যখন রাত্রি হয়, তাঁরা আরোহণ করার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁরা সক্ষম হলেন না। তখন তাঁরা তাদের ধ্বংস উপলব্ধি করেন। তখন তাঁদেরকে পার্থিব শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি, যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দান করা হয়। তাঁরা আখিরাতের শাস্তির পরিবর্তে দুনিয়ার শাস্তিকে গ্রহণ করেন। ফলে, বাবিল শহরে তাঁদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তখন তাঁরা মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। আর তা ছিল জাদু সম্পর্কিত কথাবার্তা।

হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আদম (আ.)-এর পর যখন মানুষেরা পাপাচারে লিপ্ত হয় ও আল্লাহ্ পাকের সাথে নাফরমানী ইত্যাদি শুরু করে, তখন আসমানে ফেরেশতাগণ বলতে শুরু করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো এজগতকে আপনার ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তারা কুফরী, নিষিদ্ধ হত্যাকাণ্ড, হারাম সম্পদ ভক্ষণ, চুরি করা, ব্যভিচার করা ও মদ্যপানে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা তাদের প্রতি বদদু'আ করতে শুরু করেন এবং তাদেরকে মা'যূর (ক্ষমার্হ) মনে করেন নাই। তখন তাঁদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয় যে, তারা তো পৃথিবীর গভীরতায় অবস্থান করছে, অথচ তোমরা তাদের ওযর গ্রহণ কর না।

অতঃপর তাঁদেরকে বলা হয় যে, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত কর, আমি তাদেরকে আমার আদেশ পালনের হুকুম করব এবং আমার অবাধ্যাচারিতা হতে নিষেধ করব। তখন তাঁরা হারূত ও মারূতকে নির্বাচিত করেন আর তাঁরা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর তাদের মধ্যে মনুষ্য প্রবৃত্তি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে, তাঁর সাথে শিরক না করতে আদেশ করা হয়। আর তাঁদের উভয়কে নিষিদ্ধ হত্যাকাণ্ড সংঘটন, হারাম সম্পদ ভক্ষণ, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হতে নিষেধ করা হয়। তারপর তাঁরা পৃথিবীতে এ ভাবে কিছু কাল অবস্থান করেন এবং মানুষের মধ্যে সঠিক ও ন্যায়ানুগ ফায়সালা করতে থাকেন। আর তা হযরত ইদ্‌রীস (আ.)-এর যুগে। আর সেযুগে এক মহিলা ছিল। সকল মানুষের মধ্যে তার সৌন্দর্য তারকারাজির মধ্যে যুহ্‌রাঃ নক্ষত্রের সৌন্দর্যের তুল্য ছিল।

আর সে উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট আসে। তখন তাঁরা উভয়ে সে মহিলার প্রতি কথার মাধ্যমে আসক্তি প্রকাশ করে। আর তাঁরা উভয়ে তাকে উপভোগ করার সঙ্কল্প করে। কিন্তু সে মহিলা তাঁরা উভয়ে তার নীতি ও ধর্ম অনুসরণ করা ব্যতীত তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাঁরা উভয়ে তাকে তার 'দীন' সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সে তাঁদের জন্য একটি মূর্তি বের করে বলল, আমি এরই উপাসনা করি। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, এর উপাসনা করার আমাদের প্রয়োজন নাই এবং তাঁরা উভয়ে তার নিকট হতে চলে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্য ধারণ করেন। এরপর তাঁরা উভয়ে সে মহিলার নিকট হাযির হন এবং তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। তখন মহিলাটি বলল, তা হবে না, যদি না তোমরা আমার দীনের অনুসরণ কর। তাঁরা উভয়ে বললেন, এর উপাসনা করার আমাদের প্রয়োজন নাই। তারপর মহিলাটি যখন দেখতে পেল যে, তাঁরা উভয়ে মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করছে, তখন সে তাদের উদ্দেশে বলল, তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নাও। হয়ত তোমরা মূর্তিপূজা কর কিম্বা কাউকে হত্যা কর অথবা মদ্যপান কর। তাঁরা বললেন, এগুলোর প্রত্যেকটিই অশোভনীয়। অবশ্য এ তিনটির মধ্যে মদ্যপান করা অধিকতর সহজ। তখন সে মহিলা তাঁদেরকে মদ্যপান করায়। মদ তাদের মধ্যে যখন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাঁরা উভয়ে তখন তার সহিত কুকর্মে লিপ্ত হন। এ সময় তাঁদের নিকট দিয়ে একটি লোক পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিল। অথচ তারা তখন সে অবস্থায়ই লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়ে আশঙ্কা করেন যে, হয়ত লোকটি তাঁদের বিষয়টি প্রকাশ করে দিবে। তখন তারা উভয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর যখন তাদের থেকে মাদকতা চলে গেল, তখন তারা যে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা উপলব্ধি করলেন। তারপর তারা আসমানে উঠতে চাইলেন। কিন্তু তাতে সক্ষম হলেন না। আর তাঁদের উভয়ের ও আসমানবাসিগণের মধ্যকার পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গেল। ফলে তাঁরা যে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন ফেরেশতাগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত

করলেন এবং এতে অত্যধিক বিস্মিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, যারা পৃথিবীর অতল গহ্বরে অবস্থান করে, তারা তুলনামূলক কম খোদাভীরু হয়ে থাকে। এরপর হতে তাঁরা দুনিয়াবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করেন। আর উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে তাঁদের পাপকর্মের কারণে বলা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার শাস্তি কিংবা আখিরাতের শাস্তির মধ্য হতে যে-কোন একটিকে বেছে নাও। তখন তাঁরা বললেন, দুনিয়ার শাস্তি তো এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতের শাস্তি কখনো বন্ধ হবে না। এ বলে উভয়ে দুনিয়ার শাস্তিকে বেছে নেন। ফলে, তাঁদেরকে বাবিল শহরে অবরুদ্ধ করা হয় এবং তথায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।

হযরত নাফি' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সঙ্গে সফর করেছি। এরপর যখন শেষ রাত হলো তিনি বললেন, হে নাফি'! দেখ, 'হামরা' (লাল নক্ষত্র) উদিত হয়েছে কি? এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর আমি বললাম, হ্যাঁ উদিত হয়েছে। তিনি বললেন, তবে এর জন্য কোন ধন্যবাদ কিংবা সাদর সম্ভাষণ নেই। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটি বশীভূত ও অনুগত নক্ষত্র মাত্র। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) হতে যা শ্রবণ করেছি, শুধু তাই তোমাকে বলেছি। তিনি আরও বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে, ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! বনী আদমের অন্যায় ও পাপাচারের উপর কি ভাবে আপনার এত ধৈর্য? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি, আর তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছি। ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা যদি তাদের স্থানে হতাম, তবে আমরা আপনার অবাধ্য হতাম না। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে বেছে নাও। এরপর তাঁরা মনোনীত করায় আলস্য করেননি। পরে তাঁরা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করেন।

মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারূত-মারূতের ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, ফেরেশতাগণ আদম সন্তানদের অন্যায় কাজ-কর্মে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অথচ তাদের নিকট আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে রাসূলগণ, আসমানী গ্রন্থ ও নিদর্শনাবলী এসেছে। তখন তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত কর, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করব এবং তারা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে। তখন তাঁরা হারূত-মারূতকে মনোনীত করেন। অবতীর্ণ করার সময় আল্লাহ তাআলা তাঁদের উদ্দেশ করে বলেন, তোমরা বনী আদম এবং তাদের যুলুম, অত্যাচার ও পাপাচার সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছ। তাদের নিকট তো রাসূলগণ আগমন করেন ও আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হয়। আর আমার ও তোমাদের দু'জনের মধ্যে কোন রাসূল নেই। সুতরাং তোমরা এই কাজ কর আর এই কাজ বর্জন কর। এরপর তিনি তাঁদেরকে কতিপয় আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেন। এরপর তাঁরা পৃথিবীতে এ অবস্থায় অবতরণ করেন যে, তাঁদের চেয়ে আল্লাহ তাআলার অধিকতর অনুগত আর কেউ ছিল না। তাঁরা মীমাংসা করতেন ও সুবিচার কায়েম করতেন। এভাবে তারা দিনে মানুষের মাঝে বিচার-আচার করতেন, সন্ধ্যা হলে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতেন এবং ফেরেশতাগণের সঙ্গে অবস্থান করতেন। এরপর সকাল হলে পুনরায় অবতরণ করতেন এবং সুবিচার কায়েম করতেন। এমনকি যোহরা একটি সুন্দরী মহিলার বেশে তাঁদের নিকট হাযির হলো। সে তাঁদের নিকট মুকাদ্দমা পেশ করে। আর তাঁরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে। এরপর সে যখন উঠে যায়, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ অন্তরে একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। তখন তাঁদের একজন

অপরকে বলেন, আমি যা অনুভব করছি, তুমি কি তদ্রূপ অনুভব কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনুভব করি। তখন তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট খবর পাঠালেন যে, তুমি আমাদের নিকট এসো, আমরা তোমার পক্ষে ফায়সালা করব। এরপর যখন সে ফিরে এলো, তাঁরা তাঁদের মনের কথা বললেন, এবং তার পক্ষে রায় দিলেন। আর বললেন, তুমি আমাদের নিকট এসো। সে তাদের সান্নিধ্যে এলো। তখন তাঁরা উভয়ে তার জন্য নিজেদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করলেন। আর তাদের কামভাব তাদের অন্তরে বিরাজমান ছিল। অথচ তাঁরা স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে এবং তার উপভোগ করার মানুষের মত ছিলেন না। তারপর যখন তাঁরা উভয়ে এই পর্যায়ে পৌঁছলেন আর তাকে ব্যবহার করা বৈধ জ্ঞান করলেন এবং তাঁরা উভয়ে ফিতনায় পতিত হলেন, তখন যোহরা উড়ে চলে গেল এবং যেখানে ছিল তথায় প্রত্যাবর্তন করল। অতঃপর সন্ধ্যা হলে তারা উর্ধে আরোহণ করতে চাইলেন। তখন তাদেরকে ফেরত পাঠান হলো। উর্ধে আরোহণের অনুমতি দেওয়া হলো না। তাঁদের পাখা তাঁদেরকে বহন করল না। তাঁরা মানব জাতির মধ্য হতে এক ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন। তিনি বললেন, পৃথিবীর অধিবাসী কিরূপে আসমানের অধিবাসীর জন্য সুপারিশ করবে? তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা আপনার প্রতিপালককে আসমানে আপনার বিষয়ে ভাল আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁদের জন্য অঙ্গীকার করেন যে, একদিন দু'আ করবেন এবং তাদের জন্য পরের দিন দু'আ করতে শুরু করেন। তাঁর দু'আ কবুল হয় এবং তাঁদের উভয়কে দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তির মধ্য হতে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দান করা হয়। তাঁদের একজন তাঁর সাথীর প্রতি তাকালেন। আর তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা জানি, আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলার বিবিধ শাস্তি এরূপ এবং তা চিরস্থায়ী ও দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় সাতগুণ বেশী। তাঁদেরকে বাবিল শহরে যাওয়ার আদেশ করা হয়। তথায় তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তাঁরা লোহার মধ্যে ঝুলন্ত আছেন, বন্দী অবস্থায় তাঁরা তাঁদের ডানাগুলোর দ্বারা পতপত শব্দ করছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আর কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা وما انزل على الملكين পাঠ করেন এবং তাঁরা এর দ্বারা দু'জন মানুষকে দলীল-প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, এ পাঠরীতি সঠিক নয়। সাহাবা কিরাম (রা.), তাবিঈন ও মুসলিম বিশ্বের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ পাঠরীতি অশুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই এ পাঠরীতি অশুদ্ধ হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

بابل (বাবিল) একটি জনপদ অথবা পৃথিবীর কোনো একটি স্থান। তাফসীরকারগণ এর অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, তা দামবাওয়ান্দের অন্তর্গত বাবিল শহর। এমত পোষণকারীদের সপক্ষে দলীলঃ হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তা ইরাকের অন্তর্গত বাবিল নগরী। যাঁরা এমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনাঃ হিশাম ইবন উরওয়াহ্ তাঁর পিতা হতে, তিনি হযরত আইশা (রা.) হতে জনৈকা মহিলার কাহিনী অবলম্বনে বলেছেন, যে মহিলাটি মদীনা তায়্যিবায় এসেছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, তা ইরাকের বাবিল নগরীতে সংঘটিত হয়েছে। তথায় হারূত ও মারূত এসেছিল। সে মেয়েটি তাঁদের উভয়ের নিকট হতে জাদু শিক্ষা করেছিল।

سحر (সিহ্র) শব্দের অর্থ প্রসঙ্গেও মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তা প্রতারণা, চাকচিক্য ও লুকোচুরি, যা জাদুকররা করে থাকে। যার পরিণামে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট বস্তু তার আপন

প্রকৃতির বিপরীত বলে ধারণা হয়। এর উদাহরণঃ যেমন দূর হতে যে ব্যক্তি মরীচিকা দেখতে পায়, তার মনে তা পানিরূপে অনুভূত হয় আর দূর হতে কোন বস্তুকে দেখে সে তাকে বাস্তবের বিপরীত বস্তুরূপে গণ্য করে। আর যেমন, দ্রুত ভ্রমণরত নৌকার আরোহীর অন্তরে কল্পনা হয় যে, সে বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত যা কিছু দেখছে সবই তার সঙ্গে ভ্রমণ করছে। তাঁরা বলেন, জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থাও অনুরূপ। যখন তার সাথে জাদুকরের জাদু যুক্ত হয়, তখন সে বস্তুকে তার বাস্তব আকৃতির বিপরীত দেখতে পায়।

হিশাম ইবন উরওয়াহ্ (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জাদু করা হয়, তখন তাঁর নিকট কোন বিষয়ে ধারণা হতো যে, তিনি তা করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নাই।

হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় উধৃত হয়েছে যে, বনী যুরায়ক গোত্রীয় জনৈক লবীদ ইবন আ'সাম নামক য়াহূদী হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি জাদু করে। এমনকি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তার প্রতিক্রিয়ায় ধারণা করতেন যে, অমুক কাজটি তিনি করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নাই।

ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত, উরওয়াহ ইবন যুবায়র ও সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা.) বলতেন, বনী যুরায়ক গোত্রীয় য়াহূদীরা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য জাদুর গ্রন্থি বেঁধেছিল। অতঃপর তারা ঐ গ্রন্থিকে হাযম কূপে নিক্ষেপ করে। পরিণামে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, তিনি তাঁর দৃষ্টিকে অস্বীকার করতেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে তারা যা করেছিল, তা অবহিত করেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) উক্ত হাযম কূপে লোক প্রেরণ করেন, যথায় সে গ্রন্থিগুলো ছিল। তখন তা বের করে আনা হয়। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলতেন, আমাকে বনী যুরায়ক গোত্রীয় য়াহূদীরা জাদু করেছে।

আর এমত পোষণকারিগণ একথা অস্বীকার করেছেন যে, জাদুকর তার জাদুর মাধ্যমে কোন বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির মধ্য হতে কোন বস্তুকে অনুগত করতে পারে। বরং তারা শুধুমাত্র সেরূপ কাজই করতে পারে, যা করতে অপরাপর মানুষও সক্ষম। কিংবা তারা এমন সব কিছু তৈরি করতে পারে, যা মানুষের দৃষ্টিকে প্রতারিত করে। আর তাঁরা বলেছেন, যদি জাদুকরদের ক্ষমতায় দেহ সৃষ্টি করা এবং বস্তুর প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হতো, তবে হক ও বাতিলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। আর সকল অনুভবযোগ্য বা দৃশ্যমান বস্তু জাদুকরগণ কর্তৃক জাদুকৃত ও তার মৌলিক আকৃতি পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব হতো।

তাঁরা বলেছেন, আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বাণী فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। সূরা তাহা, ৬৬ আয়াত)-এর মধ্যে ফিরআউনের জাদুকরদের যে বিবরণ দান করেছেন, তাতে এবং হযরত আইশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছে যে বর্ণনা রয়েছে, ("যখন তাঁকে জাদু করা হয়, তখন তাঁর ধারণা হতো যে, এ কাজটি আমি করেছি, অথচ তিনি তা করেন নাই।") তদ্দ্বারা সে সকল দাবী বাতিল হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেছে, যাতে দাবী করা হয় যে, জাদুকররা তাদের জাদু দ্বারা বস্তুর মৌলিক সত্তা সৃষ্টি করতে পারে এবং যাকে সে ভিন্ন অপর মানুষের পক্ষে বশীভূত করা দুঃসাধ্য,

তা বশীভূত করতে পারে। যেমন মৃত প্রাণী, জড় পদার্থ ও জীবজন্তু। আর আমরা যা বলেছি, তার বিশুদ্ধতাও সপ্রমাণিত হয়েছে।

অন্যরা বলেছেন যে, জাদুকর তার জাদুর মাধ্যমে মানুষকে গাধায় পরিবর্তিত করতে পারে। আর সে মানুষ ও গাধা উভয়ের উপর জাদু করতে পারে। সে মৌলিক সত্তা ও দেহ সৃষ্টি করতে পারে। আর তারা এর উপর যুক্তি পেশ করেছে।

হিশাম ইবন উরওয়াহ (র.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত আইশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমার নিকট দুমাতুল জন্দলবাসী এক মহিলা আস্ল। সে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পরে তাঁর অনুসন্ধান করে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট জাদু সম্পর্কে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে। সে জাদুর উপর আমল করেনি। হযরত আইশা (রা.) উরওয়াহকে বলেন, হে ভগ্নি-তনয়! তখন আমি দেখলাম, সে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে না পেয়ে কাঁদছে। এমনভাবে কাঁদছিল যে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করতে এগিয়ে এলাম। আর সে বলছিল, আমি ভয় করছি যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আমার স্বামী ছিল। সে আমার নিকট হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধা আস্ল। আমি তার নিকট বিষয়টি বললাম। সে বলল, আমি তোমাকে যা বলি, তুমি যদি তা কর, তবে সে তোমার নিকট আসবে। অতঃপর যখন রাত হলো, তখন সে আমার নিকট দু'টি কাল কুকুর নিয়ে উপস্থিত হলো। আর সে তার একটিতে সওয়ার হলো, আমি অপরটিতে সওয়ার হলাম। ফলে কিছুই হলো না, এমনকি আমরা বাবিল শহরে অবস্থান করলাম। আকস্মিক ভাবে আমরা দু'জন লোককে উপর দিকে ঝুলন্ত দেখতে পেলাম। তারা উভয়ে বলল, কি কারণে এসেছ? আমি বললাম, তুমি কি জাদু শিক্ষা দাও? তখন তারা উভয়ে বলল, আমরা তো পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব, তুমি কুফরী কর না এবং ফিরে যাও। আর আমি তা অস্বীকার করলাম। আর বললাম, না আমি ফিরে যাব না। তখন তারা উভয়ে বলল, ঐ চুল্লির নিকট যাও এবং তাতে প্রস্রাব কর। আমি চুল্লির নিকট গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। সুতরাং আমি তাও করলাম না। অতঃপর আমি তাদের উভয়ের নিকট ফিরে এলাম। তারা উভয়ে বলল, তুমি কি তা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ করেছি। তারা বলল, তবে তুমি কি কোন কিছু দেখেছ? আমি বললাম, না, কিছুই দেখি নাই। তখন তারা উভয়ে বলল, তুমি তা কর নাই; তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। আর তুমি কুফরী কর না। আমি তা অস্বীকার করলাম। তখন তারা উভয়ে বলল, তুমি সে চুল্লির নিকট যাও এবং তাতে পেশাব কর। আর আমি তথায় গমন করলাম, আমি কেঁপে উঠলাম ও ভয় করলাম। অতঃপর আমি তাদের উভয়ের নিকট ফেরত গেলাম। আর বললাম, আমি তা করেছি। তখন তারা উভয়ে বলল, তবে কি দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, কিছুই দেখতে পাই নাই। তারা উভয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি তা কর নাই। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও এবং কুফরী কর না। নিশ্চয় তুমি তোমার কাজের প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছ। আমি অস্বীকার করলাম। তারা উভয়ে বলল, সেই চুল্লিটির নিকট গমন কর এবং তাতে প্রস্রাব কর। আমি সেখানে গিয়ে তাতে প্রস্রাব করলাম। তখন আমি এক অশ্বারোহীকে লৌহ বর্ম আচ্ছাদিত অবস্থায় আমার থেকে বের হতে দেখলাম। অতঃপর সে আকাশের দিকে চলে যায়। এমনকি সে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আমি তাদের নিকট এলাম আর বললাম, আমি তা করেছি। তারা বলল, কি দেখতে পেয়েছ? তখন আমি বললাম, একটি অশ্বারোহীকে আচ্ছাদিত অবস্থায় আমার থেকে

বের হতে দেখেছি। আর সে আকাশের দিকে চলে গিয়েছে। এমন কি আমি আর তাকে দেখি নাই। তারা উভয়ে বলল, তুমি সত্য বলেছ। তা তোমার ঈমান, তোমার থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এবার তুমি চলে যাও। তারপর আমি মহিলাটিকে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি কিছুই জানি না এবং তারা উভয়ে আমাকে কিছুই বলে নাই। তখন সে বলল, হ্যাঁ, তুমি কোন কিছু ইচ্ছা কর নাই। তুমি এ গমটি নও আর তাকে বপন কর। আমি তা বপন করলাম। অতঃপর আমি বললাম, উদগত হও, তা উদগত হলো। আমি বললাম, শস্য ফলাও। তখন তা শস্য ফলাল। অতঃপর আমি বললাম, খোসা ছাড়াও, তখন তা খোসা ছাড়াল। তারপর আমি বললাম, আটা হয়ে যাও, তা আটা হয়ে গেল। তৎপর আমি বললাম, রুটি হয়ে যাও, তা রুটি হয়ে গেল। অবশেষে আমি যখন দেখলাম যে, আমি আমার হাত থেকে যা পড়ে গেছে, তা ব্যতীত কিছুই ইচ্ছা করি নাই, তখন আমি লজ্জিত হলাম। আল্লাহর শপথ! হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আমি কখনো কিছু করি নাই, আর আমি চিরদিন তা করব না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ মতের সমর্থকগণ বলেছেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি এবং তারা তদ্দ্বারা যুক্তি পেশ করেছেন, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর তাঁরা বলেছেন, যদি জাদুকর যে কাজটি করতে সক্ষম বলে দাবী করে, সে কাজটি করতে সক্ষম না হয়, তবে সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হতো না। তাঁরা বলেন, অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে তা শিক্ষা গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর তা যদি বাস্তবের বিপরীত হয় এবং ধারণা ও কল্পনা ভিত্তিক হয়, তবে সত্যিকারভাবে বিচ্ছেদ পাওয়া যেত না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা সত্যিকার ভাবেই বিচ্ছেদ ঘটাত।

অন্যরা বলেছেন, বরং জাদু হচ্ছে চোখের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ -এর ব্যাখ্যা :

এর ব্যাখ্যা হলো এ উভয় ফেরেশতা কোন মানুষকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জ্ঞান শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উভয়ে একথা বলত যে, আমরা মানুষের জন্য মুসীবত ও পরীক্ষা স্বরূপ। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কুফরী কর না।

যেমন হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, যখন তাদের উভয়ের অর্থাৎ হারূত ও মারূতের নিকট কোন মানুষ জাদু শিক্ষা করার ইচ্ছা নিয়ে আগমন করত, তখন তারা তাকে উপদেশ দান করত, আর বল্ত, তুমি কুফরী কর না। আমরা পরীক্ষা ব্যতীত কিছু নই। অতঃপর সে যদি অবাধ্যতা প্রকাশ করত, তখন তারা উভয়ে তাকে বল্ত, এ বালুকণাগুলোর নিকট এসো, আর তার উপর প্রস্রাব কর। যখন সে তার উপর প্রস্রাব করত, তখন তার থেকে আলোকপ্রভা বেরিয়ে যেত এবং আসমানে প্রবেশ করত। আর তা ছিলো তার ঈমান। কেউ কেউ বলেছেন, ধোঁয়ার আকৃতিতে এক প্রকার কাল বস্তু বেরিয়ে তার শ্রবণেন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে এবং তার প্রত্যেক অঙ্গ মাঝে প্রবেশ করত। তা ছিল

আল্লাহর গযব। অতঃপর যখন সে তাদেরকে এ সম্পর্কে সংবাদ দান করত, তখন তারা উভয়ে তাকে জাদু শিক্ষা দান করত। আর এটাই আল্লাহর বাণী—

وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر الاية

এর মর্মার্থ। হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে মানুষকে জাদু শেখাতেন। কেউ জাদু শিখার জন্য অত্যধিক জেদ ধরলে তখন তারা তা শেখাতেন এই বলে যে. আমরা পরীক্ষা মাত্র। অতএব, কুফরী কর না।

হযরত মু'আম্মার (র.) হতে বর্ণিত, হযরত কাতাদাহ (র.) ভিন্ন অপর কেউ বলেছেন যে, তাদের উভয় হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা কাউকে শিক্ষা দান করবে না যাবত না তারা তার প্রতি আদেশ করবে এবং বলবে যে, আমরা তো ফেৎনাহ স্বরূপ। সুতরাং তুমি কুফরী কর না।

হযরত হাসান (র.) হতেও অনুরূপ একখানা হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

হযরত ইব্ন জুরায়জ থেকে বর্ণিত, তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা একথা বলে শিখাবে যে, আমরা ফেৎনাহ স্বরূপ। অতএব কুফরীতে লিপ্ত হও না। বস্তুত জাদুর প্রতি কাফির ব্যতীত অপর কেউ সাহস করবে না। এখানে فتنة (ফিৎনাহ) শব্দের অর্থ পরীক্ষা ও সতর্ক করা আর। এ অর্থেই কবির নিম্নোক্ত কবিতায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

وقد فتن الناس فى دينهم + وخلى ابن عفان شرا طويلا

(লোকেরা তাদের ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছে, ইব্ন আফ্ফান দীর্ঘ অনিষ্টকারিতার যাতনা সয়েছেন।) আর এ জন্যেই বলা হয়, فتنت الذهب فى النار (স্বর্ণকে আগুনে পরীক্ষা করেছি।) যখন তার মধ্যকার খাঁটি-অখাঁটি চেনার জন্য তাকে পরখ করে দেখা হয়েছে। আর তা فتنتها। فتنة وفتونا রূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন, হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, انما نحن فتنة আয়াতাংশে فتنة অর্থ بلاء (পরীক্ষা বা বিপদ)।

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী—তারা কাউকে একথা বলা ব্যতীত শিক্ষা দান করে না যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। তখন লোকেরা ঐ ফেরেশতাদ্বয় থেকে জাদু শিক্ষা করতে অস্বীকার করত। য়াহূদীরা তাদের উভয় হতে তা শিক্ষা করত। যদ্দারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত।

আবার কেউ বলেছেন যে, فيتعلمون আয়াতাংশে য়াহূদীদের সম্বন্ধে খবর রয়েছে। এ আয়াতাংশ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت-এর সাথে যুক্ত। তারা তাদের উভয় হতে তা শিক্ষা গ্রহণ করে, যদ্দারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। এ মত পোষণকারিগণ, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা পরে নিয়ে এসেছেন।

আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, এ আয়াতাংশকে পরবর্তী আয়াতাংশের সাথে যুক্ত করা সঠিক হবে না। আর তাতে অর্থ দাঁড়ায় যে,

লোকেরা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট থেকে জাদু শিক্ষা করত। যদ্দারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। يفرقون-এর সাথের ما অব্যয়টি الذى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সেই জাদু, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। অন্য আরো কেউ বলেছেন, তা হলো জাদুর বিপরীত আরেক অর্থ। আমরা ইতিপূর্বে এক্ষেত্রে তাফসীরকারগণের মতপার্থক্য উল্লেখ করেছি।

المرء (আল-মারউ) অর্থ, এক ব্যক্তি, যার স্ত্রীলিঙ্গ امرأة। তা একবচনে ও দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর বহুবচন হয় না। এ হিসাবেই هذا امرأ صالح هذان امرأن صالحان বলা হয়, কিন্তু هؤلاء امرأ صدق বলা হয় না। অথচ هؤلاء رجال صدق ও هؤلاء قوم صدق বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে امرأة শব্দটি একবচন ও দ্বিবচন হয়, কিন্তু তার অবিকল সুরতে বহুবচন হয় না। যেমন বলা হয় ঃ هذه امرأة, هاتان امرأتان কিন্তু هؤلاء امرأت বলা হয় না, هؤلاء نسوة বলা হয়।

الزوج (আয-যাওজু) শব্দটির অর্থ, হিজাযবাসিগণ স্বামীকে زوج বলে এবং স্ত্রীকে زوجة বলে। কিন্তু زوج শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী امسك عليك زوجك —তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭ আয়াত)

আর বনী তামীম, কায়স গোত্রের অধিকাংশ লোক ও নজদবাসিগণ বলেন, هى زوجته (সে হচ্ছে তার স্ত্রী।) যেমন কবি ফরযদক বলেছেন—

وان الذى يسعى يحرش زوجتى + كماش الى اسد الشرى يستبيلها

(যে ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে যায়, সে যেন ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের কাছে গমনকারী, যাকে সে ক্ষেপাতে চায়।)

যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, জাদুকর কিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়? তাকে বলা হবে যে, আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, জাদুর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির নিকট কোন বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থার বিপরীত ধারণা দেওয়া। যে ব্যক্তি এতটুকু বুঝতে সক্ষম, তার জন্য তাই যথেষ্ট। আর আমরা যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি, তা যদি শুদ্ধ হয়, তবে জাদুকর কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অর্থ হবে, সে তাদের প্রত্যেকের নিকট অন্যজন সম্পর্কে তার রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য যা আছে, তদ্বিষয়ে বিপরীত ধারণা দেয়, যাতে সে তাকে অপর জনের নিকট অপসন্দনীয় ও অপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে অপরজন তার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কি পরিণামে স্বামী তার স্ত্রীর নিকট বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কথা বলে। সুতরাং জাদুকরই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী হবে বলে বুঝা যাবে। যেহেতু সেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণটির উদ্ভব ঘটিয়েছে। আর আমি আমার এ কিতাবের একাধিক স্থানে এটা প্রমাণিত করেছি যে, আরবগণ বস্তুর কারণ উদ্ভাবকের দিকেই বস্তুকে সম্পর্কিত করে থাকে। যদিও সে উদ্ভাবক ব্যক্তি সৃষ্ট কাজটিতে সরাসরি জড়িত না থাকে। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। জাদুকর কর্তৃক তার জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারটিও অনুরূপ। আর আমরা যে ভাবে উল্লেখ করেছি বহু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার একই ভাবে তা উল্লেখ করেছেন। যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাদের প্রসংগে আলোচনা ঃ

কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির অর্থ হলো, উভয়ের প্রত্যেকে তার সাথী হতে বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং একে অন্যকে হিংসা করবে। আর যারা ফেরেশতাদ্বয়ের মানুষকে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান শিক্ষা দানকারী হওয়া অস্বীকার করে, তাঁরা বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী فيتعلمون منهما-এর অর্থঃ তারা সে স্থানটি জেনে নেয়। যেখানে তারা উভয়ে তাদেরকে সে বস্তু শিক্ষা দিয়েছিল, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। যেমন مكان كذا -এর স্থলে কেউ বলেন, ليت لنا كذا من كذا আর যেমন কোন কবি বলেছেন—

جمعت من الخيرات وطبا وعلبة + وصرا لاخلاف المذممة البزل
ومن كل اخلاق الكرام نميمة + وسعيا على الجار المجاور بالنجل

এখানে কবি جمعت الخيرات দ্বারা مكان خيرات উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ আমি দুনিয়ার উত্তম বস্তুসমূহের স্থানে এ সকল হীন স্বভাব ও নিকৃষ্ট কাজ সঞ্চয় করেছি।

আর এ অর্থেই অন্য একজন কবি বলেছেন—

صلدت صفا تك ان تلين حيود ها + وورثت من سلف الكرام عقوقا

অর্থাৎ তুমি তোমার সম্ভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের স্থলে পিতা-মাতার অবাধ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করেছ।

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী وما هم بضارين به من احد الا باذن الله (আর তারা তদ্দ্বারা আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হারূত-মারূত হতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর বস্তু শিক্ষা গ্রহণকারিগণ উভয়ের নিকট হতে যা শিক্ষা করেছে, তদ্দ্বারা কারই ক্ষতি করতে পারবে না। কেবলমাত্র সে ব্যক্তিরই ক্ষতি সাধন করতে পারবে, যার অদৃষ্টে লিখিত ছিল যে, তা তার ক্ষতি সাধন করবে। আর যার থেকে আল্লাহ তা'আলা সে ক্ষতি প্রতিরোধ করেছেন এবং তাকে প্রতারণা, জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক ও মন্ত্রপাঠ হতে হিফাযত করেছেন, তা তার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং এর কষ্ট তার নাগালও পাবে না।

আর আরবদের পরিভাষায় اذن (অনুমতি) শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে ঃ (১) আদেশ করা। কিন্তু وما هم بضارين به من احد الا باذن الله আয়াতাংশে ব্যবহৃত اذن শব্দ এ অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা, মহান আল্লাহ তাআলা স্বামী ও তার বৈধ স্ত্রীর মাঝে জাদু ছাড়াও বিচ্ছেদ ঘটান হারাম করেছেন। সুতরাং জাদুর মাধ্যমে তা করাতে কিভাবে তিনি আদেশ করতে পারেন ? (২) অনুমতি প্রদত্ত বস্তু ও অপর বস্তুর মধ্যে অধিকার দান করা। (৩) কোন বিষয়ে জ্ঞাত থাকা। যেমন, বলা হয় اذنت بهذا الامر اذا علمت (তুমি এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছ যখন তুমি বিষয়টি সম্পর্কে জান।) এ অর্থেই বলা হয় اذن به اذنا। আর এ অর্থেই কবি হাতীআঃ বলেছেন— الا يا هند ان جددت وصلا + والا فاذنيني بانصرام

(হে হিন্দা! তুমি যদি মিলনের প্রয়াসী হও, তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় আমাকে তুমি সম্পর্কোচ্ছেদের অনুমতি দাও।) এর দ্বারা اعلمني। আমাকে জানিয়ে দাও, এ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী فاذنوا بحرب من الله (তবে তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও।)

বস্তুত এটাই হলো আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ। যেন আল্লাহ তাআলা এরূপ বলেছেন যে, তারা ফেরেশতাদ্বয় থেকে যা শিক্ষা করেছে, তার দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কেবল মাত্র আল্লাহ্ পাকের জ্ঞাতসারে অর্থাৎ যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ব হতেই জানেন, তা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যেমন হযরত সুফিয়ান (র.) হতে বর্ণিত, وما هم بضارين من احد الا باذن الله এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অর্থ بقضاء الله (আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ফায়সালা অনুসারে।)

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

এর অর্থ হলো, সে মানুষেরা ফেরেশতাদের থেকে শিখত এমন বিষয়, যা মানুষের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। তারা তাদের কাছ থেকে সেই জাদু শিক্ষা গ্রহণ করে, যা তাদের দীনের ব্যাপারে ক্ষতিকর হতো। যা আখিরাতে তাদের উপকারে আসবে না। তা দ্বারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের দ্রব্যসামগ্রী রোযগার করত এবং উপজীবিকা লাভ করত।

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قف-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তাআলার বাণী ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق (আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত, যে কেউ ক্রয় করে, আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নাই)। এর দ্বারা এমন এক মানব সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে, যখন তাদের নিকট মহান আল্লাহ্‌র রাসূল এলেন, তাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে, তখন তারা আল্লাহ পাকের কিতাবকে তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। যেন তারা কিছুই জানে না। সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। তাই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ বনী ইসরাঈলের য়াহূদীদের মধ্য হতে যারা আমার কিতাবকে না জানার ভান করে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে, হে মুহাম্মদ! তারা আপনার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা বর্জন করেছে। এ অবতীর্ণ কিতাব তাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সমর্থক ছিল। আমি আপনাকে যখন তাদের নিকট রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, তখন তারা এসব করেছে। সুলায়মানের যুগে তারা শয়তানের শিখান জাদুকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তারা অগ্রাধিকার দিয়েছে সেই বস্তুকে যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতা শিখাত। যে ব্যক্তি আমার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের বদলে জাদুর অনুসরণ করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই। যেমন, হযরত কাতাদাহ (র.)

www.eelm.weebly.com

থেকে বর্ণিত, তিনি ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে কিতাব তাদের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার মাধ্যমে জেনেছে যে, জাদুকরের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার নিকট কোন অংশ নাই।

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো য়াহূদী। তিনি বলেন, য়াহূদীরা নিশ্চিত জেনেছে যে, যে ব্যক্তি জাদু শিক্ষা করেছে কিম্বা জাদুকে অবলম্বন করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি এমন বিষয় শিখেছে, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান যায়।

হযরত ইব্ন যায়দ (র.) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদীরা জেনেছে যে, আল্লাহর কিতাব তাওরাতের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জাদু শিখেছে এবং আল্লাহর দীনকে বর্জন করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই। আর জাহান্নামই তার বাসস্থান।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী لمن اشتراه-এর মধ্যস্থিত من অব্যয়টি রফ্‘আহ্ (পেশ)-এর অবস্থায় আছে। আর ولقد علموا আয়াতাংশ তাতে কোন আমল করেনি। কেননা, علموا শব্দটি শপথ অর্থে ব্যবহৃত। এজন্যই من অব্যয়টি রফআর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আয়াতের অর্থঃ আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি জাদু শিখেছে আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নাই। আর قد علموا আয়াতাংশ শপথের অর্থে হওয়ার কারণে লামে কসম দ্বারা তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং لمن اشتراه বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, اقسم لمن قام خير ممن قعد। (আমি শপথ করে বলছি, অবশ্যই দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।) আর যেমন বলা হয় قد علمت لعمرو خير من ابيك (তুমি অবশ্যই জেনেছ যে, আমর তোমার পিতা অপেক্ষা উত্তম।

আর من অব্যয়টি হচ্ছে হরফে জাযা। এখানে اشتراه বলা হয়েছে يشتروه বলা হয় নাই। এর কারণ, যেহেতু من এর উপর শপথের লাম لام القسم দাখিল হয়েছে। আর আরবরা যখন হরফে জাযার উপর শপথের লাম দাখিল হয়, তখন তদ্বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে অতীত ক্রিয়া ব্যবহার করে, মুযারি‘ (مضارع) বা ভবিষ্যত ক্রিয়া ব্যবহার করে না। হ্যাঁ এরূপ ব্যবহার নগণ্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেহেতু তারা জাযা-এর উপর তা মাজযুম (জযম দেওয়া) অবস্থায় কোন কিছু প্রবিষ্ট করাকে অপসন্দ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لئن اخرجوا لا يخرجون معهم। আর কখনো তার ফি‘ল (فعل)-কে তার উপরে يفعل ওযনে (মাজযুম অবস্থায়) স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করাও আছে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم + ليعلم ربي ان بيتي واسع

ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ তাআলার বাণী ما له في الآخرة من خلاق-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এখানে خلاق শব্দের অর্থ نصيب (অংশ)। যাঁরা এ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনাঃ হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ما له في الآخرة من خلاق এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ من نصيب (কোন অংশ নাই।)

হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, ما له في الآخرة من خلاق অর্থ আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। হযরত সুফয়ান (র.) বলেন, و ما له في الآخرة من خلاق এর ব্যাপারে আমরা শুনেছি যে, এর অর্থ হলো, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। আর কেউ কেউ বলেন, এখানে خلاق শব্দের অর্থ হলো দলীল।

যারা এরূপ বলেছেন, তন্মধ্যে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি و ما له في الآخرة من خلاق সম্পর্কে বলেন, আখিরাতে তার পক্ষে উপস্থাপন করার কোন প্রমাণ থাকবে না। অন্যরা বলেন, خلاق অর্থ দীন।

হযরত মা‘মার (র.) থেকে বর্ণিত, ما له في الآخرة من خلاق সম্পর্কে হযরত হাসান (র.) বলেন, তার কোন দীন নেই। অনেকের মতে خلاق-এর অর্থ এখানে জীবনোপকরণ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ما له في الآخرة من خلاق-এর অর্থ হলো জীবনোপকরণ।

এ সকল মতামতের মধ্যে অধিকতর সঠিক হলো যিনি বলেছেন, خلاق-এর অর্থ এ স্থলে অংশ। কারণ এ অর্থটি আরবদের বাক্যে পাওয়া যায়। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছে ليؤيدن الله هذا الدين باقوام لا خلاق لهم অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই এ দীনকে এমন কাওমের দ্বারা শক্তিশালী করবেন দীন ও ইসলামের মধ্যে যাদের কোন অংশ নেই। এ অর্থেই উমায়্যা ইব্ন আবিস সালতের এ কবিতা—

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم + الا سرابيل من قطر واغلال

"তারা অকল্যাণের দিকে ডাকে, যার মধ্যে সেখানে তাদের জন্য তামার জামা এবং বেড়ী ছাড়া আর কোন অংশ নেই।"

এমনিভাবে আয়াত ما له في الآخرة من خلاق-এর অর্থ হলো পরকালে জান্নাতে তার কোন অংশ নেই। কারণ দুনিয়াতে তার ঈমান নেই, দীন নেই, কোন সৎকর্মও সে করে না—যার বিনিময়ে জান্নাতের অংশ তাকে দেওয়া হবে এবং তাকে পুণ্য দেওয়া হবে, যার ফলে সে জান্নাতের অংশ পাবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন و ما له في الآخرة من خلاق অর্থাৎ পরকালীন চিরস্থায়ী যিন্দিগীতে জান্নাতে তার কোন অংশ নেই। কেননা তার ঈমান ছিল না, দীন ছিল না এবং নেক আমলও ছিল না, যার বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করত, ছাওয়াব হাসিল করত। ফলে জান্নাতের কিছু অংশ সে পেত। মূলত আল্লাহ পাক যে ما له في الآخرة من خلاق বলে ইরশাদ করেছেন, এর তাৎপর্য হলো এই যে, জান্নাতে তার কোন অংশ নেই। তথা তার নেক আমলের কোন বিনিময় বা ছাওয়াব নেই, যা আছে তা হলো শুধু দোযখের অংশ। কেননা, তার নেক আমলের কোন বিনিময় আখিরাতে তার জন্য নেই। অবশ্য তার মন্দ কাজের বিনিময় রয়েছে বিদ্যমান।

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ -এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা‘ফর তাবারী (র.) বলেন, পূর্বের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, شروا শব্দের অর্থ হলো তারা বিক্রয় করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, সে বস্তু অত্যন্ত মন্দ,

যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে তথা জাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছে। যদি সে জানত তার শোচনীয় পরিণাম। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ولبئس ما شروا به انفسهم -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যার বিনিময়ে তারা নিজ আত্মাকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না নিকৃষ্ট!"

যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কি অর্থে ইরশাদ করেছেন যে, "তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানতে পারত!" অথচ ইতিপূর্বে তিনি অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, "আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত, যে কেউ তা ক্রয় করে আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।" তা হলে কিভাবে তারা জানতে পারল যে, যারা জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। অথচ তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, তারা অত্যন্ত মন্দ জিনিসের বিনিময়ে জাদুবিদ্যা অর্জন করেছে। এর জবাবে বলা যায়, অর্থটি ঠিক এ পদ্ধতিতে নয় যেটা তুমি ধারণা করেছ যে, তাদেরকে যে বিষয়ে বিজ্ঞ বলা হয়েছে, ঠিক সেই বিষয়েই অজ্ঞ, বরং আয়াতের শেষাংশে যে অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, অর্থের দিক থেকে এটার অবস্থান পূর্বে। তাই আয়াতের অর্থ হলো, তারা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কারো ক্ষতি করতে পারে না। আর তারা এমন কিছু শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি সাধন করে এবং যা কোনো উপকারই করে না। তারা যার বিনিময়ে তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ, যদি তারা জানত! আর তারা নিশ্চিতভাবেই জানত যে, যে-কেউ তা ক্রয় করে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। সুতরাং আল্লাহ পাকের বাণী لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির শিক্ষা গ্রহণকারীদের কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা সন্তুষ্ট চিত্তে জাদুর বিনিময়ে তাদের আত্মাকে বিক্রয় করে সেই দীনের পরিবর্তে যাতে রয়েছে তাদের ধ্বংস থেকে নাজাত ও মুক্তির দিশা। এটা তারা করে তাদের কাজের মন্দ পরিণাম এবং বিক্রয়ের ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত। কারণ, ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এটা তারাই শিক্ষা করে, যারা আল্লাহ তা'আলার মারিফত হাসিল করেনি এবং তাঁর হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সেই দলের বিষয় পুনরাবৃত্তি করেছেন, যাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, "তারা তাঁর কিতাবকে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করেছে যেন তারা কিছুই জানে না।

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما انزل على الملكين "এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত", "এবং যা ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।"..অতঃপর তিনি এদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, এরা জানত, যে জাদু ক্রয় করে আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। তার এদের কথাই বলেছেন যে, এরা জেনেশুনে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করে এবং শয়তান ও তার অনুসারীদের অনুকরণ করে। শত্রুতা, রাসূলের প্রতি বিদ্রোহ ও বিদ্বেষ এবং আল্লাহ পাকের সীমালংঘনবশত তারা তাঁর কিতাব, ওয়াহ্‌ী প্রভৃতি ছেড়ে তাদের গড়া জাদুর উপর আমল করে। তারা জানে যে, যে ব্যক্তি এরূপ করে, তার জন্য আল্লাহর শাস্তি ও আযাব রয়েছে---এটাই হলো আয়াতের বিশ্লেষণ।

কিছু লোক ধারণা করে ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق-এর দ্বারা শয়তানদেরকে বুঝান হয়েছে এবং لو كانوا يعلمون-এর দ্বারা বুঝান হয়েছে মানুষকে। এটা সকল প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরের মতের পরিপন্থী। কারণ, তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ পাকের কালাম ولقد علموا لمن اشتراه দ্বারা য়াহূদীদের কথাই বলা হয়েছে, শয়তানদের কথা নয়। পরন্তু এটা সরাসরি কুরআন করীমের আয়াতেরও খিলাফ। কারণ ولقد علموا لمن اشتراه এর পূর্ববর্তী আয়াত এবং لو كانوا يعلمون-এর পরবর্তী আয়াতসমূহ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে য়াহূদীদের নিন্দাবাদ জ্ঞাপন এবং তাদের গোমরাহীর কারণে সতর্কীকরণের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। য়াহূদীরা তাদের মন্দ কাজ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ওয়াহ্‌ী ও কিতাবের আয়াতসমূহকে পিছনে নিক্ষেপ করার নিন্দা এ আয়াতসমূহে রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق হলো য়াহূদীদের সম্বন্ধে একটি খবর।

কারো কারো মতে ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون বলে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের অজ্ঞতার কথা বলেছেন, যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق বলেছেন। আর প্রথমে ولقد علموا বলে তাদের জানার কথা ঘোষণা করে পরক্ষণেই لو كانوا يعلمون বলে না জানার কথা এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের জানা মত কাজ করে না। আর আলিম বা বিজ্ঞ লোক সেই, যে তার ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। কারো কাজ তার জ্ঞানের খিলাফ হলে সে মূর্খের শামিল। আর কখনো কখনো যে কাজ করা উচিত তার বিপরীত কিছু করলে সে যদি আলিমও হয় তবু তাকে বলা হয়, তুমি যদি জানতে, তাহলে অবশ্যই এটা করা থেকে বিরত থাকতে। যেমনটি বলেছেন কা'ব ইবন যুহায়র আল-মুযানী তাঁর খাদ্যদ্রব্য পাবার আশায় তাঁর অনুসরণকারী বাঘ ও কাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে—

اذا حضراني قلت لو تعلمانه + ألم تعلما اني من الزاد مرمل

"যখন তারা উভয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলো, আমি বললাম, যদি তোমরা জানতে! তোমরা কি জান না যে, আমার খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হয়ে গেছে?" তিনি এখানে لو تعلمانه (যদি তোমরা জানতে) বলে তাদের জ্ঞান না থাকার কথা বলেছেন। এরপর আবার ألم تعلما বলে তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। তাই উক্ত মুফাস্‌সিরগণের দাবী হলো, এমনি ভাবেই উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ পাকের বাণী ولقد علموا لمن اشتراه এবং ولو كانوا يعلمون।

এই ব্যাখ্যার উৎস ও বিশুদ্ধতা থাকলেও এটা ولقد علموا এবং لو كانوا يعلمون-এর স্পষ্ট বক্তব্যের খিলাফ। এটা অতি কষ্ট-কল্পনা। আর কুরআনের ব্যাখ্যা সাধারণত স্পষ্ট বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, অস্পষ্ট ও লুক্কায়িত বক্তব্যের উপর নয়। যাদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট অর্থ ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ইঙ্গিতবহ লুক্কায়িত অর্থ গ্রহণ করা উত্তম হবে না।

(١٠٣) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

(১০৩) তারা যদি ঈমান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই তাদের প্রতিফল আল্লাহর নিকট থেকে অধিক কল্যাণকর হতো, যদি তারা তা অনুধাবন করত।

ولو انهم امنوا واتقوا-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, যারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিদ্যা শিখত, তারা যদি ঈমান আনত অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (স.) এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর যদি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করত এবং তাদের প্রতিপালককে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করত, তাঁর অপরিহার্য কর্তব্য আদায়ের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করত এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকত, তবে অবশ্যই তাদের ঈমান ও পরহিযগারীর বিনিময়ে লাভ করত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অনেক ছাওয়াব আর তা হতো জাদুবিদ্যা ও তার দ্বারা যা তারা উপার্জন করে তার তুলনায় অধিক কল্যাণকর। যদি তারা জানত যে, ঈমান ও তাকওয়ার বিনিময়ে দেওয়া আল্লাহর ছাওয়াব তাদের জন্য জাদু ও তাদের উপার্জিত বস্তুর তুলনায় অধিক কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা এখানে لو كانوا يعلمون দ্বারা ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে তিনি কত ছাওয়াব দান করবেন, তা তারা জানত না।

আরবী ভাষায় مثوبة শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এর মূল অর্থ হলো ফেরত দেওয়া। তাই اثبته اليك। অর্থ—আমি ওটা তোমাকে ফেরত দিয়েছি। সুতরাং কেউ কাউকে হাদিয়া বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো, তাকে তার সে দানের প্রতিদান দেওয়া এবং তার বিনিময় দেওয়া। এরপর দান ছাড়া সকল বিনিময়—তা কাজের হোক, হাদিয়া বা উপঢৌকনের হোক অথবা বদনের হোক, যা তার পক্ষ থেকে আমলকারী, হাদিয়াদাতা প্রমুখকে বিনিময় স্বরূপ দেওয়া হয়, তাকেই ছাওয়াব বলা হয়। আর এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাহ্‌র আমলের বিনিময়ে বান্দাহকে যা দান করেন, তাকে ছাওয়াব বলা হয়। বসরার কিছু সংখ্যক আরবী ব্যাকরণবিদ-এর ধারণা হলো ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير আয়াতখানা সে ধরনেরই একটি আয়াত, যার অর্থ বুঝবার জন্য তার জওয়াব উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আয়াতে কারীমাহ্‌র অর্থ হলো, "যদি তারা ঈমান আনত এবং পরহিযগারী অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই তাদেরকে ছাওয়াব বা বিনিময় দেওয়া হতো।" কিন্তু এখানে 'অবশ্যই তাদেরকে ছাওয়াব দেওয়া হতো' لا ثيبوا উল্লেখ না করে لمثوبة ব্যবহার করা হয়েছে। আর বসরার কিছু সংখ্যক আরবী ব্যাকরণবিদ এ বক্তব্য অস্বীকার করেন। তাদের মতে لمثوبة শব্দটিই ولو انهم امنوا واتقوا-এর জওয়াব। لو-এর খবর রূপে ক্রিয়ার অতীতকাল ব্যবহৃত হলেও এ স্থলে لمثوبة-এর দ্বারা তার জওয়াব আনা হয়েছে এ কারণে যে لو এবং لئن আরবী ভাষায় প্রায় সমার্থক। কারণ, উভয়টিই ايمان এর জওয়াব। তাই একটির জওয়াব অন্যটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর لو-এর ক্ষেত্রে لئن ব্যবহার করা হয়েছে এবং لئن-এর ক্ষেত্রে لو ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও -এর প্রয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। সুতরাং لو ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হলো ক্রিয়ার অতীতকালের সাহায্যে তার জওয়াব আনা এবং لئن ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হলো ক্রিয়ার বর্তমানকালের সাহায্যে তার জওয়াব আনা। এর কারণ একটু পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তাই তারা ولو انهم امنوا واتقوا-এর অর্থ করেন ولئن امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير আর مثوبة-এর যে ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি, তাফসীরকারগণ তাই বলেছেন। হযরত

কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لمثوبة من عند الله সম্পর্কে বলতেন, এর অর্থ হলো ثواب من عند الله (আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব)। হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله এখানে مثوبة অর্থ ছাওয়াব। হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير সম্পর্কে তিনি বলতেন, এর অর্থ ثواب من عند الله (আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াব)।

(১০৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(১০৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা راعنا শব্দ ব্যবহার কর না। انظرنا বল এবং মনোযোগ সহকারে শোন, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا-এর ব্যাখ্যা ঃ

لا تقولوا راعنا-এর তাফসীর সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো "তোমরা উল্টোটা বল না। যারা এমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا অর্থ 'তোমরা উল্টোটা বল না'। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে একই অর্থ বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরো একটি অর্থ বর্ণিত। আর অন্যান্যের মতে এর তাফসীর হলো, 'আমাদের কথা শুনুন'। অর্থাৎ আপনিও আমাদের কথা শুনুন আর আমরাও আপনার কথা শুনি। যারা এ অর্থ করেছেন তারা হলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে راعنا সম্পর্কে বর্ণিত যে, এর অর্থ হলো, 'আপনি আমাদের কথা শুনুন'। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, আয়াতে কারীমাহ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা এরূপ বল না যে, 'আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমরাও আপনার কথা শুনব'। হযরত দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত, راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলত, 'আপনি আমার কথা শুনুন'।

আল্লাহ তা'আলা কি কারণে মু'মিনদেরকে راعنا বলতে নিষেধ করেছেন, সে কারণ সম্পর্কেও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, য়াহূদীগণ বিদ্রূপ ও গালি হিসেবে ঐ শব্দটি ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে প্রিয় নবী (স.)-এর ব্যাপারে শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত, يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, য়াহূদীরা ঠাট্টাচ্ছলে এ শব্দটি (راعنا) ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের অনুরূপ কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, য়াহূদীদের মধ্য থেকে কিছু লোক

বলত, আপনি আমাদের কথা শুনুন। তাদের কথা শুনে মুসলমানদেরও কিছু লোক এরূপ বলতে শুরু করল। এতে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য য়াহূদীদের একথা বলা অপসন্দ করে বললেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা راعنا বল না, যেমনটি য়াহূদী ও খৃস্টানরা বলে থাকে। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا সম্পর্কে তিনি বলেন, মু'মিনগণ বলত, راعنا سمعك (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন)। য়াহূদীরা সেখানে আসত। এরপর ঠাট্টাচ্ছলে এরূপ বলতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا —। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা রাসূল (স.)-কে বলত راعنا سمعك (আমাদের কথা শুনুন)। আর راعنا শব্দটি عاطنا -এর অনুরূপ। ইবন যায়দ থেকে বর্ণিত, يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে راعنا শব্দ দ্বারা তাদের একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين "তারা বলে, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোন না শোনার মত' আর নিজেদের জিহবা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে راعنا (সূরা নিসা ៖ ৪/৪৬)।

তিনি বলেন, راعنا অর্থ ভুল (خطاء)। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের মত এ রকম ভুল বল না; বরং বল, انظرنا। এবং ভাল করে শ্রবণ কর। তিনি বলেন, তারা (য়াহূদীরা) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করত এবং তাঁর সাথে কথা বলত, আর রাসূল (স.) তাদের সে কথা শুনতেন। তারা তাঁকে প্রশ্ন করত, তিনি তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

আর কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি আনসারগণ জাহিলী যুগে ব্যবহার করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ইসলামী যুগে তাঁর নবীর সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এরূপ যারা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আতা (র) থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্বরতার যুগে এটা আনসারদের একটি পরিভাষা ছিল। অতঃপর আয়াত নাযিল হলো, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا —। 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা আনসারদের ব্যবহৃত একটি পরিভাষা ছিল। ইবন হুমায়দ সূত্রেও আতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আবুল আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত, لا تقولوا راعنا সম্পর্কে তিনি বলেন, আরবের মুশরিকরা যখন পরস্পরে আলাপ করত, তখন একজন তার অপর সঙ্গীকে বলত, ارعني سمعك (আমার কথা শোন)। অতঃপর তাদেরকে এরূপ বলতে নিষেধ করে দেওয়া হলো। ইবন জুরায়জ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, راعنا ছিল বিদ্রূপকারীদের ব্যবহৃত একটি শব্দ। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে এরূপ কথোপকথনে বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছিলেন।

আর কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল রিফাআহ ইবন যায়দ নামক একজন বিশিষ্ট য়াহূদীর কথা। সে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে গালি স্বরূপ এ শব্দটি ব্যবহার করত। মুসলমানগণও তার কাছ থেকে এটা গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে রাসূল (স.)-এর সাথে এরূপ কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। মূসা (র.) সূত্রে সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, বানূ কায়নুকা' নামক গোত্রের একজন য়াহূদী যার নাম ছিল রিফা'আহ ইবন যায়দ ইবন সাইব, সে এরূপ কথা বলত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ইবন তাবূত, ইবন সাইব নয়। সে রাসূলুল্লাহর (স.) কাছে যাতায়াত করত। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা

বলার সময় সে বলত, ارعني سمعك واسمع غير مسمع —। এরপর মুসলমানগণ মনে করতেন, এরূপ বললে বোধ হয় নবীগণের সম্মান করা হয়। তাই তাদের কিছু লোক বলত, 'শোন না শোনার মত'। এটাই সূরা নিসায় বলা হয়েছে—من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ০ (য়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলোর অর্থকে বিকৃত করে এবং বলে, শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং 'শোন না শোনার মত', আর নিজেদের জিহবা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে "রা'ইনা"।) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, সে দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে এরূপ বলে। এরপর তিনি মু'মিনগণের প্রতি লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন যে, তোমরা "রা'ইনা" বল না।

মু'মিনগণকে নবী পাক (স.)-এর প্রতি রা'ইনা শব্দ ব্যবহার করতে যে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন এর সঠিক বিবরণ হলো, এ শব্দটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী পাক সম্পর্কে ব্যবহার করা অপসন্দ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হাদীছে পাওয়া যায়। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, তোমরা আঙ্গুরকে কারম (كرم) বল না; বরং হাবালা (حبلة) বল। তোমরা 'আবদী (عبدي) (আমার গোলাম) বল না, বরং ফাতায়া (فتاي) বল। এ ধরনেরই আরো যত দুটি শব্দ আরবী ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু একটির ব্যবহার অপসন্দ এবং নিষেধ করা হয়েছে, আর অপরটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি কেউ বলে, আঙ্গুর সম্পর্কে 'কারম' বলতে এবং দাস সম্পর্কে 'আবদ' বলতে রাসূলের (স.) নিষেধাজ্ঞার কারণ তো আমরা জানি; কিন্তু মু'মিনগণকে রা'ইনা বলতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা যে উনযুরনা (انظرنا) বলতে নির্দেশ দিলেন, এর কারণটা কি? এর জবাবে বলা হয়, এর দৃষ্টান্ত আঙ্গুরকে 'কারম' বলা এবং দাসকে 'আবদ' বলার নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে কারণ রয়েছে অর্থাৎ 'আবদী' বলতে আল্লাহর সকল বান্দাকে বুঝায়। তাই আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দা বা দাসকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দাসত্বের অর্থে ব্যবহার করাকে রাসূল (স.) অপসন্দ করেছেন এবং এটাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য তাছাড়া অন্য কোন শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই فتاي বলা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এমনি ধরনের কারণ রয়েছে আঙ্গুরকে 'কারম' বলতে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণ কারাম (দয়া) এর সাথে মিশে যাবার ভয় আছে। আঙ্গুরের প্রতিশব্দ 'কারমুন' শব্দের মধ্যের অক্ষর সাকিনযুক্ত হলেও 'আরবগণ কোন কোন হরকতযুক্ত শব্দকে সাকিন করে পড়ে, যখন সেটা একই শ্রেণীর পরে আসে। তাই রাসূল (স.) আঙ্গুরকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করতে অপসন্দ করেন। এমনি ধরনের কারণ রয়েছে, মু'মিনদেরকে 'রাইনা' বলতে আল্লাহ পাক যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তার মধ্যে। কারণ 'রাইনা' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর এক অর্থ হলো, আপনি আমাদের হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণ করুন, আমরাও আপনার হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণ করব। আরবগণ একে অপরকে বলে رعاك الله অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাকে হিফাযাত করুন।" এখান থেকেই উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 'রা'ইনা'র আর এক অর্থ হলো, আপনি আমাদের কথা শুনুন। 'আরবগণ শব্দটিকে رعاء। ক্রিয়ামূল থেকে رعيت سمعي। অথবা رعاء বা مراعاة ক্রিয়ামূল থেকে ارعيته سمعي ব্যবহার করে থাকে, যার অর্থ হলো, আমি তার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এখান থেকেই উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কবি আ'শা মায়মুন ইবন কায়স বলেন—

يرعى الى قول سادات الرجال اذا ابدوا له الحزم او ما شاء ابتدعا

"নেতৃবৃন্দের কথা সে মনোযোগ দিয়ে শোনে, যখন তারা তার বুদ্ধিমত্তার উল্লেখ করে অথবা তার নতুন সৃষ্টির উল্লেখ করে।" এখানে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার অর্থে يرعى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে রাসূল (স.)-এর সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রাসূলের আওয়াযের উপর আওয়ায বুলন্দ করতে এবং পরস্পরে যে ভাবে জোরে কথা-বার্তা বলা হয়, তাঁর সম্মুখে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং এর ফলে তাঁদের আমল বাতিল হয়ে যাবার ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরপর তাঁর সাথে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাঁকে সম্বোধন করার জন্য সুন্দর শব্দ ও মার্জিত অর্থ-বোধক শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তাদের ব্যবহৃত راعنا শব্দটিতে যেহেতু 'আপনি আমাদের কথা শুনুন আমরা আপনার কথা শুনব' (ارعنا نرعاك) অর্থটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এই শব্দটি আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে (باب مفاعلة থেকে হওয়ার ফলে) এর অর্থ দু'জন ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। যেমন বলা হয়, عاطنا, حادثنا, جالسنا অর্থাৎ তুমি আমার সঙ্গে এরূপ কাজ কর, আমিও তোমার সঙ্গে এরূপ কাজ করব। আর তাদের কথার অর্থ—আপনি আমাদের কথা শুনুন যাতে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি এবং আপনিও আমাদের কথা বুঝতে পারেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরামকে এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে তাঁকে প্রশ্ন করার ব্যাপারেও যেন তারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে অপেক্ষা করে যাতে তারা তাঁর থেকে বুঝে নিতে পারে। আর এ ব্যাপারে যেন তারা য়াহূদীদের মত বেআদবী ও ধৃষ্টতামূলকভাবে এবং রুক্ষ ও কঠোর ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন না করে। তারা যেমন রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলত اسمع غير مسمع وراعنا এরূপ তোমরা বল না। এ ব্যাপারে আমরা যে ব্যাখ্যা দিলাম তা সঠিক হবার ব্যাপারে ইঙ্গিত বহন করে আল্লাহর এ আয়াত—

ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم

অর্থাৎ "কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির এবং মুশরিক, তারা পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।" (বাকারাঃ ২/১০৫) এতে বুঝা যায় যে, য়াহূদী ও মুশরিকরা তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) গর্ব ভরে সম্বোধন ও তিরস্কার করে আনন্দ পেত। راعنا সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ খিলাফ বা উল্টো—'আরবদের বাক-পদ্ধতি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না। কারণ راعيت শব্দটি আরবী ভাষায় কেবল দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়, একটি হলো رعية ধাতু থেকে যার অর্থ হলো, হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, আরেকটি হলো শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা বা মনোযোগ সহকারে শোনা। কিন্তু راعيت এর অর্থ خالفت (খিলাফ বা উল্টো করা) আরবী ভাষায় কোথাও কখনো এরূপ ব্যবহৃত হয় না। তবে এটাকে যদি তানবীন সহকারে (رَاعِنًا) পড়া হয় যার অর্থ হলো নির্বোধ, মূর্খ ও ভ্রান্ত –যে ভাবে আবদুর রহমান ইবন যায়দ বলেছেন, তবে এটা প্রসিদ্ধ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পাঠরীতির বিরুদ্ধে হলেও তখন এর একটা অর্থ হবে।

আর 'আতিয়্যা থেকে যে মতটি বর্ণিত আছে যে, راعنا শব্দটি ছিল য়াহূদীদের উদ্ভাবিত। এটাকে তারা গালমন্দ ও বিদ্রূপ অর্থে ব্যবহার করত। এরপর মু'মিনগণ তাদের থেকে এটা

গ্রহণ করেন। কাফিরদের কোন ভাষা—যার অর্থ মু'মিনগণ জানেন না, তা তাঁরা ব্যবহার করবেন এটি তাঁদের শানের খিলাফ। আর তা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করবেন এমনকি প্রিয় নবী (স.)-কে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করবেন এটিও তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী। তবে কাতাদাহ (র.) থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে সেটা হতে পারে। তা হলো শব্দটি আরবী ভাষায় একটি সঠিক অর্থবোধক শব্দ, যা য়াহূদীদের ব্যবহৃত অনারবী শব্দের অনুরূপ। য়াহূদীদের কাছে এটা গালি অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর আরবী ভাষায় এর অর্থ ছিল, আপনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন যাতে বুঝতে পারেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর প্রতি ব্যবহৃত য়াহূদীদের এ অর্থ বুঝতে পারলেন, আর য়াহূদীদের এ অর্থ ছিল আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অর্থ থেকে পৃথক। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে নবী (স.)-এর সাথে এরূপ কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন যাতে মু'মিনদের ব্যবহৃত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তারা বাহাদুরী করতে না পারে। কিন্তু এ ব্যাখ্যার পেছনে কোন দলীল নেই। সুতরাং আমরা ইতিপূর্বে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি সেটাই উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। কারণ সেটাই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়— অন্যটি নয়।

হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি لا تقولوا راعنا কে তানবীন সহকারে পড়তেন। যার অর্থ হলো, তোমরা বোকামি ও মূর্খতামূলক কথা বল না। رعونة শব্দের অর্থ বোকামি ও মূর্খতা। এটা কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পঠিত পদ্ধতির বিরোধী। তাই এ ধরনের কিরাআত বিরল। কারণ তা পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমগণের পাঠরীতি বহির্ভূত এবং প্রমাণবিহীন হওয়ায় কারো জন্যেই বৈধ হবে না। راعنا কে যাঁরা তানবীন সহকারে পড়েন, তাঁরা لا تقولوا ক্রিয়া পদের সাথে راعنا শব্দ সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই করেন। আর যারা তানবীন পরিহার করেন, তারা এটিকে আদেশমূলক শব্দ হিসাবেই গ্রহণ করেন। কেননা, তারা যখন রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করত, তখন তারা راعنا শব্দে তানবীন ব্যবহার করত না। তাদের এ সম্বোধনের অর্থ হলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, না হয় হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এরপর তাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে, রাসূল (স.)-কে সম্বোধনের সময় তোমরা راعنا শব্দটি ব্যবহার কর না। راعنا শব্দটি যে নির্দেশসূচক (امر) তার মধ্য থেকে ى অক্ষরটি পড়ে যাওয়াই সে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ তার উৎস يراعيه-এর মধ্যে ى বর্তমান। আর راعنا এর ع এর নীচের যেরই পতিত ى এর প্রমাণ বহন করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে এক কিরাআত বর্ণিত আছে, لا تقولوا راعونا, তখন অর্থ হবে একদল লোকের তাদের পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশসূচক উক্তির উদ্ধৃতি। যদি তা সত্যিই তাঁর কিরাআত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানগণের পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সে সম্বোধন নবী (স.)-কে হোক বা অন্য কাউকে। কিন্তু এটা তাঁর কিরাআত বলে সঠিক কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

وَقُولُوا انْظُرْنَا-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নবী (স.)-এর সাথে এভাবে কথা বল, 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যাতে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি এবং

যা আপনি আমাদেরকে বলেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা যেন আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। হযরত মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তোমরা বল যে, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। হে রাসূল (স.)! বিষয়টি আমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ থেকেই বলা হয় نظرت الرجل انظره نظرة অর্থাৎ আমি তার জন্য অপেক্ষা করেছি এবং তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। এ অর্থেই কবি হুতাইআঃ তাঁর কাব্যে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন—

وقد نظرتكم اعشاء صادرة + للخمس طال بها حوزى وتنساسى

"আমি তোমাদের জন্য কয়েক রাত অপেক্ষা করেছি। আর এ অর্থেই আলোচ্য শব্দটি নিম্নের আয়াতে কারীমায় ব্যবহৃত হয়েছে—

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم

"সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি।" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭/১৩) এখানে انظرونا। অর্থ আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন, থামুন।

কেউ কেউ আবার এ উভয় স্থলে আলিফ পৃথক করে انظرنا। পড়েছেন। যারা এরূপ পড়েছেন, তারা এর অর্থ করেছেন, 'আমাদেরকে অবকাশ দাও' (اخرنا)। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, قال رب فانظرني الى يوم يبعثون অর্থাৎ "সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।" (সূরা হিজর ১৫/৩৬)

কিন্তু এস্থলে এরূপ পাঠের কোন অবকাশ নেই। কারণ সাহাবা কিরামকে রাসূল (স.)-এর নৈকট্য লাভ করতে, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে, তাঁর সাথে সুমধুর ও নম্র ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর থেকে পিছিয়ে বা দূরে সরে থাকার নয়। তাই এক্ষেত্রে সঠিক হলো, انظرنا-র আলিফকে পৃথক না করে বরং মিলিয়ে পড়া যার অর্থ হলো, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। কেউ কেউ বলেছেন, انظرنا-র আলিফকে পৃথক করে পড়লে তার অর্থ হবে 'সময় দেওয়া'। কোন কোন 'আরবী ভাষীর কাছ থেকে শ্রুত আছে انظرني اكلمك —। তাদেরই কোন শ্রোতা বলেছেন যে, এ কথার দ্বারা তিনি সময় চেয়েছেন। তাই এর অর্থ হলো, 'আপনার সাথে কথা বলতে আমাকে সময় দিন।' এটা সঠিক হলে انظرنا ও انظرنا। قولوا অর্থাৎ আলিফকে মিলান এবং পৃথক করা উভয় প্রায় সমার্থক। তবে এ ধরনের দুই কিরাআতের মতামত থাকলেও আমি قولوا انظرنا তথা আলিফকে মিলিয়ে পড়ার কিরাআতকেই অনুমোদন করি যার অর্থ হলো, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ এই কিরাআত সঠিক হবার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং অন্য যে কোন কিরাআত পরিত্যাগ করেছেন।

وَاسْمَعُوا ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

اسمعوا। এর অর্থ হলো, তোমাদেরকে যা বলা হয় এবং তোমাদের রবের কিতাব থেকে যা তিলাওয়াত করা হয় তোমরা তা শ্রবণ কর, তাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত কর এবং তার

মর্মবাণী উপলব্ধি কর। যেমন মূসা সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, اسمعوا-এর অর্থ তোমাদেরকে যা বলা হয় তা শোন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নবীকে সম্বোধন করার সময় راعنا শব্দ ব্যবহার কর না; বরং বল, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যাতে আপনি আমাদেরকে যে শিক্ষা দেন এবং যা বয়ান করেন তা ভাল রূপে বুঝতে পারি। আর তোমরা নবীর কাছ থেকে শোন, যা তিনি তোমাদেরকে বলেন এবং ভালরূপে আয়ত্ত কর এবং তার মর্মবাণী উপলব্ধি কর। এরপর তাদের মধ্য থেকে এবং অন্যদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এ অর্থের সপক্ষে প্রমাণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

(১০৫) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ط وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

(১০৫) কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

ما يود অর্থ, 'পসন্দ করে না'। অর্থাৎ আহ্লেকিতাবদের অধিকাংশই পসন্দ করে না। এ থেকেই বলা হয়, ود فلان অর্থাৎ অমুক পসন্দ করে। এর ক্রিয়ামূল হলো ود ও ودّ ও مودة —। مشركون শব্দটি اهل الكتاب শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে যের বিশিষ্ট হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা এবং মুশরিকরা পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। এরপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, কিতাবীদের মধ্যে কাফির শ্রেণী এবং মুশরিকরা পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোন কল্যাণ নাযিল হোক, যা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রতি নাযিল হতো। তাই মুশরিক এবং আহ্লে কিতাব কাফিররা কামনা করত যে, আল্লাহ যেন তাদের উপর ফুরকান নাযিল না করেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর যে হুকুম ও আয়াত তিনি নাযিল করেন, তা যেন আর নাযিল না করেন। য়াহূদী এবং তাদের অনুসারী মুশরিকরা মু'মিনদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত এরূপ আকাংখা করত।

এই আয়াতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের শত্রু কিতাবী ও মুশরিকদের প্রতি আকৃষ্ট হতে, তাদের কথা শুনতে এবং তারা যে উপদেশ দেয় তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এ কথা জানিয়ে দিয়ে যে, কিতাবী ও মুশরিকরা মনে মনে তাদের প্রতি ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে, যদিও মুখে মুখে তারা এর উল্টোটা প্রকাশ করে।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

واللّٰه يختص برحمته من يشاء-এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন। অতএব, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং যে তাঁর নিকট প্রিয় তাকে তিনি ঈমানের দ্বারা সম্মানিত করেন। তারপর তাকে হিদায়াত দান করেন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রাসূলগণকে রিসালাত দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে হিদায়াতপ্রাপ্তদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, যাতে এর দ্বারা সে তাঁর রিযামন্দী ও ভালবাসা লাভে সক্ষম হয় এবং জান্নাতের জন্য কামিয়াবী হাসিল করতে পারে এবং তাঁর প্রশংসা লাভের উপযুক্ত হয়। আর এ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য রহমত স্বরূপ।

واللّٰه ذو الفضل العظيم-এ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, বান্দা দীন ও দুনিয়ার যে কোন ধরনের কল্যাণ লাভ করে প্রকৃতপক্ষে সে কল্যাণ লাভের উপযুক্ত নয়, বরং এটা নিছক আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণেই অতিরিক্তভাবে সে পেয়ে থাকে।

واللّٰه يختص برحمته من يشاء واللّٰه ذو الفضل العظيم-এ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে কিতাবীদের প্রতি কটাক্ষ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.) ও মু'মিনদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ অতিরিক্তভাবে দিয়েছেন। আর তাঁর নি'মাত শুধু লোভ-লালসার দ্বারা লাভ করা যায় না; বরং তা আল্লাহ্ পাকের দান— সৃষ্টির মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন।

(১০৬) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত অবতীর্ণ করি। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ما ننسخ অর্থ, যা আমরা বদলিয়ে এবং পরিবর্তন করে দিই। তা এভাবে যে, হালালকে হারামে, হারামকে হালালে, জায়িযকে না জায়িযে এবং নাজায়িযকে জায়িযে রূপান্তরিত করে দিই।

আর তা কেবল আদেশ-নিষেধ, বৈধ-অবৈধ, সম্মতি-অসম্মতিতেই সম্ভব। আর খবরের মধ্যে নাসিখ বা মানসূখের (পরিবর্তনের) কোন অবকাশ নেই। মূলত نسخ শব্দটি نسخ الكتاب থেকেই নির্গত, যার অর্থ হলো, এক কপি থেকে অন্য কপিতে তার ব্যতিক্রম নকল করা। অনুরূপভাবে হুকুম نسخ করার অর্থ হলো, সে হুকুম পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য হুকুম দেওয়া। সুতরাং আয়াত نسخ করার অর্থ যখন তাই, তখন তার হুকুম نسخ করে তার ফরয পরিবর্তন করে দেওয়া এবং বান্দাদের ফরযকে তাদের জন্য কল্যাণকর অত্যাবশ্যকীয়তার গণ্ডি থেকে পরিবর্তন করে সেটিকে সাধারণ পর্যায়ে রেখে দেওয়া অথবা তার চিহ্নই বিলুপ্ত করে দেওয়া বা তা ভুলিয়ে দেওয়া একই পর্যায়ের। কারণ এ উভয় অবস্থাতেই তা মানসূখ বলে গণ্য হবে। আর নতুন হুকুম, যদ্দ্বারা প্রথম হুকুম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং যার প্রতি বান্দার ফরয পরিবর্তিত হয়েছে, তা নাসিখ (ناسخ)। এ থেকেই বলা হয় نسخ الله اية كذا—আল্লাহ্ অমুক আয়াত নসখ করেছেন। এমনিভাবে ينسخه نسخا—। আর النسخة হলো ইসম বা বিশেষ্য।

আমরা যা বললাম হাসান বসরী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এরূপই বলেছেন। হাসান বসরী থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها সম্পর্কে বলেন, কুরআনের এমন কিছু অংশ আছে, যা পাঠ করা হয়েছে, তারপর আবার তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। আর কুরআনের এমন কিছু অংশ আছে, যা রহিত করা হয়েছে আর তোমরা তা পাঠ কর। ما ننسخ-এর তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, নসখ অর্থ কবয করা বা উঠিয়ে নেওয়া। আবার অন্যরা বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية-এ নসখ অর্থ, আমরা আয়াত পরিবর্তন করে দিই। আর কেউ কেউ বলেন, যা মুহাম্মদ ইব্ন আমরের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের ছাত্রদের থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ما ننسخ من اية-এর অর্থ করেন, আমরা যার লিখিত রূপ ঠিক রাখি এবং তার হুকুম পাল্টে দিই। মুছান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية অর্থ আমরা যার লিখিত রূপ ঠিক রাখি এবং তার হুকুম পাল্টে দিই। ইব্ন মাসউদের অনুসারিগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুছান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন মাসউদের অনুসারিগণ থেকে বর্ণনা করেন, ما ننسخ من اية—অর্থাৎ আমরা তার লিখিত রূপ ঠিক রাখি।

اَوْ نُنْسِهَا-এর ব্যাখ্যা ঃ

এর পাঠরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারা ও কূফাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ স্থলে او ننسها পাঠ করেছেন। যাঁরা এরূপ পাঠ করেছেন, তাঁরা এর দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (১) এর ব্যাখ্যা হলো, 'হে মুহাম্মদ (স.)! আমরা যে আয়াতের পাঠ রহিত ঘোষণা করি অথবা তা ভুলিয়ে দিই। বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের মাসহাফে এভাবে রয়েছে ঃ ما ننسك من اية او ننسخها نجئ بمثلها এটিই হলো نسيان শব্দের ব্যাখ্যা। মুফাসসির-গণের একটি দল এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এরূপ যাঁরা বলেছেন ঃ বিশর ইব্ন মুআয সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها সম্পর্কে তিনি বলেন, এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত মানসূখ করা হতো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন এক আয়াত বা ততোধিক তিলাওয়াত করতেন, তারপর তাঁকে তা বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হতো এবং সে আয়াত উঠিয়ে নেওয়া হতো। হাসান ইব্ন য়াহ্য়া (র.) সূত্রে

কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية او ننسها সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিস্মৃত করিয়ে দিতেন। মুছান্না সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র বলতেন, ننسها অর্থ হলোঃ আমি তোমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিই। সিওয়ার ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ সূত্রে হাসান থেকে বর্ণিত, او ننسها সম্পর্কে তিনি বলেন, তোমাদের নবী (স.)-কে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করান হতো, তারপর আবার তা বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হতো। সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসও উক্ত আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করেছেন। তবে তিনি او تنسها পাঠ করতেন যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, "অথবা হে মুহাম্মদ (স.)! আপনাকে যা বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়।"

এ সম্পর্কীয় বর্ণনাসমূহ ঃ য়া'কূব সূত্রে কাসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র.)-কে বলতে শুনেছি — ما ننسخ من اية او تنسها —। আমি তাঁকে বললাম, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব او ننسها পড়েন। সা'দ তখন বললেন, কুরআন নিশ্চয়ই মুসায়্যিবের উপর নাযিল হয়নি এবং মুসায়্যিবের বংশধরের উপরও না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ سنقرئك فلا تنسى (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না। আলা ঃ ৮৭/৬) অন্যত্র বলেছেন واذكر ربك اذا نسيت (আপনার রবকে স্মরণ করুন যখন ভুলে যান। কাহাফ ঃ ২৪)। কাসিম থেকে বর্ণিত, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুছান্না সূত্রে কাসিম থেকে বর্ণিত, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে বললাম, "আমি ইবনু'ল মুসায়্যিবকে ما ننسخ من اية او ننسها পাঠ করতে শুনেছি।" সা'দ (রা.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা কুরআন মুসায়্যিবের উপর নাযিল করেননি এবং তার পুত্রের উপরও না। এটি হবে ما ننسخ من اية او تنسها يا محمد (আমি যে আয়াত নসখ করি অথবা হে মুহাম্মদ! আপনি যা বিস্মৃত হন)। এরপর তিনি سنقرئك فلا تنسى ও واذكر ربك اذا نسيت তিলাওয়াত করলেন। রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية او ننسها সম্পর্কে তিনি বলতেন, ننسها অর্থ আমি উঠিয়ে নিই। আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমের বেশ কিছু বিষয় নাযিল করেছিলেন, এরপর তা উঠিয়ে নিয়েছেন।

এর দ্বিতীয় অর্থ হলো পরিত্যাগ করা। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, نسوا الله فنسيهم অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাক-কে পরিত্যাগ করেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন (তাওবা ঃ ৬৭)। এখন তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি কোন আয়াত রহিত তথা তার হুকুম পরিবর্তন এবং ফরয পাল্টে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য আয়াত নাযিল করি। তাফসীরকারদের একটি দল এরূপ তাফসীর করেছেন। এরূপ যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, او ننسها সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, "অথবা যা আমি পরিত্যাগ করি।" আমি তা পরিবর্তন করি না। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ করেন, "যা আমি পরিত্যাগ করি"। নসখ করি না। দাহহাক (র) থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية او ننسها সম্পর্কে তিনি বলেন, নাসিখ এবং মানসূখ অর্থাৎ যে আয়াত দ্বারা রহিত করা হয় এবং যে আয়াত রহিত হয়। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ এ সম্পর্কে বলতেন, যা য়ূনুস সূত্রে বর্ণিত, ইব্‌ন যায়দ ننسها সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, যা আমি বিলুপ্ত করি। অনেকে আবার এটাকে او ننسأها নূন এর উপর যবর এবং সীন-এর পর একটি হামযা দিয়ে পাঠ করেন। যার অর্থ হলো, 'আমি তা বিলম্বিত করি'। نسأ ও نساء — نسأت هذا الامر ধাতু থেকে এর

উৎপত্তি যার অর্থ হলো বিলম্বিত করা। এটা আরবদের পরিভাষা بعته نساء (আমি তার কাছে বাকীতে বিক্রয় করেছি) থেকে উদ্ভূত। এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তারাফা ইব্‌নুল আব্‌দ-এর শ্লোকঃ

لعمرك ان الموت ما انسأ الفتى + لكالطول المرخى وثنياه باليد

"তোমার জীবনের কসম! নিশ্চয় মৃত্যু যুবককে সময় দেয় না—তা ঢিল দেওয়া রশির মত, যার দুই প্রান্ত হাতের মধ্যে রয়েছে।" সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের একটি দল এবং কূফা ও বসরার ক্বারীদের একটি দল এরূপ পাঠ করেছেন। মুফাসসিরদের একটি দলও এরূপ তাফসীর করেছেন। যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ কুরায়ব ও য়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে 'আতা থেকে বর্ণিত, ما ننسخ من اية او ننسأها সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, 'আমি যা বিলম্বিত করি'। ইব্‌ন আবী নাজীহ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী او ننسأها সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, نرجئها—আমি বিলম্বিত করি। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ করেন نرجئها ও نؤخرها—আমি বিলম্বিত করি। আহমাদ সূত্রে 'আতিয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, 'আমি বিলম্বিত করি তাই তা নসখ করি না'। ইব্‌ন 'উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি او ننسأها সম্পর্কে বলেন—এর অর্থ হলো, বিলম্বিত করা ও দেরী করা। 'আলী আল-আযদী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র থেকে বর্ণিত, তিনি ننسأها পাঠ করেন। তিনি বলেন, যারা এরূপ পাঠ করেন, তারা এর তাফসীরে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি নাযিলকৃত আয়াতের যা পরিবর্তন করি অতঃপর যার হুকুম বাতিল করি এবং লেখনীরূপ ঠিক রাখি অথবা যা বিলম্বিত করি এবং ঠিক রাখি, পরিবর্তন করি না এবং যার হুকুম বাতিল করি না—তার থেকে উত্তম কিছু অথবা তার সমতুল্য কিছু নাযিল করি।

আর কেউ কেউ এই আয়াতকে ما ننسخ من اية او تنسها পাঠ করেন। এর তাফসীর او ننسها-এর তাফসীরের অনুরূপ। তবে تنسها-র অর্থ সরাসরি রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ (স.)! যা আপনি বিস্মৃত হন'।

আবার কেউ কেউ ما ننسخ-এর নূন-এ পেশ এবং সীন-এ যের দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থ—"হে মুহাম্মদ (স.)! আমি আপনাকে যে আয়াত নসখ বা রহিত করে দিই।" তবে বর্ণিত পাঠরীতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে এটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে او تنسها বা تنسها কিরাআত যাঁরা পড়েছেন এগুলো শুদ্ধ হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। আর এ পর্যায়ে যত পাঠরীতি রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো او ننسها। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে এই মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যখনই কোন হুকুম পরিবর্তন করেন অথবা পরিবর্তন না করেন তিনি তা থেকে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত নাযিল করেন। যখন আয়াতের অর্থ এমনই, তখন উত্তম পন্থা হলো এই যে, আল্লাহ পাক যখন কোন খবর প্রদান করেন যা তিনি করবেন সে সম্পর্কে, তখন তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে দেন। যা তিনি করবেন তাও তিনি জানিয়ে দেন যদি তিনি তা পরিবর্তন না করেন। অতএব, যে খবর ما ننسخ من اية বাক্যটির পর অবশ্যই আসবে তা হলো, আমি তার পাঠ রহিত করে দিই। কেননা এটাই তো মানুষের ভাষায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। পরন্তু এরূপ পাঠ করলে তার যে অর্থ

আমি বর্ণনা করেছি তাতে الانساء। অর্থাৎ রহিত করার অর্থও অন্তর্ভুক্ত থাকে, আবার الانساء। শব্দটি বিলম্ব অর্থও বহন করে। কারণ পরিত্যাজ্য বস্তু মাত্রই বিলম্বিত। কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ او ننسها। পাঠরীতিকে বর্জন করেছেন। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআন থেকে এমন কোন আয়াত—যা নসখ করা হয়নি—ভুলে যাবেন এটা অসম্ভব। তবে হতে পারে যে, সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হয়েছেন এবং পুনরায় তা স্মরণ করেছেন। কারণ, তিনি যদি কিছু বিস্মৃতও হন, তবে সাহাবা কিরাম যাঁরা তা পাঠ করেছেন এবং মুখস্থ করে নিয়েছেন তাঁদের সবার ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁরা বলেন, আয়াতে কারীমা ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا اليك (আপনার নিকট যে আয়াত নাযিল করেছি আমি ইচ্ছা করলে তা নিশ্চয়ই উঠিয়ে নিতে পারি। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭'৮৬) এ সংবাদ বহন করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে যে জ্ঞান তথা ওয়াহী দান করেছেন, তা বিস্মৃত করবেন না।

আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাসূল (স.) ও সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে বর্ণিত সুস্পষ্ট রিওয়ায়াতই এ মতবাদ ভ্রান্ত হবার সাক্ষ্য বহন করে। যথা—আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বি'র মা'উনায় যে ৭০ জন আনসারকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমরা পাঠ করতাম। তা হলো, بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضى عنا وارضانا (আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা আমাদের সম্প্রদায়েরনিকট আমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তারপর তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন)। পরবর্তীতে এ আয়াত রহিত করা হয়। আবূ মূসা আল-আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা কুরআনের আয়াত হিসেবে তিলাওয়াত করতেন, لو ان لابن ادم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (বনী আদমের যদি সম্পদের দুটি ময়দান থাকত, তাহলেও সে তৃতীয় আরেকটি লাভের চেষ্টা করত। আর বনী আদমের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ হবার নয়। আল্লাহ যাকে খুশী তাঁর তওবা কবুল করেন)। পরবর্তীতে এ বাণী উঠিয়ে নেওয়া হয়। এমনি ধরনের আরো অনেক রিওয়ায়াত আছে, যার উল্লেখ করতে গেলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাবে আর সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের কাছে এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কোন আয়াত বিস্মৃত করে দেবেন। তাই এটা যখন অসম্ভব নয়, তখন কারো পক্ষে "তাঁর (রাসূলের) বিস্মৃত হওয়াটা অসম্ভব" একথা বলা ঠিক নয়।

আর ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا اليك আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দেননি যে, তিনি তাঁর থেকে কিছুই উঠিয়ে নেন না; বরং এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে সবটুকুই উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর অশেষ প্রশংসা যে, তিনি তা নেননি বরং মানুষের যেটুকুর প্রয়োজন নেই কেবল সেটুকুই উঠিয়ে নিয়েছেন। সেটা এ ভাবে যে, তিনি যা নসখ বা রহিত করেছেন, বান্দার তা প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, سنقرئك فلا تنسى। الا ما شاء الله। এখানে তিনি বলেছেন যে, তিনি যতটুকু ইচ্ছা তাঁর নবীকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর থেকে সেটুকুই তুলে নেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা বাদ দিয়েছেন। অতঃপর আমরা যে তাফসীর গ্রহণ করেছি সেটা বাক্যের অর্থের রীতি অনুযায়ী, যা অস্বীকার করার মত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে এমন কিছু ওয়াহী নাযিল করেছিলেন, যা পরে রহিত করে দিয়েছেন।

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا-এর ব্যাখ্যা :

মুফাসসিরগণ نأت بخير منها او مثلها-এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারো কারো মত, যা মুছান্না সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نأت بخير منها او مثلها-এর অর্থ হলো, তোমাদের জন্য উপকারী এবং সহজ-সাধ্য। আবার কারো কারো মত, যা হাসান ইব্ন য়াহ্য়া সূত্রে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি نأت بخير منها او مثلها সম্পর্কে বলেন, এটা এমন একটি আয়াত যাতে রয়েছে সহজীকরণ, যাতে রয়েছে রহমত, আমর (আদেশ) ও নাহী (নিষেধ)। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, আমি যা রহিত করি, তার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করি অথবা যা পরিত্যাগ করি, তার চেয়ে উত্তম প্রদান করি, অন্যথায় রহিত করি না। যারা এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে মূসা সূত্রে সুদ্দী থেকে বর্ণিত, نأت بخير منها সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, যা আমি রহিত করি, তা থেকে উত্তম অথবা তার সমতুল্য অথবা যা বর্জন করি, তার সমতুল্য আমি আনয়ন করি। منها-এর মধ্যে যে هاء ও الف রয়েছে, তার দ্বারা ما ننسخ من اية-এ বর্ণিত اية-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং او مثلها-এর মধ্যে যে هاء ও الف রয়েছে, তদ্দ্বারা او ننسها এর هاء-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর অন্যরা যে অভিমত ব্যক্ত করেন যেমন বলেন, মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র বলতেন, ننسها অর্থ আমি তোমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নিই, আবার তোমাদেরকে তার সমতুল্য অথবা তার থেকে উত্তম কিছু দিই। মুছান্না সূত্রে রবী' থেকে বর্ণিত, او ننسها। অর্থ আমি তা উঠিয়ে নিয়ে তার থেকে উত্তম কিছু অথবা তার সমতুল্য কিছু দিই। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর ছাত্রদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আমাদের নিকট এর অর্থ সম্পর্কে সঠিক মত হলো, আমি কোন আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করলে অথবা তা পরিবর্তন না করে তার অবস্থায় বহাল রাখলে আমি যে আয়াতের হুকুম রহিত করে পরিবর্তন করে দিয়েছি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম আয়াত প্রদান করি। হয়ত বা দুনিয়াতে এভাবে যে, কোন ফরয তোমাদের জন্য কঠিন ছিল তা হালকা করে দিই। যথা—তাহাজ্জুদ নামায মু'মিনদের জন্য ফরয ছিল। পরে তা রহিত করে দেওয়া হয়। তাই তা দুনিয়ায় তাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর হয়েছে। কারণ, এর ফলে তাদের থেকে বোঝা হালকা করা হয়েছে এবং কষ্টদায়ক কাজ লাঘব করা হয়েছে। নয়তো শারীরিক কষ্টের বিনিময়ে আখিরাতে অধিকতর ছাওয়াব রয়েছে। যা তাদের জন্য উত্তম ও মঙ্গলময়। যথা পূর্বে বছরে কয়েক দিন মাত্র রোযা ফরয ছিল। তারপর তা রহিত করে দিয়ে তদস্থলে বছরে পূর্ণ এক মাস রোযা ফরয করা হয়। কয়েক দিনের তুলনায় পূর্ণ একমাস রোযা রাখা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক হলেও বান্দার এ কষ্টের কারণে এর ছাওয়াব অনেক বেশী। সুতরাং ছাওয়াব বেশী হবার কারণে কয়েক দিনের তুলনায় এক মাস রোযা রাখা আখিরাতে বান্দার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর, যা কয়েক দিনের রোযার মধ্যে নেই। এটাই হলো نأت بخير منها-র অর্থ। কারণ, হয়তো বা দুনিয়াতে তা উত্তম হবে বান্দার উপর হালকা হবার

কারণে নতুবা আখিরাতে তা উত্তম হবে তার ছাওয়াব ও বিনিময় বেশী হবার কারণে। অথবা তার সমতুল্য হবে শরীরের উপর কষ্ট-ক্লেশের দিক দিয়ে এবং ছাওয়াব ও বিনিময়ের দিক দিয়ে। এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার ফরযকে রহিত করে দিয়ে মাসজিদে হারামের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা এবং মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করা দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও আসলে উভয় হুকুমই একই ধরনের অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতেও বান্দার যে কষ্ট হয়, কা'বার দিকে মুখ করতেও সেই একই কষ্ট। এ ধরনের সমতুল্য হওয়াই হলো أو مثلها-র অর্থ। আর ما ننسخ من آية أو ننسها-র অর্থ হলো من حكم آية অর্থাৎ আমি যে আয়াতের হুকুম রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দিই। তবে এ অর্থ যেহেতু লোকের কাছে বোধগম্য, সেহেতু حكم-এর উল্লেখ না করে শুধুমাত্র آية-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ আমি এই কিতাবেই পূর্বে উল্লেখ করেছি। যথা—আয়াতে কারীমাহ وأشربوا في قلوبهم العجل-এর অর্থ হলো حب العجل অর্থাৎ তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যখন আমি কোন আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করি অথবা তা বর্জন করি, পরিবর্তন করি না। হে মু'মিনগণ! (জেনে রাখ) তখন আমি হাল্কা ও ভারী এবং ছাওয়াব ও বিনিময়ের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভাল হুকুমসম্পন্ন আয়াত অথবা সে হুকুমের সমতুল্য হুকুমসম্পন্ন আয়াত প্রদান করি।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, গো-বৎস সম্পর্কে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তো আমরা জানি যে, গো-বৎস কখনো অন্তরে সিঞ্চিত হতে পারে না। তাই وأشربوا في قلوبهم العجل এর অর্থ "তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল" তা বুঝে নেওয়া শ্রোতার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। কিন্তু ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها আয়াতে এ ধরনের কোন ইঙ্গিত আছে কি, যদ্দারা এর অর্থ "আয়াতের হুকুম" বুঝা যাবে? এর জবাব হলো, আল্লাহ পাকের বাণী نأت بخير منها أو مثلها-ই সে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, কুরআনের কোন অংশ কোন অংশের তুলনায় উত্তম হবে তা ঠিক নয়। কারণ, এর সবটুকুই আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর সিফাত কোনটা কোনটার তুলনায় উত্তম ও কল্যাণকর হবে তা হতে পারে না।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -এর ব্যাখ্যা:

এর অর্থ হলো, হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনার উপর আমার যে সকল হুকুম ফরয করে দিয়েছিলাম তার মধ্য থেকে আমি যেগুলোকে ইচ্ছা রহিত ও পরিবর্তন করে দিয়ে তার বিনিময়ে এমন হুকুম দিতে সক্ষম, যা আপনার জন্য এবং আপনার সাথে আমার যে মু'মিন বান্দা রয়েছে, তাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হবে। হয়তো বা শীঘ্রই দুনিয়াতে নতুবা বিলম্বে আখিরাতে, অথবা আপনার এবং তাদের জন্য সে হুকুম পরিবর্তন করে দুনিয়া ও আখিরাতে তার সমান উপকারী এবং তারই মত হাল্কা হুকুমসম্পন্ন আয়াত দিতে পারি? আপনি জেনে রাখুন হে মুহাম্মদ! আমি একাজে এবং সকল জিনিসের উপর শক্তিশালী। এখানে قدير অর্থ

قوي – শক্তিমান। এই অর্থেই বলা হয়, أنا قادر على كذا وكذا অর্থাৎ আমি অমুক অমুক কাজে শক্তিশালী ও সক্ষম। এটা قدرة , قدرا ও مقدرة ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। গাতফান গোত্রের একটি শাখা বানূ মুররা قدرت عليه-এর قد-এর دال কে যের দিয়ে ব্যবহার করে। এটা কখনো কখনো قدر ক্রিয়ামূল থেকেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, قدرت أقدر قدرة قدرا وقدرا —।

(١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

(১০৭) আপনি কি জানেন না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? এবং আল্লাহ ছাড়া আপনাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) কি জানতেন না যে, আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই? তাহলে এরূপ কথা কেন বলা হলো? এর জবাবে বলা যায় যে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। তাই সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স.) এ বিষয়ে অবগত আছেন; কিন্তু বাক্যটিকে এখানে তাকবীর অর্থাৎ বিষয়বস্তু জোরদার করনের পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটি করে থাকে আরবগণ তাদের পারস্পরিক আলাপের ক্ষেত্রে। কেউ তার সঙ্গীকে বলে, ألم أكرمك! (আমি কি তোমাকে সম্মান করিনি?) ألم أتفضل عليك! (আমি কি তোমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিনি?) এর অর্থ হলো এ সংবাদ দেওয়া যে, সে তার সম্মান করেছে এবং সে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এর অর্থ তুমি তা জান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে এ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ألم تعلم অর্থ হলো, 'আপনি কি জানেন না'? এখানে لم শব্দটি حرف جحد (অস্বীকৃতিমূলক শব্দ) তার পূর্বে حرف استفهام (প্রশ্নবোধক শব্দ) এসেছে। আর حرف استفهام-এর অর্থ হয়ত ইতিবাচক হয় নতুবা নেতিবাচক। তবে আরবী ভাষায় ইতিবাচক অর্থটি প্রসিদ্ধ নয়। বিশেষত যখন حرف جحد-এর পূর্বে আসে। আমার মতে, এখানে শুধুমাত্র রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও সাহাবা কিরামও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত -যাঁদেরকে লক্ষ্য করে একটু পূর্বেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا —। আমার এ বক্তব্যের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে আয়াতের পরবর্তী অংশ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير (আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই আর না কোন সাহায্যকারী)। আয়াতের এই শেষাংশে সকলের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ প্রথমাংশে 'ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض' বলে কেবলমাত্র রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা তাঁর সাহাবা কিরামের কথা

বুঝান হয়েছে, যাদের সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বাকরীতি আরবদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। আর এটা সুসাহিত্যের একটি দিকও যে, বক্তা তার বাক্যে কিছু লোককে সম্বোধন করবে অথচ তা দিয়ে সে অন্য লোককেও বুঝাবে। আবার কোন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করবে অথচ তা দিয়ে তার উদ্দেশ্য হবে তাকে ছাড়া অন্য একটি দলকেও বুঝান, অথবা একটি দলকে বুঝান, যার মধ্যে সেও অন্তর্ভুক্ত আছে। অথবা একটি দলকে সম্বোধন করে তা দিয়ে কেবল একজনকে বুঝাবে। যথা আয়াতে কারীমাহ– يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين (হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আহযাব ঃ ১) অন্যত্র واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا ০ (আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনাকে যে ওয়াহী দেওয়া হয়েছে, তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই আপনারা যা করেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত আছেন। আহযাব ঃ ২)। এখানে শেষাংশে একটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে অথচ আয়াত শুরু করা হয়েছে কেবল রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করে। এর নযীর পাওয়া যায় প্রখ্যাত কবি কুমায়ত ইব্‌ন যায়দের কবিতায়, যা তিনি রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় রচনা করেছেন ঃ

الى السراج المنير احمد لا + يعدلني رغبة ولا رهب
عنه الى غيره ولو رفع النا + س الى العيون وارتقبوا
وقيل افرطت بل قصدت ولو + عنفني القائلون او ثلبوا
لج بتفضيلك اللسان ولو + اكثر فيك الضجاج واللجب
انت المصفى المحض المهذب في + النسبة ان نص قومك النسب

"আলোকিত প্রদীপের প্রতি যিনি আহমদ। কোন আকর্ষণ বা ভীতি আমাকে তাঁর থেকে অন্য দিকে ফিরাতে পারবে না। যদিও লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায় এবং ভীতি প্রদর্শন করে। বলা হয় আমি বেশী বাড়াবাড়ি করি; বরং আমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি যদিও তারা আমার নিন্দা করে। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানে বহু লোক শত্রুতা পোষণ করে যদিও আপনার ব্যাপারে শোরগোলকারীরা অনেককিছুই বলে। আপনি বংশের দিক দিয়ে পবিত্র, খাঁটি ও শালীন। আপনার সম্প্রদায় যদি স্পষ্টভাবে বংশ তালিকা বর্ণনা করে।"

কবি এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করেছেন অথচ তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাঁর পরিবার-পরিজনকে বুঝান। তাই তিনি রাসূল (স)-এর উল্লেখ করে ইঙ্গিতে তাঁর পরিবার-পরিজনের গুণ ও প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন এবং নিন্দা ও তিরস্কারকারী বলে ইঙ্গিতে বানূ উমায়্যাকে বুঝিয়েছেন। কারণ, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূল (স.)-এর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাকারীকে নিন্দা ও তিরস্কার করার এবং তাঁর সম্মানের দীর্ঘ কথায় অধিক শোরগোল সৃষ্টি করার প্রবণতা আর কারো নেই।

অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জামীল ইব্‌ন মা'মারের কবিতায়। তিনি বলেছেন—

الا ان جيراني العشية رائح + دعتهم دواع من هوى ومنادح

"আমার প্রতিবেশিগণ রাতে ভ্রমণকারী। দুরন্ত আকাংখা এবং দূরের বিস্তীর্ণ ভূমি তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।" কবি এখানে তাঁর প্রতিবেশীদের একটি দল সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন

করেছেন। এরপর আবার رائح (ভ্রমণকারী) একবচন ব্যবহার করেছেন। কেননা, তাঁর কথার সূচনা হয়েছে একজনের সম্পর্কে, দলের সম্পর্কে নয়। কবি জামীল অন্যত্র বলেছেন—

خليلي فيما عشتما هل رأيتما + قتيلا بكى من حب قاتله قبلي

"হে আমার বন্ধু! তোমার যিন্দিগীতে তুমি কি এমন কোন নিহত ব্যক্তিকে দেখেছ, যে তার হত্যাকারীর ভালবাসায় কাঁদে?" কবি এখানে তাঁর হত্যাকারিণী মহিলাকে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি একজন মহিলার গুণ বর্ণনা করেছেন। তাই পুরুষের উল্লেখ করে ইঙ্গিতে মহিলাকে বুঝিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে الم تعلم ان الله على كل شيء قدير — الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض-এ বাহ্যিকভাবে রাসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও এর দ্বারা তাঁর সাহাবা কিরামকে বুঝান হয়েছে। আর সাহাবা কিরামকে যে বুঝান হয়েছে, তা وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير — ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل - الايات

(আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?) —পরবর্তী এ তিনটি আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

এখানে مالك السماوات না বলে ملك السماوات والارض এজন্য বলা হয়েছে যে, এখানে রাজার রাজ্য বুঝান হয়েছে—সাধারণ মালিকানা নয়। আর আরবগণ যখন রাজার রাজ্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাইত, তখন বলত— ملك الله الخلق ملكا —"আল্লাহ পাক মানুষকে রাজ্যের মালিক বানিয়েছেন।" আর যখন সাধারণ মালিকানা বুঝাতে চাইত, তখন বলত— ملك فلان هذا الشيء "অমুক ব্যক্তি এই জিনিসের মালিক হয়েছে।" এর ধাতু হলো, ملكا ، ملكة ، ملكا — । অতঃপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো—হে মুহাম্মদ (স.)! আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র আধিপত্য আমারই– আর কারো নয়? আমি তার ব্যাপারে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার ব্যাপারেও যা ইচ্ছা ফয়সালা করি। তার এবং তার মধ্যস্থিত সকল কিছুর ব্যাপারে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিই এবং যা ইচ্ছা তার থেকে নিষেধ করি। আমার বান্দাদের যে হুকুম দিয়েছিলাম, তার মধ্যে যখন যা ইচ্ছা রহিত ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করি এবং যা ইচ্ছা ঠিক রাখি! আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ সম্বোধনটি সম্মান ও মর্যাদার কারণে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে করা হলেও পরোক্ষভাবে এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে য়াহূদী জাতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে—যারা তাওরাতের হুকুম রহিতকরণকে অস্বীকার করে এবং হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর কাছ থেকে তাওরাতের হুকুম পরিবর্তন হওয়া সম্পর্কে যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, সে বাণীর কারণে য়াহূদীরা তাঁদের নুবুওয়াতকে অস্বীকার করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমান ও যমীনের আধিপত্য ও বাদশাহী তাঁরই আর সকল সৃষ্টি তাঁরই রাজত্বের অধিবাসী ও অনুগত। তাঁর বাণী শ্রবণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁর যা খুশী আদেশ দেওয়ার, যা খুশী নিষেধ করার, যা খুশী রহিত করার এবং যা খুশী স্থির রাখার অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে। আর তাঁর হুকুম-আহকাম ও

আদেশ-নিষেধ থেকে যা খুশী ভুলিয়ে দেওয়ারও তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে। এরপর তিনি তাঁর নবী (স)-কে এবং তাঁর সাথে সকল মু'মিনকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন—তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর এবং আমার হুকুম-আহকাম ও ফরযের মধ্য থেকে যা আমি রহিত করি আর যা রহিত করি না, সব ব্যাপারেই আমার পূর্ণ আনুগত্য কর। আমার আদেশ, নিষেধ, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যের কোন বিরোধিতাকারীর বিরোধিতা যেন তোমাদেরকে কখনো ভীত না করে, ঘাবড়িয়ে না দেয়। কেননা, আমি ব্যতীত তোমাদের কর্মের আর কোন ব্যবস্থাপক নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন সাহায্যকারীও নেই। আমি তোমাদের একচ্ছত্র অভিভাবক এবং তোমাদের রক্ষাকারী। আমি আমার মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি দ্বারা তাদের উপর তোমাদেরকে এককভাবে সাহায্যকারী, যারা তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, এমনকি আমি তোমাদের দলীল-প্রমাণকে সমুন্নত রাখি এবং তা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে করে দিই। ولى শব্দটি আরবদের বাগধারা وليت امر فلان অর্থাৎ "আমি অমুকের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি" থেকে কর্তৃবাচক পদ। এ থেকেই বলা হয়, فلان ولى عهد المسلمين -এর অর্থ হলো মুসলমানদের ব্যাপারে তার কাছে যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠাকারী আর نصير শব্দটি نصرتك (আমি তোমাকে সাহায্য করেছি) انصرك (আমি তোমাকে সাহায্য করব) থেকে কর্তৃবাচক পদ। ناصر ও نصير উভয়টিই এ পদভুক্ত। এর অর্থ সাহায্যকারী, শক্তিদাতা।

من دون الله-এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহর পরে। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যেমন উমায়্যা ইব্‌ন আবিস-সালত-এর কবিতায়ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে ঃ

يا نفس ما لك دون الله من واقى + وما على حدثان الدهر من باقى

"হে আত্মা! আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন রক্ষাকারী নেই। আর যুগের মুসীবতের উপর কেউ বাকী থাকবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত তোমার কেউ নেই এবং আল্লাহর পরে এমন কেউ নেই, যে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। এখন আয়াতের অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ব্যতীত এবং আল্লাহর পরে তোমাদের কাজের আর কোন ব্যবস্থাপক নেই এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারীও নেই যে, তোমাদেরকে শক্তিশালী করবে এবং তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবে।

(١٠٨) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

(১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করতে চাও মূসাকে যেইরূপ প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে-কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ط -এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা এবং ওয়াহাব ইব্‌ন যায়দ রাসূল (স.)-কে বলল, আমাদের জন্য এমন কিতাব আনয়ন করুন, যা আকাশ থেকে আমাদের উপর নাযিল হবে, আমরা তা পাঠ করব। আর আমাদের জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করুন, তাহলে আমরা আপনার আনুগত্য করব এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে নাযিল করলেন, ام تريدون ان تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل الخ। "তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও, যেরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?"

আর কেউ কেউ বলেন, যা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, ام تريدون ان تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل সম্পর্কে তিনি বলেন, মূসা (আ.)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হতো। তারপর তাঁকে বলা হয়েছিল, أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً —"আল্লাহ পাককে প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে দেখাও" (সূরা নিসা ৪/১৫৩)। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত ام تريدون.. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মূসা (আ.)-কে বলা হয়েছিল আল্লাহ পাককে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে। এরপর আরববাসী রাসূল (স.)-কে বলেছিল আল্লাহকে তাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য যাতে তারা প্রকাশ্যভাবে তাঁকে দেখতে পায়। আর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, যেমন মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, ام تريدون ان تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل সম্পর্কে তিনি বলেন, মূসা (আ.)-এর প্রতি তাদের প্রশ্ন ছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার। তারপর কুরায়শ গোত্রের পৌত্তলিকরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে বলেছিল যে, আল্লাহ পাক যেন সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের জন্য এরূপ হবে বনী ইসরাঈলদের জন্য যেরূপ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা হয়েছিল, কিন্তু যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে তোমাদের শাস্তি অবধারিত। এরপর তারা অস্বীকার করল এবং তারা ফিরে গেল। তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট আবেদন জানায় সাফা পর্বত তাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়ার। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা তোমাদের জন্য সেরূপ হবে বনী ইসরাঈলদের জন্য যেরূপ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা হয়েছিল। যদি তোমরা কুফরী কর, তবে তোমাদের শাস্তি হবে কঠোরতম। এরপর তারা এতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তারা ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, যা মুছান্না সূত্রে আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের (গুনাহের) কাফফারা যদি বনী ইসরাঈলের কাফফারার ন্যায় হত।" তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ও আল্লাহ! আমরা তা চাই না। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন, তা বনী ইসরাঈলদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বনী ইসরাঈলদের কেউ যখন কোন পাপ কাজ করত, তখন সেই পাপ কাজের কথা দরজায় লিপিবদ্ধ হতো এবং তার কাফফারাও লিপিবদ্ধ থাকত। তারপর সে সেই কাফফারা আদায় করলে দুনিয়াতে অপদস্থ হতো। আর যদি সে কাফফারা আদায় না করত, তবে আখিরাতের অপমান নির্দিষ্ট থাকত। আর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ০ "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে অথবা তার আত্মার উপর যুলুম করবে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াময় রূপে পাবে" (নিসাঃ ১১০)। আবুল 'আলিয়াহ বলেন, রাসূল (স.) আরো বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুম'আ থেকে অন্য জুম'আ তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার সংকল্প করে অথচ তখনো সে কাজটি করেনি, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। তারপর সে যদি কাজটি করে, তাহলে তার জন্য দশটি ছাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ام تريدون ان تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل —। এ আয়াতাংশে ام শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বসরাবাসীদের কিছু সংখ্যকের মতে ام শব্দটি প্রশ্নবোধক (استفهام) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো—"তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করতে চাও?" অপর একদল বলেন, ام শব্দটি প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য, পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না। তার দ্বারা পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। যেমন আরবগণ বলে থাকে— انها لابل يا قوم ام شاء ولقد كان كذا وكذا ام حدس نفسى "হে সম্প্রদায় নিশ্চয়ই তা উটের জন্য হে! সে কি চায়? আর তা ছিল এরূপ এরূপ। আমার অন্তর কি ধারণা করে?" তাঁরা বলেন, ام تريدون। এখানে সন্দেহের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং তাদের মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের সমর্থনে তারা আখতাল-এর নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় পেশ করেন:

كذبتك عينك ام رايت بواسط + غلس الظلام من الرباب خيالا

"তোমার চোখ তোমাকে প্রতারণা করেছে। তুমি কি দরজা দিয়ে তোমার কল্পনায় মেঘের ঘোর অন্ধকার দেখেছ?"

কূফার কিছু আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন, ام تريدون-কে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর প্রশ্নবোধক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: الم - تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ০ ام يقولون افتراه "আলিফ-লাম-মীম। বিশ্ব-প্রতিপালকের কাছ থেকে এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এর মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তবে কি তারা বলে 'এটাতো সে নিজে রচনা করেছে?' (সাজদা: ১—৩) এখানে ام শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ এর পূর্বে কোন প্রশ্নবোধক শব্দ নেই। তাই তা তাদের কাছে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর স্বতন্ত্র আলাদা একটি প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহারের দলীল। এই মত পোষণকারী বলেন, ام দুটি পন্থায় তার পূর্ববর্তী অর্থে প্রশ্নবোধক ভাবকে প্রত্যাখ্যান করে— একটি হলো اَىْ। এর অর্থ প্রকাশ করে। আর অন্যটি প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আর তা হবে, পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عطف-এর পন্থায়। আর তা দ্বারা তখনই বাক্য শুরু হতে পারে, যখন পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে মিলিত থাকে। যখন তুমি বাক্য শুরু কর যার পূর্বে কোন বাক্য নেই, তৎপর তুমি প্রশ্ন কর, তখন তা الف বা هل শব্দ ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ام تريدون সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এর পূর্বে অর্থাৎ الم تعلم ان الله على كل شئ قدير যে প্রশ্নবোধক বাক্যটি রয়েছে, ام تريدون বাক্যটি তা প্রত্যাখ্যান করে। এব্যাপারে তাফসীরকারদের যে সব মতামত আমি ব্যক্ত করেছি তন্মধ্যে আমার নিকট সঠিক মত হলো এটা প্রাথমিক

ভাবেই প্রশ্নবোধক অর্থে (استفهام مبتدا) ব্যবহৃত। এর অর্থ হলো—হে সম্প্রদায়! তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করতে চাও? ام-এর দ্বারা প্রশ্ন বুঝানোর একটি শর্ত হলো তার পূর্বে বাক্য থাকার কারণে সে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عطف করতে হবে—এতদসত্ত্বেও এখানে সম্প্রদায়কে ام-এর দ্বারা প্রশ্ন করা এজন্য বৈধ হয়েছে যে, ام শব্দটির পূর্বে যখন কোন বাক্য থাকে, তখন তা স্বতন্ত্র প্রশ্নবোধক (استفهام مبتدا) হয়। আরবদের নিকট থেকে কখনো এরূপ শোনা যায়নি যে, ام-এর দ্বারা প্রশ্ন করবে অথচ তার পূর্বে কোন বাক্য থাকবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো الم ০ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه —।

ام শব্দটি কখনো কখনো بل (বরং)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন তার পূর্বে এমন কোন প্রশ্নবোধক বাক্য থাকে যাতে اَىْ শব্দ ব্যবহার করা যায় না। তাই 'আরবগণ বলে থাকে هل لك قبلنا حق ام انت رجل معروف بالظلم "আমাদের উপর কি তোমার কোন হক আছে? বরং তুমি একজন প্রসিদ্ধ অত্যাচারী।" আর কবি বলেন—

فوالله ما ادرى اسلمى تغولت + ام القوم ام كل الى حبيب

(আল্লাহর কসম! আমি জানি না সালমাই কি এটা বানিয়ে বলেছে, না সম্প্রদায়; বরং প্রত্যেকেই আমার প্রিয়পাত্র।) এখানে ام বরং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে কেউ কেউ অপ্রচলিত মত ব্যক্ত করেছেন। যারা ধারণা পোষণ করেন যে, ام تريدون-এর ام শব্দটি ভবিষ্যতের জন্য প্রশ্নবোধক (استفهام مستقبل) যা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন। তার দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। প্রথমটি খবর এবং দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক। আর খবরের ব্যাপারে প্রশ্ন-বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয় না; আর খবর হয় না প্রশ্নবোধক বাক্যে। তবে তাদের ধারণায় খবর অতিক্রান্ত হবার পর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে। এরপর ام-এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে কওম! তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সে সমস্ত জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাও, যা তোমাদের পূর্বে মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল? তাহলে তো তোমরা কুফরী করবে, যদি তোমরা তোমাদের এমন সকল প্রশ্ন দিয়ে তাঁকে বিব্রত কর, যার অনুমতি আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী তোমাদেরকে দেওয়া উচিত নয়। এরপর তোমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ হয়েছ। যেমনটি হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত। যারা তাদের নবীকে এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, যা তাদের জন্য উচিত ছিল না। এরপর তাদেরকে যখন তা দেওয়া হলো, তখন তারা কুফরী করল। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাংখিত বিষয় প্রদানের পরও যখন তারা কুফরী করল, তখন তাদেরকে অনতিবিলম্বে শাস্তি প্রদান করা হলো।

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ-এর ব্যাখ্যা:

من يتبدل-এর অর্থ হলো, যে কুফরীকে বিনিময়ে গ্রহণ করে। আর كفر-এর দ্বারা বুঝান হয়েছে আল্লাহ পাক ও তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা। ايمان এর অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুখে তা স্বীকার করা। কারো কারো মতে, এখানে كفر-এর অর্থ হলো কঠোরতা এবং ايمان-এর অর্থ হলো নম্রতা।

আমার জানা মতে كفر-এর অর্থ কঠোরতা এবং ايمان-এর অর্থ নম্রতা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এ মত পোষণকারী এখানে كفر অর্থ কঠোরতা এবং ايمان অর্থ নম্রতার ব্যাখ্যায় বলতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য আখিরাতে যে বিভীষিকা ও আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং মু'মিনদের জন্য যে নি'মাতরাশি প্রস্তুত রেখেছেন তাই বুঝান হয়েছে। এটা একটা দিক অবশ্য হতে পারে; যদিও তা বাহ্যত বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে।

মুছান্না (র) সূত্রে আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত, ومن يتبدل الكفر بالايمان এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কঠোরতাকে নম্রতার বিনিময়ে গ্রহণ করে। কাসিম (র.)-এর সূত্রেও আবুল আলিয়াহ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل আয়াতটি ইতিপূর্বে আমরা যা বলেছি তার সুস্পষ্ট দলীল যে, يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا থেকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.)-এর সাহাবা কিরামকে খিতাব করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মু'মিনদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে, তাদের অতীত কর্মের জন্য যাতে য়াহূদীগণ সন্তুষ্ট হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আল্লাহ পাকও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য তাদেরকে ধমক দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, য়াহূদী জাতি ধোকাবাজ, হিংসুটে ও বিদ্রোহী। তারা মু'মিনদের বিপদাপদ এবং ধ্বংস কামনা করে। তিনি য়াহূদীদেরকে সুহৃদ ও বন্ধু মনে করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন। আর তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর দীন পরিত্যাগ করবে এবং ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করবে, সে হবে পথভ্রষ্ট।

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ০-এর ব্যাখ্যা :

فقد ضل অর্থ সে চলে গেল এবং দূরে সরে গেল। ضلال-এর আসল অর্থ হলো কোন জিনিস থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং পৃথক হয়ে যাওয়া। তারপর এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু এবং যার কোন ঠিকানা নেই এমন বস্তুর বেলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবগণ হারান ব্যক্তি যার কোন নাম-নিশানা নেই, তার সম্পর্কে বলে থাকে ضل بن ضل وقل بن قل —। এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও হারান বস্তু সম্পর্কে আখতাল-এর পংক্তি—

كنت القذى فى موج اكبر مزبد + قذف الاتى به فضل ضلالا

(আমি ছিলাম সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে একখণ্ড তৃণ, প্লাবন তাকে নিক্ষেপ করল, এরপর তা ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে গেল।) فقد ضل سواء السبيل দ্বারা আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সোজা ও মধ্যম পথ থেকে তারা দূরে সরে গেল। سواء السبيل-এর ব্যাখ্যা হলো : سواء অর্থ সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা। سواء-এর আসল অর্থ হলো 'মধ্যম'। 'ঈসা ইব্‌ন 'উমার আননাহ্‌বী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— ما زلت اكتب حتى انقطع سوائى অর্থাৎ আমি লিখতে থাকলাম। লিখতে লিখতে আমার অর্ধেক সমাপ্ত করলাম। আর হাসসান ইব্‌ন ছাবিত বলেন—

يا ويح انصار النبى ونسله + بعد المغيب فى سواء الملحد -

(হায় আফসোস ! নবী ও তাঁর বংশধরগণের সাহায্যকারিগণ অন্তর্ধানের পর কবরের মাঝখানে থাকে।) আলোচ্য পংক্তিতে سواء অর্থ 'মধ্যস্থল'। 'আরবগণ বলে থাকেন هو فى سواء السبيل —সে রাস্তার মধ্যস্থলে। তাদের মতে, سواء الارض-এর অর্থ যমীনের মধ্যস্থল। আর سبيل অর্থ الطريق المسبول অর্থাৎ রাস্তা। مسبول শব্দটিকে রূপান্তরিত করে سبيل করা হয়েছে। এরপর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (স.)-এর প্রতি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করে এবং তাঁর দীন পরিত্যাগ করে, সে সোজা এবং সুস্পষ্ট মধ্যম রাস্তা থেকে দূরে সরে যায়। এতে বাহ্যত ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণকারীর পথভ্রষ্টতার খবর প্রদান করা হয়েছে এই মর্মে যে, সে আল্লাহ পাকের দীনকে বর্জন করেছে, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্য পসন্দ করেছেন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে একটি সঠিক পথ-নির্দেশ করেছেন, যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। যে পথ তাদেরকে তাঁর মহব্বতের দিকে ধাবিত করে এবং চির শান্তি-নিকেতন জান্নাত লাভে সফল হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই পথ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে করে পথিক মনযিলে পৌঁছতে পারে, নাজাত হাসিল করতে পারে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। যেমন দুনিয়াতে কেউ সঠিক পথ অবলম্বন করলে সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। আর যে পথভ্রষ্ট—আখিরাতে তার আমলের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবার এবং তার প্রতিপালক থেকে দূরে থাকার ব্যাপারটিকে উদাহরণস্বরূপ করেছেন সেই ব্যক্তির সাথে, যে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায়, পরিণামে তার গোমরাহীই বেড়ে যায় এবং সে গন্তব্যস্থল থেকে দূরে সরে যায়।

আর এ পথটি, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "যে ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে দূরে সরে যায়।"—এ পথ হলো সেই 'সিরাতুল মুসতাকীম' আয়াতে যাঁর হিদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে দু'আ করার আদেশ করা হয়েছে — اهدنا الصراط المستقيم । صراط الذين انعمت عليهم (আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের পথে।)

(১০৯) وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

(১০৯) তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনবার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যান-কারী রূপে ফিরে পাওয়ার আকাংখা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا-এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ করে যে, يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا থেকে এ সকল আয়াতে বাহ্যিক-

www.eelm.weebly.com

ভাবে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মু'মিন ও সাহাবা কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, ধমক দেওয়া হয়েছে। আর য়াহূদ ও তাদের সমমনা মুশরিকদের থেকে কোন সদুপদেশ গ্রহণ করতে এবং দীনের কোন ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে এরও প্রমাণ রয়েছে যে, মু'মিনগণ য়াহূদীদের অনুকরণ বশত রাসূল (স.)-এর সাথে সম্বোধন করা বা তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গত শব্দ ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করে বললেন, তোমরা য়াহূদীদের অনুকরণবশত তাদের ন্যায় তোমাদের নবী (স.)-কে راعنا বল না, বরং انظرنا و اسمعوا বল। কারণ, নবী (স.)-কে কষ্ট দেওয়ার অর্থ আমার সাথে কুফরী করা এবং তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার আমার যে হক রয়েছে, যা আদায় করা তোমাদের উপর অপরিহার্য, তা অস্বীকার করা। আর যে আমার সাথে কুফরী করে, তার জন্য পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে। কারণ, য়াহূদ ও মুশরিকগণ চায় না যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক, বরং তাদের অধিকাংশই চায় ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর তা চায় তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত। মুহাম্মদ (স.) যে তাদের প্রতি এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে এ সত্য জাহির হবার পরও তারা এরূপ করে।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ود كثير من اهل الكتاب দ্বারা কা'ব ইবনুল আশরাফকে বুঝান হয়েছে। যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ود كثير من اهل الكتاب (অধিকাংশ কিতাবী চায়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে হলো কা'ব ইব্নুল আশরাফ। যুহরী ও কাতাদাহ থেকে আরও বর্ণিত, তাঁরা বলেন, ود كثير من اهل الكتاب দ্বারা কা'ব ইবনুল আশরাফকে বুঝান হয়েছে। আর কারো কারো মতে, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, য়াহূদীদের মধ্যে হুয়াই ইব্ন আখতাব ও আবু য়াসির ইব্ন আখতাব আরবদের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষ পোষণ করত, যখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করত। আর তারা মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের সম্পর্কে ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم আয়াত নাযিল করেন। যারা দাবী করেন যে, ود كثير من اهل الكتاب দ্বারা কা'ব ইব্নুল আশরাফকে বুঝান হয়েছে—আয়াতের দ্বারা তাদের এ অর্থ বুঝা যায় না, কারণ কা'ব ইবনুল আশরাফ এক ব্যক্তি। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাদের অধিকাংশ চায় ঈমান আনার পর মু'মিনদেরকে আবার কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অতএব, এক ব্যক্তির জন্য كثير শব্দ, যার অর্থ হলো সংখ্যায় বেশী, ব্যবহার করা হয় না। তবে হ্যাঁ, এমত পোষণকারী যদি আল্লাহ পাক বর্ণিত এ আধিক্যের দ্বারা কওম ও গোত্রের মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদার আধিক্য বুঝিয়ে থাকেন, তবে হতে পারে, যেমন বলা হয় فلان فى الناس كثير "অমুক ব্যক্তি লোকের মধ্যে অধিক সম্মানী ও মর্যাদাবান।"

তারা যদি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকেন, তবে ভুল করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি জামায়াত বা দলের বিশেষণে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে আল্লাহ পাক সংখ্যার আধিক্য বুঝিয়েছেন। অথবা তারা যদি এ ধারণা করে যে, এটা সেই সকল বাক্যের ন্যায় যাতে একটি দল সম্পর্কে উল্লেখ

করা হয় অথচ উদ্দেশ্য থাকে একজনকে বুঝান—যার নযীর ইতিপূর্বে আমরা জামীল-এর কবিতা দ্বারা উল্লেখ করেছি, তবে এটাও ভুল; কারণ কোন বাক্যের এ ধরনের অর্থ হতে গেলে তার জন্য বিশেষ প্রমাণ প্রয়োজন। কিন্তু ود كثير من اهل الكتاب-এর মধ্যে এ ধরনের কোন প্রমাণ নেই যে, এখানে দল বা অধিক ব্যক্তি নয়, বরং এক ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে—যার দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপ করা যাবে। এটা প্রমাণবিহীন এজন্য যে, এরূপ সাধারণত ব্যবহার হয় না।

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ-এর ব্যাখ্যা :

حسدا من عند انفسهم-এর অর্থ হলো, কিতাবীদের অধিকাংশই মু'মিনদের সম্পর্কে এই কামনা করে, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তারা হিংসা ও বিদ্বেষবশত চায় যে, মু'মিনদেরকে পুনরায় কাফিরে পরিণত করে। حسدا শব্দটি যে যবর বিশিষ্ট, তা كفارا শব্দের সিফাত হবার কারণে নয়; বরং এমন এক مصدر (ক্রিয়ামূল) হবার কারণে, যে مصدر-টি বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের অর্থ বহির্ভূত এবং সে ক্রিয়াপদ থেকে ভিন্ন শব্দের। যেমন কেউ অপরকে বলে, تمنيت لك ما تمنيت من سوء حسدا منى لك (আমি তোমার জন্য খারাপ ও অমঙ্গল কামনা করি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে হিংসা ও বিদ্বেষবশত)। এখানে حسد শব্দটি تمنيت ক্রিয়াপদের অর্থ থেকে مصدر—। কারণ تمنيت لك ذالك-এর অর্থ من سوء حسدتك على ذالك (আমি তোমাকে এ ব্যাপারে হিংসা করি), সুতরাং حسدا শব্দটির যবর এ নিয়মেই হয়েছে। কারণ, আল্লাহ পাকের বাণী ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا-এর অর্থ হলো, কিতাবীগণ তোমাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এই সব কারণে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাওফীক দান করেছেন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও দীনের হিদায়াত দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে, তোমাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট তাঁর রাসূল মনোনীত করেছেন—যিনি তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল মনোনীত করেননি যাতে তোমরা তাদের অনুসারী হবে। অতএব, حسد শব্দটি এই অর্থেই مصدر—। من عند انفسهم অর্থ হলো, তাদের পক্ষ থেকে। যেমন কেউ বলে لى عندك كذا وكذا অর্থাৎ তোমার কাছে আমার এত এত পাওনা রয়েছে। আম্মার (রা.) সূত্রে ইব্ন আবী জা'ফর (রা.) থেকে من عند انفسهم সম্পর্কে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা মু'মিনদের জন্য এরূপ কামনা করে নিজেদের পক্ষ থেকেই। তিনি তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের (য়াহূদীদের) কিতাবে তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তারা আল্লাহর নিষেধ জেনেশুনেও এরূপ করে নিজেদের তরফ থেকে।

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ-এর ব্যাখ্যা :

এর অর্থ হলো, সেই অধিকাংশ কিতাবী, যারা চায় তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে

যা এসেছে এবং যে মিল্লাতের প্রতি তিনি আহবান জানান, তা সত্য হিসেবে সুস্পষ্ট। তার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন বিশর ইব্‌ন মু'আয সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, من بعد ما تبين لهم الحق এর অর্থ হলো, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হবার পর যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল এবং ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দীন। মুছান্না (র.) সূত্রে আবুল 'আলিয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত, من بعد ما تبين لهم الحق এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলতেন, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। এ কথা তারা তাদের তাওরাতে লিখিতাবস্থায় পেয়েছিল। 'আম্মার (রা.) সূত্রে রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো অতিরিক্ত রয়েছে যে, অতঃপর তারা তাঁর সাথে কুফরী করেছে বিদ্বেষবশত ও বিদ্রোহমূলকভাবে। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য সম্প্রদায়ের। মূসা (র.) সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, من بعد ما تبين لهم الحق-এর حق সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ (স)। তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, তিনিই সেই রাসূল। ইউনুস (র.) সূত্রে ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, من بعد ما تبين لهم الحق অর্থ তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট ছিল যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের কুফরী ছিল শত্রুতামূলক এবং একথা জেনেশুনে যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। যেমন আবূ কুরায়ব (র.) সূত্রে হযরত 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, من بعد ما تبين لهم الحق -এ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে সত্য প্রকাশিত হবার পর তারা এর কোন কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না; বরং বিদ্বেষের কারণেই অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লজ্জা দিয়েছেন এবং চরমভাবে তিরস্কার করে ধমক দিয়েছেন।

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط -এর ব্যাখ্যা ঃ

فاعفوا অর্থ তোমরা ক্ষমা কর তাদের থেকে যে দুষ্কর্ম প্রকাশ পেয়েছে তা এবং তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে রাখার সংকল্প করে এবং তোমাদের ঈমান থেকে মুরতাদ করে দেওয়ার কামনা পোষণ করে যে ভুল করেছে, তা। তোমাদের নবীর প্রতি واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم বলে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি প্রকাশ করেছে তাও ক্ষমা কর। আর এব্যাপারে তাদের থেকে যে অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন তাদের সম্পর্কে তাঁর মনোনীত নির্দেশ ও ফায়সালা যতক্ষণ না তোমাদেরকে বাতলে দেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ফায়সালা করলেন এবং নির্দেশ ঘোষণা করে তাঁর নবীকে এবং মু'মিনদেরকে বললেন—

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ০

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না ও পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযয়া দেয়" (তাওবা ঃ ২৯)। এরপর আল্লাহ

তা'আলা মু'মিনদের উপর তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করা এবং উপেক্ষা করার নির্দেশ রহিত করে দিয়েছেন। যাতে তাদের এবং মু'মিনদের কালিমাহ একই হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা ইসলাম গ্রহণ করে) অথবা নত হয়ে স্বহস্তে জিযয়া দেয়। যেমন মুছান্না (র.) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ০ (মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর (সূরা তাওবা—৯/৫) আয়াত দ্বারা। বিশর ইব্‌ন মু'আয সূত্রে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره ط-এর পর আল্লাহ পাক তাঁর নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেছেন قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر .... وهم صاغرون (যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের সাথে জিহাদ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা নতি স্বীকার করে। তাওবা ঃ ৯/২৯)। এ আযাতটি পূর্ববর্তী فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره আয়াতকে রহিত করে। মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হলো, তোমরা কিতাবীদেরকে ক্ষমা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ জারী করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ জারী করে ইরশাদ করেন—قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر .... وهم صاغرون—। হাসান ইব্‌ন য়াহ্‌য়া সূত্রে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره আয়াতটি রহিত হয়েছে فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم আয়াত দ্বারা। মূসা সূত্রে সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره সম্পর্কে বলেন যে, এ আয়াতটি মানসূখ হয়েছে قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر .... وهم صاغرون আয়াত দ্বারা।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইতিপূর্বে আমরা قدير-এর অর্থ বর্ণনা করেছি যে, এর অর্থ হলো সর্বশক্তিমান। এরপর এখানে আয়াতের অর্থ হলো, কিতাবী এবং অন্যরা যাদের ক্রিয়াকলাপ তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে সক্ষম। তাদের দুশমনীর কারণে যদি তিনি শাস্তি দিতে চান তাও পারেন। আর যদি তোমাদের ন্যায় তাদেরকে ঈমানের হিদায়াত দিতে চান, তবে তাও পারেন। তিনি যা চান তা তাঁর কাছে মোটেই কষ্টকর নয়। আর তিনি যা ফায়সালা করতে চান, তাও তাঁর কাছে কঠিন নয়। কেননা সৃষ্টিও তাঁর এবং আদেশও তাঁর।

(১১০) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ০

(১১০) তোমরা সালাত কায়িম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللّٰهِ ۗ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সালাত কায়িম করার অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, নামাযের সীমা ও শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন করা। সালাত-এর ব্যাখ্যা এবং তার মূল উৎপত্তিও বর্ণনা করেছি। ايتاء الزكوة-এর অর্থও বর্ণনা করেছি যে, তার উপর যা ফরয হয়েছে তা সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করা। زكوة-এর অর্থ, সে সম্পর্কে মতভেদকারীদের মতভেদ এবং সে ব্যাপারে আমরা যে মত পোষণ করেছি তা আমরা বর্ণনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله-এর অর্থ হলো তোমরা মৃত্যুর পূর্বে যে সব নেক আমল করবে আখিরাতে তার ছাওয়াব তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে পাবে। তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন। خير শব্দটির অর্থ হলো, এমন কাজ যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন। আর আলোচ্য আয়াতে تجدوه শব্দের অর্থ হলো তোমরা তার ছাওয়াব পাবে যেমন 'আম্মার ইবনু'ল হাসান সূত্রে রবী' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, تجدوه অর্থ تجدوا ثوابه عند الله (তোমরা আল্লাহর কাছে তার ছাওয়াব পাবে।)

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা শ্রোতাদের কাছে এর কাংখিত অর্থ বোধগম্য হবার কারণে পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা হয়নি। যেমন 'আমর ইবন লাজা বলেছেন,

وسبحت المدينة لا تلمها + رأت قمرا بسوقهم نهارا

"শহরবাসী পবিত্রতা বর্ণনা করে। তুমি তাদেরকে তিরস্কার করনা। তারা দিনের বেলায় তাদের সওয়ারী চালানোর মাধ্যমে চাঁদ দেখতে পায়।" এখানে سبحت المدينة অর্থ শহরবাসী পবিত্রতা বর্ণনা করে। আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদেরকে সালাত কায়িম করতে, যাকাত আদায় করতে এবং নিজেদের জন্য নেক 'আমল প্রেরণ করতে নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন, যাতে তারা এর দ্বারা তাদের কৃত ভুল, যে ভুল তাদের কেউ কেউ করেছিল য়াহূদীদেরকে সুহৃদ বানিয়ে এবং তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে আর কেউ কেউ করেছিল রাসূলুল্লাহ (স.)-কে راعنا-র ন্যায় বেহুদা শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে যেন এসব থেকে পবিত্রতা লাভ করতে পারে। কেননা সালাত কায়িমের দ্বারা গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যাকাত আদায়ের দ্বারা আত্মা শরীর ও পাপের কালিমাহ থেকে পবিত্র হয়। আর নেক 'আমল দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সফলতা অর্জন করা যায়।

إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝-এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে সম্বোধিত মু'মিনগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যে কোন ভাল কাজ বা মন্দ কাজ গোপনে বা প্রকাশ্যে করুক না কেন, আল্লাহ তা দেখেন। তাঁর কাছে তাদের কৃত কোন কাজই গোপন থাকে না। ফলে তিনি নেক 'আমলের

উপযুক্ত বিনিময় দিবেন আর খারাপ কাজেরও অনুরূপ বদলা দিবেন। এ আয়াতটি খবরের আকারে বলা হলেও এতে ওয়াদা, ধমক, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে। সেটা এভাবে যে, তিনি কওমকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের সকল 'আমল দেখতে পান। তাই তারা যেন তার 'ইবাদাত ও আনুগত্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কেননা, এটা তাদের জন্য তাঁর কাছে জমা থাকবে। যার ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে ছাওয়াব দান করবেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন, وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله (তোমরা যে কোন নেক 'আমলই অগ্রিম প্রেরণ করবে তার ছাওয়াব আল্লাহর কাছে পাবে)। আর তারা যেন গুনাহের কাজ বর্জন করে। কেননা, পাপ কাজ তার কাছে পেশ করার পর পাপীকে তিনি শাস্তি দিবেন। আমাদের প্রতিপালক যে কাজের উপর ধমক প্রদান করেছেন সেটাই নিষিদ্ধ কাজ। আর যার বিনিময়ের (ছাওয়াবের) ওয়াদা করেছেন, সেটাই নির্দেশিত কাজ। بصير শব্দটি مبصر থেকে রূপান্তরিত। যেমন مبدع থেকে بديع এবং مؤلم থেকে اليم।—

(১১১) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

(১১১) এবং তারা বলে, 'জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করবে না'। এ তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর'।

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে وقالوا অর্থ—য়াহূদী ও নাসারারা বলে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ খবরে য়াহূদী ও নাসারাকে কিরূপে একত্রিত করা হলো অথচ তাদের উভয় দলের দাবীই ভিন্ন। য়াহূদীগণ নাসারারা যে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, তা অস্বীকার করে। অনুরূপভাবে নাসারাগণও য়াহূদীদের কথা অস্বীকার করে। জবাবে বলা যায়, এর অর্থ তুমি যা ধারণা করেছ তার উল্টো। এর অর্থ হলো— য়াহূদীগণ বলে, 'জান্নাতে য়াহূদী ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। আর নাসারাগণ বলে, জান্নাতে নাসারা ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু যাদের কাছে এ কথা বলা হয়েছে, তাদের কাছে বিষয়টির অর্থ পরিষ্কার ছিল, সেহেতু উভয় দলকে একত্রিত করে বলে দেওয়া হয়েছে وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى অর্থাৎ য়াহূদীগণ বলে, জান্নাতে য়াহূদীগণ ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। আর নাসারাগণ বলে, জান্নাতে নাসারাগণ ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে না।

من كان هودا-এর هود সম্পর্কে দুই ধরনের মতামত রয়েছে ঃ (১) তা هائد এর বহুবচন। যেমন عائط-এর বহুবচন عوط, عائذ-এর বহুবচন عوذ ও حائل-এর বহুবচন حول প্রভৃতি।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের বহুবচনে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। هائد শব্দের অর্থ তওবাকারী, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (২) তা مصدر যেমন বলা হয়, رجل صوم, قوم صوم, رجل فطر, قوم فطر, نسوة فطر প্রভৃতি। আবার কেউ কেউ বলেন, 'الا من كان هودا' আসলে 'الا من كان يهودا' ছিল। অতিরিক্ত ياء অক্ষরটিকে লুপ্ত করে يهودية থেকে فعل-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, উবায়্যি (রা.)-এর কিরাআত হলো, الا من كان يهوديا او نصرانيا —। ইতিপূর্বে আমরা نصارى শব্দের অর্থ, নামকরণের হেতু ও বহুবচন ব্যবহারের কারণ বর্ণনা করে এসেছি—যার ফলে পুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন নেই।

تلك امانيهم-এ আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, যারা বলে, 'জান্নাতে কেবলমাত্র য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারবে না'— তাদের উক্তি সম্পর্কে যে, এটা তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর উপর মিথ্যা আশাবাদ, যা ঠিক নয়। আর তা দলীল-প্রমাণবিহীন। তারা যা দাবী করে, তা সঠিক হবার ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত জ্ঞান নেই, বরং এটা তাদের ভ্রান্ত দাবী এবং প্রতারক আত্মার ভ্রান্ত আশাবাদ। যেমন বিশর ইব্‌ন মু'আয (র.) সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, تلك امانيهم-এর অর্থ হলো, এমন আশা, যা তারা অমূলকভাবে আল্লাহর উপর পোষণ করত। মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, تلك امانيهم-এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, এমন আশা, যা অন্যায়ভাবে তারা আল্লাহর উপর পোষণ করত।

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○-এর ব্যাখ্যা :

এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীর প্রতি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ, যারা দাবী করে জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ নির্দেশটি মুসলিম, য়াহূদী ও নাসারা সকল দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো, তারা যে দাবী করে যে, জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না - এর উপর দলীল-প্রমাণ পেশ করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! যারা ধারণা করে যে, জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারবে না, তাদেরকে বলুন যে, তোমরা এ ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ কর, সে সম্পর্কে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। তাহলে আমরা তোমাদের দাবী সমর্থন করব, যদি তোমরা তোমাদের 'জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না'—এ দাবীতে সত্যবাদী হও।

برهان হলো, বিবরণ ও দলীল-প্রমাণ। যেমন বিশর ইব্‌ন মু'আয (র.) সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, هاتوا برهانكم অর্থ তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। মূসা (র.) সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, هاتوا برهانكم অর্থ তোমরা তোমাদের হুজ্জাত বা দলীল আন। মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, هاتوا برهانكم অর্থ তোমাদের হুজ্জাত বা প্রমাণ আন।

আয়াতটিতে বাহ্যত যারা 'জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না' বলে দাবী করে, তাদের সে দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের নির্দেশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কারণ, তারা কখনো

তাদের এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে না। এ আয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে য়াহূদী ও নাসারাদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে আমরা যা উল্লেখ করলাম, পরবর্তী আয়াত بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن সে বিষয়টিই আরো স্পষ্ট করে তোলে। قل هاتوا برهانكم-এর ব্যাখ্যা হলো, তোমরা উপস্থাপন কর এবং আন।

(١١٢) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

(১১২) হ্যাঁ, যে-কেউ আল্লাহর নিকট পুরাপুরি আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ - এর ব্যাখ্যা :

بلى من اسلم-র অর্থ হলো অবান্তর ধারণাকারিগণ যা বলেছে যে, 'জান্নাতে য়াহূদী বা নাসারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না'—ব্যাপারটি এরূপ নয়; বরং যে-কেউ আল্লাহ পাকের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁর নিয়ামতরাশি ভোগ করবে। যেমন মূসা (র.) সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, من اسلم وجهه لله الاية "যে-কেউ আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়---।" بلى শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। اسلم وجهه অর্থ, বিনীতভাবে তাঁর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। اسلام-এর আসল অর্থ অনুগত হওয়া। কারণ এর উৎপত্তি হলো استسلمت لامره থেকে, যার অর্থ নির্দেশের প্রতি বিনীত ও অনুগত হওয়া। মুসলমানকে এজন্য মুসলমান নাম রাখা হয়েছে যে, সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য প্রকাশকালে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে। যেমন মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بلى من اسلم وجهه لله অর্থ, যে আল্লাহর জন্য ইখলাস পোষণ করে। আর যেমন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল (র.) বলেছেন —

و اسلمت وجهى لمن اسلمت + له المزن تحمل عذبا زلالا -

অর্থাৎ আমি তাঁর আনুগত্যে বিনীত ও নম্র হই, যার ইবাদাতের জন্য সেই মেঘও বিনীত ও নম্র হয়, যা ময়লা-আবর্জনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা بلى من اسلم وجهه لله এর মধ্যে যাদের সম্পর্কে বলেছেন কেবলমাত্র তাদের মুখমণ্ডলের (وجه) কথাই উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য অঙ্গের কথা উল্লেখ করেননি। এর কারণ হলো, মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তার মুখমণ্ডলই বেশী সম্মানিত। এর মর্যাদা ও অধিকার (হক) সবচেয়ে বেশী। সুতরাং যখন কোন জিনিসের প্রতি তার সর্বাধিক সম্মানিত মুখমণ্ডল বিনীত হবে, তখন সঙ্গত কারণেই আরো উত্তমরূপে তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রতি বিনীত হবে। এ জন্যেই আরবগণ কোন জিনিস সম্পর্কে কিছু বলতে হলে কেবলমাত্র وجه -এর উল্লেখ করে এবং তার দ্বারা মূল বস্তুটিকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন কবি আ'শার কবিতা ঃ

واول الحكم على وجهه + ليس قضائى بالهوى الجائر

"এবং আদেশকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা কর। আমার সিদ্ধান্ত অত্যাচারী মানসিকতার প্রতিপালন নয়।" এখানে على وجهه অর্থ—'তার সঠিক ও শুদ্ধ হবার উপর'। আর যেমন কবি যুররিম্মা বলেছেন ঃ

فطاوعت همى وانجلى وجه نازل + من الامر لم يترك خلاجا نزولها-

"আমি আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেছি এবং বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে, এমন কোন দিক বাকী রাখেনি, যা সে দূরীভূত করবে।" এখানে وجه نازل -এর দ্বারা نجلى النازل من الامر। অর্থাৎ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে এবং এ ধরনের আরো যেসব বাক্য রয়েছে। কেননা, প্রত্যেক জিনিসের ভাল ও মন্দ তার চেহারায় প্রকাশ পায়। আর কোন জিনিসের وجه তথা চেহারা বা মুখমণ্ডলের বর্ণনা করা হলে প্রকৃতপক্ষে তার মূল জিনিসেরই বিবরণ দেওয়া হয়। সুতরাং এমনিভাবেই আল্লাহ পাকের বাণী بلى من اسلم وجهه لله -এর অর্থ হবে। অর্থাৎ হ্যাঁ, যে-কেউ আল্লাহ পাকের জন্য তার দেহকে অনুগত করে, অতঃপর বিনীত দেহে সে তাঁর 'ইবাদাত করে এবং সে তার আত্মসমর্পণে শরীরের দ্বারা সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার জন্য তার প্রতিপালকের মহান দরবারে রয়েছে ছাওয়াব ও বিনিময়।

এখানে শরীর (جسد)-এর কথা উল্লেখ না করে চেহারা বা মুখমণ্ডল-এর কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাক্যটির দ্বারা যে অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য وجه -এর উল্লেখের দ্বারা সে অর্থই বুঝা যায়।

وهو محسن -এর অর্থ হলো, সে ইখলাসের অবস্থায় আছে। আর বাক্যটির অর্থ হলো, হ্যাঁ, যে-কেউ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদাত ও আনুগত্য প্রকাশ করে, সে তার একাজে সৎকর্মপরায়ণ।

فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ -এর ব্যাখ্যা ঃ

فله اجره عند ربه -এর অর্থ হলো, খালিসভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে ইবাদাত ও আত্মসমর্পণকারীর জন্য কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে তার এ আত্মসমর্পণ ও ইবাদাতের বিনিময়ে রয়েছে ছাওয়াব ও প্রতিদান। ولا خوف عليهم -এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ পাকের জন্য আত্মসমর্পণ করেছেন খালিসভাবে এবং তাঁর দীনকে আন্তরিকতা সহকারে মান্য করেছেন, তাদের আমলের ব্যাপারে পরকালে কোনো প্রকারের শাস্তি বা জাহান্নামের আযাবের ভয় নেই।

ولا هم يحزنون -এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে সে যা রেখে যাবে তার জন্য সে দুঃখিত হবে না এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'ইবাদাতগুযার বান্দাদের জন্য জান্নাতে যে নিয়ামতরাশি তৈরি করে রেখেছেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিত ও করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ ইতিপূর্বে فله اجره عند ربه ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ হলো, তাদের সম্পর্কে بلى من اسلم وجهه لله -তে যদিও একবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তাতে বহুবচনের অর্থ রয়েছে। সুতরাং فله اجره -এর মধ্যে শব্দের দিকে লক্ষ্য করে একবচন এবং ولا خوف عليهم -এর মধ্যে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

(১১৩) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(১১৩) এবং য়াহুদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'য়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই'। অথচ তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে। এভাবেই তাদের কথার ন্যায় বলেছে সে সব লোকেরা, যারা কিছু জানে না। অতঃপর আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবের দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে ঝগড়া করেছিল। তাদের একদল অপর দলকে বলেছিল। যারা এরূপ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ইব্ন হুমায়দ (র.) সূত্রে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাজরানের অধিবাসী নাসারারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-র কাছে যখন হাযির হয়, তখন য়াহূদীদের ধর্মযাজকরাও উপস্থিত হয়। অতঃপর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে ঝগড়া জুড়ে দেয়। য়াহূদীদের মধ্য থেকে রাফি' ইব্ন হুরায়মালাঃ বলল, 'তোমাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং সে 'ঈসা ইব্ন মারয়াম ও ইনজীলকে অস্বীকার করল। অতঃপর নাজরানবাসী খৃস্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, 'তোমাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং সে মূসা (আ.)-এর নুবুওয়াত এবং তাওরাতকে অস্বীকার করল। তখন তাদের এ ঝগড়া ও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন—

وقالت اليهود ليست النصرى على شيء وقالت النصرى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ○

আম্মার সূত্রে রবী' থেকে বর্ণিত, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء। সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগের কিতাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, য়াহূদীরা বলে, খৃস্টানরা সঠিক দীনের উপর নেই, আর খৃস্টানরা বলে, য়াহূদীরা সঠিক দীনের উপর নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবী সম্পর্কে মু'মিনদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, এদের প্রত্যেক দলই সেই কিতাবের হুকুম লংঘন করছে—যার বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার কথা তারা স্বীকার করে এবং আল্লাহ তাতে যে সকল ফরয নাযিল করেছেন, তা তারা অস্বীকার করে। কারণ যে ইনজীলকে খৃস্টানরা বিশুদ্ধ ও হক বলে মান্য করে, সেই ইনজীলই তাওরাতে যা আছে—মূসা (আ.)-র নুবুওয়াত এবং আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বনী ইসরাঈলদের উপর যা কিছু ফরয করেছিলেন—সে সবই হক বলে ঘোষণা করে। আর যে তাওরাতকে য়াহূদীরা বিশুদ্ধ ও হক বলে মান্য করে, সেই তাওরাতই 'ঈসা (আ.)-এর নুবুওয়াত এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব হুকুম-আহকাম ও ফরয নিয়ে এসেছিলেন, সে সবই হক বলে ঘোষণা করে। এরপর প্রত্যেক দল অন্য দলকে ভিত্তিহীন বলে, যা আল্লাহ তাঁর বাণীতে وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক দল তাদের কিতাব—যা তাদের এ দাবী মিথ্যা হবার সাক্ষ্য দেয়—তিলাওয়াত করা সত্ত্বেও এরূপ বলে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, এদের প্রত্যেক দল তারা যা বলছে তা বাতিল—এটা জেনেশুনেও ঐরূপ বলে থাকে এবং তারা যে কুফরীর উদ্ভব করে তা চালিয়ে যাচ্ছে তাও জেনেশুনেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণের পরও কি য়াহূদী ও খৃস্টানরা কোন ভিত্তির উপর ছিল যে, একদল আরেক দলকে তাদের দাবীতে বাতিল ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করত? এর জবাবে বলা যায় যে, ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে আমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি যে, তাদের প্রত্যেক দলের অস্বীকৃতি ছিল মূলত হযরত রাসূল (স.)-এর নুবুওয়াতকে এবং অপর পক্ষ যা পেশ করেছে তা অস্বীকার করা। যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল। এটা প্রত্যাখ্যান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না যে, যে অবস্থা ও সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী (স.)-কে প্রেরণ করেছেন, সেই অবস্থা ও সময়ে অন্যদলের দীনের কোন ভিত্তি নেই। কারণ তারা আমাদের নবী করীম (স.)-এর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। আয়াতের অর্থ এটা হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেক দল অন্যদলের সম্পর্কে অস্বীকার করত যে, আমাদের নবী (স.)-এর আবির্ভাবের পর তারা আর কোন ভিত্তির উপর নেই। কারণ, যে অবস্থা ও সময়ে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন, সে অবস্থা ও সময়ে তারা উভয় দলই আমাদের হযরত নবী করীম (স.)-এর নুবুওয়াতকে অস্বীকার করত। তাই আয়াতের অর্থ হলো, য়াহূদীরা বলে, "খৃস্টানগণ তাদের দীনের জন্মলগ্ন থেকেই কোন ভিত্তির উপর নেই। আর খৃস্টানরা বলে, য়াহূদীরা তাদের দীনের জন্মলগ্ন থেকেই কোন ভিত্তির উপর নেই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে একটু পূর্বে আমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি, তার প্রকৃত অর্থ এটাই। এরপর আল্লাহ তাআলা উভয় দলকেই তাদের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বিশর ইব্ন মাআয (র.)-এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء সম্পর্কে তিনি বলেন, হাঁ, প্রথম যুগের নাসারারা সঠিক ভিত্তি তথা দীনের উপর ছিল, কিন্তু পরে তারা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়। وقالت النصارى ليست اليهود على شيء (নাসারারা বলে, য়াহূদীরা কোনো ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত নয়) কিন্তু তাদের সম্প্রদায় নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যায়। কাসিম (র.) সূত্রে ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء সম্পর্কে তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন যে, প্রথম যুগের য়াহূদী ও নাসারারা সঠিক ভিত্তির উপর ছিল।

وهم يتلون الكتاب এর দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর কিতাব তাওরাত ও ইনজীলকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর এ কিতাবদ্বয় য়াহূদ ও নাসারা সম্প্রদায়ের কুফরী এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করার উপর সাক্ষ্য বহন করে।

আবূ কুরায়ব (র.) সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وهم يتلون الكتاب -এর অর্থ হলো, প্রত্যেকেই তিলাওয়াত করে নিজ নিজ কিতাব সে বিষয়ে বিশ্বাস করার কথা যা তারা অবিশ্বাস করে অর্থাৎ য়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কুফরী করে এবং তাঁকে অস্বীকার করে অথচ তাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর জবানীতে তাদের কাছ থেকে হযরত 'ঈসা (আ.)-কে বিশ্বাস করার এবং তাঁর উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার নেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আবার হযরত 'ঈসা (আ.) যে ইনজীল নিয়ে এসেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা এবং তিনি যে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন, তা যে আল্লাহর কিতাব—তার কথা উল্লেখ রয়েছে। এদের প্রত্যেক দলই তার সমকালীন দলের কাছে যা আছে, তা অস্বীকার করে।

كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ -এর ব্যাখ্যা :

كذلك قال الذين لا يعلمون -এর দ্বারা কাদের কথা বুঝান হয়েছে—এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রবী' (র.) قال الذين لا يعلمون مثل قولهم এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : নাসারারা য়াহূদীদের পূর্বেই তাদের অনুরূপ কথা বলত। হযরত কাতাদাহ (র.) قال الذين لا يعلمون مثل قولهم এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : নাসারারা য়াহূদীদের অনুরূপ কথা বলত তাদের পূর্বেই। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, "আমি একবার আতাকে বললাম, الذين لا يعلمون এ আয়াতাংশে কাদের কথা বলা হয়েছে? তিনি বললেন, এমন এক জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা য়াহূদী ও নাসারা এবং তাওরাত ও ইনজীলের পূর্বে ছিল। আর কোন কোন মুফাস্সির বলেন, "এর দ্বারা 'আরবের মুশরিকদেরকে বুঝান হয়েছে। কেননা, তারা কিতাবধারী ছিল না। তাই তাদের সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে এবং কিতাব না থাকার কারণেই তাদের জ্ঞান নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতের সমর্থনে হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, (كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) তারা হলো আরববাসী, যারা বলত, হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ভিত্তির উপর নেই।

আমাদের কাছে এসব মতামতের মধ্যে সঠিক হলো, আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন এক জাতির কথা বলেছেন, যারা ছিল অজ্ঞ। য়াহূদী ও নাসারাদের যে জ্ঞান ছিল, তা তাদের ছিল না। এ অজ্ঞতা সত্ত্বেও য়াহূদী ও নাসারারা একে অপরকে যেরূপ বলত, আরবরাও হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সেরূপ বলত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীতে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন وقالت اليهود ليست

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء —এরা আরবের মুশরিকও হতে পারে, য়াহূদী ও নাসারাদের পূর্ববর্তী কোন জাতিও হতে পারে। কোন এক জাতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, আয়াতে তাদেরকেই বুঝান হয়েছে। কারণ, এর দ্বারা কাদেরকে বুঝান হয়েছে আয়াতে সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকেও এর সমর্থনে নির্ভরযোগ্য পন্থায় কোন রিওয়ায়াত ও প্রমাণ বর্ণিত নেই।

كذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم-এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, য়াহূদী ও খৃস্টানরা অমূলক কথা বলে, আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নবী-রাসূলগণের নুবুওয়াত অস্বীকার করে। অথচ তারা কিতাবের অনুসারী। তারা জানে যে, তারা যা বলে তা ভুল। তারা যা অস্বীকার করছে, সে অস্বীকারের কারণে তারা তাদের দীন ও মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যারোপ করছে। অনুরূপ বলে আল্লাহ পাক, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও, যাদের প্রতি আল্লাহ কোন রাসূল প্রেরণ করেননি এবং কোন কিতাবও নাযিল করেননি।

এ আয়াতটি একথাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা জেনেশুনেও কোন পাপ কাজ করে, তার সে পাপ কাজ দীনের ক্ষেত্রে অধিক পাপ বলে গণ্য হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে অজ্ঞতাবশত তা করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে তাদের মিথ্যা দাবীর কারণে কঠোরভাবে ধমক দিয়ে ইরশাদ করেন: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء। এই কারণে যে, তারা কিতাবী। এ ব্যাপারে তারা যা কিছু বলছে, এটা জেনেশুনেই বলছে যে, তারা ভ্রান্ত।

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ০ -এর ব্যাখ্যা:

فالله يحكم-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যেদিন সমস্ত মানুষ কবর থেকে উঠে তাদের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান হবে, সেদিন তিনি এই সব মতভেদকারী যারা একে অপরকে বলে যে, তোমাদের দীনের কোন ভিত্তি নেই– তাদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন। তারপর তাদের মধ্যে কে হকপন্থী আর কে বাতিলের অনুসারী, তা নিরূপিত হয়ে যাবে। হকপন্থীকে ছাওয়াব প্রদান করবেন, যা দেওয়ার অঙ্গীকার তিনি করেছেন ইবাদাতকারীদের সম্পর্কে তাদের নেক 'আমলের বিনিময়ে। আর বাতিলের অনুসারীদের বদলা দিবেন যার ধমক তিনি দিয়েছিলেন কাফিরদের সম্পর্কে তাদের কুফরীর কারণে। দুনিয়ার যিন্দিগীতে তারা তাদের দীন ও মিল্লাত সম্পর্কে যে মতভেদ করত, তিনি সে ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করবেন।

قيامة শব্দটি قمت ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। قمت قياما, قيامة —যেমন বলা হয়ে থাকে عدت فلانا عيادة এবং لا مر صيانة। صنت هذا প্রভৃতি। قيامة -এর অর্থ হলো, সকল সৃষ্টির নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। আর يوم القيامة। অর্থ, সকল সৃষ্টির তাদের কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে গিয়ে দাঁড়ানোর দিন।

(١١٤) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ط أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ط لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ০

(১.৪) আর সেই ব্যক্তি থেকে বড় যালিম কে হবে, যে আল্লাহ্র ঘরে তাঁর পবিত্র নামের যিকরে বাধা দেয় এবং আল্লাহ তাআলার ঘর ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। তাদের জন্য তো ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ব্যতীত তাতে প্রবেশ করা উচিত নয়। এই পৃথিবীতে রয়েছে তাদের জন্য অপমান এবং আখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا -এর ব্যাখ্যা:

ومن اظلم-এর ব্যাখ্যা হলো, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর সীমালংঘনকারী, আল্লাহর উপর ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতাকারী আর কে আছে, যে মসজিদগুলোতে আল্লাহর 'ইবাদত হতে বাধা দেয়? مساجد — مسجد-এর বহুবচন। সেই সব স্থানকে মসজিদ বলা হয়, যেখানে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা হয়। আর ইতিপূর্বে আমরা سجود (সিজদা)-এর অর্থ বর্ণনা করেছি। অতএব, مسجد-এর অর্থ হলো সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ পাকের জন্য সিজদা করা হয়। যেমন যে স্থানে বসা হয়, তাকে مجلس এবং যে স্থানে অবতরণ করা হয়, তাকে منزل বলা হয়। مسجد-এর বহুবচন যেমন مساجد, তেমনি منزل-এর বহুবচন منازل এবং مجلس-এর বহুবচন مجالس —। কোন কোন আরববাসীর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, مساجد-এর একবচন مساجد-ই। এটা হয়ত বর্ণনাকারীর ভুল।

ان يذكر فيها اسمه-এর দু'ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) এর অর্থ হলো, সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয়? এমতাবস্থায় কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদের মতে ان। শব্দটি نصب তথা যবরের স্থলে। (২) এর অর্থ হলো, সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে মসজিদগুলোতে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয়? এমতাবস্থায়ও ان। শব্দটি نصب-এর স্থলে থাকবে।

وسعى فى خرابها-এর অর্থ হলো, সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ঘরকে বিনাশ করতে চেষ্টা করে? এমতাবস্থায় سعى শব্দটি منع-এর উপর عطف হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها -এর দ্বারা কাকে বুঝান হয়েছে এবং তা কোন্ মসজিদ? এ প্রশ্নের জবাবে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যারা মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দিত, তারা ছিল খৃস্টান আর সে মসজিদটি হলো বায়তু'ল মুকাদ্দাস। যারা এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মদ

ইবন সা'দ সূত্রে ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه-তে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো খৃস্টান। মুহাম্মদ ইবন 'আমর সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা হলো খৃস্টান। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে ময়লা-আবর্জনা ফেলত এবং মানুষকে তাতে সালাত আদায় করতে বাধা দিত। মুছান্না (র.) সূত্রেও মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর অন্য কয়েকজন মুফাস্সির বলেন, বখ্ত নাসার ও তার সৈন্যদল এবং খৃস্টানদের মধ্য থেকে যারা তাদের সহায়তা করত, তাদের কথা বলা হয়েছে। আর সে মসজিদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। যারা এরূপ বলেছেন ঃ হযরত কাতাদাহ (র.) ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো আল্লাহর দুশমন খৃস্টান, তারা য়াহূদীদের উপর শত্রুতাবশত বাবেলের অগ্নি-উপাসক বাদশাহ বখ্ত নাসারকে বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল। হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে অন্য সূত্রে ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বখ্ত নাসার ও তার দল-বল বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে। আর এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছিল খৃস্টানরা। হযরত সুদ্দী (র.) ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রোমবাসিগণ বখতনাসারকে বায়তুল মুকাদ্দাস বিনষ্ট করতে সাহায্য করেছিল। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিনষ্ট করে সেখানে দুর্গন্ধময় মরা জীবজন্তু ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিল। বনী ইসরাঈলগণ য়াহয়া ইবন যাকারিয়া (আ.)-কে হত্যা করার কারণেই রোমবাসিগণ বখ্তনাসারকে বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসে সাহায্য করেছিল। আর কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা কুরায়শের মুশরিকদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন। যখন তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে মসজিদে হারামে 'ইবাদত করতে বাধা দিয়েছিল। যারা এরূপ বলেছেন, তাদের মধ্যে হযরত ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এরা ছিল মুশরিক। হুদায়বিয়ার দিন হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে তারা মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। যার ফলে "যু-তুওয়া" নামক স্থানে তিনি তাঁর জন্তু কুরবানী করেছিলেন এবং তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "এ ঘরে প্রবেশ করতে ইতিপূর্বে কেউ কাউকে বাধা দেয়নি, এমনকি কেউ যদি তার পিতার বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে সেখানে পায়, তাকেও সে বাধা দেয় না। আর কাফিররা বলেছিল, আমাদের কোন লোক জীবিত থাকতে, বদরের দিন যারা আমাদের বাপ-দাদাকে হত্যা করেছিল, তারা আমাদের কাছে প্রবেশ করতে পারবে না।

আর وسعى في خرابها-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, যারা আল্লাহর যিকরের দ্বারা আল্লাহর ঘরকে আবাদ করবে এবং হজ্জ ও উমরা পালনার্থে যারা আসবে, তাদেরকেও সেখানে প্রবেশে বাধা দিবে।

এ পর্যন্ত উক্ত আয়াতের যে সব ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করলাম তন্মধ্যে উত্তম হলো, আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খৃস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন। আর এরাই সেই সব ব্যক্তি, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এবং একাজে বখ্ত নাসারকে সাহায্য করেছে। বখ্ত নাসার তার দেশে ফিরে যাবার পর এরাই বনী ইসরাঈলদের মু'মিন ব্যক্তিগণকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করতে বাধা দিয়েছে।

আমরা যা বললাম, তা সঠিক হবার ব্যাপারে দলীল হলো ঃ একথা প্রমাণিত যে, উক্ত আয়াতের অর্থে উল্লিখিত তিনটি মতের যে কোন একটি প্রযোজ্য হবে। আর وسعى في خرابها-এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে মসজিদ বুঝাতে চেয়েছেন, তা উল্লিখিত দু'টি মসজিদের যে কোন একটি হবে—হয়তো বায়তুল মুকাদ্দাস, নয়তো মাসজিদুল হারাম। একথা যখন স্বীকৃত হলো, আর এটা জানা কথাই যে, কুরায়শের মুশরিকরা কখনো মসজিদে হারামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি, যদিও তারা কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবা কিরামকে সেখানে সালাত আদায়ে বাধা দিয়েছে। অতএব, একথাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদ ধ্বংস করার চেষ্টা সম্পর্কে যাদের কথা বলেছেন, তারা সে সব ব্যক্তি নয়, যাদের সম্পর্কে তিনি মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার কথা বলেছেন। কারণ কুরায়শের মুশরিকরা জাহিলী যুগে মসজিদে হারাম নির্মাণ করেছিল। আর এর নির্মাণ ও আবাদ করা নিয়ে তারা গর্ববোধ করত। যদিও সেখানে তাদের কোন কোন কাজ আল্লাহ তা'আলার মরযি মুতাবিক হতো না।

আর একটি দলীল হলো, আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে য়াহূদী ও খৃস্টানদের খবর এবং তাদের দুষ্কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতে খৃস্টানদের দুষ্কর্মের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তারা যে তাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করে, সে সংবাদও দেওয়া হয়েছে। কুরায়শ, 'আরবের মুশরিক এবং মসজিদে হারামের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়নি যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদেরকে এবং মসজিদে হারামকে বুঝান হবে। সুতরাং আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা সেটাই হবে, যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতের ঘটনার সাথে সাদৃশ্য রাখবে। কারণ উক্ত আয়াতের খবর তার পূর্বাপর আয়াতের খবরেরই অনুরূপ হবে। তবে হ্যাঁ, যদি এর পরিপন্থী এমন কোন প্রমাণ থাকে, যা অবশ্যই মেনে নিতে হয়, তাহলে ব্যতিক্রম হতে পারে। যদিও এর ঘটনাবলী এক হয় এবং সাদৃশ্যমূলক হয়।

যদি কেউ মনে করে যে, আমরা যা বলেছি, বিষয়টি আসলে তা নয়। কারণ, মুসলমানদের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ফরয নামায আদায় করা কখনো জরুরী ছিল না যে, তাদেরকে সেখানে সালাত আদায়ে বাধা দেওয়া হতো। সুতরাং ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলা কখনো সঙ্গত হবে না যে, এখানে মসজিদ দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝান হয়েছে—তবে তার এরূপ ধারণা করা ভুল। কারণ, বনী ইসরাঈলের মু'মিনদেরকে যারা বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায়ে বাধা দিত আল্লাহ পাক সেই যালিমদের কথাই উল্লেখ করেছেন। বিশেষত যুলুমের খবর দ্বারা তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছে এবং মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টাও তারাই করেছে। যদিও আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি প্রত্যেক বাধাদানকারীকেই বুঝায়। আর মসজিদ ধ্বংস করার প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রই সীমালংঘনকারী যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

যারা আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়—এখানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে যে, যে মসজিদ ধ্বংস করার জন্য তারা চেষ্টা করে এবং

তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা থেকে তাঁর বান্দাদেরকে বাধা দেয়, সে মসজিদে প্রবেশ করা তাদের জন্য হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জঙ্গী মনোভাব পোষণ করবে। তবে হ্যাঁ, সেখানে প্রবেশের সময় তারা শাস্তির ভয়ে ভীত থাকলে তাদের প্রবেশে কোন বাধা নেই।

কাতাদাহ (র.)(যিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁর যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিঃ ৬১-১১৭) ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বর্তমানে কোন খৃস্টানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে পেলেই মারধর করা হয় এবং ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হয়। কাতাদাহ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা হলো খৃস্টান—তারা মসজিদে গোপনে ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না। সুযোগ পেলেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আজ তাঁর যুগে পৃথিবীতে কোন খৃস্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না এই ভয় ব্যতীত যে, তাকে হত্যা করা হবে অথবা তাকে জিযুয়া কর আদায়ের ভয় দেখান হবে। পরিণামে তাকে তা আদায় করতে হয়। ইউনুস (র.) সূত্রে ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, ও আল্লাহ! আমাদেরকে সেখানে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হলো।

এখানে اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين এই আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে সেই সব লোকদের সম্পর্কে, যারা আল্লাহর ঘরে তাঁর যিকর করতে মানুষকে বাধা দিত। যদিও এজন্য একবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (من), কিন্তু বহুবচনের অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে।

لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-এর ব্যাখ্যা :

لهم-এর দ্বারা তাদেরকেই বুঝান হয়েছে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়। لهم فى الدنيا خزى-এ خزى দ্বারা লাঞ্ছনা ও অপমানের কথাই বলা হয়েছে। এ অপমান ও লাঞ্ছনা হয়তো হত্যা বা গ্রেফতারীর মাধ্যমে নতুবা জিযয়া কর আদায়ের মাধ্যমে হবে। যেমন হাসানের সূত্রে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لهم فى الدنيا خزى-এর অর্থ হলো, তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে স্বহস্তে জিযয়া কর আদায় করবে। মূসা সূত্রে সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لهم فى الدنيا خزى-এর অর্থ হলো, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে যখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ঘটবে এবং কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে, তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর তাই হলো তাদের পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা ও অপমান। আর عذاب عظيم-এর অর্থ হলো, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি, যা কখনো সহজ করা হবে না। আর তাদেরকে মৃত্যুও দেওয়া হবে না। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান, হত্যা ও গ্রেফতারী। কেননা, তারা আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দিত এবং তা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করত। তাদের পাপাচার, আল্লাহ্র

সাথে কুফরী এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তা হবে মহাশাস্তি।

(১১৫) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ◎

(১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। অতএব, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র, আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط-এর ব্যাখ্যা :

و لله المشرق والمغرب-এর অর্থ হলো, পূর্ব-পশ্চিমের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। যেমন বলা হয় لفلان هذه الدار অর্থাৎ এই বাড়ীটির মালিক অমুক। তদ্রূপ و لله المشرق والمغرب-এর অর্থ হবে, পূর্ব এবং পশ্চিমের মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। المشرق। অর্থ সূর্যরশ্মি উদ্ভাসিত হবার স্থান। আর সেটা হলো সূর্যোদয়ের স্থান। যেমন সূর্যোদয়ের স্থানকে বলে مطلع (লাম অক্ষর যেরযুক্ত)। যেমন ইতিপূর্বে مساجد-এর ব্যাখ্যায় বলে এসেছি। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহর জন্য সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের স্থান কি মাত্র একটিই? আর সে কারণেই কি বলা হয়েছে و لله المشرق والمغرب? জবাবে বলা যায় যে, তোমার ধারণা ঠিক নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো: সূর্য প্রতিদিন যেখান থেকে উদিত হয় এবং প্রতিদিন যেখানে অস্ত যায়, সেটা আল্লাহরই মালিকানাধীন। উল্লিখিত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সকল প্রান্তের মালিকই আল্লাহ। কারণ সূর্য একদিন যেস্থান থেকে উদিত হয় এবং যে স্থানে অস্ত যায় বছরের সব দিনেই সে স্থান থেকে উদিতও হয় না এবং অস্তও যায় না। যদি কেউ বলে, আপনার উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম কি এটাই দাঁড়ায় না যে, গোটা সৃষ্টিই রাব্বুল আলামীনের? জবাবে বলা যায়, জী হ্যাঁ। এই ব্যাখ্যার পর যদি সে প্রশ্ন তোলে যে, তাহলে অন্যান্য সকল বস্তু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিমের কথা বলা হলো কেন? জবাবে বলা যায় যে, যে কারণে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে শুধুমাত্র এ দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন, সে কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা সে মতভেদগুলো উল্লেখ করার পর কোন্‌টি উত্তম তা বর্ণনা করব। কেউ কেউ বলেন, এ দুটি দিককে বিশেষভাবে বর্ণনার কারণ হলো, য়াহূদীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। আর রাসূলুল্লাহ (স.)-ও প্রথম দিকে কিছুদিন পর্যন্ত এরূপ করতেন। এরপর তাঁকে কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর একাজে য়াহূদীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها অর্থাৎ "তারা যে কিবলার দিকে ছিল, তা থেকে কে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?" তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দিক সবগুলোই আমার। আমি যেদিকে চাই, সেদিকেই আমার

বান্দাকে ফিরিয়ে দিই। সুতরাং তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র। যাঁরা এরূপ বলেছেনঃ হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনে সর্বপ্রথম যা রহিত করা হয় তা হলো কিবলা পরিবর্তনের আদেশ। তা এই রূপে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মদীনা তায়্যিবায় হিজরত করলেন আর সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল য়াহূদী, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় করার হুকুম দিলেন। এতে য়াহূদীগণ খুশী হলো। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) প্রায় সতের মাস সেদিকে ফিরে নামায আদায় করেন। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলাহ্‌কে ভালবাসতেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন এবং ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা قد نرى تقلب وجهك في السماء ...... فولوا وجوهكم شطره পর্যন্ত আয়াত নাযিল করলেন। তখন য়াহূদীরা সন্দেহপরায়ণ হয়ে বলতে লাগল, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল সে কিবলাহ থেকে, যে কিবলাহ তারা মেনে চলত? তারপর আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন।

হযরত সুদ্দী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর কেউ কেউ বলেন, মাসজিদে হারামকে কিবলাহ্ হিসাবে ফরয করার পূর্বেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স.) ও সাহাবা কিরামকে একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমের যে দিকেই ইচ্ছা, নামাযে সেদিকেই তারা মুখ ফিরাতে পারে। কারণ, যেদিকেই মুখ ফিরান হোক না কেন, সেদিকেই রয়েছেন আল্লাহ পাক। পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক তিনিই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যেমন অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন —

ولا ادنى من ذالك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا

(ছোট-বড় সকলের সাথেই তিনি রয়েছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। সূরা মুজাদালাহ ৫৮/৭) পরবর্তীতে মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানকে ফরয করে দিয়ে এটা রহিত করে দিয়েছেন।

এ বর্ণনার সূত্র হলোঃ হযরত কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত, ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله কে পরবর্তীতে মানসূখ (রহিত) করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام "যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।" (বাকারাঃ ১৪৯)

অন্য সূত্রে হযরত কাতাদাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, فاينما تولوا فثم وجه الله সম্পর্কে তিনি বলেন, এটাই ছিল কিবলাহ্। এরপর মাসজিদু'ল হারাম কিবলাহ রূপে ঘোষিত হওয়ায় পূর্ববর্তী কিবলাহ রহিত হয়। আরেকটি সূত্রে হযরত কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, فاينما تولوا فثم وجه الله সম্পর্কে তিনি বলেন, য়াহূদীরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করত। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-ও হিজরতের পূর্বে মক্কাহ্ মুয়ায্‌যমাতে এবং হিজরতের পর প্রায় সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। এরপর তিনি কা'বাহ্ শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। আল্লাহ তাআলা .. .. فلنولينك قبلة ترضاها ..... وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره .. .. এর দ্বারা কিবলাহ্ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আয়াত রহিত করেন। হযরত ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব (র.) বলেছেন, আমি হযরত যায়দ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم — এই আয়াত যখন

নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবা কিরামকে বললেন, য়াহূদীরা আল্লাহ্‌রই এক ঘরের দিকে ফিরে নামায আদায় করে, আমরাও সেদিকে মুখ করব। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) প্রায় সতের মাস সেদিকে ফিরে নামায আদায় করেন। একদা তাঁর কানে এলো যে, য়াহূদীরা বলাবলি করছে, 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা জানত না তাদের কিবলাহ কোথায়? আমরাই তাদেরকে পথ দেখিয়েছি।' হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের এ উক্তি অপসন্দ করলেন এবং আকাশের দিকে চেহারা মুবারক তুলে তাকালেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেনঃ قد نرى تقلب وجهك في السماء —।

আর অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে এ অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে যে, তিনি যেকোনো দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে পারেন সফরে ও যুদ্ধ চলাকালে এবং দুশমনের হামলার ভয়ে দুশমনের মুকাবিলার সময় এ বিধান ফরয নামাযের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তিনি ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله এ আয়াত দ্বারা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যেদিকেই ফিরবেন, আল্লাহ তাআলা সেদিকেই রয়েছেন।

এ মতের সমর্থনে যাঁরা বলেছেনঃ আবু কুরায়ব (র.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সওয়ার যেদিকে যেত, সেদিকেই মুখ করে তিনি নামায আদায় করতেন এবং বলতেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এরূপ করতেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত পেশ করতেন, فاينما تولوا فثم وجه الله —।

আবু সাইব (র.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فاينما تولوا فثم وجه الله আয়াতখানি নাযিল হওয়ায় সফরে তোমার সওয়ারী যেদিকে যাবে, সেদিকে মুখ করেই তুমি তোমার নফল নামায আদায় করতে পার। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মক্কাহ মুকাররমাহ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরার সময় সওয়ারীর উপর যখন নফল নামায আদায় করতেন, তখন মদীনা তায়্যিবাহ্‌র দিকে শির মুবারক দ্বারা ইশারা করতেন।

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতখানি এমন একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়, যারা তাদের কিবলাহ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, তারা কিবলাহ্‌র দিক নির্ণয়ে ব্যর্থ হলো। এতে তারা বিভিন্ন দিকে নামায আদায় করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, পূর্ব ও পশ্চিম আমার। তোমরা যেদিকে মুখ কর, তা আমারই দিক আর তাই তোমাদের কিবলাহ। এর দ্বারা তাদের বিগত নামায সম্পর্কে অবগত করানোই উদ্দেশ্য।

এ বর্ণনার সূত্র হলো, রবীআঃ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ঘোর অন্ধকার রাতে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর আমরা একস্থানে অবতরণ করলাম। আমাদের প্রত্যেকেই যার যার ইচ্ছামত এক এক পাথরের উপর গিয়ে নামায আদায় করলাম। ভোর হলে দেখলাম, আমরা কিবলার ভিন্নদিকে ফিরে নামায আদায় করেছি। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতরাতে আমরা কিবলাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামায আদায় করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন—

ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ٥

হযরত হাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার উসতাদ ইবরাহীম নাখঈ (র.)-কে বললাম, আমি যখন রাতে জেগেছি, তখন আকাশে মেঘ ছিল। ফলে, আমি কিবলাহ্ নির্ণয় করতে না পেরে কিবলাহ ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করেছি। তিনি বললেন, তোমার নামায সঠিক হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فاينما تولوا فثم وجه الله

হযরত রবীআঃ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা'র সাথে ছিলাম। তখন রাত ছিল ঘোর অন্ধকার। তাই কিবলাহ্ কোন্ দিকে তা আমরা জানতে পারলাম না। ফলে, আমরা প্রত্যেকেই যার যার অনুমানের উপর নির্ভর করে নামায আদায় করলাম। ভোর হলে আমরা ব্যাপারটি হযরত নবী পাক (স.)-এর দরবারে জানালাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, — فاينما تولوا فثم وجه الله।

অন্যান্য মুফাসসির বলেন, নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার সম্রাট) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি কিবলার দিক ফিরে নামায আদায় করার পূর্বেই ইন্তিকাল করার কারণে সাহাবা কিরাম তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আমার। তাই যে আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে এর যে-কোন দিকে মুখ করবে, সেদিকেই সে আমাকে পাবে। এর দ্বারা তিনি নাজ্জাশীকে বুঝিয়েছেন, যদিও তিনি কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেননি। কারণ, তিনি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিকল্পে কখনো কখনো পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। যারা এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ কাতাদাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) একবার বললেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছেন তোমরা তাঁর জন্য দু'আ কর। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, আমরা কি একজন অমুসলমানের জন্য দু'আ করব? তখন নাযিল হয়—

وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله

(কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপরও এবং তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপরও ঈমান রাখে আল্লাহর ভয়ে। আল-ইমরান ঃ ১৯৯)

কাতাদাহ্ (র.) বলেন, সাহাবা কিরাম তখন বললেন, "তিনি তো কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেননি।" আল্লাহ্ তাআলা তখন নাযিল করলেন — ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এতক্ষণ যে সব মতামত ব্যক্ত করা হলো, তন্মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির একচ্ছত্র মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখানে পূর্ব-পশ্চিমের উল্লেখ শুধু এজন্য করেছেন, যেনো তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম এবং এর মাঝে যত সৃষ্টি আছে, সব কিছুরই একমাত্র মালিক তিনি।

অতএব, আল্লাহ্ পাকের বিধান মুতাবিক জীবন যাপন করা তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা, ফরযগুলি আদায় করা এবং যেদিকে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিকে ফিরা সকল মানুষের

উপর অবশ্যকর্তব্য। কারণ ভৃত্যের কাজ হলো তার মালিকের হুকুম তা'মীল করা। আলোচ্য আয়াতে পূর্ব ও পশ্চিমকে উল্লেখ করা হলেও তার উদ্দেশ্য হলো সমগ্র সৃষ্টি। যেভাবে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, কোনো কিছুর কারণ বর্ণনা করার স্থলে সে সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়। যেমন, অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে واشربوا فى قلوبهم العجل তাদের অন্তরে গো-বৎস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এটা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সকল সৃষ্টির মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের। তিনি তাঁর বান্দাদের যা ইচ্ছা হুকুম করেন। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার দিকে মুখ ফিরাও। কারণ, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, তাই আমার দিক।

আলোচ্য আয়াতখানি কি নাসিখ (রহিতকারী) না মানসূখ, না এর কোনটাই নয়—এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো আয়াতখানি 'আম' বা ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ 'খাস' অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হলো فاينما تولوا فثم وجه الله-এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সফরের হালাতে তোমাদের নফল নামায যেদিকে ইচ্ছা ফিরে আদায় করতে পার এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধে রত থাকাকালে নফল ও ফরয নামায যেদিকে সুবিধা ফিরে আদায় করতে পার, সেদিকই আল্লাহ্ পাকের দিক। যেমনভাবে হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) ও নাখঈ (র.) মত পেশ করেছেন, যা এই মাত্র আমরা উল্লেখ করেছি। আবার এটাও হতে পারে যে. তোমরা পৃথিবীর যেখান থেকেই যেদিকে মুখ কর না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্ পাকের নির্দিষ্ট কিবলা। কেননা, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, সেখান থেকেই কিবলার দিক মুখ করা সম্ভব। যেমন মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, فاينما تولوا فثم وجه الله সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর কিবলা। তাই তুমি পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় কর। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের মুখ করার একটি কিবলা রয়েছে। তিনি বলেন, সেটা হলো কা'বাহ্। আর এটাও হতে পারে যে, তোমরা তোমাদের দু'আর মধ্যে যেদিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আমি রয়েছি। তোমাদের দু'আ কবুল করব। তেমনি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ادعونى استجب لكم (তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি কবুল করব) নাযিল হলো, তখন সাহাবা কিরাম বললেন, "কোন্ দিকে ফিরে?", তখন নাযিল হলো, — فاينما تولوا فثم وجه الله।

فاينما تولوا فثم وجه الله-এর যখন এতগুলি অর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করলাম, তখন কারো জন্য উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, আয়াতটি নাসিখ বা মানসূখ। কারণ, মানসূখ ছাড়া নাসিখ হতে পারে না। আর এ কথার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই যে, فاينما تولوا فثم وجه الله-এর অর্থ হলো, সালাতে তোমরা যেদিকে মুখ কর, সেটাই তোমাদের কিবলা। আর একথাও বলা যাবে না যে, এটা রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবা কিরামের বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে কা'বার দিকে ফিরবার নির্দেশ হিসেবে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায়কে রহিতকারী (নাসিখ)। কারণ সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা আলিম ছিলেন এবং তাবিঈদের মধ্যে যাঁরা

ইমাম ছিলেন, তাঁরা আয়াতটি এ অর্থে নাযিল হবার কথা অস্বীকার করেছেন। আর রাসূল (স.) থেকেও এরূপ কোন রিওয়ায়াত নেই যে, আয়াতটি উক্ত অর্থে নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা আমি বর্ণনা করেছি। সুতরাং এটা যখন নাসিখ হতে পারে না, তখন মানসূখও হতে পারে না। কারণ, ইতিপূর্বে আমি যা বর্ণনা করেছি যে, এখানে ব্যাপক অর্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সালাতের মধ্যে মুখ করার অর্থ ধরা হলে বিশেষ অবস্থায় এবং দু'আর অর্থ ধরা হলে সকল অবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে—এ ধরনের আরো বিভিন্ন রকমের অর্থ হতে পারে, যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আমার রচিত কিতাব كتاب البيان عن اصول الاحكام-এ আমি উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রত্যেক নাসিখই পূর্ববর্তী হুকুমকে বিলুপ্ত করে বান্দার উপর পরবর্তী ফরযকে অত্যাবশ্যক করে, যার মধ্যে যাহির ও বাতিন প্রভৃতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি এরূপ কোন সম্ভাবনা থাকে যে, এটা ইসতিছনা বা খাস ও 'আম বা মুজমাল ও মুফাসসাল-এর অর্থে ব্যবহৃত, তবে তা নাসিখ বা মানসূখ কোনটাই হতে পারবে না। এ বিষয়ে এখানে তা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর প্রত্যেক মানসূখই যার হুকুম ও ফরয পূর্বে প্রযোজ্য ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর فاينما تولوا فثم وجه الله-এর মধ্যে এ দু'টি অর্থের কোনটিই উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রযোজ্য নয় যে, একে নাসিখ বা মানসূখ বলা যাবে।

فاينما অর্থ যেখানেই বা যেদিকেই। تولوا-এর সঠিক ও উত্তম ব্যাখ্যা হলো শব্দটি تولون نحوه واليه (তোমরা যেদিকে মুখ কর) যেমন কেউ বলে وليت وجهى و وليت اليه অর্থাৎ আমি তার দিকে ফিরেছি বা মুখ করেছি। এটাকে উত্তম ব্যাখ্যা এ জন্যে বলা হয়েছে যে, এর সপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে। অপরপক্ষে এর ব্যাখ্যা تولوا عنه (তা থেকে ফিরে যাও) করা বিরল। এরপর যেদিকে তোমরা মুখ কর, তাই আল্লাহর দিক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিবলা।

فثم অর্থ সেদিকে। فثم-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এর ব্যাখ্যা হলো, সেদিকেই আল্লাহ্‌র কিবলা, অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত দিক।

যাঁরা এরূপ বলেছেনঃ মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فثم وجه الله অর্থ সেদিকেই আল্লাহ পাকের মনোনীত কিবলা। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেখানেই তোমরা থাক, তোমাদের একটি কিবলা রয়েছে—যেদিকে তোমরা মুখ করবে।

আর অন্যান্য তাফসীরকারগণ فثم وجه الله-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিকও আল্লাহ পাকের দিক।

আর কেউ কেউ বলেন, فثم وجه الله অর্থ তোমরা সেদিকেই মুখ করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর তাঁরই রয়েছে সম্মানিত চেহারা। আর অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, وجه অর্থ ذوالوجه – চেহারার অধিকারী। এই ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, আল্লাহ পাকের চেহারা অর্থ তাঁর অঙ্গ নয় বরং এটা তাঁর গুণ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক কি? জবাবে বলা হবে, পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, সেসব নাসারার

চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? যারা মসজিদে আল্লাহ পাকের বান্দাকে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিনষ্ট করার চেষ্টা করে? আর পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুহু। সুতরাং তোমরা যেদিকে ফিরেই তাঁকে স্মরণ কর না কেন, তিনি সেদিকেই আছেন। তাঁর অনুগ্রহ ও আশ্রয় তোমরা লাভ করতে পারবে। তোমাদের আমল সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসকারিগণের ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা এবং তাতে আল্লাহ পাকের নাম স্মরণে বাধাদানকারিগণের বাধা তোমাদেরকে এ কাজ থেকে অন্তত ফিরাতে পারবে না যে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁকে স্মরণ করবে।

ان الله واسع عليم ○-এর ব্যাখ্যা ঃ

واسع অর্থ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, অনুদান এবং নিয়ন্ত্রণ সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত।

عليم-এর অর্থ তিনি বান্দার সকল কাজ সম্পর্কে অবগত। কিছুই তাঁর কাছে অদৃশ্য নয় এবং তাদের আমল থেকে তিনি দূরেও নন; বরং সব বিষয়েই তিনি অবগত।

(١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا لا سُبْحٰنَهُ ط بَلْ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ○

(১১৬) এবং তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

وقالوا اتخذ الله ولدا বলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন, যারা আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দিত। وقالوا শব্দটি وسعى فى خرابها-এর উপর 'আত্ফ্' করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যারা আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ঘর বিনষ্ট করতে চেষ্টা করে? আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তারা হলো, সেসব খৃস্টান—যারা ধারণা করে যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তাদের আরোপিত মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন سبحانه অর্থাৎ তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র এবং এর থেকে অতি ঊর্ধে। سبحان الله-এর অর্থ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুরই তিনি মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। আর এ কথার তাৎপর্য হলো, কি করে ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হতে পারেন, তিনি তো আসমান ও যমীন ছাড়া অন্য কোন স্থানের অধিবাসী নন। আর আসমান ও যমীন উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই তো আল্লাহর মালিকানাধীন। তোমাদের ধারণা মতে, যদি ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র পুত্র

হতেন, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহর যে সব সৃষ্টি ও বান্দা রয়েছে, তাদের ন্যায় তাঁর মধ্যে সৃষ্টিগত চিহ্ন বিদ্যমান থাকত না।

كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ۝ -এর ব্যাখ্যা :

كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো مطيعون—সব কিছু অনুগত। যারা এরূপ বলেছেন : হাসান ইব্ন য়াহয়া সূত্রে কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি قانتون-এর অর্থ করেন 'অনুগত'। মুহাম্মদ ইব্ন আমর সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, আনুগত্যকারী। কাফিরের আনুগত্য প্রকাশ পায় তার ছায়ার সিজদার মাধ্যমে। মুছান্না সূত্রেও মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি আরো একটু যোগ করেছেন যে, কাফিরের ছায়ার সিজদার মাধ্যমে তার আনুগত্য প্রকাশ পায় এমন অবস্থায় যে, সে তাতে অসন্তুষ্ট। মূসা (র) সূত্রে সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কিয়ামাতের দিন সব কিছুই তাঁর অনুগত হবে। মুছান্না (র.) সূত্রে ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, এখানে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। মিনজাব ইব্নুল হারছ (র.) সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قانتون অর্থ مطيعون—'অনুগত'।

আর অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, এর অর্থ হলো, তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতিদানকারী। যাঁরা এরূপ বলেছেন : ইব্ন হুমায়দ (র.) সূত্রে ইকরামাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ অর্থ প্রত্যেকেই তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতিদানকারী। আর অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, যা মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ অর্থ প্রত্যেকেই কিয়ামাতের দিন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবে।

আরবী ভাষায় قنوت শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে : (১) আনুগত্য; (২) দণ্ডায়মান হওয়া; (৩) কিছু বলা থেকে বিরত থাকা। كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ-এর মধ্যে قنوت-এর উত্তম অর্থ হলো আনুগত্য এবং আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা। তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রকৃতিই এ সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহ্ পাক যে এক ও অদ্বিতীয় এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা—এ কথারও ইঙ্গিত বহন করে। আর তা এ ভাবে যে, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্ পাকের সন্তান রয়েছে, তিনি بل له ما في السماوات والأرض (বরং আসমান ও যমীনের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই) বলে তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। এরপর আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সকল বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, সবকিছুই ইঙ্গিতে একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ পাকই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। কেউ কেউ একথা অস্বীকার করলেও তাদের যবান নিশ্চিতভাবে তার আনুগত্য করে। তার গঠন-প্রকৃতি এবং সৃষ্টির আলামতই এ সাক্ষ্য বহন করে। আর মাসীহ আলায়হিস্ সালাম তো তাদেরই একজন। সুতরাং কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাকে ছেলে রূপে গ্রহণ করবেন?

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু লোকের ধারণা হলো, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ আয়াতাংশ 'আম বা ব্যাপক নয়, বরং খাস। এর দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাদেরকে বুঝান

হয়েছে। যে আয়াত বাহ্যিকভাবে আম তথা ব্যাপক, কোন উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তার খাস হবার দাবী করাটা অসঙ্গত যা আমি আমার কিতাব كتاب البيان عن أصول الأحكام-এ বর্ণনা করেছি। এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এখবর দেওয়া হয়েছে যে, যে ঈসা (আ.)-কে নাসারারা আল্লাহ পাকের ছেলে বলে ধারণা করে, সে হযরত ঈসা (আ.)-ই এবং আসমান-যমীন ও তার মধ্যবর্তী সকল বস্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে হয়ত বা ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে নতুবা ইঙ্গিতে। আর তা এ ভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা وقالوا اتخذ الله ولدا বলার পর একথা উল্লেখ করেছেন যে, সকল সৃষ্টিই তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর অনুগত হয়।

(١١٧) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

(১১৭) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ -এর ব্যাখ্যা :

بديع অর্থ مبدع—। এটাকে مبدع-এর ওযন থেকে فعيل-এর ওযনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন مؤلم থেকে أليم এবং مسمع থেকে سميع-এ রূপান্তরিত করা হয়। مبدع অর্থ এমন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, যার অনুরূপ পূর্বে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। এজন্যই দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে مبتدع বলা হয়। কারণ, দীনের মধ্যে সে এমন জিনিসের উদ্ভাবন করে, যা তার পূর্বে আর কেউ করেনি। এমনিভাবে সেই সকল কাজ বা কথার উদ্ভাবনকারীকে আরবগণ مبتدع বলে, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে হাওযা ইব্ন আলী আল-হানাফীর প্রশংসায় রচিত আ'শা ইব্ন ছা'লাবাঃর কবিতা :

يرعى إلى قول سادات الرجال إذا + أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا

"সে নেতৃবৃন্দের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, যখন তারা তার বুদ্ধিমত্তার উল্লেখ করে অথবা তার নতুন সৃষ্টির উল্লেখ করে।" অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে রু'বাঃ ইব্নুল আজ্জাজের কবিতা :

فأيها الغاشي القذاف الأتيعا + إن كنت لله التقي الأطوعا

فليس وجه الحق أن تبدعا

"পথিক! তুমি যদি মুত্তাকী—আল্লাহর অনুগত হও, তবে জেনে রাখ যে, হকের দাবী হলো—দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি না করা।" অর্থাৎ তুমি দীনের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করবে না

যা পূর্বে ছিল না। তিনিতো এর থেকে পূত পবিত্র; অতএব একালামের অর্থ এই যে, কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে? তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে, তার মালিক, সব কিছুই ইঙ্গিতে তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। তিনিই তাদের কোনরূপ পূর্ব আকৃতি বা মূল ভিত্তি ছাড়াই সৃষ্টিকর্তা ও অস্তিত্বদানকারী। তাঁর এ সৃষ্টির কোন তুলনা নেই। এ আয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ঈসা (আ.)-কে তারা আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে, সেই ঈসা (আ.)-ই তাঁর নুবুওয়াতের দ্বারা তাদের জন্য এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, যিনি এই বিশাল আসমান ও যমীনকে কোন মূল ভিত্তি বা পূর্ব আকৃতি ও নযীর ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান সত্তাই তাঁর কুদরতের দ্বারা ঈসা (আ.)-কে বিনা বাপে সৃষ্টি করেছেন। আমি যা বললাম—মুফাসসিরগণের একটি দল এরূপ বলেছেন। তাঁরা হলেন –রবী' থেকে বর্ণিত, بديع السماوات والارض সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, তিনি প্রথম নতুনভাবে এসব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে আর কোন শরীক নেই। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, بديع السماوات والارض -এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনিই প্রথমত নতুনভাবে তা সৃষ্টি করেছেন, যার সমতুল্য কোন জিনিস ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি।

وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -এর ব্যাখ্যা :

واذا قضى امرا অর্থ যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। قضاء শব্দের আসল অর্থ হলো ফায়সালা করা এবং কার্যকর করা। এ থেকেই মানুষের মধ্যে ফায়সালাকারীকে বলা হয় حاكم। বাদী-বিবাদীর মধ্যে ফায়সালা করা, তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ জারী করা এবং তা সমাপ্ত করার কারণেই তাকে এরূপ বলা হয়। এ থেকেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় قد قضى অর্থাৎ সে দুনিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেছে এবং দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। এ থেকেই বলা হয়েছে ما ينقضى عجبى من فلان (অমুক সম্পর্কে আমার আশ্চর্যের শেষ হয়নি)। এ থেকেই দিন শেষ হয়ে গেলে বলা হয় تقضى النهار। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে মহান আল্লাহর বাণী— وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত আর কারো বন্দিগী করবে না (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)। এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের বাণী وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب অর্থাৎ বনী ইসরাঈলীদেরকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের হিদায়াতের কাজ সুসম্পন্ন করলাম। বিখ্যাত আরবী কবি আবু যুআয়বও তাঁর কাব্যে অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন :

وعليهما مسرودتان قضاهما + داود او صنع السوابغ تبع

অর্থাৎ "তাদের শরীরে দু'টি লৌহ বর্ম রয়েছে, যা দাউদ মযবুত করে বানিয়েছে, অথবা কোন অভিজ্ঞ শিল্পীর পূর্ণকর্ম।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, وتعاورا مسرودتين قضاهما এখানে قضاهما অর্থ মযবুত করে তৈরি করা। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক কবির কবিতায়, যা হযরত উমার ইব্‌নিল খাত্তাব (রা.)-এর প্রশংসায় রচিত হয়েছে :

قضيت امورا ثم غادرت بعدها + بوائق فى اكمامها لم تفتق

"আপনি বিষয়গুলোকে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করেছেন, তারপর তার সকল খারাবীকে তার খোসার আবরণের মধ্যে গোপন করে দিয়েছেন, যা আর বের হতে পারে না।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে بوائج –।

فانما يقول له كن فيكون-এর অর্থ হলো, তিনি যখন কোন কাজ করার ইচ্ছে করেন, তখন সে কাজকে বলেন, 'হও', তখনই সে নির্দেশিত কাজটি তিনি ঠিক যেভাবে হবার ইচ্ছা করেছিলেন, সেভাবেই হয়ে যায়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এখানে واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون -এর অর্থ কি? আর যে কাজটি বা বিষয়টি সৃষ্টি করার আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, 'হও'— এ নির্দেশ তিনি কোন্ অবস্থায় দেন? যদি সে নির্দেশের অস্তিত্ব না থাকা অবস্থায় হয়, তবে তাকে এ অবস্থায় এ নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব ব্যতীত নির্দেশ দেওয়া অমূলক। তথা নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর অবর্তমানে তাকে নির্দেশ দেওয়া অসম্ভব, যেভাবে নির্দেশদাতা ব্যতীত নির্দেশ দেওয়া অকল্পনীয়। পক্ষান্তরে এ নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে এক্ষেত্রেও তার সৃষ্টির প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া অবাস্তব। কারণ, সে তো বর্তমানেই রয়েছে। যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাকে অস্তিত্ব লাভের আদেশ দেওয়া অহেতুক মনে হয়। এর জবাবে বলা হবে—মুফাসসিরগণ এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এখানে সেসব মতামত এবং যে কারণে তাঁরা সে মত পোষণ করেছেন, সে কারণসমূহও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কেউ কেউ বলেন, কোন বর্তমান সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নতুন যে ফায়সালা করেন এবং সে ফায়সালা বাস্তবায়িত হবার নির্দেশ দেওয়ার পর সে নির্দেশ কার্যকর হয় এবং সে বর্তমান বস্তুটি আল্লাহর ফায়সালাকৃত নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়—একথাই আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হলো, বনী ইসরাঈলীদের বানর হয়ে যাবার নির্দেশ। তাদের সম্পর্কে যে নতুন ফায়সালা করা হয়েছিল, সে ফায়সালার সময় এবং তা কার্যকর হবার নির্দেশের সময় তারা বর্তমান ছিল। এর আরো দৃষ্টান্ত হলো, কারূন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দেবার নির্দেশ। এমনিভাবে বর্তমান বস্তুকে নতুন ফায়সালায় রূপান্তর করার নির্দেশ সম্বলিত আরো বহু নযীর রয়েছে। এ মত পোষণকারিগণ واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون আয়াতখানিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত বলে মনে করেন—সাধারণ অর্থে নয়।

আর অন্যরা বলেন, আয়াতখানি প্রকাশ্যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো জন্য এটাকে অপ্রকাশিত দিকে ফিরান সঙ্গত হবে না। তারা বলেন, কোন কিছু বাস্তবে অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে জানেন। সুতরাং যেসব বস্তু এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি, ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভ করবে আল্লাহ পাকের ইলমে তা বর্তমান থাকে। তাই তাকে অস্তিত্ব লাভের নির্দেশ দেওয়া অর্থাৎ প্রকাশ্যে যা নেই, তা আল্লাহ পাকের 'কুন' আদেশে অস্তিত্ব লাভ করে। এটা সম্পূর্ণ সঙ্গত।

আর কেউ কেউ বলেন, আয়াতখানি যদিও প্রকাশ্যে সকলের জন্য, কিন্তু তার একটি বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। কারণ, নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর অবর্তমানে নির্দেশ দেওয়া অবাস্তব, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তারা বলেন, এ কারণেই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যখন তিনি কোন মৃতকে জীবিত করার

অথবা কোন জীবিতকে মৃত্যু ঘটানোর সঙ্কল্প করেন, তখন জীবিতকে বলেন, মৃত্যুমুখে পতিত হও, অথবা মৃতকে বলেন, 'জীবিত হও'। আর এমনি সব বিষয়েই।

আর অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এখানে তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি যখন তা সৃষ্টির ফায়সালা করেন এবং সৃষ্টি করে ফেলেন, তখন তা অস্তিত্ব লাভ করে। তাঁদের মতে এখানে আদৌ কোন কথা বা নির্দেশ নেই; বরং সৃষ্ট বস্তুর বর্তমান হওয়া এবং সঙ্কল্পকৃত বস্তুর সৃষ্টি হয়ে যাওয়া বুঝান হয়েছে। তাঁরা বলেন, واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ০ আয়াতখানি قال فلان برأسه অর্থাৎ অমুক মাথা নেড়েছে এবং قال بيده – "সে হাত দ্বারা ইশারা করেছে" আসলে কিছুই বলে নাই – উল্লিখিত বাগধারার সমপর্যায়ের। এখানেও প্রকৃতপক্ষে কোন 'কথা' বলা হয় নাই। এ কথার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কবি আবুন নাজমের রচনায় :

وقالت الانساع للبطن الحق + قدما فاضت كالفنيق المحنق

"হাতের কবযি বলে পেটকে, 'তুমি পায়ের সাথে মিশে যাও'। তারপর তা মোটা সৌখিন উটের মত হয়ে গেল।"—এখানে আসলে কোন কথা বা উক্তি নেই; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, পেট পিঠের সাথে মিশে গিয়েছে। আরো উদাহরণ যেমন 'আমর ইব্‌ন হুমামাতুদ-দাওসী বলেন—

فاصبحت مثل النسر طارت فراخه + اذا رام تطيارا يقال له قع

"সে শকুনের ন্যায় হয়ে গেল। তার বাচ্চা যখন উড়তে চেষ্টা করে, তখন বলা হয় 'নীচে নেমে যাও'।" এখানে আদৌ কোন কথা হয় না, বরং এর অর্থ হলো, যখন সে উড়বার চেষ্টা করে, তখন পড়ে যায়। আর এক কবি বলেন—

امتلاء الحوض وقال قطنى + مهلا رويدا قد ملات بطنى

"পানির হাউয ভরে গেলে সে বলে, যথেষ্ট প্লাবন হয়ে গিয়েছে। আমাকে ছেড়ে দাও, আমার পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون-এর অর্থ সম্পর্কে এসব মতামতের মধ্যে সঠিক মত হলো, এটা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ব্যাপকভাবে বুঝিয়েছে। কারণ, আয়াতখানি প্রকাশ্যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা প্রকাশ্য তা দলীল-প্রমাণ ব্যতীত অপ্রকাশ রাখা অনুচিত—যা আমি আমার كتاب البيان عن اصول الاحكام নামক কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার কোন জিনিসকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তাকে كن বলে নির্দেশ দেওয়াটা সে জিনিসের অস্তিত্ব লাভের জন্য যথেষ্ট। কেননা, তাঁর নির্দেশ এবং সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একই সাথে সংঘটিত হয়। এরূপ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়টির ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, কোন বস্তুকে সৃষ্টি করার নির্দেশের সাথে সাথেই তা অস্তিত্ব লাভ করে।

আলোচ্য আয়াত واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون এ মর্মেই ইরশাদ হয়েছে,

ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ০ (তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে

আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডাকবেন, তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসবে। সূরা রূম : ২৫) এখানে মানুষের কবর থেকে বেরিয়ে আসাটা আল্লাহর ডাকের পূর্বেও হবে না, পরেও হবে না। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই হবে।

যাঁরা واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون কে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত বলে মনে করেন এবং তাঁরা এর কারণ স্বরূপ বর্ণনা করেন যে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয়, তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কবরবাসীকে কবর থেকে বের হবার নির্দেশটা তাদের বের হবার পূর্বে, না পরে, নাকি এটা কিছু সংখ্যক সৃষ্টির জন্য খাস? তারা অনুরূপভাবে অন্য একটিতেও জটিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া এর কোন সদুত্তর দিতে পারবে না।

আর যাঁরা فانما يقول له كن فيكون কে قال فلان برأسه এবং قال بيده (মাথার ইশারায় অথবা হাতের ইঙ্গিতে কথা বলা) এর দৃষ্টান্ত বলে ব্যাখ্যা করেন এবং যেমন কবি বলেছেন,

تقول اذا درأت لها وضينى + اهذا دينه ابدا ودينى

"আমি যখন তার জন্য ফরাশ বিছিয়ে দিলাম, তখন সে বলল, এটা কি তার সব সময়কার স্বভাব এবং আমার স্বভাব?" এ ধরনের আরো যা আছে সে সবকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাদের অভিমত আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আল্লাহ্ পাকের কিতাব কুরআন মজীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক নয় এবং এর সঠিক হবার উপর কোন প্রমাণও নেই, যা তারা অনুসরণ করে। তাদেরকে বলা যেতে পারে যে, 'আল্লাহ্ তাআলা নিজের সম্পর্কে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, 'হও'। তিনি এরূপ বলেন —এটা কি তোমরা অস্বীকার কর? যদি তারা একথা অস্বীকার করে, তবে তারা কুরআনে করীমকেও মিথ্যা জ্ঞান করে এবং তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি তারা বলে যে, না, বরং আমরা এটা স্বীকার করি, তবে আমরা ধারণা করি যে, এটা قال الحائط فمال (দেয়ালটি হেলে গেল)-এর নযীর। এখানে যেমন কোন কথা নেই, বরং দেয়াল হেলে যাওয়া সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে, আলোচ্য আয়াতও ঠিক তদ্রূপ। তবে তাদেরকে বলা যায়, তোমরা কি দেয়াল হেলে যাওয়া সম্পর্কে সংবাদদাতার এ বক্তব্য সঙ্গত মনে কর যে, 'দেয়ালের কথা হলো সে যখন হেলে যাবার ইচ্ছা করে, তখন এরূপ বলে', অতঃপর সে হেলে যায়? যদি তারা এটা সঙ্গত মনে করে, তাহলে 'আরবের প্রসিদ্ধ বাকরীতি থেকে তারা বহির্ভূত হয়ে যাবে এবং তাদের কথাবার্তাও প্রচলিত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যদি তারা বলে যে, না, এটা অসঙ্গত, তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। সুতরাং বান্দাদেরকে তিনি তাঁর সেই কথাটি এবং ইচ্ছাটি জানিয়ে দিয়েছেন, যার দ্বারা কোন জিনিস সৃষ্টি হয়। আর এটা তোমাদের কাছে অসঙ্গত। তোমরা মনে কর এ বাক্যে প্রকৃতপক্ষে কোন কথা নেই قال الحائط فمال -এর ন্যায়। অন্যত্র আমরা এমতের ভ্রান্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون সম্পর্কে আমরা যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছি কোন জিনিসকে তার অস্তিত্বে আসার নির্দেশ এবং তার অস্তিত্বলাভ একই সময়ে হয়ে থাকে—এ

ব্যাখ্যার আলোকে এটা স্পষ্ট হবে যে, فيكون শব্দটি يقول শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ 'কওল' (কথা, নির্দেশ) ও 'কওন' (হওয়া) উভয়টি একই সময়ে হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ বলে, تاب فلان فاهتدى—"অমুক তওবাহ্ করেছে, ফলে হিদায়াত পেয়েছে" এবং اهتدى فلان فتاب—"অমুক হিদায়াত পেয়েছে তাই তওবাহ্ করেছে।" কেননা, তওবাহ্ করা মাত্রই সে হিদায়াত পায়, আবার হিদায়াত পাওয়া মাত্রই সে তওবাহ্ করে। উভয়টির সময়কাল একই। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কোন জিনিসকে অস্তিত্বে আসার নির্দেশ দেওয়ার সময়ই সে অস্তিত্ব লাভ করে। উভয়টির সময়কাল একই। এজন্যই কিছু লোক فيكون কে যবর-এর অবস্থায় পড়া বৈধ মনে করেন। যারা انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون পড়েন, এর অর্থ 'আমি বলি আর অমনি তা হয়ে যায়' (সূরা নহল ১৬/৪০)। আর যারা একে পেশ দিয়ে পড়েন, তারা মনে করেন اذا اردناه ان نقول له كن পর্যন্তই খবর শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ, একথা জানাই আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করেন, তখন সে বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। এরপর فيكون দ্বারা শুরু করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন---

لنبين لكم ونقر فى الارحام مانشاء "যেন তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করি এবং আমি মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা স্থিত রাখি" সূরা হজ্জ, ২২/৫)। আরো উদাহরণ পেশ করা যায় যেমন কবি ইব্ন আহমার বলেন—

يعالج عاقرا اعيت عليه + ليلقحها فينتجها حوارا

"তিনি বন্ধ্যাকে চিকিৎসা করেন, যার বাচ্চা প্রসব করা কষ্টকর, ফলে গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করে।" এখানে আসল অর্থ হলো, ফলে সে বাচ্চা প্রসব করে।

সুতরাং আয়াতের অর্থ হলোঃ তারা বলে, আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, বরং তিনি তো আসমান, যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক। সৃষ্টি মাত্রই তাঁর অনুগত। তাঁর একত্ববাদের সাক্ষী। তাঁর সন্তান হওয়া কী করে সম্ভব। তিনি তো আসমান ও যমীনকে কোন মূলভিত্তি ছাড়াই নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতা ব্যতীত নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার দ্বারা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, কোনো কিছুই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়, বরং তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন, 'হও', অমনি তা তাঁর ইচ্ছা মতন হয়ে যায়। এমনিভাবেই তিনি যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতা ব্যতীত পয়দা করতে ইচ্ছা করলেন, নির্বিঘ্নে তাঁকে পয়দা করলেন।

(১১৮) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

(১১৮) এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের কাছে আসে না কেন?' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ -এর ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তাআলা নাসারাদেরকে বুঝিয়েছেন। এমতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا اية-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, নাসারারা একথা বলেছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, তাতে وقال الذين لا يعلمون النصارى (যারা জানে না তারা নাসারা) কথাটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ তা'আলা একথা দ্বারা হযরত নবী করীম (স.)-এর সময়ের য়াহূদীদেরকে বুঝিয়েছেন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাফি' ইব্ন হুরায়মালা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলল,—"যদি আপনি আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত রাসূলই হয়ে থাকেন, যেমন আপনি বলে থাকেন, তা হলে আপনি মহান আল্লাহ পাককে বলুন, তিনি স্বয়ং আমাদের সাথে কথাবার্তা বলুন, আর আমরা তাঁর কথা শুনি। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا اية থেকে পুরো আয়াতখানি নাযিল করেন। কেউ কেউ বলেন, এসব প্রশ্ন যারা তুলেছিল, তারা ছিল আরবের মুশ্রিক সম্প্রদায়। অতএব, আল্লাহ্ তাআলা তাদের কথাই বলেছেন।

যাঁরা এ মতের সমর্থক, তাঁদের আলোচনা :

হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا اية আয়াতাংশে উল্লিখিত কথাগুলো আরবের কাফিরদের। হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, এ কথাগুলো আরবদের। এসব অভিমতের মধ্যে সঠিক অভিমত হলো, 'যারা জানে না' একথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র নাসারা সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছেন। কেননা, বিষয়টি ধারাবাহিকতার দিক থেকে তাই বুঝায়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তারা যে মিথ্যারোপ করেছে এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে যে আল্লাহ পাকের ছেলে বলে ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করেছে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার বিষয় তুলে ধরেছেন। অধিকন্তু 'আল্লাহ্র ছেলে আছে'—এই মিথ্যারোপ করা সত্ত্বেও তারা একটি অবান্তর, অবাস্তব ও নিরর্থক আশা পোষণ করে এবং অজ্ঞতাবশত এতেও তারা আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে শিরক করে বলে, কেন

তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেমন তিনি বলে থাকেন নবী-রাসূলগণের সঙ্গে? অথবা কেন আমাদের কাছে আয়াত আসে না, যেমন তাঁদের কাছে এসেছিল? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো আল্লাহ পাক তাঁর মনোনীত বান্দা ব্যতীত কারো সাথে কথা বলেন না। কেউ দাবী করলেই তাকে মু'জিযার নিদর্শন দেন না, তবে যে তার দাবীতে সত্যবাদী হয় এবং যে আল্লাহ পাকের তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করে। পক্ষান্তরে যে তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি আছে বলে দাবী করে -এমন লোকের সঙ্গে আল্লাহ পাক কথা বলবেন, তা সম্ভব নয়। অথবা তিনি তার জন্য কোনো মু'জিযাঃ মনযুর করবেন, তাও সম্ভব নয়। কোনো কোনো লোক মনে করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা وقال الذين لا يعلمون আয়াতাংশ দ্বারা আরবদের বুঝিয়েছেন। এ কথার সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ পাকের কালামেও কোন প্রমাণ নাই। আয়াতের প্রথমাংশ وقال الذين لا يعلمون এর আলোচনা এপর্যন্তই শেষ। তবে لولا يكلمنا —'কেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে কথা বলেন না?' এখানে لولا (কেন না) অর্থ هلا—অর্থাৎ কেন আমাদের সাথে আল্লাহ পাক কথা বলেন না? প্রমাণ স্বরূপ কবি আল্-আশহাব ইব্ন রুমায়লাহ্র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

تعدون عقر النيب افضل مجدكم + بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا

কাতাদাহ (র.) বলেন, এখানে لولا — هلا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لولا يكلمنا الله অর্থ কেন আল্লাহ পাক আমাদের সাথে কথা বলেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اية শব্দের অর্থ এখানে 'নিদর্শন'। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ খবর দিয়েছেন যে, তারা বলেছে, আমরা যা চাই সে অনুযায়ী আমাদের নিকট কোন নিদর্শন কেন আসে না? যেমন আম্বিয়া ও রাসূলগণের নিকট এসেছিল।

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ -এর ব্যাখ্যা ঃ

মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এ আয়াতাংশে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো য়াহূদী। অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর অন্যারা বলেছেন, তারা হলো য়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। কেননা, যারা জানে না (অজ্ঞ), তারা হলো য়াহূদী। যারা এ মত পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে কাতাদাহ (র.) অন্যতম। তিনি বলেন, এ আয়াতে যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তারা হলো য়াহূদী, নাসারা ও অন্যান্য। আর সুদ্দী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে আরবদেরকে বুঝান হয়েছে। যেমন, য়াহূদী-নাসারারাও এমন কথা বলেছে।

রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াতে য়াহূদী-নাসারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী- قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله (অজ্ঞ লোকেরা বলে, কেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে কথা বলেন না?) এর দ্বারা যে খৃস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত প্রমাণাদি পেশ করেছি। আর যারা তাদের অনুরূপ কথা বলত, তারা হলো য়াহূদী। য়াহূদীরা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাককে চাক্ষুষভাবে দেখার জন্য এবং তাদের রবের কথা তাদেরকে শুনানোর জন্য হযরত

মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করেছিল। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। যে বিষয়ে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন চেয়ে তারা প্রশ্ন করেছে, তাতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র জবরদস্তি করেই তেমন প্রশ্ন তারা করেছিল। অনুরূপভাবে, খৃস্টানরাও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে জবরদস্তিমূলক ভাবেই কথাবার্তা বলা বা শোনার অসম্ভব আশা পোষণ করেছিল এবং নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নাসারারা এসব ব্যাপারে এমনসব কথা বলেছে, যা য়াহূদীরাও বলেছে। এরূপ অবাস্তব অলীক আশা পোষণ য়াহূদীরাও করেছে। তাদের কথাবার্তার সাথে য়াহূদীদের কথাবার্তার সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। যেহেতু তাদের অন্তঃকরণ পথভ্রষ্টতা এবং আল্লাহর নাফরমানী উভয়েই এক ও অভিন্ন। যদিও আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যারোপের ব্যাপারে তাদের পথ ভিন্ন এবং নবী ও রাসূলদের সাথে হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ির ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি একাধিক। আমরা এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা পেশ করলাম, তার সমর্থনে মুজাহিদ (র.) আল্ মুছান্না (র) সূত্রে تشابهت قلوبهم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের অন্তর একই রকম। এর অর্থ খৃস্টান ও য়াহূদীদের অন্তঃকরণ। অন্যরা বলেছেন, একথার অর্থ আরবের কাফির, য়াহূদ, নাসারা ও অন্যান্যের অন্তঃকরণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের অন্তর সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ আরবের কাফির, য়াহূদী, খৃস্টান ও অন্যদের অন্তর। অনুরূপভাবে আল-মুছান্না সূত্রে আর-রাবী' থেকে বর্ণিত যে, এর অর্থ—আরব, য়াহূদী, নাসারা এবং অন্যরা। এভাবে আয়াতের অর্থ হবেঃ আল্লাহ পাকের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মূর্খ খৃস্টানরা বলেছে, কেন প্রভু আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে কথা বলেন না, যেমন তিনি তাঁর নবী ও রাসূলদের সাথে কথা বলেছেন? অথবা, কেনই বা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন নিদর্শন আসে না, যা দ্বারা আমরা তাঁর পরিচয় পেতে পারি এবং যা আমরা জিজ্ঞাসা করি তা জানতে পারি। তার জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ এই মূর্খ খৃস্টানরা যেভাবে কথা বলেছে এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ভিত্তিহীন আশা করেছে, ঠিক তেমনিভাবে ইতিপূর্বে য়াহূদীরাও তা করেছে। তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের কাছে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে দেখবার আবেদন করেছে এবং তাদেরকে নিদর্শন দেওয়ার জন্য যেদ করেছে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তারা ভিত্তিহীন আশা-আকাংখা করেছে। অতএব, আল্লাহর নাফরমানী ও বিদ্রোহে তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধির ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং নবী ও রাসূলগণের প্রতি বেআদবীপূর্ণ উক্তি করার ব্যাপারে য়াহূদ ও নাসারাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাদের কথাবার্তায়ও তারা তা প্রকাশ করেছে।

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ যেসব নিদর্শনের কারণে আল্লাহ তা'আলা য়াহূদীদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, তাদের কিছু সংখ্যককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং তাদের জন্য পরকালের হীন শাস্তিও নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে সব বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। আর নাসারাদেরকে পৃথিবীতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং আখিরাতেও তাদের জন্য অপমান এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর একারণেই নেককার বান্দাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী করেছেন। এ বিষয়ে এ সূরা ও অন্যান্য সূরায় স্পষ্ট

ঘোষণা রয়েছে। অতএব, এদের প্রত্যেক দলের লোকদেরকে তাদের কর্মফল হিসাবে কি প্রতিদান দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই নিদর্শনগুলোকে অবহিত করার বিষয়টিকে আস্থাবান লোকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কেননা, প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দৃঢ়তায় ও শরীয়তের সব বিষয়ের উপর বিশ্বাসে একমাত্র তারাই স্থিতিশীল। আর বস্তুসমূহের প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তারাই আগ্রহী। অতএব, মহান আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যারা এমন গুণের অধিকারী, তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। আর তারাই বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। কেননা, এ হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার সংবাদ বা শিক্ষা, যাতে শ্রোতার কোন দ্বিধা বা সন্দেহ থাক্তে পারে না। পক্ষান্তরে, তিনি ব্যতীত অপর কারোর শিক্ষা বা সংবাদে বিভিন্ন কারণে ভুল-ত্রুটি বা মিথ্যা সংমিশ্রিত কথা থাক্তে পারে। যা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদে অসম্ভব।

(১১৯) إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

(১১৯) আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্পর্কে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا -এর ব্যাখ্যা :

মহান আল্লাহ তা'আলার একথার অর্থ এই : হে মুহাম্মাদ (স), আমি তোমাকে ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছি, এ দীন ব্যতীত আমি কারোর কাছ থেকেই অন্য কোনো দীন গ্রহণ করব না। ইসলামই একমাত্র সত্য দীন। অতএব হে নবী! যে লোক তোমার অনুসারী হয়ে তোমার আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আমি পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও পারলৌকিক সাফল্য, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং স্থায়ী নিয়ামত লাভের জন্য যে আহবান তোমার মাধ্যমে পাঠিয়েছি তা গ্রহণ করে, তার জন্য তুমি সুসংবাদদাতা। পক্ষান্তরে যে লোক তোমার অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করে, তোমার মাধ্যমে সত্যের দিকে আমি যে আহবান জানাই তা প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সতর্ককারী।

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○ -এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পাঠ-পদ্ধতি অনুসারে و لا تسئل শব্দের শেষাক্ষর (ـُ) পেশ যোগে উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় বাক্যটি خبر বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় এ অর্থে যে, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠান হয়েছিল তদনুযায়ী তুমি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছ। তোমার প্রতি কর্তব্য ছিল পৌছিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক করা। সে কর্তব্য তুমি সম্পাদন করেছ। সুতরাং কেউ যদি তোমাকে দেওয়া আমার সে সত্যবাণী

অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে জাহান্নামী হয়ে যায়, তবে এজন্য তোমাকে দায়ী করে তোমাকে কোন রূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

মদীনার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ و لا تسئل শব্দ না-বোধক অনুজ্ঞা ধরে মূল শব্দের আদ্যাক্ষর ت-এর উপর যবর (ـَ) এবং শেষাক্ষর ل জাযম (ـْ) যোগে পাঠ করেছেন। এদের এরূপ পাঠ অনুসারে অর্থ এই দাঁড়ায় : আমি তোমাকে সত্য দিয়ে সুসংবাদদাতা ও সতর্ক-কারী হিসাবে পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি তাদেরকে রিসালাতের বিষয়াদি পৌছে দেবে। উদ্দেশ্য এ নয় যে, তুমি সত্যবাণী প্রত্যাখ্যানকারী জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করবে না। এরূপ পঠন-পদ্ধতির সমর্থকরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব-এর হাদীছ থেকে যুক্তি পেশ করেন, যাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আফ্‌সোস! আমার পিতা-মাতার কি যে পরিণতি হয়েছে তা যদি আমি বুঝতে পারতাম! এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে و لا تسئل عن اصحاب الجحيم (জাহান্নামীদের সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন কর না।)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল্‌-কারযী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) দুঃখ করে বলেছেন, হায়! আমার মা-বাবার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা যদি আমি জানতে পারতাম! আমার পিতা-মাতার কি অবস্থা তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!! আফ্‌সোস! আমার পিতা কি অবস্থায় রয়েছেন, তা যদি আমি অনুভব করতে পারতাম!!! এ ভাবে তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এরপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আর তাঁদের কথা উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপভাবে আবূ 'আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়! আমার বাবা-মা কোথায় আছেন, তা যদি জানতে পারতাম। তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে পঠন পদ্ধতির এরূপ বিভিন্ন-তার মধ্যে শব্দটিকে পেশ যোগে (ـُ) পড়াই সঠিক ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এর ফলে বাক্যটি বিধেয় (خبر) রূপে ধরা হবে। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা এক্ষেত্রে য়াহূদ ও নাসারাদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের গোমরাহী, বিভ্রান্তি, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস ও তাঁর নবীদের সঙ্গে অবান্তর কথা-বার্তা ও অশালীন আচরণের দুঃসাহস ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তারপর নবী (স.)-কে বলেছেন, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সেসব ইতিহাস যা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি, আর যা করি নাই, তার সব কিছুতেই যারা আস্থাবান, তাদের জন্য তোমাকে সুসংবাদদাতারূপে, আর যারা তোমাকে অবিশ্বাস করে ও তোমার বিরোধিতা করে, তাদের প্রতি তোমাকে সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। সুতরাং আমার রিসালাত তাদের কাছে পৌছে দাও। এভাবে রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার পর যারা তা বাস্তবে অনুশীলন না করে তোমার বিরোধিতা করল, তার জন্য তাদেরকে তোমার আর অনুসরণ করবার প্রয়োজন নেই, আর তাদের সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিতও হবে না। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) জাহান্নামীদের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেছেন বলে আয়াতে উল্লেখ নাই, যার দরুন و لا تسئل عن اصحاب الجحيم এই আয়াতাংশে না-বোধক অনুজ্ঞা পড়ার কোন কারণ থাকতে পারে। অতএব, সঠিক অর্থ এই, যা পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কথাটি য়াহূদ, নাসারা ও অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আয়াতের বক্তব্য এটা নয় যে, নবী (স.)-কে জাহান্নামীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(১২০) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

(১২০) য়াহূদী ও খৃস্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যে পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করেন। আপনি বলে দিন, আল্লাহ যে পথ প্রদর্শন করেন তাই সরল সঠিক পথ। আর যদি জ্ঞান লাভের পরও আপনি তাদের ভাবাবেগের অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষাকারী আপনার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط **-এর ব্যাখ্যা:**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ। য়াহূদ ও নাসারা সম্প্রদায়ের কেউ-ই তাদের ধর্মমত অনুসরণ না করা পর্যন্ত আপনার উপর কখনো সন্তুষ্ট হবে না। অতএব, আপনি তাদের আকাংখিত বিষয়বস্তুকে পরিত্যাগ করুন এবং যে সত্যবাণী প্রচারের জন্য আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সেই পথে অগ্রসর হন। সত্য প্রচারের যে দায়িত্ব আল্লাহ পাক আপনার প্রতি অর্পণ করে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তাতে আত্মনিয়োগ করুন। যে সত্যের দিকে আপনি তাদেরকে আহবান করেন, তাই হলো সঠিক পথ, পরস্পরের সম্প্রীতির মাধ্যমে দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। আর তাদের ধর্মমত অনুসরণের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন আপনার কাজ নয়। কারণ, য়াহূদী ধর্মমত খৃস্টান ধর্মমতের বিরোধী, আর খৃস্টান ধর্মের সঙ্গে য়াহূদীদের রয়েছে সংঘাত। এই উভয় ধর্মমত একই ব্যক্তিতে একই সময়ে একত্রিত হতে পারে না। য়াহূদী ও নাসারারা সম্মিলিতভাবে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে না, যে পর্যন্ত না আপনি (একই সময়ে) য়াহূদী ও নাসারা হন। আর এমনটি হওয়া আপনার পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। কেননা, আপনি মাত্র একজন ব্যক্তি। একটি ব্যক্তির মধ্যে দু'টি পরস্পরবিরোধী ধর্মমত একই সময় কখনো একত্রে প্রকাশ লাভ করতে পারে না। যখন একজন ব্যক্তিতে এরূপ পরস্পরবিরোধী দুটি ধর্মের একত্রে সমাবেশ সম্ভব নয়, তখন আপনার জন্য উভয় দলের সন্তুষ্টি অর্জনেরও কোন উপায় নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন পথই খোলা নাই, তখন সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য একমাত্র আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণই কাম্য– পরস্পরের সম্প্রীতির মাধ্যমে।

ملة অর্থ দীন, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। ملة-এর বহুবচন ملل —। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেছেন, "হে মুহাম্মাদ! যে নাসারা ও য়াহূদী একথা বলে যে, "য়াহূদী কিংবা নাসারা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না"– তাদেরকে আপনি বলুন, ان هدى الله هو الهدى

(আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত)। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বর্ণনাই একমাত্র চূড়ান্ত ব্যাখ্যা এবং সেটাই আমাদের জন্য নির্ভুল মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত। অতএব, আল্লাহ পাকের কিতাবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও এবং যে সব বিষয়ে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ মতবিরোধ করছে, সে সব বিষয়ে ঐ কিতাবে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আর সে কিতাব তাওরাত, যা তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহ্র কিতাব বলে স্বীকার কর, যে কিতাব কে সত্যপন্থী, আর কে বাতিলপন্থী, কে জান্নাতী, আর কে জাহান্নামী, কে সঠিক পথে আর কে বিভ্রান্তিতে—এসব বিতর্কিত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান বলে দেয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তাঁর নবী (স.)-কে তাঁর হিদায়াত ও ব্যাখ্যার প্রতি আহবান জানানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন, যাতে য়াহূদী ও নাসারাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তারা বলেছে যে, য়াহূদী কিংবা নাসারা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না এবং যাতে উল্লেখ রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হুকুমের ব্যাখ্যা এবং এ কথা যে, তাকে সত্য জ্ঞানকারী ব্যতীত মিথ্যা জ্ঞানকারীরা অবশ্যই দোযখী হবে।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○ **-এর ব্যাখ্যা:**

হে মুহাম্মদ! যদি তুমি য়াহূদী ও নাসারাদের সন্তুষ্টি বিধানে এদেরই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে তো তুমি এদেরই মনোরঞ্জনকারী হয়ে গেলে এবং এদেরই ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে গেলে। আর এ আচরণ তুমি করলে তাদের পথভ্রষ্টতা ও প্রতিপালকের প্রতি তাদের কুফরীর বিষয় অবগত হওয়ার পর এবং এ সূরার মাধ্যমে তাদের ঘটনার বিবরণ তোমার কাছে প্রকাশ করার পর, তাহলে অবস্থার এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তোমার বান্ধবরূপে কাউকে তুমি পাবে না, যে তোমার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে, তোমার দেখাশোনা করবে এবং অবস্থার এ চরম দুর্যোগ মুহূর্তে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়ে গেলে তুমি এমন কোন সাহায্যকারীও তার পক্ষ থেকে পাবে না, যে তোমাকে তা থেকে রক্ষা করবে।

আয়াতের ولى ও نصير শব্দ দুটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমরা ولى ও نصير শব্দ দুটির ব্যাখ্যা পূর্বেই দিয়েছি। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ আয়াত নাযিল করেছেন এ কারণে যে, য়াহূদ ও নাসারারা নবী (স.)-কে তাদের দীনের প্রতি আহবান জানিয়েছিল এবং বলেছিল, প্রতিটি দলই তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আরো বলেছিল, আমরা যে মতাদর্শে আছি, তাই সত্য পথ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যে মতাদর্শে রয়েছে, তা সত্য নয়। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় যা দাবী করছে, তার মধ্যে কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা মিথ্যা, তার পার্থক্য বুঝানোর প্রমাণাদি আল্লাহ পাক তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(১২১) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰۤئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(১২১) যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথ এর আবৃত্তি করে, তারাই এতে বিশ্বাস করে, আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

'যাদেরকে কিতাব দিয়েছি' বলে এখানে কাদেরকে বুঝান হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে, এঁরা রাসূল করীম (স.)-এর রিসালাতে বিশ্বাসী সাহাবা কিরাম (রা.)।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ

الذين اتيناهم الكتاب আয়াতাংশ সম্পর্কে কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা নবী (স.)-এর সাহাবা, যাঁরা আল্লাহ পাকের কিতাবে বিশ্বাসী ও তাকে সত্য বলে জানেন। আর কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ পাক যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরা হলেন বনী ইসরাঈলের সে সব বিদ্বান ব্যক্তি, যাঁরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও তাঁর রাসূলগণকে সত্য জ্ঞানকারী। আর তাঁরা তাওরাত কিতাবের হুকুম স্বীকার করে নিয়ে মুহাম্মদ (স.)-কে অনুসরণ করা, তাঁকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আনীত বিষয়াদি সত্য জ্ঞান করার যে নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তা মেনে নিয়েছেন এবং সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন করেছেন।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ

ইব্‌ন যায়দ الذين اتيناهم الكتاب শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'য়াহূদী সম্প্রদায়ের যারা নবী করীম (স.)-কে অস্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত'— এ অভিমত কাতাদাহ্ (র.)-এর অভিমত অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এর আগের আয়াতগুলোতে আহলে কিতাবদের বিবরণ আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তন সাধন করা, আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান, আল্লাহ্‌র উপর অবান্তর দাবীকরণ ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত ছিল। আর এর আগের ও পরের আয়াতেও নবী (স.)-এর সাহাবাদের কোন উল্লেখ নাই এবং সাহাবা ব্যতীত অন্যদের প্রসঙ্গ বর্ণনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সাহাবাদের কোন বিবরণ আসে নাই যাতে কাতাদাহ্‌র অভিমত মেনে নেওয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় পূর্বে ও পরের আয়াতে যাঁদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তাই উত্তম ব্যাখ্যা। আর তারা হচ্ছে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারী আহ্‌লে কিতাব। অতএব, আয়াতের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা এই—হে মুহাম্মদ! যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, সে কিতাব তাওরাত, তারা তা পড়েছে, তার অনুসরণ করেছে, আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছে, আপনার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আপনি আমার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সে কিতাব পাঠের মত পাঠ করেছে। الكتاب শব্দে ال অব্যয় যোগে 'কিতাব'টিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, নবী (স.) তাঁর সাহাবীগণকে এ নির্দিষ্ট কিতাব কোন্‌টি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -এর ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকারগণের কেউ কেউ বলেছেন, يتلونه حق اتباعه (তারা তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে)। তিলাওয়াত করার অর্থ অনুসরণ করা—এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, يتلونه حق تلاوته অর্থ—তারা তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে। 'ইক্‌রামা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, يتلونه حق تلاوته অর্থ—তারা কিতাবে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানে এবং তাতে পরিবর্তন করে না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অন্য সূত্রে একই রকম অর্থের উল্লেখ করেছেন, তবে তাতে ব্যতিক্রম শুধু এই, সেখানে لا يحرفونه শব্দের পরে عن مواضعه শব্দ বাড়িয়ে বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-এর রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ করে আমি বলছি, حق تلاوته অর্থ—তাতে উল্লিখিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করে তা পালন করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে নাযিল করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন না করে সেগুলোকে ঠিক তেমনিভাবে তিলাওয়াত করা এবং শুধু সঠিক ব্যাখ্যারই অনুসরণ করা। হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর অপর এক রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর অন্য এক রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আতা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত আবূ রাযীন (র.) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত, এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'তারা তা আমল করে'। কায়স ইব্‌ন সা'দ (র.) বলেছেন, আয়াতাংশের অর্থ—'তারা তা যথার্থ অনুসরণ করে'। তাঁর এরূপ অর্থের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তিনি والقمر اذا تلاها আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, তুমি কি দেখ না যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক কি অর্থে এ আয়াত নাযিল করেছেন? হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, يتلونه حق تلاوته অর্থ—তারা তা যথার্থভাবে আমল করে। মুজাহিদ (র.) থেকেও বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত 'আতা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'তারা তা যথার্থভাবে অনুসরণ করে' এর অর্থ—তারা তার উপর সঠিকভাবে আমল করে। হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, يتلونه حق تلاوته অর্থ তারা কিতাবের 'মুহকাম' আয়াত অনুযায়ী আমল করে আর 'মুতাশাবিহ' আয়াতে বিশ্বাস করে এবং যে সব আয়াতের মর্ম বুঝতে কষ্ট হয়, তা জানার জন্য আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যায়-পারদর্শীদের শরণাপন্ন হয়। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, يتلونه حق تلاوته-এর মর্মকথা এই, তারা তাতে বর্ণিত হালাল বিষয়কে হালাল এবং হারাম বিষয়গুলোকে হারাম জানে এবং সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন করে। অধিকন্তু তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.) বলতেন, যথার্থ পাঠ করার অর্থ কিতাবে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করা এবং আল্লাহ পাক যেভাবে নাযিল করেছেন, সেভাবে তিলাওয়াত করা আর এতে কোনরূপ পরিবর্তন না করা। হযরত কাতাদাহ থেকেও একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইক্‌রামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, يتلوله حق تلاوته-এর অর্থ যথার্থ অনুসরণ করা। তুমি কি মহান আল্লাহর এ বাণী والقمر اذا تلاها শ্রবণ করনি? এর অর্থ—যখন চাঁদ সূর্যের অনুসরণ করে।

'অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, يتلونه حق تلاوته অর্থ, যথার্থ তিলাওয়াত করা। যা হোক, এর সঠিক ব্যাখ্যা যথার্থ অনুসরণ করা, যা ما زلت اتلو اثره اذا اتبع اثره—'আমি তার নিদর্শন পাঠকারী যখন আমি তার নিদর্শন অনুসরণ করি'—এরূপ প্রবাদ বাক্য থেকে পাওয়া গেছে। অধিকন্তু এ কারণেও যে, তাফসীরকারগণ এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। আর তা

প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যখন তাই সঠিক ব্যাখ্যা, তখন আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়, হে মুহাম্মদ! তাওরাতের অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, যারা তোমার প্রতি এবং আমার কাছ থেকে তুমি যেসব সত্যবাণী পেয়েছ, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর আমার রাসূল মূসার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি, তাতে তোমার যে পরিচিতি ও গুণ বর্ণনা করেছি তা এবং তুমি আমার রাসূল, একথা যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য আমার আনুগত্যে তোমার প্রতি ঈমান আনা এবং আমার কাছ থেকে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যা পেয়েছ, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয করা হয়েছে। এ অবস্থায় তাদের জন্য যা হালাল করেছি, তার উপর আমল করে আর যা তাতে হারাম করেছি তা বর্জন করে যথাস্থানে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর শাব্দিক দিক দিয়ে স্থানের কোন পরিবর্তন করে না, বদলিয়ে অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ বা বিকৃত করে না। আর অর্থের দিক থেকেও যেমন তাদের উপর নাযিল করেছি, ঠিক তেমনি রেখে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে না।

এরপর حق تلاوته আয়াতাংশের তাৎপর্য, কিতাবের অনুসরণ ও তদনুযায়ী আমল করার অর্থকে জোরদার করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন বলা হয় : ان فلانا لعالم حق عالم (অমুক ব্যক্তি অবশ্যই জ্ঞানী এবং যথার্থ জ্ঞানী), ان فلانا لفاضل كل فاضل (অমুক একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং প্রকৃতই তিনি বিদ্বান)। এখানে উল্লেখ্য যে, حق শব্দ যা একটি نكرة বা অনির্দিষ্ট শব্দ, তার সঙ্গে একটি معرفة বা নির্দিষ্ট শব্দের সম্পর্ক যুক্তকরণ বিষয়ে আরবী ভাষাবিদগণ একাধিক মত পোষণ করেন অর্থাৎ حق تلاوته আয়াতাংশের যা একটি সম্বন্ধ পদ, তার اضافت বা সম্বন্ধ, الكتاب যা একটি معرفة-এর সঙ্গে বৈধ বা নিয়মসঙ্গত নয়। এ হচ্ছে কূফার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদের অভিমত। আবার কিছু সংখ্যক বস্‌রাবাসী বৈয়াকরণিকের মতে, এরূপ সম্বন্ধ নিয়মসঙ্গত। এর ফলে অর্থের দিক থেকেও উভয়ের মতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক দলই তাদের সমর্থনে বিস্তারিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। তবে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে পূর্ব বর্ণিত অভিমতই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ আগে-পরের বর্ণনানুসারে এটাই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

أُولَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ -এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اولئك শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একথাই বুঝিয়েছেন—এরা সেসব লোক, যাদেরকে কিতাবে যা তিনি দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে পাঠ করেন। তবে يؤمنون শব্দের অর্থ—তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। আর به শব্দের هاء এবং تلاوته শব্দের هاء উভয় সর্বনাম একই কিতাবকে বুঝিয়েছে। যে কিতাবটির কথা আল্লাহ তা'আলা الذين اتينا هم الكتاب আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাওরাতে ঐ ব্যক্তিই বিশ্বাসী, যে তাতে নির্দেশিত হালাল ও হারাম বস্তুগুলোর অনুসারী। আর তাওরাতের অনুসারীদের উপর ঐ কিতাবে আল্লাহ যে সব কাজ ফরয করেছেন, সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন করে এবং প্রকৃত অনুসারী তারাই, যাদের ব্যাখ্যা-বর্ণনা এ ক্ষেত্রে এভাবে করা হয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা তার মূল শব্দ পাল্টিয়ে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে, ব্যাখ্যার পরিবর্তন করে এবং বর্ণিত সুন্নাতগুলোকে বিকৃত আর ফরযকে বর্জন করে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশে তাওরাতের অনুসারীদের গুণ বর্ণনা এবং তাদের প্রশংসা করেছেন। কারণ, তাওরাতের অনুসরণ করাতেই মহান আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসরণ করা

হবে এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে। কেননা, তাওরাত তার অনুসারীদেরকে এ কথার নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে তাঁর নুবুওয়াতের বর্ণনা দেয়, যাতে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য তাঁর আনুগত্য 'ফরয' বলে ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে, তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করার অর্থই তাওরাতকে মিথ্যা ও অবিশ্বাস করা বুঝায়। অতএব, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তাওরাতের অনুসারীরাই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসী এবং তাতে নির্দেশিত বিষয়গুলোর যথাযথ প্রতিপালনকারী। এ বিষয়ের সমর্থনে اولئك يؤمنون به আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত, এরা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের সেসব লোক, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাওরাতে বিশ্বাস করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তারা তাওরাতেও অবিশ্বাসী এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون—এবং যারা তাতে অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তা'আলা যে কিতাবের বিষয়ে খবর দিয়েছেন, মু'মিনদের মধ্যে যারা সে কিতাব যথার্থ ভাবে পাঠ করে, ঐ কিতাবে যেসব অবশ্যকরণীয় বিষয় উল্লিখিত রয়েছে, সেগুলোসহ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নুবুওয়াত অস্বীকার করে এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, কিতাবের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার ব্যাখ্যা পাল্টিয়ে দেয়, তারাই তাদের জ্ঞান ও কর্মে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তার পরিবর্তে তাঁর গযব ও অসন্তোষ অর্জন করেছে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত —এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, য়াহূদীদের মধ্যে যারা হযরত নবী করীম (স)-এর নুবুওয়াতে অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(١٢٢) يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ۝

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই সব নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং তোমাদের আমি বিশ্বে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) মুহাজিরগণকে নিয়ে মদীনাহ্ তায়্যিবাহ্‌তে বাস করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যেসব য়াহূদী একত্রে বসবাস করত, তাদের জন্য উক্ত আয়াত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি উপদেশ। তিনি আপন দয়ায় তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, সেসব বিষয়ে উক্ত আয়াতটি একটি উপদেশ। তাঁর এ সব দয়া ও মেহেরবানীর অর্থ, এ সবের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা তাঁর দীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাঁর

রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বাস করবে। অতএব, এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাদের প্রতি ইরশাদ করেছেন, হে বনী ইসরাঈল। তোমরা আমার দানসমূহ স্মরণ কর, স্মরণ কর ফেরাউন ও তার দলীয় শত্রুদের কবল থেকে কিভাবে তোমাদেরকে মুক্ত করেছি, সে কথা। 'তীহ' প্রান্তরের বিপদ সময়ে তোমাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নামক সুখাদ্য প্রেরণের বিষয়টি ধিক্কার, অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগের পর তোমাদেরকে বিভিন্ন শহরে পুনর্বাসনের ব্যাপার, বিশেষ করে তোমাদেরই বংশ থেকে রাসূল মনোনীত করার ইতিহাস এবং যতদিন তোমরা আমার রাসূলের যথার্থ অনুসরণ ও অনুকরণে কার্যত নিয়োজিত ছিলে, ততদিন তোমাদেরকে পৃথিবীতে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম; নিঃসন্দেহে এসব আমার উল্লেখযোগ্য অবদান। অতএব, তোমরা একটানা দীর্ঘস্থায়ী পথভ্রষ্টতা ও কুফরী ছেড়ে দাও।

বনী ইস্রাঈলকে আল্লাহ তা'আলা যেসব অবদান ও অনুকম্পায় সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং পৃথিবীর যে অঞ্চলে তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা বিগত আলোচনায় রিওয়ায়াত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। এক্ষণে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলোর পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক মনে করি। অধিকন্তু উভয় ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন।

(১২৩) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

(১২৩) এবং সেদিনকে ভয় কর, যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে উপকারী হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

আয়াতের ব্যাখ্যা ও মতামতঃ এ আয়াত মহান আল্লাহর একটি সতর্কবাণী তাদের জন্য, যাদেরকে আগের আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ করে পুনরায় সতর্ক করে বলা হয়েছেঃ হে বনী ইসরাঈল! আমার অবতীর্ণ কিতাবের শব্দ ও সঠিক অর্থ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকারী!! তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছ। সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কেউ কারো ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। কারণ আমার কুফরী ও আমার রাসূলের অমান্যকারী অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হলে যে অপরাধ হবে, সে কারণে সেদিন কারো পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে অপর কাউকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া যাবে না। তদ্রূপ তোমাদেরকেও নাজাত দেওয়া হবে না এবং কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না কিংবা কোন সাহায্যকারীও সে বিপদ সময়ে এগিয়ে আসবে না। এ সম্পর্কে প্রতিটি দিকের ব্যাখ্যা এ ধরনের আয়াতে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। অতএব, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(১২৪) وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ○

(১২৪) স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূরণ করেছিল। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম মনোনীত করেছি। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও? আল্লাহ বললেন, অত্যাচারীরা আমার অঙ্গীকারপ্রাপ্ত হবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ -এর ব্যাখ্যাঃ

ابتلى শব্দের অর্থ 'সে পরীক্ষা করল'। আরবী ভাষায় বলা হয়, ابتليت فلانا ابتليه ابتلاء —(আমি অমুককে পরীক্ষা করলাম)। কুরআন মাজীদের অপর এক আয়াতে য়াতীমদের ধন-সম্পদ তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়ার প্রাক্কালে তাদের পরিণত বয়স, বিবেক-বুদ্ধি ও যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলা হয়েছে, وابتلوا اليتامى (য়াতীমদেরকে পরীক্ষা করে দেখ)। এখানেও ابتلاء শব্দের অর্থ পরীক্ষা করা। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ابتلى শব্দ পরীক্ষা অর্থেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইব্রাহীম (আ.)-কে কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করে নিলেন। পরীক্ষার বিষয় হিসাবে কতকগুলো অবশ্যকরণীয় কাজ ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ মাধ্যমে নির্ধারিত করে দিলেন। এ কাজগুলো তাঁকে অবশ্যই করতে হবে এবং এগুলোই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়।

আয়াতে উল্লিখিত এই كلمات বা নবী ইব্রাহীমের পরীক্ষার বিষয়বস্তু কি ছিল, এ নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কিছু সংখ্যক তাফ্সীরকারের মতে, এগুলো ইসলামী শরীআতের বিভিন্ন দিক, যেগুলো ত্রিশটি অংশে বিভক্ত।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ

ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আ.) ব্যতীত কেউ সফলতা লাভ করতে পারেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করায় তিনি তার সবগুলোতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তীর্ণ বলে লিখিতভাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে বলেন, وابراهيم الذى وفى (এবং ইব্রাহীমই পুরোপুরিভাবে পরীক্ষার বিষয়গুলো পূরণ করেছে। সূরা নযম ৫৩/৩৭)। বর্ণনাকারী আরো বলেন, এগুলোর মধ্যে ১০টি কথা সূরা আহ্যাবে, ১০টি সূরা বারাআত বা তাওবায় এবং বাকী ১০টি সূরা মু'মিনূন ও সাআলা-সা-ইলুন বা আল্ মা'আরিজে বর্ণিত হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, এই দীন-ইসলাম ৩০ অংশে বিভক্ত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এ দীনের পরীক্ষায় ইব্রাহীম (আ.) ছাড়া কেউ-ই উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁকে 'ইসলাম বিষয়ে' পরীক্ষা করা হয়। তিনি তা পূরণ করেন

এবং তাতে কৃতকার্য হন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তীর্ণ বলে লিখে নেন এবং কুরআন পাকে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেন, وإبراهيم الذي وفى (একমাত্র ইব্রাহীমই পুরোপুরি পূরণ করেছে বা উত্তর দিয়েছে)। ইসলাম বিষয়ে এসব প্রশ্নের মধ্যে ১০টি বর্ণনা করেছেন সূরা বারাআতের (যার অপর নাম আত্-তাওবা) التائبون العابدون শীর্ষক আয়াতে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত), ১০টি সূরা আহ্‌যাবের إن المسلمين والمسلمات আয়াতে, ১০টি সূরা মু'মিনূনের والذين هم على صلواتهم يحافظون পর্যন্ত শেষাংশ আয়াতে এবং ১০টি সূরা সা-আলা সা-ইলুনের (অপর নাম সূরা আল্ মা'আরিজ) والذين هم على صلواتهم يحافظون আয়াতে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে তিনি বলেন, ইসলাম ৩০টি অংশে বিভক্ত। আর এই দীনের পরীক্ষায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছাড়া অন্য কেউ-ই টিক্তে পারেননি। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وإبراهيم الذي وفى (ইব্রাহীমই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পুরোপুরি উত্তর দিয়েছেন), অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জাহান্নাম থেকে নাজাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

অন্যরা বলেছেন, ইসলাম ১০টি অভ্যাসের নাম। এমতের সমর্থকদের আলোচনাঃ হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات সম্পর্কে তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পবিত্রতা বিষয়ে পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে ৫টি মাথায় এবং ৫টি দেহের মধ্যে সীমিত ছিল। মাথার ৫টি যথাক্রমে এইঃ (১) গোঁফ খাটো করা, (২) কুলি করা, (৩) নাকে পানি দেওয়া, (৪) মিসওয়াক করা এবং (৫) মাথার চুল আঁচড়ান। দেহের ৫টি যথাক্রমে এইঃ (১) নখ কাটা, (২) নাভির নীচের লোম পরিস্কার করা, (৩) খাত্না করা, (৪) বগলের পশম পরিস্কার করা এবং (৫) পায়খানা ও প্রস্রাবের পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা এসেছে, তবে সে বর্ণনায়, أثر البول। 'প্রস্রাবের চিহ্ন' কথাটা বলা হয় নাই। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি বলেন, পরীক্ষার বিষয়গুলো ছিল খাত্না করা, নাভির নীচের লোম পরিস্কার করা, পেশাব-পায়খানার জায়গা ধুয়ে ফেলা, মিস্ওয়াক করা, মোঁচ ছোট করা, নখ কাটা এবং বগলের পশম পরিস্কার করা। এ প্রসঙ্গে রাবী আবু হিলাল (র.) বলেন, আমি আর একটি অভ্যাসের কথা ভুলে গিয়েছি। হযরত আবুল খালদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ১০টি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এগুলো মানব জীবনে চলার পথে পালনীয় বিধানঃ কুলি করা, গোঁফ ছোট রাখা, মিস্ওয়াক করা, বগল পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়া বা সংযোগস্থল ধোয়া, খাতনা করা, নাভির নীচের পশম পরিষ্কার করা, পেশাব-পায়খানার জায়গা ধোয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, বরং যে-সব বিষয়ে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন, সে হলো ১০টি অভ্যাস। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো দেহের পবিত্রতা সম্পর্কে, আবার কতক হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বিষয়ে। এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ সব বিষয়ের ৬টি মানুষের দেহ সম্বন্ধীয় এবং বাকী ৪টি হজ্জের নিদর্শন ও নিয়মাবলী সম্পর্কীয়। যেগুলো মানবদেহ সম্বন্ধীয় তা হলো, নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, খাত্না করা, বগল পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা এবং জুম্'আর দিনে

গোসল করা। আর হজ্জ সম্বন্ধীয় ৪টি—যেমন তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা, প্রস্তর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে যিয়ারাত করা।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং পরীক্ষার বিষয় হলো إني جاعلك للناس إماما। "আমি তোমাকে হজ্জের ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে ইমাম নির্বাচন করব।" এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ হযরত আবূ সালিহ (র.) থেকে وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে إني جاعلك للناس إماما—"আমি তোমাকে জনগণের ইমাম করে দেব" আয়াতাংশে জনগণের ইমামতের দায়িত্ব এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদির কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল, 'আমি তোমাকে জনগণের ইমাম বানাব' কথাটি এবং হজ্জের নিদর্শনাদি, যেগুলো وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت (স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল) শীর্ষক আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বললেন, আমি তোমাকে একটি বিষয়ে পরীক্ষা করতে চাই। হযরত ইব্রাহীম (আ.) জান্তে চাইলেন, সে বিষয়টি কি এই, আপনি আমাকে কি জনগণের ইমাম বানাতে চান? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হাঁ। হযরত ইব্রাহীম (আ.) অনুরোধ করলেন, তা হলে আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ইমাম বানাবেন। একথার উত্তরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, আমার অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ ইমামতের পদ-মর্যাদা, অত্যাচারী লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এরপর তিনি দু'আ করলেন, আপনার এ ঘরকে আপনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মিলন-কেন্দ্র করে দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, একে নিরাপদ স্থান করে দিন। আল্লাহ পাক তাও মনযুর করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আবার আরয করলেন। আমাদের বাপ-বেটা উভয়কেই সত্যিকার অনুগত মুসলমান বানিয়ে দিন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একদলকে আপনার এক অনুগত উম্মতে পরিণত করুন। এবারেও আল্লাহ তাআলা মনযুর করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আবার আরয করলেন, আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিন আর আমাদের তাওবা কবুল করুন। আল্লাহ পাক তাতেও রাযী হলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আবেদন জানাতে থাক্লেন, এ শহরকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করুন। এ দু'আও তিনি কবুল করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আরয করলেন, এ শহরের বাশিন্দাদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে, তাদেরকে ফলমূল দ্বারা উপজীবিকা দান করুন। তিনি এ দরখাস্তও কবুল করলেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকেও একই রকম বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইকরামাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ বিষয়ে হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনা সমর্থন করেন। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن আয়াতাংশ সম্পর্কে অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তা হলো, إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين—আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করে দেব। ইব্রাহীম বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমার বংশধরগণের মধ্য থেকেও? আল্লাহ বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারী লোকদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। হযরত রবী' (র.) থেকে রিওয়ায়াতে আয়াতে উল্লিখিত كلمات সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো إني جاعلك للناس إماما। (আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করে দেব), وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি এ ঘরকে

মানুষের মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করেছিলাম), واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى (তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর), وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى الاية (আমি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখার আদেশ দিয়েছিলাম) এবং واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الاية (স্মরণ কর, যে সময় ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মাঈল কা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চিতই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা)। এগুলোই সেসব কালিমাহ বা বিষয় যদ্দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে انى جاعلك للناس اماما (আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করব), واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل (স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল), হজ্জ ও কুরবানীর বিষয়ে আয়াতসমূহ, সে স্থানটি যা ইব্‌রাহীমের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, হেরেম শরীফের বাশিন্দাদেরকে প্রদত্ত রিযক এবং তাদের বংশ থেকে নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর আবির্ভাব।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং এ সব পরীক্ষার বিষয়সমূহ বিশেষভাবে হজ্জের اعمال বা নিয়ম-পদ্ধতি সংক্রান্ত। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে আছে, আয়াতে বর্ণিত كلمات বা পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলো مناسك الحج বা হজ্জের নিয়ম-প্রণালী। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এ আয়াতে পরীক্ষার বিষয় বা কালিমাত সম্পর্কে বল্‌তেন, এগুলো হজ্জের নিয়ম-কানুন। হযরত কাতাদাহ (র.) আরো বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা হজ্জের বিধান দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে সব বিষয়ে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল হজ্জের আমলসমূহ। অনুরূপভাবে অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, এগুলো ছিল مناسك الحج অর্থাৎ হজ্জের আমলসমূহ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এগুলো এমন সব বিষয়, যেগুলোর মধ্যে খাত্‌নাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ মতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ হযরত শা'বী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات সম্পর্কে তিনি বলেন, পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে খাত্‌নাও আওতাভুক্ত রয়েছে। হযরত শা'বী (র.) থেকে অনুরূপ আরো দুটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, বরং এগুলো الست الخلال অর্থাৎ ৬টি চারিত্রিক বিষয়— যেমন তারকা, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, হিজরত এবং খাত্‌না। এগুলোর মাধ্যমে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তিনি এ পরীক্ষায় সবরের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এ মতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ আল্‌-হাসান থেকে বর্ণিত, واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তাঁকে তারকা দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন করলে তিনি তাতে রাযী হয়ে যান। তাঁকে চন্দ্র দিয়ে পরীক্ষা নিলে তিনি তাও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। তাঁকে সূর্যের মাধ্যমে আযমায়েশ করতে চাইলে তিনি তাও সন্তোষের সঙ্গে স্বীকার করেন। আগুনের পরীক্ষার সম্মুখীন করলে তিনি তাও সানন্দে গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তাঁকে হিজরত ও খাতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। হযরত আল্‌-হাসান (র.)

বল্‌তেন, আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহর শপথ! তাঁকে (হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে) যে কোন বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন করলে তিনি তাতে ধৈর্যের পরিচয় দেন। তাঁকে তারকা, সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং তিনি এসব বিষয়ে অনুপম কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার প্রতিপালক চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব এবং অবিনশ্বর। অতএব, তিনি তারই প্রতি একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করেন, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং এভাবে ঐকান্তিক বিশ্বাসের কারণে তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হন নাই। অতঃপর তাঁকে স্বদেশ ত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয় এবং তিনি তাঁর জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে সিরিয়ায় উপনীত হন। এরপর হিজরতের প্রাক্‌কালে তাঁকে আগুনের পরীক্ষা দিতে হয় এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এ পরীক্ষারও মুকাবিলা করেন। অতঃপর তাঁর ছেলে কুরবানী ও নিজের খাতনার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং তিনি এ দুটি পরীক্ষারও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে টিকে থাকেন। আল্‌-হাসান ইব্‌ন য়াহ্‌য়ার এক সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে তাঁর ছেলের কুরবানী, আগুন, তারকা, সূর্য এবং চন্দ্র দ্বারা পরীক্ষা করেন। ইব্‌ন বাশ্‌শার সূত্রে আল্‌-হাসান থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তারকা, সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা পরীক্ষা করেছেন এবং এসব পরীক্ষায় তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত সুদ্দী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর পরীক্ষার বিষয়গুলো ছিল—

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ○ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك ص وارنا مناسكنا وتب علينا ج انك انت التواب الرحيم ○ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم

(হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের তরফ থেকে এই সাধনা কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে (পিতা-পুত্র) আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার এক অনুগত উম্মত সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে এ পর্যায়ে সঠিক কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-কে এমন কতকগুলো বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন, যেগুলো ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিশেষ করে তাঁকেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে সেগুলো বাস্তবে অনুশীলন ও পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে এই খবর দিয়েছেন যে, তিনি সেগুলো প্রতিপালন করেছেন। এমতাবস্থায় এ কথা বলা সঙ্গত যে, পরীক্ষার বিষয়ের বিশ্লেষণে যেসব কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলোই পরীক্ষার বিষয় ছিল অথবা কয়েকটি বিষয়ই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল- সবগুলো নয়। কারণ, যেসব তথ্য সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি এবং যেসব বিষয়ের কথা আলোচনায় এসেছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তার সবগুলোতেই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনি সেসব যথাযথভাবে প্রতিপালন করে আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতিপালন তাঁর জন্য অবশ্যকর্তব্য ছিল। এমতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য হাদীছ কিংবা

ইজমা'র (ঐকমত্যের) অনুপস্থিতিতে কারোর জন্যই একথা বলা সঠিক হবে না যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ঐ আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে অথবা সবগুলোতেই পরীক্ষা করার কথা বুঝিয়েছেন। কেননা, ঐ পর্যায়ের কোন খবরে ওয়াহিদ বা খবরে মুতাওয়াতির ঐসব আলোচনায় আসে নাই, যদ্দ্বারা অভিমতদ্বয়কে প্রামাণ্য বলা যেতে পারে। অধিকন্তু, এ বিষয়ে দুটি রিওয়ায়াত হযরত নবী করীম (স.) থেকে বর্ণিত আছে। যদি সে দুটো বা তার একটি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক প্রতীয়মান হবে। রিওয়ায়াত দুটি হলো এই যে, সাহাল ইব্ন মাআয ইবন আনাস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (স.) বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে এই সংবাদ দিব না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু ইবরাহীমকে পরীক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ পুরণকারী বলে কেন আখ্যায়িত করেছেন ? এর কারণ এই ছিল যে, তিনি প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون শীর্ষক আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। অপর রিওয়ায়াতটি আবু উমামা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) وابراهيم الذي وفى আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা কি জান যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কি পূরণ করেছেন ?' এ প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত সব সাহাবীই বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত'। তখন তিনি বললেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) দিনের বেলায় চার রাক্'আত নামায আদায় করে দিনের (২৪ ঘণ্টায়) ইবাদত পুরণ করতেন। অতএব, যদি সাহাল ইবন মা'আযের হাদীছের সূত্র সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে তো আমরা বলে দিয়েছি যে, যেসব কথায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তিনি সেগুলোতে কৃতকার্য হয়েছিলেন, সেগুলো আল্লাহ পাকের বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই বাণীতে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি বলতেন, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ۝ وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ۝ (সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। সূরা রূম ঃ ১৭-১৮) অথবা আবু উমামার রিওয়ায়াত যা অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে বুঝা যায় যে, যে সব কথা ইব্‌রাহীম (আ.)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে জানান হয়েছিল এবং যেগুলোতে তাঁকে আমলের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল তা হলো প্রতিদিন ৪ রাকআত নামায আদায় করা। যদিও রিওয়ায়াত দুটোর সূত্র সম্পর্কে কথা আছে। তবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষায় كلمات বা বিষয়গুলোর ব্যাখ্যার সঠিক অভিমত আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি। কেউ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.), হযরত আবু সালিহ (র.) এবং হযরত রবী' (র.) প্রমুখ ব্যক্তির অভিমত অন্যান্য অভিমত অপেক্ষা অধিকতর সঠিক। কেননা, আল্লাহ পাকের বাণী اني جاعلك للناس اماما এবং তাঁর অপর এক বাণী وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين (এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘর পবিত্র রাখার আদেশ দিয়েছিলাম।) এবং এ সম্পর্কে এ ধরনের যাবতীয় আয়াত واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এসব আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

فَاَتَمَّهُنَّ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বাণী দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর পরীক্ষার কথাগুলো পূরণ করেছেন। এর অর্থ, যে বিষয়গুলো তাঁর উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবশ্য-করণীয় বলে নির্ধারিত হয়েছিল, সেগুলো তিনি তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। এমন পরিপূরণ করাকেই আল্লাহ তাআলা وابراهيم الذي وفى আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) -এর কাছ থেকে যে সব কথার প্রতিশ্রুতি তিনি নিয়েছিলেন এবং যেগুলোকে ফরযরূপে প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলো তিনি যথার্থ সম্পন্ন করেছেন। যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে فاتمهن -এর অর্থ فاداهن অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো পালন করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেন, তিনি সেগুলো বাস্তবে অনুশীলন করে পরিপূরণ করেছেন। এমনিভাবে হযরত রবী' (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি কথাগুলো বাস্তবে অনুশীলন করেছেন।

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হে ইব্‌রাহীম! আমি তোমাকে মানব গোষ্ঠীর ইমাম করব, যাকে ইমাম বলে মেনে নেওয়া হবে এবং যাকে অনুসরণ করা হবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে হযরত রবী' (র.) বলেন, 'আমি তোমাকে জনগণের ইমাম করব, যাকে ইমাম বলে মানা করা হবে এবং যার অনুসরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষায় যখন কাউকে ইমামতের পদে নির্বাচন করা হয় এবং এ ভাবে তিনি ইমাম হয়ে যান, তখন বলা হয়, اممت القوم فانا اؤمهم اما — وامامة। অতএব, আল্লাহ তা'আলা اني جاعلك للناس اماما একথায় বললেন, আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমানদার জনগোষ্ঠী, যারা তোমার পরবর্তীকালে আসবে, তাদের জন্যও অর্থাৎ সর্বকালের জনগণের জন্য আমি তোমাকে ইমাম বানিয়ে দিচ্ছি। অতএব, তুমি হবে সকল সময়ের সকলের পুরোধা এবং তারা অনুসরণ করবে তোমার হিদায়াত এবং যে সকল সুন্নাতের উপর আমল করার নির্দেশ ও ওয়াহী তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলো তুমি পালন করেছ, সে সব সুন্নাতও তারা অনুসরণ করে চলবে।

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ যখন এ ভাবে আল্লাহ পাক নবী ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পদ-মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন, এবং তাঁকে তাঁর যুগের ও তাঁর পরবর্তী যুগের সদাচারী বংশধরদের ইমাম বানিয়ে কি উদ্দেশ্যে কি করতে চাচ্ছেন তা তাঁকে জানিয়ে দিলেন এবং এ ছাড়া তাঁর স্ববংশের বাইরের সমগ্র ভবিষ্যত মানব গোষ্ঠী তাঁর পথ-নির্দেশনা থেকে সৎ পথের সন্ধান পাবে এবং তাঁর কার্যকলাপ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করবে এ সব কথাও তাঁকে অবহিত করলেন, তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বিনয়ের সাথে আবেদন জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমার

বংশধরদের মধ্য থেকেও এমন অনুসরণীয় ইমামের সৃষ্টি করুন যেমন আপনি আমাকে করলেন। এ ছিল বিশ্বপালক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর এক বিশেষ মুনাজাত। যেমন হযরত রবী' (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মুনাজাত করলেন, আমার বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করুন, যাকে ইমাম হিসাবে মান্য ও অনুসরণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর এ মুনাজাত ছিল সীমাবদ্ধভাবে শুধুমাত্র তাঁর সন্তানদের জন্য, যেন তারা তাঁর অঙ্গীকার ও দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন তিনি তাঁর অপর এক মুনাজাতে বলেছিলেন, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ○ (স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। সূরা ইব্‌রাহীম ৩৫)। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা---لا ينال عهدى الظالمين আয়াতাংশ দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, যেহেতু তাঁর সন্তান-দের মধ্যে যালিম ও তাঁর দীনের বিরোধী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, কাজেই আমার অঙ্গীকার এমন যালিম লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। আয়াতাংশের প্রকাশ্য অর্থ এ মতের বিপরীত। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ومن ذريتي কথাটি আল্লাহ তা'আলার إني جاعلك للناس إماما (আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম করব) কথাটির প্রেক্ষিতে এবং পরে পরেই বলা হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল যে, মুনাজাত হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের জন্য করেছিলেন। তা যদি তাঁর প্রতিপালক যে পদ-মর্যাদার সুসংবাদ তাঁকে দিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন, তার বিপরীত হয়, তবে তো তার ব্যাখ্যা ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। কিন্তু মুনাজাতের গতিধারা যেভাবে চলে আসছিল, তদনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুনাজাতের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি না করে শুধু ومن ذريتي কথাটি বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন। যার অর্থ এই : হে আমার প্রতিপালক! মানব জাতির ইমামত দান করে আমাকে যে সম্মান দিলেন, অনুরূপভাবে আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও তেমনি মর্যাদা দান করুন।

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِيْنَ ○-এর ব্যাখ্যা :

এ হলো আল্লাহ তা'আলার এমন একটি ঘোষণা, যাতে বলা হয়েছে, অত্যাচারীরা নেককার-গণের অনুসরণীয় ইমাম হতে পারবে না। বস্তুত এ কথাটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি জবাব স্বরূপ তখনই এসেছে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে তাঁরই মতো ইমাম নির্বাচন করা হবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ করছিলেন। অতএব, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তা করবেন, কিন্তু অত্যাচারীদের মধ্য থেকে নয়। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি এমন মর্যাদা দেবেন না, বা তাদেরকে ওয়ালীর আসনে বসিয়ে ইমামতের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবেন না। কেননা, ইমামতের মহান মর্যাদা তাঁর শত্রুকুল ও কাফিরের দল ব্যতীত কেবলমাত্র তাঁর অনুগত বান্দাগণের জন্যই নির্ধারিত। এরপর যে পদ-মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা যালিমদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তৎসম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ ঘোষণার বিষয়টি হলো নুবুওওয়াত। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত,

لا ينال عهدى الظالمين -এ উল্লিখিত عهدى শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে এর অর্থ আমার নুবুওওয়াত। অতএব, এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, নুবুওওয়াতের মর্যাদা যালিম ও মুশরিকরা পাবে না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে বর্ণিত عهد শব্দের অর্থ ইমামতের মর্যাদা। অতএব, তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ, তোমার বংশের মধ্যে যারা গঠন ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক থেকে পুরোপুরি যালিম হবে, তাদেরকে আমি আমার বান্দাদের জন্য অনুসরণযোগ্য ইমাম করব না। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, لا ينال عهدى الظالمين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন (সত্যিকার) ইমাম যালিম হয় না। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে ভিন্ন সনদেও এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইমাম যালিম হতে পারে না। অপর এক সনদেও হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, এ আয়াতাংশের অর্থ 'কোন ইমাম যালিম হতে পারে না। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, কিন্তু হযরত আতা (র.) إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাঁর (ইব্‌রাহীম (আ.)-এর) বংশ থেকে কোন যালিমকে ইমাম নির্বাচন করার বিষয়কে অস্বীকার করেন। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র.) আরো বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আয়াতে বর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র عهد-এর তাৎপর্য কি? তিনি উত্তরে বললেন, তাঁর হুকুম।

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'কোন অত্যাচারী, অত্যাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার উপর কোন অঙ্গীকার বা চুক্তির বাধ্যবাধকতা নাই'। এ মতের অনুসারীদের আলোচনা : হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, لا ينال عهدى الظالمين-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'অত্যাচারীদের জন্য কোন অঙ্গীকার নাই, যদিও তুমি তাদের সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাক, তবে সে যুলুমের কাজে তোমার ওয়াদা পূরণ করা কর্তব্যের অন্তর্গত নয়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, যালিমের সাথে কোনো অঙ্গীকার করার বিধান নেই। যদি ওয়াদা করে থাক, তবে তা ভেঙ্গে ফেলো। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, 'যালিমের জন্য কোন ওয়াদা নাই'।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ ক্ষেত্রে عهد অর্থ নিরাপত্তা। অতএব, তাঁদের কথায় আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার দুশমন এবং আমার বান্দাদের মধ্যে যালিমের দল আমার নিরাপত্তা লাভ করবে না। অর্থাৎ আমি তাদেরকে আখিরাতের আযাব থেকে রেহাই দেব না। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, لا ينال عهدى الظالمين এ বর্ণনা মহান আল্লাহর নিকটে কিয়ামতের দিনের ব্যাপার। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন যালিমই তাঁর নিরাপত্তা পাবে না। তবে দুনিয়ায় তারা নিরাপত্তা পেয়েছে, তদ্দ্বারা বংশ পরম্পরায় নির্বিঘ্নে মুসলমানগণ তা ভোগ-ব্যবহার করছে, তাদের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশা করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁর এ অঙ্গীকার তথা এ নিরাপত্তা ও মর্যাদা কেবলমাত্র তাঁর আউলিয়া ও বন্ধুদের মধ্যেই বিশেষ করে সীমিত রাখবেন। হযরত কাতাদাহ (র.) لا ينال عهدى الظالمين এর ব্যাখ্যায় বলেন, যালিমরা আখিরাতে আল্লাহর নিরাপত্তা পাবে না। তবে পার্থিব জগতে তারা তা পেয়েছে। তার দ্বারা তারা খেতে পায় পরতে পায় এবং নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করছে। হযরত ইব্‌রাহীম

(র.) থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যালিমরা আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা পাবে না। তবে ইহকালে তারা তা পেয়েছে, এর দ্বারা তারা খেতে পায়, পরতে পায় এবং নিরাপদে জীবন ধারণ করছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'যে অঙ্গীকারের বিষয় আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতাংশে ইরশাদ করেছেন, তা অন্য কিছু না হয়ে বরং তার অর্থ আল্লাহ্‌র দীন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন لا ينال عهدى الظالمين —। এ আয়াতাংশে যে অঙ্গীকার তিনি বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন, তা হলো, তাঁর দীন। অর্থাৎ 'তাঁর দীন যালিমদের নিকট পৌঁছবে না।' তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ০ (আমি তাকে বরকত দান করেছি এবং ইসহাককেও; তাদের বংশধরগণের কতেক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতেক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭:১১৩)। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'হে ইব্‌রাহীম ! তোমার সব সন্তানই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' হযরত যাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র لا ينال عهدى الظالمين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমার দীন আমার শত্রুরা পাবে না এবং তা আমার অনুগত ওয়ালীগণ ব্যতীত অপর কাউকে আমি দান করব না। এ কথা যদিও এক সুস্পষ্ট ঘোষণা এ বিষয়ে যে, عهد শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা দুনিয়ায় সৎকর্মশীলদের অনুসরণীয় নুবুওওয়াত ও ইমামত বুঝায়, ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ তা পাবে না এবং দুনিয়ায় যে অঙ্গীকার পূরণ করলে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যায় তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী এবং পথভ্রষ্ট, তারা তাও পাবে না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন লোকও জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহ্‌ পাকের সাথে শিরক করবে, পথভ্রষ্ট হবে, নিজেদের প্রতিও যুলুম করবে এবং আল্লাহ্‌ পাকের বান্দাহদের প্রতিও যুলুম করবে। যেমন হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনায় لا ينال عهدى الظالمين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'অদূর ভবিষ্যতে তোমার বংশের মধ্যে অনেক অত্যাচারী লোক হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আরবী ব্যাকরণ অনুসারে আয়াতের الظالمين শব্দকে 'যবরের' স্থানে অর্থাৎ কর্ম হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে। কেননা, عهد শব্দ যার অর্থ অঙ্গীকার বা ওয়াদা তা ظالمين বা অত্যাচারীরা পাবে না। সুতরাং শব্দটি مفعول বা কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা.)-এর পাঠরীতি অনুসারে لا ينال عهدى الظالمون-ও পড়া হয়ে থাকে এ অর্থে যে, যালিমরা আল্লাহর ওয়াদা বা অঙ্গীকার লাভ করবে না। এ অবস্থায় ظالمون শব্দ فاعل বা কর্তারূপে ব্যবহৃত হবে। বস্তুত ظالمون শব্দকে পেশ (ـُ) ও যবর (ـَ) উভয় অবস্থায়ই অর্থাৎ فاعل ও مفعول হিসাবে ব্যবহার করা নিয়মসঙ্গত। এবং অনুরূপভাবে عهد শব্দও উভয় রকমে ব্যবহার করা চলে। কেননা, ব্যক্তি যা পায়, তা ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। অতএব, দেখা যায়, একই বস্তু একবার 'কর্তা' হচ্ছে, আবার ঐ একই বস্তু 'কর্ম' হিসাবে স্থান লাভ করছে। আসলে এতে কোন বাধা নাই। আর ظالم শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

(১২৫) وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ০

(১২৫) এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বাঘরকে মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যা :

اذ শব্দ দ্বারা আয়াতাংশকে واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات-এর সঙ্গে এবং يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى-কে واذ ابتلى ابراهيم الا يه-এর সঙ্গে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত করা হয়েছে। অতএব অর্থ এই- হে ইসরাঈল বংশধররা! স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং স্মরণ কর সে সময়কে, যখন কা'বাঘরকে মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান করেছিলাম। যে ঘরকে আল্লাহ্‌ মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র করেছেন সেটি বায়তুল হারাম—কা'বাঘর।

مثابة শব্দের অর্থ এবং যে কারণে শব্দটি مؤنث বা স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়ে আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য বিদ্যমান। বস্‌রার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ বলেন, مثابة শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ة যোগ করার কারণ হচ্ছে, এ স্থানে আগমনকারী বা দর্শনার্থীদের ভিড় জমে এবং তারা বহুবার এখানে যাতায়াত করে। যেমন سيارة ও نسابة শব্দে ভ্রমণের আধিক্যের কারণে ة স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে, مثاب ও مثابة শব্দ দুটি সমার্থবোধক এবং এর নযীর مقام ও مقامة —। এখানে مقام কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে স্থানে দাঁড়ান হয় তা বুঝান। مقامة শব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ এই, এতে নির্দিষ্ট স্থান বুঝান হয়েছে। কিন্তু এঁরা مثابة শব্দ سيارة ও نسابة শব্দ দুটির সঙ্গে সাদৃশ্য হওয়ার উপরোক্ত যুক্তির বিরোধিতা করে বলেছেন, سيارة ও نسابة শব্দ দুটির مؤنث হওয়ার কারণ শব্দ দুটির আহবায়ক বা উদ্যোক্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। মূলত مثابة শব্দের ওযন مفعلة, যা

ثاب يثوب مثابا و مثابة وثوابا থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা—এবং একারণে مثابة শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল, যেখানে মানুষ বারবার যাতায়াত করে। অতএব, واذ جعلنا البيت مثابة للناس আয়াতাংশের অর্থ ঃ স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাঘরকে মানুষের প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিলাম, যেখানে তারা প্রতিবছর আসা-যাওয়া করে। এঘর যিয়ারত করে কেউ তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই যিয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। مثاب শব্দটির এরূপ ব্যাখ্যাই ওয়ারাকা ইব্ন নওফল হেরেম শরীফের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন ঃ

مثاب لا فناء القبائل كلها + تخب اليه اليعملات الطلائح

অর্থাৎ হেরেম শরীফ সব গোত্রের জন্যই প্রত্যাবর্তন-স্থল, যেখানে সকল রকমের গর্হিত কাজই নিন্দিত ধিকৃত হয়ে যায়। এ অর্থেই বলা হয়েছে, ثاب اليه عقله লোকটির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার পর আবার তা ফিরে এসেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আমি শব্দটির ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করলাম, অন্যান্য তাফসীরকারও এরূপ বলেছেন। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ واذ جعلنا البيت مثابة للناس আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, পবিত্র কা'বা যিয়ারত করে কেউ তৃপ্ত হয় না। অন্য একটি সূত্রেও মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রেও উক্ত আয়াতাংশের একই অর্থ নেওয়া হয়েছে। সুদ্দী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, مثابة শব্দের তাৎপর্য হলো এই যে, ঘরটি এমন এক মিলন-কেন্দ্র, যেখানে মানুষ প্রতিবছরই যাতায়াত করে এবং যেখানে একবার এলে পুনরায় আস্তে মন চায়। ইব্ন আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঘরটি এমন যে, সেখানে যতবারই যাওয়া যায় তৃষ্ণা মিটে না। লোকেরা এখানে আসে, পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়, পুনরায় তারা এখানে ফিরে আসে। আবাদা ইব্ন আবূ লুবাবা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে কোন প্রত্যাবর্তনকারীকেই তৃপ্ত হয়ে ফিরে যেতে দেখা যায় না। আতা (র.) বলেন, লোকেরা প্রতিটি জায়গা থেকে এখানে যতই যাতায়াত করে, তাতে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। আতা (র.) থেকেও অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আতিয়্যা (র.) বলেন, যারা ঘরটি যিয়ারত করে, তাদের তৃপ্তি হয় না। সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) واذ جعلنا البيت مثابة للناس আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, লোকেরা হজ্জ করে, আবার এ ঘরে ফিরে আসে। সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) مثابة للناس-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ হজ্জ করে, আবার হজ্জ করে এবং এ ভাবে বারবার হজ্জ করেও তৃপ্ত হয় না। সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) অপর এক সূত্রে এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ এখানে বারবার আসা-যাওয়া করে। কাতাদাহ্ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, مثابة শব্দের অর্থ মিলন-কেন্দ্র। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, مثابة للناس কথার অর্থ লোকেরা এখানে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে। রবী' (র.) বলেন, مثابة للناس-এর অর্থ, মানুষ এখানে বারবার ফিরে আসে। ইব্ন যায়দ (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ সকল দেশ থেকেই এখানে আসে এবং প্রত্যাবর্তন করে।

وَأَمْنًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

امن শব্দ একটি مصدر —। যেমন বলা হয় امن يامن امنا —। এর অর্থ নিরাপত্তা। কা'বাঘরের এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, জাহিলী যুগে এটা ছিল যে-কোন ব্যক্তির আশ্রয় ও নিরাপদ-স্থল। সে যুগেও যদি কোন ব্যক্তি এখানে তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ

পেত, তবুও তাকে গালিগালাজ করত না, এবং প্রতিশোধ নিত না, যতক্ষণ না সে এখান থেকে বেরিয়ে যেত। এ ভাবে কা'বাঘর তথা হেরেম শরীফের এ মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের মতই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم (তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ-স্থান করেছি। অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়। আনকাবূত ঃ ২৯/৬৭)

ইব্ন যায়দ امنا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, যে কোন লোক কা'বাঘরের দিকে অগ্রসর হলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। তখনকার যুগেও কোন লোক তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ পেলেও এখানে সে তার প্রতিশোধ নিত না। সুদ্দী (র.) এই امنا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কা'বাঘরে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মুজাহিদ (র) امنا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ঘরের মর্যাদা এই, যে কোন ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নির্ভয় হয়ে যায়। আর-রাবী' (র.) امنا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিরাপত্তা অর্থ শত্রু থেকে নিরাপত্তা এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র বহন না করা। জাহিলী যুগের অবস্থা এই ছিল যে, পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদেরকে হত্যা ও ছিনতাই করা হতো। কিন্তু হেরেমের লোকেরা নিরাপদে থাকত, এমন কি তাদেরকে কটূক্তিও করা হতো না। ইব্ন আব্বাস (রা.) امنا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ মানুষের জন্য নিরাপত্তা। মুজাহিদ (র.) امنا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এ ঘরের মর্যাদা এমন যে, এতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, সে নির্ভয় হয়ে যায়।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيمَ مُصَلًّى-এর ব্যাখ্যা ঃ

আয়াতের পাঠ-পদ্ধতির ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মত-পার্থক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ আয়াতে واتخذوا শব্দের خاء বর্ণ যের (ـِ) দ্বারা উচ্চারণ করেন। এ অবস্থায় শব্দটি امر বা হাঁ-বোধক অনুজ্ঞা হওয়ার কারণে মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ প্রদান করে। সাধারণভাবে এ পাঠ-পদ্ধতি হলো মিসর, কূফা, বস্রা, মক্কা এবং কিছু সংখ্যক মদীনাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞের। যারা এ পাঠ-পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাঁরা প্রমাণ হিসাবে যে সব দলীলের উপর ভিত্তি করেন, তা এই ঃ হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি ইচ্ছা করলে মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে নির্বাচন করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াতটি নাযিল করেন। হযরত 'উমার (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এ প্রসঙ্গে অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন—তাঁরা বলেন, আসলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সালাতের স্থানরূপে মাকামে ইব্রাহীমকে গ্রহণ করার জন্য আদেশ করেছেন। যেহেতু এটা আম্র বা নির্দেশ, সেহেতু একে 'খবর' বা বিধেয় হিসাবে ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়। বস্রার কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াতাংশটি يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ অবস্থায় এ মতের সমর্থকদের কথায় এ আয়াতে মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান নির্বাচন করার নির্দেশটি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ের ইস্রাঈল বংশীয়দের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে ঃ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, যে সব কথায় ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াতাংশটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই তাদেরকে মাকামে

ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়ত। সুতরাং এ মতের সমর্থকদের আলোচনা অনুসারে আয়াতের ব্যাখ্যা হবেঃ স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভু কতকগুলো কথার দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং তিনি সেগুলো পূরণ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম বানাব এবং তিনি (আল্লাহ্) আরো বললেন, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।' কিন্তু এর আগে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যে হাদীছ হযরত 'উমার (রা.)-এর রিওয়ায়াতে আমরা বর্ণনা করেছি, তা এর বিপরীত এবং তা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এমন একটি আদেশ, যা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.), মু'মিন এবং শরীআতের বিধান পালনে বাধ্য সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য।

মদীনা ও সিরিয়া অধিবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ واتخذوا শব্দের خاء অক্ষর 'যবর' দ্বারা উচ্চারণ করে خبر বা বিধেয় হিসাবে واتخذوا পাঠ করেছেন। এরপর এ ভাবে واتخذوا শব্দে 'যবর' দিয়ে পড়ায় خبر হিসাবে রাখার পরও বাক্যটির সম্পর্ক নিয়ে তারা মতদ্বৈধতা পোষণ করেন। বস্রার কোন কোন বৈয়াকরণিকের মতে, এরূপ পঠন-পদ্ধতি অনুসারে واتخذوا শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করলে এর ব্যাখ্যা হবে— وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى অর্থাৎ "স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি কা'বাঘরকে মানব জাতির জন্য মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপদ-স্থল বানালাম এবং তারা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।" আবার কূফার কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে, واتخذوا শব্দটি جعلنا শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে কথাটির অর্থ হবেঃ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه مصلى অর্থাৎ "যখন আমি কা'বা-ঘরকে মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল বানালাম এবং তারা তাকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করে নিল।" ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, পাঠ-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট সঠিক মত হলো, واتخذوا শব্দের خاء বর্ণে যের দিয়ে পাঠ করা। কেননা, হযরত রাসূলে করীম (স.) থেকে বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার আদেশের ব্যাখ্যানুযায়ী خاء অক্ষরে 'যের' দিয়ে পাঠ করাই প্রমাণিত। যে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। জাবির ইবুন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশে خاء বর্ণে যের দিয়ে তিলাওয়াত করেছেন।

অতঃপর তাফ্সীরকারগণ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ও مقام إبراهيم সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মাকামে ইব্রাহীম বলতে পূর্ণ হজ্জকেই বুঝায়। এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ হযরত ইবুন আব্বাস (রা.) বলেন, হজ্জের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকেই মাকামে ইব্রাহীম বলে। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হজ্জের প্রতিটি আমলই মাকামে ইব্রাহীম। আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের সবই মাকামে ইব্রাহীম।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাকামে ইব্রাহীম হচ্ছে, 'আরাফা, মুয্দালিফা এবং জিমার।

এ মতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ 'আতা ইবুন রিবাহ (র) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।' কারণ আমি তাঁকে ইমাম বানিয়েছি এবং তাঁর স্থান হচ্ছে আরাফা, মুযদালিফা ও জিমার। মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁর মাকাম

সবই, আরাফা ও মিনা। তবে তিনি এর সাথে 'মক্কা' যোগ করেছেন কিনা তা আমার মনে পড়ে না। ইবুন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন –তাঁর মাকাম হচ্ছে 'আরাফা'। শা'বী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন اليوم أكملت। শীর্ষক পুরো আয়াতটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম (স) 'আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। শা'বী (র.) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মতান্তরে অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাকামে ইব্রাহীম হচ্ছে হারাম শরীফ।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, মাকামে ইবরাহীম বলতে সমগ্র হেরেমকেই বুঝায়। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সে পাথরটি, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন এবং এ সময় তিনি পাথর উত্তোলন করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়েন।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ ইবুন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ.) কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন আর তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর এনে দিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা উভয়েই বল্ছিলেন ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (প্রভু! তুমি আমাদের এ কাজ কবুল করে নাও, তুমি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা)। এরপর যখন প্রাচীর এতটা উপরে উঠে গেল যে, বৃদ্ধ নবী ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কাজের জন্য আর পাথর উঠাতে পারছিলেন না, তখন তিনি একটি পাথরের উপর দাঁড়ালেন। এ পাথরটিই মাকামে ইবরাহীম নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, মাকামে ইব্রাহীম মসজিদে হারামের ভিতরেই রয়েছে।

এ মতের অনুসারীদের আলোচনাঃ কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মূলত লোকদেরকে মাকামের নিকট নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তা স্পর্শ করার আদেশ দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ উম্মতের লোকেরা এমন কিছু বানিয়ে বা সৃষ্টি করে নিয়েছে যেমন করেছিল পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা। যারা পাথরটিতে হযরত ইবরাহীমের পদচিহ্ন ও আঙ্গুলের দাগ দেখেছেন, তাদের কিছু লোক আমাদের নিকট বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর এ উম্মতের লোকেরা তা স্পর্শ করতে শুরু করে। যার ফলে পাথরটি পুরান এবং চিহ্নগুলো মুছে যায়। রবী' (র.) থেকে واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাঁরা মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়তেন। সুদ্দী (র.) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى। এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এর অর্থ হজ্জের সময় মাকামে ইবরাহীমের নিকটে নামায পড়া। আর 'মাকাম' হচ্ছে সে পাথরটি, যা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী তাঁর শ্বশুর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মাথা ধৌত করার সময় তাঁর পা রাখার জন্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি এর উপর উঠে পা রেখেছিলেন। এ ভাবে তাঁর একদিক ধুয়ে দেওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, তাঁর পা পাথরে বসে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখন তিনি পাথরটি সরিয়ে এর অপর দিকটি পায়ের নীচে রাখলেন এবং তা ধুয়ে দিলেন। এবারেও দেখা গেল যে, তাঁর পা পাথরটিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ তাআলা এ স্থানটিকে তাঁর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন এবং বল্লেন, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى। (তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করে নাও।)

এ অভিমতগুলোর মধ্যে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে যারা বলেছেন মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সেই সুপরিচিত স্থান, যা মাসজিদুল হারামের অভ্যন্তরেই স্থাপিত রয়েছে

এবং যার সপক্ষে আমরা ইতিপূর্বে হযরত 'উমার ইব্নুল্ খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা পেশ করেছি। হযরত জাবির (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) হাজার আসওয়াদ চুম্বন করলেন। এরপর তিনবার দ্রুত এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে তা তওয়াফ করলেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হয়ে واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং মাকামকে তাঁর ও কা'বাঘরের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এ দুটি বর্ণনা এ কথা প্রমাণ করে যে, যে স্থানটিকে আল্লাহ তা'আলা নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো আমরা যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যদি আমাদের ব্যাখ্যার সপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে কোন বর্ণনা না-ও থাকত, তবুও আমরা যা বলেছি তা মেনে নেওয়াই অবশ্যকর্তব্য। কেননা, আয়াতাংশের অপ্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে কোন দলীল পাওয়া যায়। অধিকন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাকামে ইব্রাহীম নামে সাধারণত মানুষ যা ধারণা করে তা হলো—'মুসাল্লা' বা নামাযের স্থান, যা আল্লাহ তা'আলা واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাফসীরকারগণ এর অর্থে একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, 'মুসাল্লা' অর্থ মুদ্দাআ (مدعى) অর্থাৎ যা প্রতিপাদ্য।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : আল্লাহ পাকের বাণী واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেন : এখানে মুসাল্লা শব্দের অর্থ মুদ্দাআ (مدعى) অর্থাৎ করণীয়। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ যার নিকট তোমরা নামায পড়, সেটাকেই নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।

এ মতের সমর্থকদের সম্পর্কে আলোচনা : কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা মাকামে ইবরাহীম-এর নিকট নামায পড়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। সুদ্দী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, মাকামে ইব্রাহীমের নিকট নামাযই মূলবস্তু। অতএব, যাঁরা এখানে মুসাল্লার ব্যাখ্যা দাবীর মূলবস্তু ধরেছেন, তাঁরা যেন মুসাল্লার ব্যাখ্যাকে مفعل অর্থাৎ কর্মস্থলের দিকে নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় صلوت অর্থ— دعوت করা হয়। অর্থাৎ তাঁরা নামায অর্থ দু'আ ধরে নিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার সমর্থকরাই বলেন, মাকামে ইবরাহীম বলতে হজ্জের সব ক্রিয়াকর্মকেই বুঝায়। অতএব, আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, 'তোমরা আরাফা, মুযদালিফা, মাশআর, জিমার এবং হজ্জের সবগুলো স্থানকেই দু'আর জায়গা হিসাবে গ্রহণ কর, যেগুলোর নিকট তোমরা আমাকে ডাকবে এবং আমার বন্ধু ইব্রাহীমকে ইমাম হিসাবে মান্য করবে। কেননা, আমি তাকে তার পরবর্তী আমার প্রিয় বান্দা ও অনুগত লোকদের জন্য ইমাম বানিয়ে দিয়েছি। তারা তাকে ও তার স্মৃতিচিহ্নগুলোকে অনুসরণ করবে। অতএব, তোমরাও তাকে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে অন্য মতের সমর্থকরা আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে মানব জাতি! তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর, যার নিকট তোমরা নামায পড়বে। যা হবে তোমাদের পক্ষ থেকে একটি 'ইবাদত এবং আমার পক্ষ থেকে ইব্রাহীমের জন্য একটি মর্যাদা বা সম্মান। এ অভিমতই সঠিক হওয়ার দিক থেকে উত্তম। কারণ, আমরা এ প্রসঙ্গে হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) ও জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীছ পেশ করেছি।

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ-এর ব্যাখ্যা :

عهدنا শব্দে 'আল্লাহ তা'আলা আদেশ করলেন'— একথা বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন জুরায়জ (র.) বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম— তাঁর 'আহ্দ' কি? তিনি উত্তরে বললেন, 'তাঁর আদেশ'। ইব্ন যায়দ, (র.) وعهدنا الى ابراهيم আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি ইবরাহীমকে আদেশ করলাম'। এতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘর পবিত্র রাখার আদেশ দিলাম। এবং ঘরের ব্যাপারে পবিত্রকরণের যে নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা হচ্ছে, ঘরটিকে মূর্তিপূজা, পাথরপূজা এবং শির্ক থেকে পবিত্র করা। যদি প্রশ্ন করা হয়, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমার ঘর তওয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশের অর্থ কি? এবং ইব্রাহীমের ঘর নির্মাণের পূর্বে সে যুগে হেরেম শরীফে এমন কোন ঘর অবস্থিত ছিল কি, যাতে শিরক ও মূর্তিপূজা হতো? যে কারণে ঘর ও হেরেমকে পবিত্র রাখার নির্দেশ বৈধ ও সঙ্গত হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর দু'রকম ব্যাখ্যা দ্বারা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যাখ্যার সমর্থনে তাফসীরকারদের এক একটি দল রয়েছেন। তার একটি এই, আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমার ঘর শিরক ও সন্দেহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে নির্মাণ করার নির্দেশ দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار (যে লোক অন্তরে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টি নিয়ে মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে, আর যে ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দিগ্ধ মন নিয়ে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে— এই উভয় ব্যক্তি কি সমান? সূরা তাওবা : ১০৯) শীর্ষক আয়াতে বলেছেন। অতএব, এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে শিরক ও সন্দেহ থেকে পবিত্র করে তাঁর এ কা'বাঘরটি নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মূসা ইব্ন হারূন (র.) সূত্রে সুদ্দী (র.) বলেন, 'তোমরা উভয়ে আমার ঘর পবিত্র করে তৈরি কর।' অপর একটি ব্যাখ্যা এই : ঘর নির্মাণের পূর্বেই ঘরের স্থানটি তাঁদের উভয়কে পবিত্র করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং নির্মাণের পরে মুশরিকরা মূর্তিপূজাসহ যেসব শিরকী কার্যকলাপ নূহ (আ.)-এর যুগে এবং তাঁর পরে ইব্রাহীম (আ.)-এর আগে তার মধ্যে করত, সেসব থেকেও পবিত্র করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এ কাজ তাদের পরবর্তী কালের লোকদের জন্য সুন্নাতরূপে পালিত হতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে পরবর্তীকালের লোকদের জন্যও ইমাম নির্বাচিত করেছেন।

ইব্ন যায়দ (র.)-এর রিওয়ায়াতে ان طهرا শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ— যে মূর্তিগুলোকে সম্মানের পাত্র বলে মনে করে মুশরিকরা পূজা করত, সেগুলো থেকে পবিত্র করার জন্য তাঁদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আহমাদ ইব্ন ইসহাক (র.) সূত্রে উবায়দ ইব্ন উমায়র (র.) ان طهرا بيتي للطائفين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ আমার ঘরকে মূর্তিপূজা ও সন্দেহ থেকে পবিত্র কর। 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র (র.)-এর রিওয়ায়াতে অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক বর্ণনায় শিরক থেকে পবিত্র রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ (র.) থেকে আরো একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তওয়াফকারীদের জন্য ঘর পবিত্র করার আদেশের অর্থ— মূর্তিপূজা থেকে পবিত্র কর।

কাতাদাহ্ (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর অর্থ শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে পবিত্র করা। বিশ্‌র ইব্‌ন মু'আয (র.) সূত্রে কাতাদাহ (র.) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে 'মিথ্যা কথা' শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে।

لِلطَّائِفِينَ-এর ব্যাখ্যা :

এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একমত হতে পারেন নাই। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, طائفين শব্দের অর্থ সেই সব দরিদ্র লোক, যারা দারিদ্র্যের কারণে দূর প্রান্ত থেকে হেরেম শরীফে আগমন করত।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) للطائفين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা সেই সব লোক, যারা আর্থিক দারিদ্র্যের কারণে হেরেমে আসতেন। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, বরং طائفون সেই দরিদ্র তওয়াফকারীদের দল, যাদের পরিবার সেখানে আশ্রিত থাক্‌ত।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : 'আতা (র.) তাঁর বর্ণনায় للطائفين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, যে লোক কা'বাঘরে তওয়াফরত থাকবে কেবল তখনই তাকে الطائفين অর্থাৎ তওয়াফকারীদের দলভুক্ত ব্যক্তি বলে ধরা হবে। উল্লিখিত দু'রকম ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা সেটিই, যা 'আতা (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন। কেননা, الطائف ---অর্থাৎ তওয়াফকারী সেই ব্যক্তি, যে কোন বস্তু প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং দারিদ্র্যের কারণে কেউ এখানে আস্‌লে, সে তওয়াফ না করলে, তাকে তওয়াফকারী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না।

وَالْعَاكِفِينَ-এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা দ্বারা সেখানে অবস্থানকারীদেরকে বুঝিয়েছেন। বস্তুত কোন কিছুর ই'তিকাফকারী অর্থে সে বস্তু বা স্থানের অবস্থানকারীকে বুঝায়। যেমন বনী যুবয়ানের কবি নাবিগাহ্‌র কবিতা

عكوفا لدى ابياتهم يثمدونهم + رمى الله فى تلك الاكف الكوانع

(তারা তাদের ঘরের নিকট অবস্থানরত) দ্বারা এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। মূলত মু'তাকিফ (معتكف)-কে মু'তাকিফ এ কারণে বলা হয় যে, সে মহান আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে সে স্থানে অবস্থানকারী হিসাবে আবদ্ধ করে নিয়েছে। তারপর والعاكفين দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাদেরকে বুঝিয়েছেন, এ বিষয়ে তাফ্‌সীরকারদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, মাস্‌জিদুল হারামে তওয়াফ ও নামায ছাড়া যারা উপবিষ্ট থাকে, এ কথায় তাদেরকেই বুঝান হয়েছে।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা : হযরত 'আতা (র.) বর্ণনা করেন, যখন কেউ কা'বাঘরে তওয়াফরত থাকে, তখন তাকে তওয়াফকারী বলা হবে এবং যখন সে সেখানে উপবিষ্ট থাকে, তখন তাকে আকিফীন-এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, عاكفون তারাই, যারা (কা'বাঘরের) আশেপাশে অবস্থান করে। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত মুজাহিদ (র.) ও ইক্‌রামাহ (র.) طهرا بيتى للطائفين والعاكفين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো আশপাশে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ। অন্যান্য তাফসীরকারের মত—তারা হলো, হেরেমের শহরবাসী। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, العاكفون। অর্থে মক্‌কা শহরের অধিবাসীদেরকে বুঝায়। হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেন— العاكفون। অর্থ সেখানকার অধিবাসী। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, العاكفون। অর্থে সেখানকার মুসল্লীকে বুঝায়। এমতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)— طهرا بيتى للطائفين والعاكفين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে والعاكفون অর্থ মুসল্লীগণ অর্থাৎ নামাযীগণ। এ সব ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বোত্তম ও সঠিক ব্যাখ্যা হলো যা হযরত আতা (র.) বলেছেন এবং তা হলো : এ ক্ষেত্রে 'আকিফ অর্থ তওয়াফ ও নামায ব্যতীত কা'বাঘরে অবস্থানকারী নিকটের বসবাসকারী লোকজন। কেননা, আমরা ই'তিকাফের যে বর্ণনা দিয়েছি, তাতে স্থানের অবস্থান আবশ্যক। আর প্রকৃত অবস্থা, 'মুকীম' বা স্থানের অবস্থানকারী, সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় কখনো উপবিষ্ট, কখনো মুসল্লী, তওয়াফকারী, দণ্ডায়মান ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর ان طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود আয়াতাংশে মুসল্লী ও তওয়াফকারিগণের বর্ণনা দিলেন, তখন একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, 'আকিফ' শব্দ দ্বারা তিনি যে অবস্থা বুঝিয়েছেন, তা মুসল্লী ও তওয়াফের অবস্থা থেকে ভিন্ন এবং যা আকিফের অবস্থা বুঝায় তা হলো কাবা'ঘরের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করার অবস্থা, যদিও সে নামাযরত, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারী অবস্থায় না-ও থাকে।

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ-এর ব্যাখ্যা :

الركع শব্দে আল্লাহ তা'আলা এখানে কা'বাঘরের রুকূকারিগণের দলকে বুঝিয়েছেন। শব্দটি বহুবচন, এর একবচন راكع —। অনুরূপভাবে السجود শব্দের অর্থ কা'বাঘরের সিজ্‌দাকারিগণ এবং এ শব্দটিও বহুবচন এবং একবচন ساجد —। যেমন বলা হয়— رجل قاعد উপবিষ্ট ব্যক্তি, رجال قعود উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ; رجل جالس উপবেশনকারী ব্যক্তি, رجال جلوس উপবেশনকারী ব্যক্তিগণ। অনুরূপভাবে رجل ساجد সিজদারত ব্যক্তি; رجال سجود সিজদারত ব্যক্তিবর্গ। কেউ বলেছেন, الركع السجود দ্বারা নামায আদায়কারিগণকে বুঝান হয়েছে। এমতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, الركع السجود-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কেউ নামায পড়লেই সে الركع السجود। অর্থাৎ নামায আদায়কারিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, الركع السجود। অর্থ নামায আদায়কারিগণ। আমরা বিগত আলোচনায় রুকূ' ও সিজ্‌দার অর্থ বর্ণনা করেছি, কাজেই পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

(১২৬) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৪২—

(১২৬) স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ শহর কর আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদান কর।' তিনি বললেন, 'যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কতই না নিকৃষ্ট পরিণতি।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا-এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দেন সে সময়ের কথা, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) পবিত্র মক্কা শহরকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করেছিলেন। তাঁর আবেদন ছিল অত্যাচারী যুলুমবাজ শত্রুকুলের আক্রমণ থেকে স্থানটিকে নিরাপদ করার। যাতে তারা জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে স্থানটি দখল করতে না পারে এবং বিধ্বংস, স্থানচ্যুতি, প্লাবিত হওয়া ইত্যাদি আল্লাহ পাকের আযাব ও গযবে অন্যান্য দেশ ও শহর যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তেমনিভাবে যেন এ শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত না হয়।

এ ব্যাখ্যার সমর্থনে বর্ণনাঃ কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হারাম শরীফ তার চারপাশসহ আরশ পর্যন্ত অতি সম্মানিত স্থান। আর আমাকে এ কথাও বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন তাঁর সাথেই এসেছিল আল্লাহ পাকের এ ঘর। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেছিলেন, তুমি নীচে নেমে যাও। তোমার সাথে থাকবে আমার ঘর। এর চারপাশে তওয়াফ করা হবে যেমন আমার আরশের চারপাশ তওয়াফ করা হয়। তাই হযরত আদম (আ.) এবং তাঁর পর যারা ঈমান এনেছেন সবাই আল্লাহ পাকের ঘরের চারপাশে তওয়াফ করেছেন। যখন হযরত নূহ (আ.)-এর সময় প্লাবন এসেছিল, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক মহা প্লাবনে নিমজ্জিত করলেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তাঁর ঘরকে উঁচু করে রাখলেন এবং পবিত্র করে রাখলেন। বিশ্ববাসীর কোন বিপদ-আপদ এই পবিত্র কা'বা শরীফকে স্পর্শ করল না। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) তারই নিদর্শনের অনুসরণ করলেন এবং তিনি প্রাচীনকালের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করলেন। যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের নিকট কা'বা শরীফের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেছিলেন, পূর্বে কি পবিত্র হেরেম নিরাপদ ছিল না? এর জবাবে বলা হবে, তত্ত্বজ্ঞানিগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে সর্বদা হেরেম শরীফ নিরাপদ ছিল। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগত বালা-মুসীবত এবং যালিমের ফেৎনা-ফাসাদ থেকে সর্বদা হেরেম শরীফ নিরাপদ ছিল। সাঈদ ইবন আবু সা'ঈদ আল-মুকবেরী (র.) বলেন, আমি আবু শুরায়হ খুযাঈকে বলতে শুনেছি—মক্কা বিজয়ের সময় হুযায়ল গোত্রের কোন ব্যক্তি নিহত হলে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই মক্কাকে হারাম করে দিয়েছেন। অতএব, এ স্থানটি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুরমত ও

মর্যাদা নিয়ে চিরকাল টিকে থাকবে। আল্লাহ পাক ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্যই স্থানটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে সেখানে কারো রক্ত ক্ষয় করা কিংবা সেখানকার কোন গাছ-পালা কর্তন করা কখনই বৈধ নয়। সাবধান! এ মক্কাভূমি আমার পূর্বেও কারোর জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও তা কারোর জন্য হালাল নয়। কিন্তু শুধুমাত্র এক ঘণ্টা বা এক মুহূর্ত কালের জন্য, যখন এখানকার অধিবাসীরা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং আমার বিদ্রোহী হয়েছে! খবরদার! স্থানটি আবার তার পূর্ব মর্যাদায় ফিরে গেছে। সাবধান! যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা যেন অনুপস্থিত লোকদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এখানে যুদ্ধ করেছেন, তাকে বলে দিও যে, স্বয়ং আল্লাহই তাঁর রাসূলের জন্য তা হালাল করেছিলেন, আর তোমার জন্য তা হালাল করেননি। ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এ স্থানটি 'হেরেম'—আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই এবং সেখানে চন্দ্র ও সূর্য স্থাপন করার সময় থেকেই এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব, আমার পূর্বে অথবা আমার পরে কারোর জন্যই এ সম্মান বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট করা বৈধ নয়; তবে দিনের মাত্র এক ঘণ্টার জন্য শুধু আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। (তাঁরা বলেন,) অতএব, সৃষ্টির প্রথম থেকেই 'হেরেম' আল্লাহর আযাব ও অত্যাচারী মানুষের নির্যাতন থেকে নিরাপদ। (তাঁরা বলেন,) আমরা এ ব্যাপারে যে বক্তব্য পেশ করেছি, সে প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে প্রামাণ্য রিওয়ায়াত পেশ করেছি। এর প্রতিবাদে বলা হয়েছে, ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রভুর নিকট কা'বাঘরটিকে আল্লাহর রোষ এবং অত্যাচারী মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানান নাই, বরং আবেদন করেছেন সেখানকার অধিবাসীদেরকে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ থেকে নিরাপত্তা দানের জন্য এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের ফল থেকে জীবিকা প্রদানের জন্য। যেমন তাঁর প্রভু সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر (তাঁরা বলেন,) ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা করার কারণ এই ছিল যে, তিনি এমন ভূখণ্ডে তাঁর পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছিলেন, যা ছিল অনুর্বর, নীরস এবং শস্যোৎপাদনের অনুপযোগী। অতএব, তিনি প্রভুর নিকটে এ জন্য শরণ ও আশ্রয়ের প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁদেরকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা ধ্বংস না করেন এবং তিনি তাদের ব্যাপারে ভীতি ও আশংকার কারণেই নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিলেন।

(তাঁরা বলেন,) কি করে ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য 'হেরেম'কে হারাম করার এবং তা আল্লাহর আযাব ও তাঁর সৃষ্টির অত্যাচারী লোকদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করার প্রার্থনা বৈধ ও সঙ্গত হতে পারে, যে ক্ষেত্রে তিনি সেখানে তাঁর পুত্র ও পরিবার-পরিজন নিয়ে অবতরণ করার সময় নিজেই বলেছিলেন, ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم (হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে তোমার হারামকৃত ঘরের সন্নিকটে এমন এক উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছি, যা শস্যোৎপাদনের অনুপযোগী। সূরা ইব্রাহীম : ৩৭ আয়াত) অতএব, তাঁরা বলেন, যদি ইব্রাহীম (আ.) হেরেমকে হারাম করে থাকতেন অথবা তিনিই তাঁর প্রভুকে তা হারাম করার আবেদন করে থাকতেন, তবে অবশ্যই عند بيتك المحرم (তোমার হারামকৃত ঘরের সন্নিকটে) কথাটি সেখানে অবতরণ করার সময় তিনি বলতেন না। বরং এমতাবস্থায় এটাই সঠিক কথা যে, ঘরটি তাঁর পূর্বেও হারাম ছিল এবং তাঁর পরেও হারাম থাকবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, 'হেরেম' অন্যান্য শহর বা দেশের মতই ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার পূর্বে হালাল ছিল, তবে ইব্রাহীম (আ.) স্বয়ং একে হারাম বলে ঘোষণা করার জন্য এটা হারাম হয়ে গেছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনা শহর তাঁর হারাম ঘোষণার পূর্বে হালাল ছিল। একথার সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ আমরা যা বলেছি, সে সম্পর্কে জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) বায়তুল্লাহকে হারাম করেছেন ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, আর আমি মদীনাকে তার মধ্যবর্তী দুই পাহাড়ের ('আয়ের' ও ছওর') স্থান সহ 'হারাম' করেছি, একারণে সেখানে কোন শিকার করা যাবে না এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা বা নষ্ট করা যাবে না।

আবূ হুরায়রাহ্ (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও খলীল বা দোস্ত, আর আমি হচ্ছি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইব্রাহীম (আ.) মক্কাকে 'হারাম' করেছেন, আর আমি হারাম করেছি মদীনাকে—তার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূমিসহ গাছপালা ও শিকার। সেখানে কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাবে না এবং উটের খোরাক ব্যতীত কোন গাছপালা ও তৃণ-লতাও কাটা যাবে না।

রাফী' ইব্‌ন খুদায়জ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) মক্কা শরীফকে হারাম করেছেন, আর আমি হারাম করেছি মদীনা শরীফকে তার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূমিসহ। এ শ্রেণীর হাদীছের সংখ্যা এত বেশী যে, সেগুলো পুরোপুরি লিখলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মুনাজাতের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন رب اجعل هذا بلدا امنا 'প্রভু! এ শহরকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও'। এতে একথা বলা হয়নি যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) কোন কোন বস্তু বাদ দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ বিপদ থেকে শহরটিকে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। অতএব, সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে কারোর পক্ষে এ কথা দাবী করার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, তিনি ঐ নিরাপত্তার প্রশ্নে ও মুনাজাতে কোন কোন বিষয়কে বাদ রেখেছিলেন। তাফসীরকারগণ আরো বলেন, আবূ শুরায়হ্ (র.) ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে যা বলা হয়েছে এ দুটি হাদীছের সনদে এমন সব কারণ রয়েছে যে জন্য তা গ্রহণ করা যায় না। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের নিকট সঠিক কথা এই, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীছ অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নবী ও রাসূলের ভাষায় হারাম না করে মক্কা সৃষ্টি এবং আকাশ ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মক্কা শহরকে হারাম করে রেখেছিলেন। তবে তা কোন নবী-রাসূলের ভাষায় নয় এবং এ দ্বারা যারা মক্কার কোন অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা এবং মক্কা ছাড়া অন্যান্য স্থান ও সেখানকার অধিবাসীরা যেসব বিপদ-মুসীবতের কবলে পতিত হয়, সে সব থেকে একে এবং এর অধিবাসীদেরকে রক্ষা করাই ছিল এরূপ হুরমতের মূল উদ্দেশ্য। এমনিভাবে রক্ষিত হতে থাকে মক্কার এরূপ মর্যাদা, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা সেখানে তাঁর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে, তাঁর স্ত্রী হাজিরা (আ.) ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে সেখানে অবস্থান করতে বলেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রভুর নিকট মক্কার হুরমতকে তাঁর বান্দাদের উপর 'ফরয' হিসাবে নির্ধারিত করে দেওয়ার জন্য আবেগভরে প্রার্থনা জানান, যার ফলে তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিকুলের জন্য এটি একটি অনুসরণীয় সুন্নাতের মর্যাদা

পায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে অনুসরণীয় ইমাম নির্বাচিত করবেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করলেন এবং এ সময়ে এর হুরমত তাঁর বান্দাদের উপর ইব্রাহীম (আ.)-এর আবেদন অনুযায়ী 'ফরয' করে দিলেন। এরপর থেকেই যে মক্কা বান্দার জন্য কতক ফরয হিসাবে এযাবত অঘোষিত ছিল, তা পরবর্তীতে ইব্রাহীমের কথায় বান্দার উপর একটি ফরযকৃত বিশেষ মর্যাদার এলাকা হিসাবে নির্ধারিত হয়ে গেল এবং একে হালাল জানা, এলাকায় শিকার করা, গাছপালা কর্তন ও কোন প্রকারে বিনষ্ট করার নিষেধাজ্ঞাকে ওয়াজিব করা হলো। হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ.)-এর ভাষায় আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের একটি বিশেষ অংশকে পৌছিয়ে দেওয়া হলো, যা এ যাবত কোন নবী-রাসূলের কথায় প্রকাশিত হয়নি। এ কারণেই এর হারাম করার বিষয়কে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে সম্মানিত শহর হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কারণ যে মক্কার মর্যাদা পরবর্তীকালে বান্দার উপর ইবাদত হিসাবে অত্যাবশকীয় করা হয়েছে, তা ছিল ইতিপূর্বে বান্দার উপর চিরকালের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত ইবাদতের স্থান মক্কা শরীফের তত্ত্বাবধানের জন্য। এ কারণেই তাঁর মুনাজাত ছিল এর মর্যাদাকে তাঁরই ভাষায় বান্দার উপর ফরয করে দেওয়ার জন্য। উপরোক্ত আলোচনায় দু'টি হাদীছের অর্থে আমরা যা বর্ণনা করেছি, তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে গেল। হাদীছ দুটি—অর্থাৎ আবূ শুরায়হ ও ইব্‌ন 'আব্বাসের হাদীছ - যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মক্কাকে চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির দিন থেকেই হারাম করেছেন এবং অপরটি জাবির, আবূ হুরায়রাহ, রাফি' ইব্‌ন খুদায়জ এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীর হাদীছ -যাতে হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে আল্লাহ! হযরত ইব্রাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম করেছেন। আসলে এ দুটি হাদীছের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই, যেমন কোন কোন জাহিল মনে করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার পরে তার মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ জ্ঞান করা আদৌ বৈধ নয়। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এ দুটি হাদীছের বর্ণনাই স্পষ্টত ওযর-আপত্তির অবকাশ দেয় না। অধিকন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মুনাজাত ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم (হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট (ইব্রাহীম ১৪'৩৭)। যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, এ ছিল সৃষ্টিকুলের উপর ঘরটির সম্মানের 'ফরযিয়াত'। তাঁর মৌখিক কথায় আবশ্যিক করে দেওয়ার পূর্বের ঘটনা। তবে তদ্দ্বারা বরং আল্লাহ্‌র সেই সম্মানকে ধরে নিতে হবে যা ছিল মক্কাকে مسجد হিসাবে তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার সতর্ক করার জন্য—সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর সম্মানের আবশ্যকতা কায়েম করার জন্য নয়। আর যদি তাঁর এ মুনাজাত তাঁর মৌখিক ভাষায় আল্লাহ পাকের সম্মান দেওয়ার পরেরকার ঘটনা হয়ে থাকে, বা মানুষের উপর পালন করা কর্তব্য ছিল, তবে তো আমাদের কারুরই কোন প্রশ্ন বা বিতর্ক এ সম্পর্কে থাকতে পারে না।

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -এর ব্যাখ্যা:

কাফির ব্যতীত কেবলমাত্র ঈমানদার মক্কাবাসীদেরকেই ফলফলাদির রিয্‌ক দেওয়ার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট এ একটি মুনাজাত। এ মুনাজাত তিনি

কাফিরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্যই করেছিলেন। কেননা, এর পূর্বের মুনাজাতে তিনি যখন তাঁর সন্তানদের থেকে অনুসরণীয় ইমাম নির্বাচনের কথা বলেছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যেহেতু তাঁর সন্তানদের মধ্যে যালিম ও অসৎ লোকেরও উদ্ভব ঘটবে, সুতরাং তাঁর অঙ্গীকার বা নেতৃত্ব কাফির-যালিম লোকেরা পেতে পারে না। এ অবস্থায় তিনি যখন জানতে পারলেন অত্যাচারী কাফিররা নেতৃত্বের অযোগ্য বিবেচিত হবে, তখন ফল-মূলের জীবিকার এ প্রার্থনায় সতর্ক হয়ে কাফিরদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মক্কার মু'মিনদের কথাই বলেছেন। এ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমার এ দু'আ কবুল করলাম, তবে জীবিকার প্রশ্নে শহরের ঈমানদারদের সাথে কাফিরদেরকেও আমি রিয্ক দেব। অর্থাৎ সামান্য জীবিকা দেব। এখানে উল্লেখ্য, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী من آمن منهم بالله واليوم الآخر বাক্যে آمن শব্দ مفعول রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه (হে রাসূল! লোকেরা আপনাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাতে যুদ্ধ করার ব্যাপারে।) এর অর্থ তারা আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে প্রশ্ন করে। এবং যেমন বলেছেন ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য যে ব্যক্তি ব্যয়ভার বহনে সক্ষম।) এর অর্থ—যে ব্যক্তি ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, তার উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করা ফরয। এ ক্ষেত্রে ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর পরওয়ারদিগার আল্লাহ পাকের কাছে রুযীর জন্য ফরিয়াদ করেছিলেন তা এ কারণে যে, তিনি এমন এক অনুর্বর উপত্যকায় অবতরণ করেছিলেন, যেখানে ছিল না পানি, ছিল না কোন আপনজন। তাই আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন করলেন তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে ফলমূল দ্বারা যেন তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়। আর মানুষের মন যেন তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাঁর প্রতিপালকের নিকট এই ফরিয়াদ করলেন, তখন আল্লাহ পাক ফিলিস্তীন থেকে তায়িফকে বর্তমান স্থানে পৌঁছায়ে দিলেন।

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا-এর ব্যাখ্যা :

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, উক্তিটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁদের মতে এর ব্যাখ্যা এই: যে কাফির হবে, তাকে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত পার্থিব জগতের ফল-ফলাদির ন্যায় রিয্ক দিয়ে উপকৃত করব। এ মতের অনুসারীরা ব্যাখ্যাটিতে فامتعه قليلا শব্দের ت অক্ষরে تشديد দিয়ে এবং ع অক্ষরে পেশ (ُ) যোগে পাঠ করেন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা: আল্লাহ তা'আলার বাণী ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار এর ব্যাখ্যায় উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) বলেছেন, এ বাণীটি স্বয়ং আল্লাহ পাকের। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر আল্লাহ পাক তাঁর হুকুমের বিরোধীদেরকে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার

করেছেন, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হলেও। তবে তাকে রিযক দেবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: যারা কাফির আমি তাদেরকেও রুযী দেব, কেননা, আমি পুণ্যবান ও পাপী নির্বিশেষে সবাইকে রুযী দিয়ে থাকি, তবে যারা পাপী, তাদেরকে শুধু পার্থিব জগতের রিয্ক দান করব।

অন্য একদল ব্যাখ্যাকার বলেন-- একথাটি মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে কাফিরদের রিযকের ব্যাপারে আরযি পেশ করেছেন- যেভাবে মু'মিনদেরকে রিযক দেওয়া হয়, সেভাবে কাফিরদেরকেও যেন রিযক দেওয়া হয়। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে—তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য রিযক দেওয়া হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে فامتعه শব্দের ت অক্ষর হালকা, ع অক্ষর جزم (ْ) এর সঙ্গে উচ্চারিত হবে। যেমন فامتعه এবং اضطره শব্দে ر অক্ষরে যবর (َ) দিয়ে ثم اضطره- শব্দ দুটিকে একত্রে মিলিয়ে পড়তে হবে যাতে اضطره শব্দের আদ্যক্ষর الف বর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত না হয়। যেমন ثم اضطره—। এ মতের সমর্থকদের আলোচনা: আবুল 'আলিয়াহ (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন, এ ছিল হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর উক্তি, যদ্দারা তিনি কাফিরদেরকেও দুনিয়ার রিয্ক দান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মুজাহিদ (র.) ومن كفر فامتعه قليلا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা কাফির হবে, তাদেরকেও তুমি রিয্ক দিও, এরপরে তাদেরকে জাহান্নামের আযাবে ঠেলে দিও। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত পাঠ-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে আমাদের নিকট উবাই ইব্‌ন কা'বের পঠন-পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাই উত্তম। কারণ তা হাদীছ ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রমাণিত। আর এ পঠন-রীতির বিরুদ্ধে বর্ণনার সংখ্যা খুবই কম। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত কিরাআত ও ব্যাখ্যায় কোন আপত্তি বা প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয়। কেননা, বিরুদ্ধ বর্ণনায় ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এ অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইব্‌রাহীম! আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করলাম এবং আমি এ শহরের মু'মিন বাশিন্দাদেরকে ফলের রুযী দান করব এবং এখানকার কাফিরদেরকেও তাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত উপকৃত করব, অতঃপর তাদেরকে দোযখের আগুনের দিকে ঠেলে দিব।

এখানে فامتعه قليلا কথার অর্থ এই—আমি তাকে এখানে যে রুযী দান করব, তা হবে তার জীবনের এমন সম্পদ, যদ্দারা সে মৃত্যুকাল পর্যন্তই উপকৃত হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের এরূপ বলার কারণ এই, মক্কাবাসী মু'মিনদের রিয্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তাঁকে একথা বলেছেন। অতএব বুঝা গেল, উত্তরটিও ঠিক সে বিষয়েই, যা তিনি তাঁর প্রার্থনায় জানিয়েছিলেন—তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নয়। তবে আমরা যা বলেছি মুজাহিদ (র.)-এর বক্তব্যও তাই।

কেউ কেউ বলেন, কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ মনে করেন فامتعه قليلا কথার ব্যাখ্যা فامتعه بالبقاء في الدنيا অর্থাৎ যারা কুফরী করবে আমি তাদেরকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে উপকৃত করব। আর অন্যরা বলেন-- فامتعه قليلا অর্থ সে কুফরী করতে থাকলেও যতদিন সে মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন আমি তাকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে উপকৃত করব, যে পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ (স.) রাসূল হিসাবে প্রেরিত হবেন এবং তখনও যদি সে কুফরে লিপ্ত থাকে, তখন তিনি তাকে হত্যা অথবা সেখান থেকে তাকে নির্বাসিত করবেন। এ

ব্যাখ্যাটি যদিও কথা দৃষ্টে কোন রকমে ধরে নেওয়া সম্ভব, তবে কথাটির প্রকাশ্য ভাবধারা এর বিপরীত, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ -এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দেব এবং সেদিকে তাড়িয়ে নেব। যেমন তিনি জাহান্নামীদের উদ্দেশ করে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, يوم يدعون الى نار جهنم دعا (যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তূর ৫২/১৩) اضطر। শব্দ اضطرار শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ اكراه (বাধ্য করা)। আরবী ভাষায় বলা হয় اضطرت فلانا الى هذا الامر। — আমি অমুককে এ কাজে বাধ্য করলাম, এরূপ কথা তখনই বলা হয়, যখন কাউকে কোন কাজের দিকে বাধ্য করা হয় এবং কাজটি তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপ অর্থই এ ক্ষেত্রে ثم اضطره الى عذاب النار বাক্যটির। অর্থাৎ অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -এর ব্যাখ্যা:

আমরা প্রমাণ করেছি যে, بئس শব্দের মূল بَئِسَ যা بؤس শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর দ্বিতীয় বর্ণ জযমযুক্ত করে তার যের প্রথম বর্ণে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যেমন كبد থেকে كبد এবং অনুরূপ অন্যান্য শব্দ। وبئس المصير কথাটির অর্থ—দুনিয়ার সম্পদ ও উপকরণে আমি তাদেরকে উপকৃত করার পরে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর তা হবে তাদের জন্য নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তন-স্থল। আর مصير শব্দ مفعل-এর ওযনে। এ হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তির সেই স্থান, যেখানে কাফিররা ফিরে যাবে।

(১২৭) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

(১২৭) আর স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মাঈল কা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল। তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই সাধনা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط -এর ব্যাখ্যা:

قواعد শব্দ বহুবচন। এর একবচন قاعدة, যা قواعد البيت (ঘরের ভিত্তি) কথা থেকে গৃহীত। আর قواعد النساء অর্থ দুর্বল মহিলারা, যারা মাসিক ঋতুস্রাব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এর একবচন নিয়মিত ভাবে قاعدة না হয়ে قاعد যার مؤنث এর চিহ্ন تاء অতিরিক্ত বিবেচনায় লোপ করে দেওয়া হয়েছে, একারণে যে, এটা اسم فاعل। বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য যা قعدت عن الحيض। (আমি মাসিক ঋতুস্রাব থেকে বসে পড়েছি অর্থাৎ আমার মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে।) কথা থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এতে পুরুষদের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন বলা হয়, امراة طاهر وطامث। পবিত্রা ও পরিচ্ছন্না রমণী। এতে تاء تانيث (مؤنث এর প্রতীক চিহ্ন ة) ব্যবহৃত হয় না। কারণ এতে পুরুষের কোন অংশ বা সম্পর্ক নাই। যদি এ দ্বারা 'উপবেশন' ধরা হতো, যা 'দাঁড়ানো'র বিপরীত, তবে অবশ্যই قاعدة ব্যবহৃত হতো। আর এ প্রেক্ষিতে تاء تانيث লোপ করা বৈধ হতো না। আর قواعد البيت অর্থ, ঘরের ভিত্তি।

অতঃপর, ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ঘরের যে ভিত্তি নির্মাণ করছিলেন, সে সম্পর্কে ভাষ্যকারদের মধ্যে একাধিক মত বিদ্যমান। এখানে একটি প্রশ্ন হয়, সে ভিত্তিটি কি তাঁরা নতুনভাবে নির্মাণ করছিলেন, না আগের পুরান ভিত্তির উপর তাঁরা নির্মাণকার্য করছিলেন? এ প্রশ্নের সমাধানে মুফাস্‌সিরগণের একদল বলেন, এ ছিল সেই ঘরের ভিত্তি, যা নির্মাণ করেছিলেন মানবকুলের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে। এরপর কালক্রমে এর ভিত্তি ও স্থান পুরান হয়ে যায় এবং চিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে যায়, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ.)-কে সেখানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এরপরে তিনি এ ঘরটি নির্মাণ করেন।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা: 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রভু! আমি তো এখন আর ফেরেশতাদের আওয়ায শুনতে পাই না! আল্লাহ্ এ কথার উত্তরে বললেন, শুনতে পারছ না তোমার গুনাহের কারণে। তবে তুমি পৃথিবীতে নেমে যাও এবং আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর। এরপর এ ঘরের তওয়াফ কর। যেমন তুমি দেখেছ আসমানে ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করে। তাই লোকেরা ধারণা করছে, তিনি পাঁচটি পাহাড় থেকে প্রস্তর একত্রিত করে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন। এর নিম্নস্তর ছিল হেরা পর্বতের পাথর দ্বারা নির্মিত। এ ছিল আদম (আ.)-এর নির্মাণ। এরপর পরবর্তীকালে ইব্‌রাহীম (আ.) ঘরটি পুনর্নির্মাণ করেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت সম্পর্কে বলেন, কা'বাঘরের যে ভিত্তির কথা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, তা পূর্বেই ছিল। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, বরং এ ছিল সেই ঘরের ভিত্তি, যা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-এর জন্য আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। তিনি সেই ঘরের তওয়াফ করতেন। যেমন তিনি আসমানে আল্লাহ পাকের আরশের তওয়াফ করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় ঘরটি আসমানে উঠিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘরটির ভিত্তি পুনরায় স্থাপন করেন।

এ মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের কথা: ইব্‌ন 'আমর (র.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে বেহেশত থেকে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমার সাথে একটি ঘরও অবতরণ করব। যার চতুর্পার্শ্বে তওয়াফ করা হবে, যেমন তওয়াফ করা হয় আমার আরশের চারপাশে এবং যার নিকট নামায পড়া হবে, যেমন নামায পড়া হয় আমার আরশের নিকটে। এরপর হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় ঘরটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে নবীগণ সে

ঘরটিতে হজ্জ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না তার সঠিক অবস্থান, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে সেখানে বসবাসের স্থান করে দেন এবং তাঁকে ঘরটির সঠিক স্থান জানিয়ে দেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) পাঁচটি পাহাড় যথা হিরা, ছাবীর, লুবনান, তুর এবং খুমুর থেকে পাথর নিয়ে ঘরটি নির্মাণ করেন।

আবূ কালাবাহ (র.) বলেন, 'যখন হযরত আদম (আ.)-কে অবতরণ করা হয়,' এরপরে তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। 'আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন, তখন তাঁর পা দুটি ছিল যমীনে আর মাথা ছিল আসমানে। এ সময় তিনি আসমানবাসীদের কথাবার্তা ও দু'আ শুনতে পান। এতে তিনি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু ফেরেশতারা তাঁকে ভয় করছিলেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের দু'আ ও নামাযে আল্লাহ পাকের কাছে অভিযোগ করলেন। ফলে, তাঁকে পৃথিবীর দিকে নীচু করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি আসমানবাসীদের কথাবার্তা, যা তিনি ইতিপূর্বে শুনতেন, তা থেকে বঞ্চিত হলেন। তখন তিনি শংকিত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানালেন এবং নামাযেও অভিযোগ পেশ করলেন। এ সময় তিনি মক্কার দিকে মুখ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাঁর পা ফেলবার জায়গা ছিল একটি গ্রাম (গ্রাম পরিমাণ দূরত্ব)। দৌড়ে যাওয়ার মত ফাঁকা ছিল একটি ময়দান। এ ভাবে ভ্রমণ শেষ করে তিনি মক্কায় পৌঁছলেন। আল্লাহ তাআলা জান্নাতের য়াকূতের মধ্য থেকে একটি য়াকূত নাযিল করলেন। এ পাথরটি যে জায়গায় পড়ল, সেটিই কা'বাঘরের স্থান। এখানেই আজো কা'বাঘর বিদ্যমান আছে। হযরত আদম (আ.) এ ঘরের তওয়াফ করতে লাগলেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় আল্লাহ য়াকূত পাথরটি উঠিয়ে নেন। এখানেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী কালে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পাঠান এবং ঘরটি তিনি পুনরায় নির্মাণ করেন। বস্তুত এই হচ্ছে وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت (এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। সূরা হাজ্জ: ২৬) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা।

কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় অবতরণ করার সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কা'বাঘরও অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণের স্থান ছিল ভারতের কোন অঞ্চল। এ সময় তাঁর মাথা ছিল আসমানে আর পা দুটি ছিল পৃথিবীতে। তাঁর দেহের এমন বিরাট আকৃতি দেখে ফেরেশ্তারা ভীত হয়ে পড়লে, তাঁকে কমিয়ে ষাট গজ করা হলো। এতে ফেরেশ্তাদের কথাবার্তা ও তাস্বীহ্ শুন্তে না পাওয়ায় হযরত আদম (আ.) চিন্তিত হয়ে বিষয়টি আল্লাহ পাকের নিকট নিবেদন করলেন। আল্লাহ তা'আলা বল্লেন, হে আদম! আমি তোমার সাথে এমন একটি ঘর পাঠিয়েছি যাকে তুমি তওয়াফ করবে। যেমন তওয়াফ করা হয় আমার আরশের চারদিকে। তুমি তার পাশে নামায পড়বে, যেমন নামায পড়া হয় আমার আরশের নিকটে। এরপর হযরত আদম (আ.) ঘরটির দিকে যান। চলার পথে তাঁর পায়ের ধাপ দীর্ঘ করা হয়। এতে তাঁর দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের দূরত্বের সমান। এ দূরত্ব পরবর্তী সময়ের জন্যও স্থায়ী হয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) ঘরটির নিকটে পৌঁছেন এবং তওয়াফ করতে থাকেন এবং এভাবে তাঁর পরবর্তী নবীগণও ঘরটির তওয়াফ করেন। আব্বান (র.) থেকে বর্ণিত যে, ঘরটি যখন অবতরণ করা হয়, তখন তার আকার ছিল একটি য়াকূত পাথর বা একটি মোতির মত। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন, তখন তা উঠিয়ে নেন।

কিন্তু তার ভিত্তি থেকে যায়। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে সেখানে বসবাস করার জন্য ঠিকানা করে দেন। এখানেই তিনি ঘরটি পুনরায় নির্মাণ করেন।

কেউ কেউ বলেন: ঘরটি ছিল একটি লাল টিলার উপর। এক গম্বুজের আকৃতিতে। কারণ, আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবী সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন পানির উপর লাল অথবা সাদা ফেনার সৃষ্টি হয়। এটাই ছিল বায়তুল্ হারামের স্থান। এরপর এর নীচ থেকেই পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত করে দেন। এভাবেই ছিল দীর্ঘদিন। এরপর আল্লাহ তা'আলা সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বসবাস করতে দেন। তিনি এর উপরই ভিত্তি করে কা'বাঘর নির্মাণ করেন। ব্যাখ্যাকারগণ আরো বলেন, এর ভিত্তি ছিল সপ্তম পৃথিবীতে চারটি স্তম্ভের উপর।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা: মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে কা'বাঘরের স্থানটি ছিল পানির উপরে। সাদা রঙের ফেনার ন্যায়। এর নীচ থেকেই পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়। 'আতা এবং আমর ইব্ন দীনার বলেন, আল্লাহ পাক এক প্রকার বাতাস পাঠালে পানি আন্দোলিত হওয়ায় ঘরের অবস্থান ক্ষেত্রে গম্বুজের মত একটি বস্তু বেরিয়ে পড়ে। এখান থেকেই কা'বাঘরের সৃষ্টি হয়। একারণেই একে أم القرى (গ্রামসমূহের বা দেশসমূহের মূল) বলা হয়। 'আতা (র) আরও বলেন, এরপর তা পর্বত দ্বারা (পেরেক বা খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে) মযবুত করা হয়, যাতে হেলে-দুলে কাত না হয়ে পড়ে। এ কাজে সর্বপ্রথম যে পাহাড়টি ব্যবহার করা হয়, সে হলো আবু কুবায়স পাহাড়। ইব্ন আব্বাস (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুনিয়া সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে কা'বাঘরের বুনিয়াদ পানিতে চারটি খুঁটির উপর স্থাপন করা হয়। এরপর ঘরের নীচ থেকে পৃথিবীকে বিস্তার করা হয়। 'আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র.) বলেন, লোকেরা মক্কায় একটি পাথর পেয়েছিল, যাতে লেখা ছিল, 'আমিই আল্লাহ, কা'বাঘরের মালিক, আমি যেদিন চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছি, সেদিনই কা'বাকে নির্মাণ করেছি এবং সাতজন ফেরেশতা দিয়ে কা'বাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছি। মুজাহিদ (র.) ও অন্যান্য বিদ্বানগণের রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইব্রাহীম (আ.)-কে কা'বাঘরের অবস্থান ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিলেন, তখন তিনি সিরিয়া থেকে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মা হাজিরা (আ.)। এ সময় ইসমাঈল (আ.) ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু আর তাঁর সাথে ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। তিনি তাঁদেরকে কা'বা শরীফে এবং হারাম শরীফের সীমানা দেখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বের হলেন। আর জিবরাঈল (আ.) ও তাঁর সাথে বের হলেন। তখন কোন এলাকা অতিক্রম করার সময় তিনি বলতেন, হে জিবরাঈল! এ এলাকার জন্যই কি আমি আদিষ্ট হয়েছি? জিবরাঈল (আ.) বলতেন, এগিয়ে চলুন। এভাবে চল্তে চল্তে তাঁরা অবশেষে মক্কায় এসে পৌঁছলেন। তখনকার দিনে মক্কায় কন্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল এবং বাবলা বৃক্ষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মক্কার বাইরে আমালীক নামে পরিচিত গোত্রের লোকেরা তা দেখাশোনা করত। কা'বাঘরটি ছিল একটি লাল টিলার উপরে অবস্থিত। ইব্রাহীম (আ.) জিব্রাঈল (আ.)-কে আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখানেই কি আমাদেরকে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? এবারে তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে নিয়ে হাজারে আস্ওয়াদের কাছে নামিয়ে দিলেন এবং হাজিরা (আ.)-কে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং নিম্নোক্ত দু'আ

করলেন। কুরআনের ভাষায় ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم আয়াতটি لعلهم يشكرون পর্যন্ত পাঠ করলেন। অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে চাষাবাদের অযোগ্য একটি উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিয়েছি। হে পরওয়ারদিগার! যাতে তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলের দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।" সূরা ইবরাহীমঃ ৩৭)। ইব্‌ন ইসহাক ও কতিপয় মুফাস্‌সির মনে করেন, (আর আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন) পবিত্র কা'বাঘরের প্রাচীর উঠানোর পূর্বে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মা হাজিরা (আ.)-কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন, তখন কোন এক ফেরেশতা হযরত হাজিরার নিকটে এসে ঘরটির দিকে ইশারা করে বললেন, এটাই পৃথিবীর প্রথম নির্মিত ঘর, আর এটাই بيت الله العتيق —আল্লাহ্‌র পুরান ঘর। তুমি জেনে রেখো, ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল উভয়ে এ ঘরের প্রাচীর তুল্‌বেন। বস্তুত আল্লাহ্‌ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছু সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা কা'বাঘরের স্থান সৃষ্টি করেছিলেন। এর স্তম্ভগুলো সপ্তম পৃথিবীতে ছিল। কা'ব (রা.) বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে ঘরটি পানির উপরে ফেনার মত ছিল। এ থেকেই পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আর্মেনিয়া থেকে আসার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল সাকীনা নামক ফেরেশতা। তিনি ঘর নির্মাণ বা স্থান নির্দেশনার ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন। যেমন মাকড়সা তার ঘর তৈরি করে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, ফেরেশতা পাথর দিয়ে প্রাচীর তোলেন। যা বহন করা তিরিশ জন লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল অথবা ছিল না। বর্ণনাকারী আরো বলেনঃ আমি বললাম—"হে মুহাম্মদের পিতা! আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, واذ يرفع ابراهيم القواعد —হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) কা'বাঘরের প্রাচীর তুলেছেন। (আর আপনি বলছেন, ফেরেশতা পাথর দিয়ে প্রাচীর তোলেন!) উত্তরে তিনি বললেন, ইব্‌রাহীমের প্রাচীর তোলার কাজ পরের ঘটনা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতামতের মধ্যে আমাদের নিকট এ কথা বলাই সঠিক হবে যে, আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আ.) উভয়েই কা'বাঘরের প্রাচীর তুলেছেন। কাজেই সে قواعد (প্রাচীর কিংবা ভিত্তি) সে ঘরেরও হতে পারে, যা আদম (আ.) দুনিয়ায় প্রেরিত হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল এবং যা মক্কায় বায়তুল হারামের স্থানে অবস্থিত। আর যে গম্বুজের কথা 'আতা (র.) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, ঘরটি আল্লাহ তা'আলা পানির ফেনা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাও হতে পারে। এ কথাও মেনে নেওয়া সঙ্গত যে, ঘরটির নিম্নস্তর বা মেঝে আকাশ থেকে নাযিলকৃত য়াকূত পাথর বা মোতি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটাও গ্রহণ করা যায় যে, ঘরটি আদম (আ.)-ই প্রথম তৈরি করেন এবং পরবর্তীকালে ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়ে পুরান ভিত্তির উপর প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করেন। বিষয়-গুলোর কোন্‌টি কোত্থেকে কিরূপ গ্রহণ করল এ সম্পর্কে আমাদের সঠিক ও নিশ্চিত কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে প্রাপ্ত কোন হাদীছ ব্যতিরেকে প্রকৃত ঘটনা কি, তা আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। অতএব, আমরা যা বলেছি, তা যথার্থতার দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا-এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন কা'বাঘরের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা দু'আ করছিল, ربنا تقبل منا—'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন।' এ ব্যাখ্যাটি ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর পঠনরীতি অনুযায়ী এবং তাফসীরকারগণের একটি দলের অভিমতও এই।

সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে কা'বাঘর নির্মাণ করছিলেন এবং যে সব কালিমাহ দ্বারা ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাঁরা সে সব কথা দ্বারা দু'আ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর কথাগুলো ছিল এইঃ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ○ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك — ربنا وابعث فيهم رسولا منهم (হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশ থেকে আপনার অনুগত একটি দলের সৃষ্টি করুন। আর হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য থেকেই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণের সময় বলেছিলেন, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।) বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘাড়ে পাথর বহন করছিলেন, আর বৃদ্ধ পিতা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যাঃ 'স্মরণ কর সে সময়ের ঘটনা, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এ সময় তারা উভয়ে দু'আ করছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন।'

অন্যান্য তাফ্‌সীরকার বলেনঃ দু'আ করেছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। এ মতানুসারে আয়াতাংশের ব্যাখ্যাঃ স্মরণ কর, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন এবং স্মরণ কর, যখন হযরত ইস্‌মাঈল (আ.) বল্‌ছিলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। এখানে পরবর্তী বাক্যের কর্তা হযরত ইসমাঈল (আ.)— হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) নন।

তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কা'বাঘরের ভিত্তি কে উত্তোলন করেছেন? অবশেষে তাঁরা একমত হয়েছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা এ মহান কাজ করেছেন। এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) পথ চলতে চলতে মক্কা শরীফে এসে পৌঁছেন এবং তিনি ও ইসমাঈল (আ.) উভয়ে কোদাল হাতে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, ঘরটি কোথায়। এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার বাতাস প্রেরণ করলেন। তাকে বলা হতো 'রীহুল খাজূজ'। এর দুটি ডানা ও সাপের আকৃতির একটি মাথা ছিল। এ প্রাণীটি পবিত্র কা'বার ভিত্তির নিকটে স্থান নিল। আর

ইব্রাহীম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) উভয়ে কোদাল হাতে তার অনুসরণ করলেন এবং খুঁড়তে লাগলেন। এভাবে তাঁরা ভিত্তি স্থাপন করলেন। এ ঘটনারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم শীর্ষক আয়াতে। যার অর্থ—স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাঘরের স্থান নির্দেশ করেছিলাম। এভাবে যখন তাঁরা উভয়ে ভিত্তি নির্মাণ করে রুক্‌ন (হাজারে আস্‌ওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমাকে একটি অতি উত্তম পাথর খুঁজে এনে দাও, যা আমি এখানে স্থাপন করব। ইসমাঈল (আ.) বললেন, হে আব্বাজান! আমি বড় ক্লান্ত। তিনি বললেন, তবুও। এরপর হযরত ইসমাঈল (আ.) একটি পাথর এনে দিলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) এ পাথরটি পসন্দ করলেন না। তিনি বললেন, এর চাইতেও সুন্দর পাথর চাই। ইস্‌মাঈল (আ.) আবার পাথরের খোঁজে বের হলেন। ইতিমধ্যে ফেরেশতা জিব্‌রাঈল (আ.) হিন্দুস্তান থেকে 'হাজারে আসওয়াদ' নিয়ে ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকটে উপস্থিত হলেন। এটা ছিল ধব্‌ধবে সাদা রঙের একটি মূল্যবান সুদৃশ্য য়াকূত পাথর। জান্নাত থেকে পতনের সময় এ পাথর আদম (আ.)-এর সঙ্গে ছিল। এর রং মানুষের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে তাদের উপর্যুপরি স্পর্শের কারণে কালক্রমে কালো হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ইসমাঈল (আ.) অপর একটি পাথর নিয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটি দেখে বলেন, পিতঃ। কে আপনাকে এ পাথর এনে দিল? এর উত্তরে ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, যিনি তোমার চাইতে অধিক তৎপর। এরপর তাঁরা উভয়ে কা'বা শরীফের নির্মাণ কাজ সমাধা করলেন।

'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র আল্‌ লায়ছী (র.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) উভয়েই কা'বাঘরের ভিত্তি নির্মাণ করেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই পবিত্র ঘরটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আর হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর এগিয়ে দিয়ে নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। এ মতের সমর্থনে আলোচনাঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, একদা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-এর নিকট এসে দেখলেন, তিনি যমযম কূপের ধারে বসে তীর মেরামত করছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁকে দেখে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ালেন। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে যেমন সাদর সম্ভাষণ জানায় তাঁরা উভয়ে উভয়ের প্রতি তদ্রূপ অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন, ইসমাঈল! আল্লাহ পাক আমাকে একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে কাজের হুকুম দিয়েছেন, তা করে ফেলুন। ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আ.) উত্তর দিলেন, করব। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এবার বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছেন, এই বলে কা'বার দিকে ইশারা করলেন। এ সময় কা'বা পার্শ্ববর্তী স্থান নিয়ে উচ্চভূমিতে অবস্থিত ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময়েই তাঁরা উভয়ে পবিত্র ঘরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, ইসমাঈল (আ.) পাথর আন্‌তে থাকেন আর হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। যখন প্রাচীর উপরে উঠে যায়, তখন এ পাথরটি আনা হলো। তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যান, আর ইসমাঈল (আ.) পাথর এগিয়ে দিতে থাকেন। এ সময়ে তাঁরা বল্‌ছিলেন ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন)। এমনিভাবে তিনি পবিত্র ঘরটির চারদিকে ঘোরেন।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) এক সময় এসে দেখেন, ইসমাঈল (আ.) 'যমযমের' ধারে বসে তীর মেরামত করছেন। তিনি বল্লেন, ইসমাঈল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতিপালক। তিনি একটি ঘর নির্মাণের জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) বল্‌লেন, আপনার প্রতিপালক যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তা শুরু করুন। ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, তিনি তাঁর এ কাজে আমার সাহায্য করার জন্য তোমাকেও আদেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) জানালেন, আমি তা করব এবং তিনি পরে তাঁর সঙ্গে এ কাজে শরীক হন। এমনিভাবে তিনি ঘরের কাজ করতে থাকলেন আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর সরবরাহ করে সাহায্য করতে লাগলেন। এ সময় তাঁরা উভয়ে বল্‌ছিলেন, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন)।

অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, পবিত্র ঘরটির ভিত্তি একমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই তুলেছিলেন। কেননা, ইসমাঈল (আ.) এ সময় ছোট্ট বালক ছিলেন। এ মতের সমর্থনে আলোচনাঃ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাঘর নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হন, তখন তাঁর সঙ্গে ইসমাঈল (আ.) ও বিবি হাজিরা (আ.) রওয়ানা হন। যখন তাঁরা মক্কায় এসে পৌছেন, তখন তাঁরা ঘরটির স্থানে মাথার উপরে মেঘের মত দেখতে পান। সেটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সম্বোধন করে বলল: হে ইবরাহীম! আমার ছায়ায় আমার আন্দাজে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং এতে কম-বেশী কর না। এরপর ঘরটির নির্মাণ শেষ করে তিনি যখন ইসমাঈল (আ.) ও হাজিরা (আ.)-কে সেখানে রেখে চলে যান, তখন হাজিরা (আ.) বললেন, ইবরাহীম! তুমি কার তত্ত্বাবধানে আমাদেরকে ফেলে যাচ্ছ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে। হাজিরা (আ.) বল্‌লেন, তাহলে তুমি চলে যাও, তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইসমাঈল (আ.) অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। হাজিরা (আ.) 'সাফা' পর্বতের উপরে উঠে তাকান, কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। এরপর 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠে তাকান এবং সেখানেও কিছুই না দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। আবার সাফা পর্বতে যান। এবারেও তাকান, কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। এমনিভাবে সাতবার আসা-যাওয়া করেন। এর পর বলেন, 'হে ইসমাঈল! আমি মরে যাচ্ছি, আমি আর তোমাকে দেখতে পাব না'। একথা বলার পর তাঁর কাছে ফিরে এসে দেখেন, পিপাসায় অস্থির হয়ে শিশু ইসমাঈল তার পা নাড়া-চাড়া করছে। এ সময় জিব্‌রাঈল (আ.) হাজিরা (আ.)-কে বললেন, তুমি কে? তিনি উত্তর দেন, আমি হাজিরা, ইবৃরাহীমের স্ত্রী, ইসমাঈলের মা। জিবৃরাঈল (আ.) বললেন, কার তত্ত্বাবধানে তিনি তোমাদেরকে এখানে রেখে গেছেন? হাজিরা (আ.) বললেন, আল্লাহ্ পাকের তত্ত্বাবধানে। জিব্‌রাঈল (আ.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যার কাছে তোমাদেরকে সঁপে গেছেন, তিনিই যথেষ্ট। এরপর দেখা গেল, শিশু ইসমাঈলের পায়ের আঙ্গুলের নাড়া-চাড়া ও উপর্যুপরি ঘর্ষণের ফলে যমযমের পানির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। হাজিরা সে (আ.) পানি ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন। এতে জিব্‌রাঈল (আ.) বল্‌লেন, ছেড়ে দাও। কেননা, এর প্রবাহ চল্‌তে থাকবে।

খালিদ ইব্‌ন 'আর'আরাহ (র.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কোন লোক 'আলী (রা.)-এর নিকটে এসে বল্‌ল, 'আপনি আমাকে কা'বাঘরের কিছু বিবরণ দেন। ঘরটি কি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বল্‌লেন, না, বরং সেটাই সর্বপ্রথম ঘর, যা নির্মিত হয়েছে বরকতের মধ্যে মাকামে ইব্‌রাহীমে, অর্থাৎ ঘরটিতে বরকত বা প্রাচুর্য নিহিত রয়েছে এবং এতে রয়েছে মাকামে

ইব্রাহীম। যে লোক এখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে। তবে ঘরটি নির্মাণের ইতিহাস এই ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ঘর নির্মাণের জন্য ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট ওয়াহী পেশ করলেন। এতে ইব্রাহীম (আ.) বিব্রত বোধ করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাকীনা নামে ফেরেশ্তা পাঠালেন, যা ছিল ريح الخجوج নামে কথিত এক প্রকার বাতাস, যার দুটি মাথা ছিল। এর একটি তার সঙ্গী হয়ে মক্কায় পৌঁছল। এরপর সাকীনা সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘরটির অবস্থান ক্ষেত্রে স্থান গ্রহণ করল। যে জায়গায় সাকীনা আশ্রয় নিয়ে থেমে গেল, সেখানেই ইব্রাহীম (আ.)-কে ঘরটি তৈরি করার আদেশ দেওয়া হলো। তিনি এ নির্দেশ অনুসারে ঘরটি নির্মাণ করলেন। কিন্তু একটি মাত্র পাথর পরিমাণ জায়গা বাকী রয়ে গেল। তাঁর ছেলে স্থানটি পূরণের জন্য কোন বস্তু খুঁজতে গেল। এতে ইব্রাহীম (আ.) তাকে নিষেধ করে বললেন, আমাকে একটি পাথরই খুঁজে এনে দাও। যা আমি তোমাকে আদেশ করছি তাই কর। এ নির্দেশে পুত্র পাথরের খোঁজে বের হয়ে গেলেন। এরপর পাথর নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, ইব্রাহীম (আ.) হাজারে আসওয়াদকে তার স্থানে জুড়ে দিয়েছেন। এ ঘটনা দেখে অবাক হয়ে তিনি বল্লেন, পিতা! কে আপনাকে এ পাথর এনে দিল? তিনি উত্তরে বল্লেন, যিনি নির্মাণ কাজে তোমার সাহায্যের ভরসা করেন না। এ পাথরটি আসমান থেকে জিব্রাঈল (আ.) এনে দিয়েছেন। এরপর তাঁরা দু'জনেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

সাম্মাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন 'আর'আরাকে 'আলী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

খালিদ ইব্ন 'আর'আরা (র.) আলী (রা.) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমা'ঈল (আ.) উভয়েই প্রাচীর তুলেছেন, অথবা কেউ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) একাই প্রাচীর তুলেছেন, আর ইসমা'ঈল (আ.) তাঁকে পাথর এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কা'বাঘরের প্রাচীর বা ভিত্তি নির্মাণের সময় ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) প্রার্থনায় বলেছিলেন ربنا تقبل منا.... — । আয়াতাংশে هما يقولان (তারা উভয়ে বল্ছিল) অথবা يقول (সে বলছিল) শব্দ উহ্য আছে। অতএব, মুনাজাত কি উভয়ের, না হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর? এব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ সম্পর্কে বলেন, এখানে উহ্য কথাটির দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়কে। এ অবস্থায় আয়াতের পূর্ণ ভাষা হবে, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم তবে এ ব্যাখ্যানুসারে এ-ও ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, উহ্য কথাটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ব্যতীত কেবলমাত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিংবা ইসমাঈল (আ.) ব্যতীত কেবলমাত্র ইব্রাহীম (আ.)-এর। যদি অধিকাংশ তাফ্সীরকার এ ব্যাখ্যা না দিতেন যে, উহ্য কথাটি ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েরই। কিন্তু যে ব্যাখ্যা হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, ইসমাঈল (আ.) নয়, বরং ইব্রাহীম (আ.)-ই প্রাচীরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সে অনুসারে উহ্য কথাটি বিশেষ করে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এরই হবে। আমাদের মতে সঠিক কথা এই, উহ্য কথাটি ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েরই এবং প্রাচীর তোলার কাজ যৌথ ও সম্মিলিত-ভাবে ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়েরই। কারণ, যদি ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) উভয়ে প্রাচীরের ভিত্তি উত্তোলন করে থাকেন, তবে তো আমরা যা বলেছি তাই ঠিক। আর যদি মনে করা হয় যে, নির্মাণের কাজ এককভাবে ইব্রাহীম (আ.)-ই করেছেন, আর ইসমাঈল

(আ.) পিতাকে পাথর এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন, তবে এ অবস্থায়ও তাঁরা দু'জনেই প্রাচীর উত্তোলনের কাজ করেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা, একজনের নির্মাণ আর অপর জনের পাথর এগিয়ে দিয়ে তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করার জন্য সাহায্য করা এই উভয় প্রকার কাজই নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু আরবরা যার কারণে ও সহযোগিতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে নির্মাণকারী বলতে আপত্তি করে না। এ ছাড়া সকল তাফসীরকারই এ ব্যাপারে একমত যে, যে কথাটি ইব্রাহীম (আ.)-এর বলে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে উল্লেখ করেছেন, তাতে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন আর তা হচ্ছে ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন।) এতে বুঝা গেল, ইসমাঈল (আ.) যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন হয় তিনি পূর্ণ-পরিণত যুবক ছিলেন, না হয় এমন একজন কিশোর ছিলেন, যে নিজের লাভ-লোকসানের বিষয় বুঝবার ক্ষমতা রাখতেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের যে বিধি-নিষেধগুলো তাঁর উপর বাধ্যতামূলক ছিল, সেগুলো সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এবং যেহেতু আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তাঁর পিতা কা'বাঘর নির্মাণ করছিলেন, তাই একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর পিতার সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন না। তা নির্মাণ কাজেই হোক, আর পাথর আনার ব্যাপারেই হোক। তবে যে কাজেই তিনি অংশ নিয়ে থাকুন না কেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণ কাজে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ভূমিকা ছিল। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, উহ্য কথাটি তাঁর ও তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে খবর স্বরূপ। তাহলে আলোচ্য কথাটির ব্যাখ্যা এই ঃ স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাঘরের প্রাচীর উত্তোলন করছিল, তখন তারা বলছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কবুল করুন আমাদের এ কাজ ও আমাদের আনুগত্য। আপনারই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে যে ঘর নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, সে আদেশ অনুসারে এ পবিত্র ঘর নির্মাণ কাজ শেষ করা পর্যন্ত আপনি আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা উভয়ে কা'বাঘরের প্রাচীর তোলার সময় বলছিলেন ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم — । এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের এ নির্মাণ এমন কোন বাসোপযোগী ঘরের জন্য ছিল না, যেখানে তাঁরা বাস করবেন এবং এমন কোন বাসভবনের জন্য ছিল না, যেখানে তাঁরা আয়েশ-আরামের জন্য অবস্থান করবেন। বরং এ ছিল এ কথারই প্রমাণ যে, তাঁরা ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রাচীর তুলে-ছিলেন সেই সব লোকের জন্য, যারা এখানে আল্লাহ্র 'ইবাদত করবে তাঁর নৈকট্য লাভের মানসে। এ কারণেই তাঁরা বলেছেন, ربنا تقبل منا (হে আমাদের প্রভু! আমাদের এ কাজ কবুল করুন)। যদি তাঁরা নিজেদের বসবাসের জন্যই ঘরটি নির্মাণ করতেন, তবে تقبل منا বলতেন না। কেননা, তদবস্থায় আল্লাহ্র নৈকট্য উদ্দেশ্য হতো না। এ কারণেই এ কথাটা যথার্থ ও সঙ্গত হতো না।

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ০-এর ব্যাখ্যা ঃ

একথার তাৎপর্য এই, প্রভু! আপনিই আমাদের বাসনা-কামনা শোনার জন্য একমাত্র শ্রোতা। আপনার আদেশ প্রতিপালনে আপনার আনুগত্যে ঘর নির্মাণের যে কাজ আমরা করে যাচ্ছি এক-

মাত্র আপনিই তা গ্রহণ ও মনযূর করবেন। এতে যে আনুগত্যের পরিচয় আমরা দিয়েছি, তাতে আমাদের অন্তরের দরদ ও ঐকান্তিকতা কেমন ও কি পরিমাণ ছিল, সে সম্পর্কে আপনিই একমাত্র ওয়াকিফহাল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতাংশের অর্থ ঃ আপনিই কবূল করুন। কেননা, নিশ্চিতরূপে একমাত্র আপনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

(١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ص وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

(১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার অনুগত উম্মতের সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ص - এর ব্যাখ্যা ঃ

একথাটিও আগের মতই ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আর একটি নিবেদিত প্রার্থনা, যা তিনি তাঁদের ভাষায় এখানে প্রকাশ করেছেন। কা'বাঘরের প্রাচীর নির্মাণকালের এ প্রার্থনায় বক্তব্য ছিল — প্রভু! আমাদের দু'জনকেই মুসলমান বানিয়ে দিন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও মুসলমানদের একটি দলের সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে আপনার হুকুমের পরিপূর্ণ বাধ্য ও অনুগত করে দিন, যেন আমরা আনুগত্যেও আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে শরীক না করি আর ইবাদতেও কাউকে অংশী না করি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, ইসলাম অর্থ সবিনয়ে আল্লাহ পাকের আনুগত্য। আর বিশেষ করে কেবল সন্তানদের মধ্য থেকেই মাত্র কিছু সংখ্যক মুসলমানের একটি দল সৃষ্টি করুন এ কথার তাৎপর্য এই, আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ.)-কে আগের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে কিছু লোক নাফরমান, অবাধ্য, যালিম ও সীমালংঘনকারী হবে। তারা তাঁর প্রতিশ্রুতির যোগ্য বিবেচিত হবে না। অতএব, তাঁরা এ প্রার্থনায় তাঁদের সন্তানদের এক অংশকে বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, এ প্রার্থনায় সন্তানদের কিছু সংখ্যক লোকের অর্থে তাঁরা কেবল আরবদেরকে বুঝিয়েছেন।

এমতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত যে, ومن ذريتنا امة مسلمة لك এ আয়াতাংশের দ্বারা তাঁরা আরবদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এর বিপরীত। কারণ, তাঁদের মুনাজাতে তাঁরা এ আরযী পেশ করেছেন যে, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে তাঁর অনুগত নেতৃত্বের যোগ্য বান্দা সৃষ্টি করেন। আর তাঁদের বংশধরদের

মধ্যে আরব-অনারব সকলেই ছিল। অতএব, তাঁদের সন্তানদের মধ্যেই আবার আরব-অনারবের শ্রেণীগত পার্থক্যের সৃষ্টি করে কোন দলকে রাখা আর কোন দলকে বাদ দেওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে امة শব্দ দ্বারা সেই সব লোককে বুঝায়, যারা জনগণকে ন্যায় ও সত্যের পথ-নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহ পাকের কালামেই রয়েছে মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে তার দৃষ্টান্ত ومن قوم موسى امة يهدون بالحق (মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল ছিল, যারা মানুষকে সত্যের দিকে হিদায়াত করত। সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৯)।

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا -এর ব্যাখ্যা ঃ

এ বাক্যটির পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ পাঠ করেছেন وارنا مناسكنا —যার অর্থ চোখে দেখা। অর্থাৎ হজ্জের ক্রিয়াকর্মগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে সাধারণত হিজায ও কূফাবাসীদের পাঠ-পদ্ধতি। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ ارنا শব্দের راء অক্ষরে যের না দিয়ে জযম দিয়ে পাঠ করেন। তারা مناسكنا শব্দের উপরোক্ত অর্থের বিরোধিতা করে বলেন, এর অর্থ مناسك الحج বা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম ও নিদর্শনাদি।

এমতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ ارنا مناسكنا। কথাটির ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হলো, আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়, আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া, মিনায় শয়তানকে পাথর মারা। এভাবেই আল্লাহ পাক তাঁর দীনকে পূর্ণ করেছেন। কাতাদাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, ارنا مناسكنا। অর্থ —আমাদের কুরবানী ও হজ্জের পদ্ধতি দেখিয়ে দিন। সুদ্দী (র,) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) কা'বাঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পবিত্র কুরআনের ভাষায় হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ واذن فى الناس بالحج (এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও। সূরা হজ্জ ঃ ২৭)। অতঃপর তিনি মক্কার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঘোষণায় বল্লেন, 'হে মানুষেরা! শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর ঘরের হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন।' ঘোষণার এ কথাটি প্রতিটি মু'মিনের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং মু'মিনসহ পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা কিংবা জীব-জন্তু যারাই এ আওয়ায শুনতে পেল, সকলেই সমস্বরে 'লাব্বায়েক,' 'লাব্বায়েক' বলে উত্তর দিল এবং তারা তাল্‌বিয়াহ্‌ অর্থাৎ 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' পাঠ করতে থাক্‌ল। এরপর তাঁর কাছে কেউ উপস্থিত হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরাফাত ও তাঁর পার্শ্ববর্তী স্থানে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এ আদেশ পেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যখন আকাবার নিকটস্থ গাছের কাছে পৌঁছলেন, তখন শয়তান তাঁর সম্মুখে আস্‌লে তিনি তাকে সাতটি পাথর মারলেন, আর প্রতিটি পাথর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আক্‌বার বললেন, যার ফলে শয়তান ছুটে পালিয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বার নিক্ষেপের সময়ও সে আবার তাঁর সম্মুখে এসে তাঁকে বাধা দিল। তিনি তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং তাক্‌বীরধ্বনি করলেন এবং সে দ্রুত পালিয়ে গেল। শয়তান তৃতীয় বার নিক্ষেপের সময় পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি এবারেও আগের মত তাকবীরধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ

করলেন। সে যখন বুঝতে পারল যে, সে আর ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে মুকাবিলায় টিক্তে পারছে না, আর ইব্রাহীম (আ.) এরপর কোথায় যাবেন তাও বুঝতে পারল না, তখন সে ক্ষান্ত হয়ে গেল। ইব্রাহীম (আ.) এরপর 'যাল্ মাজায(ذا المجاز) নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তার দিকে তাকালে তিনি আর তাকে দেখ্তে পাননি। তখন সে এড়িয়ে চলে যায়। এ কারণেই স্থানটি 'যাল-মাজায' (ذا المجاز) অর্থাৎ 'অতিক্রম করার স্থান' নামে অভিহিত হয়। এরপর ইব্রাহীম (আ.) 'আরাফাতে' গিয়ে উপস্থিত হন। স্থানটির দিকে লক্ষ্য করেন এবং নিদর্শনাদি দেখে চিন্তে পারেন। এ কারণেই স্থানটি 'আরাফাত' নামে অভিহিত হয়। এখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করার পর জাম' (جمع)-এর দিকে অগ্রসর হন। অতএব, এ স্থানটিকে 'মুয্দালিফা' নামকরণ করা হয়। এরপর জাম্'-এ অবস্থান করার পর আবার অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় প্রথম বারে যেখানে শয়তানের সাক্ষাত পেয়েছিলেন, সেখানে সে আবার এসে উপস্থিত হয়। তিনি তাকে সাতটি পাথর মারেন। এরপর 'মিনায়' অবস্থান করেন এবং এভাবে হজ্জক্রিয়া শেষ করেন এবং আল্লাহ্র আদেশ পালন করেন। এই হচ্ছে সেই মর্মকথা, যা ব্যক্ত করা হয়েছে وارنا مناسكنا আয়াতাংশে।

কেউ কেউ مناسك দ্বারা المذابح—অর্থাৎ 'যাব্হ-এর স্থান' অর্থ করেছেন। তাঁদের মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যাঃ হে প্রতিপালক! আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, কি ভাবে আমরা কুরবানী করব। এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ 'আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مناسكنا অর্থ আমাদের কুরবানীর জানোয়ার। অন্য এক সূত্রেও আতা (র.) থেকে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। মুজাহিদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অপর এক সূত্রে বর্ণিত, 'আতা (র.) বলেন, আমি 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়রকে বলতে শুনেছি, ارنا مناسكنا। অর্থ, আমাদেরকে যাবহ করার জায়গা দেখিয়ে দিন। কেউ কেউ ارنا مناسكنا-এর راء অক্ষরে জযম দিয়ে পড়েন। তারা ارنا-এর অর্থ করেন, আমাদেরকে জানিয়ে দিন। আলোচ্য শব্দটি চোখে দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আসওয়াদ ইব্ন রা'ফার-এর ভাই হাতায়িত ইব্ন রা'ফার-এর কবিতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়ঃ

ارینی جوادا مات هزلا لاننی + اری ما ترین او بخیلا مخلدا

এখানে ارینی শব্দ دلینی অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা চোখে দেখার অর্থ বুঝান হয়নি। এরূপ পাঠ-রীতি পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরের বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এমতের অনুসারীদের আলোচনাঃ 'আতা (র.) বলেছেন, ارنا مناسكنا। অর্থ, সেগুলো আমাদের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করুন যেন আমরা শিখতে পারি। 'আলী (রা.) ইব্ন আবী তালিব বলেছেন, ইব্রাহীম (আ.) কা'বাঘরের নির্মাণকাজ শেষ করে বললেন, فعلت اى رب فارنا مناسكنا (হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আদেশ পালন করেছি। আমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন বাতলিয়ে দিন।) এরপর আল্লাহ তা'আলা জিব্রাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ পালন করলেন।

حركت বা স্বরচিহ্ন সম্পর্কে কথা একই। যারা ارنا শব্দের راء অক্ষরে كسره বা 'যের' দেন, তারা 'যের'কে বিদূরিত ى অক্ষরের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেন। কেননা, নিয়মানুসারে ى অক্ষর حرف علت হওয়ায় তার বিলুপ্তি ঘটে এবং راء অক্ষরকে পূর্বাবস্থায় 'যের' বিশিষ্ট রেখে দেওয়া হয়। আবার যারা راء অক্ষরটিকে ساكن রাখেন, তারা মনে করেন راء অক্ষরে حركت

বা স্বরচিহ্ন দেওয়া তাকে ساكن রাখারই সমতুল্য। যেমন ব্যাকরণবিদগণ لم يكن ও لم يك শব্দ দুটির ব্যবহার উভয় রকমে শুদ্ধ ও নিয়মসঙ্গত বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তবে আয়াতে উল্লিখিত ارنا। শব্দের অর্থ চোখের দেখা বা অন্তরের উপলব্ধি উভয়ই হতে পারে। এই উভয় অর্থের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট করা ও উভয় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অর্থ হয় না।

আয়াতের مناسك শব্দটি বহুবচন। এর একবচন منسك-এর অর্থ সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের জন্য 'ইবাদত-বন্দিগী ও নেক 'আমল করা হয়। আর সেই নেক আমল কুরবানী, নামায, তওয়াফ, সা'ঈ ও অন্যান্য নেক 'আমল হতে পারে। এ কারণেই مشاعر الحج (হজ্জের নিদর্শনসমূহ)-কে হজ্জের مناسك (ক্রিয়াকর্ম) বলা হয়। কেননা, এগুলো এমন সব স্মৃতি-চিহ্ন বা নিদর্শন, যেগুলোতে মানুষ আকৃষ্ট হয় ও সংস্পর্শে আসতে অভ্যস্ত হয় এবং এগুলোর সন্দর্শন লাভ করার জন্য বারবার ফিরে আসে। মূলত আরবী ভাষায় منسك শব্দে যা বুঝায়, তা হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে যাতায়াত করতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। স্থানটিকে ভালবাসে। আরবী ভাষায় বলা হয় لفلان منسك—অমুক ব্যক্তির একটি منسك বা নির্দিষ্ট স্থান আছে। এমন কথা তখনই বলা হয়, যখন সে স্থানটিতে ভাল কিংবা মন্দের জন্য স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আকৃষ্ট ও চলাচল করতে অভ্যস্ত হয়। এ কারণেই مناسك الحج-কে مناسك নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এসব 'মানাসিক্' (مناسك) বা স্থানগুলোতে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই যাতায়াত ও দর্শন করতে অভ্যস্ত হয় এবং 'হজ্জ' ও 'উম্রাহ' পালন এবং যে সব আমল দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়, সেসব কাজের উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করে। এ ছাড়াও বলা হয় نسك অর্থ আল্লাহ্র ইবাদত। আর ইবাদতকারীকে ناسك নামে অভিহিত করা হয় এ কারণে যে, সে প্রচুর ইবাদতে রত থাকে। অতএব, এমতের প্রবক্তারা وارنا مناسكنا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এ ভাবে করেন যে, আমাদেরকে তোমার ইবাদত শিখিয়ে দাও। কেমন করে আমরা তোমার ইবাদত করব, কোথায় করব এবং কিসে তোমার সন্তুষ্টি, যা আমরা করব। এ মত নীতি ও অভিমত হিসাবে মেনে নেওয়া সম্ভব। তবে مناسك শব্দের ব্যাখ্যায় পূর্বে আমরা যা বলেছি, তাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো مناسك الحج। অর্থাৎ হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় আমল ও কার্যকলাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ কথাটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর ব্যক্তিগত প্রার্থনার বাইরের কথা। কিন্তু কথাটির (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك) সঙ্গে ومن ذريتنا কথা দ্বারা তাঁদের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদেরকে সংযুক্ত করে নিলেন। এতে তাঁরা প্রার্থনাকারী হিসাবে নয় বরং সংবাদদাতার ভূমিকায় পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। এ কথা এ জন্য বলা হলো যে, তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের বংশের মুসলমানদের জন্য পূর্বেই আগের আয়াতে এবং পরে অপর আয়াতে দু'আ করা হয়েছিল। আগের আয়াতে যা বলা হয়েছিল, তা ছিল ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك। (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'জনকে মুসলিম (অনুগত) বানিয়ে দিন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও একটি মুসলিম দল সৃষ্টি করুন।) এরপর তাঁদের প্রার্থনায় সন্তানদের মধ্যকার সৃষ্ট মুসলিম দলকে হজ্জের مناسك (ক্রিয়াকর্ম) বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ের সঙ্গে তাদের নিজেদের কথাও জুড়ে দিয়ে বললেন, وارنا مناسكنا (আমাদেরকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম বলে দিন) কথাটি। কিন্তু পরের আয়াতে যা বললেন, তা ছিল ربنا وابعث فيهم رسولا منهم (হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করুন।) আর এ দু'আ

বিশেষভাবে তাঁদের বংশধরদের জন্যই। অর্থাৎ রাসূল প্রেরণ তাঁদের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.)-এর পঠনরীতি অনুসারে وارنا مناسككم এর পরিবর্তে وارهم مناسككم পড়া হয়েছে। এর দ্বারা "আমাদের মুসলিম সন্তানদেরকে হজ্জের নিয়মাবলী বাতলিয়ে দিন" একথা বুঝান হয়েছে।

وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -এর ব্যাখ্যা ঃ

মূলত তাওবা অর্থ মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফিরে যাওয়া। বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দিকে তাওবার অর্থ, যা আল্লাহ পসন্দ করেন না, লজ্জা ও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তা থেকে ফিরে যাওয়া এবং তা বর্জন করা। এই ফিরে যাওয়ার মধ্যে অটুট ও দৃঢ়সংকল্প হওয়া। পক্ষান্তরে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাওবা বান্দার প্রতি তার অপরাধ মার্জনা করা। এ ভাবে দয়াপরবশ হয়ে গুনাহের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেওয়া বান্দার জন্য তাঁর এক বিশেষ অনুগ্রহ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাঁদের কি এমন কোন পাপ ছিল, যার ক্ষমার জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে এরূপ তাওবার দ্বারস্থ হয়ে তাঁর নিকট দু'আর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন? এ কথার উত্তর এ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি ব্যক্তিই তার প্রতিপালকের সাথে এমন কিছু আচরণ করে বসে, যে জন্য তার ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করার প্রয়োজন হয়। অতএব, পূর্বে প্রতিপালক ও তাঁদের মধ্যে এমন কিছু ঘটে থাকতে পারে, যার জন্য তাঁরা উপরোক্ত তাওবা করেছিলেন। তবে এ কাজের জন্য কা'বাঘরের প্রাচীর তোলা বা ভিত্তি নির্মাণের অবস্থা ও সময়টাকেই নির্বাচন করার তাৎপর্য ও কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দু'আ কবুলের জন্য এখানকার স্থানগুলোকে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আর তা এ কারণেও যে, তাকে পরবর্তী লোকদের জন্য একটি অনুসরণীয় সুন্নাত হিসাবে এটি প্রতিপালিত হবে এবং তারা এ নির্দিষ্ট ভূমিকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পাপ-মোচনের জন্য দু'আর স্থান হিসাবে গ্রহণ করে নেবে। প্রসঙ্গত এটাও মেনে নেওয়া সঙ্গত যে, وتب علينا কথা দ্বারা তাঁরা বুঝিয়েছেন—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সন্তানদের মধ্যে যেসব লোক যুলুম ও শিরকে লিপ্ত হবে বলে আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, তাদের দিকে আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ফিরে আসুন, যে পর্যন্ত না তারা আপনার আনুগত্যে ফিরে আসে। তবে এ প্রেক্ষিতে দু'আর প্রকাশ্য বক্তব্য তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত। আর অন্তর্নিহিত কথা তাঁদের সন্তানদের জন্য। যেমন বলা হয়, واكرمنى فلان فى ولدى واهلى (অমুক ব্যক্তি আমার সন্তান ও পরিবারের ব্যাপারে আমাকে সম্মানিত করেছে।) আবার কেউ কোন ব্যক্তির পুত্রকে সম্মান প্রদর্শন করলে, সে ব্যক্তি বলে, ব্যক্তিটি তাকেই সম্মান করেছে (برنى فلان اذا بر ولده)।

انك انت التواب الرحيم —আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। আপনি নিজ রহমতে যাকে ইচ্ছা ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেন, যাকে ইচ্ছা আপনার মেহেরবানীতে আপনার রোষ ও অসন্তোষ থেকে রেহাই দিয়ে থাকেন।

(১২৯) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

(১২৯) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে আপনার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

এ কথাটি বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দু'আ। আর এ দু'আ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমি আমার পিতামহ ইব্‌রাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং 'ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ। এ সম্পর্কে খালিদ ইব্‌ন মি'দান আল্-কালাঈ (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কয়েকজন সাহাবা বল্লেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, হাঁ, আমি আমার পিতামহ ইব্‌রাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং 'ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ। 'ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ আস্-সালমী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আমি সর্বশেষ নবী। আল্লাহ পাকের নিকট পবিত্র কুরআনে তা লিপিবদ্ধ। আর নিশ্চয়ই আদম (আ.) তাঁর স্বভাবেই তৈরী। আমি অবিলম্বে এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলব, আমি আমার পিতামহ ইব্‌রাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং 'ঈসা (আ.)-এর জাতির নিকট তাঁর প্রদত্ত সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের একটি স্বপ্ন। 'ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ আস্-সালমী (রা.)-এর রিওয়ায়াতে নবী (স.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন। আর এ বিষয়ে আমি যা বললাম, তা তাফসীরকারগণের এক দলের অভিমত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের বাণী ربنا وابعث فيهم رسولا منهم এই আয়াতে যে দু'আ রয়েছে, তা কবুল করে তদনুযায়ী আল্লাহ পাক রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাঁর চেহারা-ছবি ও বংশ-পরিচয় সম্পর্কে তারা অবগত ছিল, যিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে গেলেন আর তিনি তাদেরকে পরম প্রশংসিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে হিদায়াত করতেন। সুদ্দী (র.) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এ আয়াতে যাঁর কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনিও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে রাসূলের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তারপর তাঁকে বলা হয় ঃ এই মুনাজাত কবুল করা হয়েছে। আর তিনি শেষ যামানায় আগমন করবেন। আর আল্লাহ পাক তাঁর বাণীতে নবী (স.) সম্পর্কেই বলেছেন, يتلوا عليهم ايتك —হে আল্লাহ পাক! যে কিতাব আপনি তাঁর নিকট ওয়াহীরূপে প্রেরণ করবেন, তিনি তা মানুষকে পাঠ করে শুনাবেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

কিতাব অর্থে এখানে কুরআন মাজীদকে বুঝান হয়েছে। কুরআনকে কিতাব কেন বলা হয়েছে, তা বিগত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফসীরকারগণের এক দলের অভিমতও তাই। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الكتاب। يعلمهم-এ উল্লিখিত কিতাব অর্থ 'আল-কুরআন'।

এরপর حكمة শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, হিকমাত অর্থ 'সুন্নাত'। এমতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিকমাত অর্থ সুন্নাত। অন্যরা বলেন, হিকমাত অর্থ দীন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। এ মতের সমর্থনে আলোচনা ঃ ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিকমাত শব্দটি সম্পর্কে মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হচ্ছে দীনের পরিচিতি এবং দীন সম্পর্কে জানা, গবেষণা করা ও অনুসরণ করা। ইব্‌ন যায়দ (র.) হিক্‌মত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ দীন, যা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.) ব্যতীত অন্য কারো শিক্ষা দ্বারা বুঝা যায় না। একমাত্র তিনিই এর শিক্ষা দিতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, হিক্‌মাত হচ্ছে দীনের জ্ঞান। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا। (যাকে হিক্‌মাত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বাকারা ২/২৬৯)। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে বলা হয়েছিল ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (এবং তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল। আলে ইমরান ৩/৩৮)। বর্ণনাকারী বলেন, এবং ইব্‌ন যায়দ পাঠ করেন واتل عليهم نبأ الذى اتينه ايتنا فانسلخ منها। (হে নবী ! আপনি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত তিলাওয়াত করে শুনান, যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ। এরপর সে তা বর্জন করে। আরাফ—৭/১৭৫)। বর্ণনাকারী এরপর বলেন, এর অর্থ তারা সেসব আয়াত দ্বারা উপকৃত হয় নাই, যেহেতু তাদের মধ্যে 'হিক্‌মত' ছিল না। রাবী বলেন, 'হিকমাত' এমন বস্তু, যা আল্লাহ্ পাক মানুষের অন্তরে দান করেন এবং তদ্দ্বারা তাকে আলোকিত করেন। তবে 'হিক্‌মাত' সম্পর্কে আমাদের ধারণায় সঠিক ব্যাখ্যা এই ঃ 'হিকমাত' আল্লাহ্‌র যাবতীয় হুকুম সংক্রান্ত এমন জ্ঞান, যা রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর প্রদর্শিত প্রমাণ এবং নযীর ব্যতীত অপর কারো বর্ণনা দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে حكمة শব্দ حكم হতে উদ্ভূত, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী (যেমন جلوس থেকে جلسة এবং قعود থেকে قعدة)। এ থেকেই বলা হয়, ان فلانا لحكيم بين الحكمة (অমুক ব্যক্তি হিকমাতের ক্ষেত্রে حكيم বা জ্ঞানী), যদ্দ্বারা কথা ও কাজে সে সঠিক এ কথা বুঝায়। অতএব, আয়াতটির ব্যাখ্যা এই হবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবে এবং আপনার যে কিতাব তাদের উপর নাযিল করবেন, তা তাদেরকে শিক্ষা দিবে। আর হক ও বাতিলের সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ ছাড়া অন্যান্য হুকুম-আহকাম যেগুলো আপনি তাকে শিক্ষা দিবেন, সেসবও সে তাদেরকে শিখাবে।

وَيُزَكِّيْهِمْ ط-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণাদিসহ বলেছি যে, এর মূল শব্দ تزكية — যার অর্থ পবিত্রকরণ। আর زكوة অর্থ প্রবৃদ্ধি, বর্ধন, আধিক্য, প্রাচুর্য ইত্যাদি। অতএব, এ ক্ষেত্রে يزكيهم অর্থ

আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে তাদেরকে পবিত্র করবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে তাদেরকে বাড়িয়ে তুলবে। যেমন প্রমাণ স্বরূপ, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় يتلوا عليهم ايتك ويزكيهم আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, زكوة অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ঐকান্তিকতা। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেছেন, এর অর্থ— তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করবে।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝-এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ হে প্রতিপালক ! আপনি প্রবল পরাক্রমশালী, যাঁর ইচ্ছাকে কেউ বা কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না। অতএব, আমরা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য আপনার কাছে যা চেয়েছি, তা দান করুন। আপনি এমন হাকীম ও জ্ঞানময়, যাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনায় কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই। অতএব, যা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য লাভজনক ও ফলপ্রসূ, তা আমাদেরকে দিয়ে দিন। এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, আর আপনার অফুরন্ত ভাণ্ডারেও কোন ঘাটতি পড়বে না।

(١٣٠) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলছেন যে, কে এমন ব্যক্তি, যে ইব্‌রাহীমের ধর্মীয় মতাদর্শ থেকে বিমুখ হবে। কে এমন লোক, যে ইবরাহীমের ধর্মে বিরাগভাজন হয়ে তা পরিত্যাগ করবে— অপর কোন ধর্মে আকৃষ্ট হবে। একথায় আল্লাহ্ তা'আলা য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বুঝিয়েছেন। এ কারণে যে, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে য়াহূদী ও খৃস্টীয় মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এ কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে যে, ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ধর্মই একমাত্র এবং একনিষ্ঠ মুসলিম ধর্ম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما (ইবরাহীম য়াহূদীও ছিল না, আর নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আলে ইমরান ঃ ৩/৬৭)। অতএব, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন—ইব্‌রাহীমের একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্ম বাদ দিয়ে যে লোক অপর কোন ধর্ম অবলম্বন করে, সে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, য়াহূদী ও নাসারারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে নতুন ধর্ম য়াহূদী ও নাসরানী মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ পাকের

পক্ষ থেকে যার কোন স্বীকৃতি নাই। এভাবে তারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর একনিষ্ঠ ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, যা ছিল সকল ধর্মের সারাংশ। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে দীন দিয়ে প্রেরণ করেন। রবী' (ربيع) (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, য়াহূদী ও নাসারারা মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং য়াহূদিয়্যাত ও নাস্‌রানিয়্যাত নামে নতুন ধর্মের সৃষ্টি করল। যার আদৌ কোন স্বীকৃতি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নাই। আর এ ভাবে তারা ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ধর্ম ইসলাম বর্জন করল।

إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط -এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, 'কেবল সেই ব্যক্তি যার অন্তঃকরণ বোকা হয়েছে।' سفه শব্দের অর্থ অজ্ঞতা। অতএব, আয়াতের অর্থ এই : ইবরাহীমের একনিষ্ঠ ধর্ম থেকে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই বিমুখ হবে, যে নিজের পরকালের লাভ-লোকসানের অংশগ্রহণে বোকা। যেমন ইব্‌ন যায়দ (র.)-এর রিওয়ায়াতে الا من سفه نفسه। বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যে তার অংশকে ভুল করেছে। উল্লেখ্য, ব্যাকরণের দিক থেকে نفس শব্দকে بيان বা ব্যাখ্যার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এ ভাবে যে, سفه বা 'বোকামি' আসলে ব্যক্তির নফ্‌স-এর। এরপর যখন তা স্থানান্তর করে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির দিকে নেওয়া হলো, তখন نفس তাফ্‌সীর হিসাবে স্থান পেল। যেমন বলা হয়, دارا ضاق وسعكم دارا (সে তোমাদের মধ্যে ঘরের দিক থেকে প্রশস্ততম)। এক্ষেত্রে একথার মধ্যে 'ঘর' এ কারণে অনুপ্রবেশ করল যে, (ঘরের) প্রশস্ততা ঘরের মধ্যে—লোকটির মধ্যে নয়। অনুরূপভাবে نفس ও এখানে প্রবেশপ্রাপ্ত হলো। কেননা, আসলে سفه (বোকামি) 'নফ্‌স'-এর—ব্যক্তির নয় (যা من শব্দে বুঝায়)। এ কারণে سفه نفسه বলা সঠিক হলেও سفه اخوك। (তোমার ভাই বোকা বনেছে) এ কথা বলা নিয়মসঙ্গত হবে না। তবে سفه শব্দ معرفه-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও نفس দ্বারা ব্যাখ্যা করা এ কারণে সঙ্গত হয়েছে যে, এটি نكره-এর ব্যাখ্যা। তবে বসরার কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেছেন, যেহেতু سفه ক্রিয়া غير متعدى (অকর্মক), কাজেই سفه نفسه কথাটি سفه শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং نفسه শব্দ দ্বারা একে متعدى করা হয়েছে। سفه অর্থে ক্রিয়াটিকে متعدى রূপে প্রয়োগ-ব্যবহার না করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু غبن (সে ঠকে গেল) এবং خسر (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো) এ দুটি ক্রিয়াকে نفس শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ যোগেও متعدى করা হয়ে থাকে। যেমন غبن خمسين ও خسر خمسين।

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج -এর ব্যাখ্যা :

ব্যাকরণের দিক থেকে এখানে اصطفيناه শব্দের ها অক্ষর হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গকে নির্দেশ করে। এর মূল ধাতু صفوة এবং এ থেকে শব্দটি افتعال। باب-এর অন্তর্গত। صاد ও طاء অক্ষরের সঙ্গে مخرج বা উচ্চারণগত নৈকট্যের কারণে এর تاء অক্ষরকে طاء অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

এখানে আয়াতে বলা হয়েছে—আমি ইব্‌রাহীমকে বন্ধুত্বের জন্য নির্বাচিত ও মনোনীত করেছি এবং আমি তাকে পৃথিবীতে তার পরবর্তী লোকদের জন্য নেতা বানাব। এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন একটি ঘোষণা, যাতে বলা হয়েছে, যে-কেউ পরবর্তীকালে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রবর্তিত সুন্নাতের বিরোধিতা করবে, সে আর যাই হোক, স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিরোধী এবং একই সঙ্গে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি এ এমন এক বিজ্ঞপ্তি যে, যে-কেউ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আনীত যে-কোন বিষয় বা বস্তুর বিরোধিতা করবে, সে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এরও বিরোধী একারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইব্‌রাহীম (আ.)-কে বন্ধুত্বের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে ইমাম রূপে নির্বাচিত করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, তাঁর দীনই একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্ম। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য এই মর্মে রয়েছে যে, যে কেউ তাঁর বিরোধিতা করবে, সে আল্লাহর শত্রু, যেহেতু সে বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ইমামের বিরোধিতা করেছে।

وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ -এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্ তা'আলা বলতে চান যে, ইব্‌রাহীম (আ.) পরকালে সৎকর্মশীলগণের একজন হবেন। মানব জাতির মধ্যে সালিহ্ বা সৎকর্মশীল তাকেই বলা হয়, যে লোক আল্লাহ্‌র হক্ব বা দায়িত্বসমূহ যথার্থ আদায় করে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীতে নির্মল চরিত্রের অধিকারী এবং আখিরাতে তাঁর বন্ধু ও ভালবাসার পাত্র এবং তিনি আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণকারীদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

(১৩১) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(১৩১) তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও মতামত : যখন ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর প্রতিপালক জানালেন, আমার উদ্দেশ্যে খাঁটিভাবে আমারই ইবাদত কর এবং আনুগত্যে বিনীত হও, তখন তাৎক্ষণিক-ভাবে তিনি তা মেনে নিলেন। আরবী ভাষায় ইসলাম অর্থে যা বুঝায়, তা আমরা বিগত আলোচনায় ব্যক্ত করেছি। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে اسلمت لرب العالمين। আয়াতাংশে বিশ্বপালক আল্লাহ্ তা'আলার اسلم। ঘোষণার উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, 'আনুগত্যে বিনীত হয়েছি' এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের মালিক ও পরিচালকের জন্য আমার ইবাদতকে বিশেষভাবে পরিশোধিত ও নির্ভেজাল করেছি, অপর কারো উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু এখানে اذ। শব্দ সময়-জ্ঞাপক, কাজেই 'সময়' কি এবং এর প্রেক্ষিতই বা কি? উত্তরে বলা হয়েছে, সময় ও প্রেক্ষিত ছিল, ولقد اصطفيناه فى الدنيا আয়াতাংশে যা আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বে

ইরশাদ করেছেন। ولقد اصطفيناه আয়াতাংশের ব্যাখ্যা: আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করলাম, যে সময় তার প্রতিপালক তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলল, 'আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।' কথাটির তাৎপর্য হলো, আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করলাম, যখন আমি তাকে বললাম, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলল, 'আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম'। এতে তাঁর اذ قال له ربه اسلم আয়াতাংশের মধ্যে তৃতীয় পুরুষের 'খবর' হিসাবে আল্লাহ্‌র নাম প্রকাশ করল, যদিও পূর্বে এর বর্ণনা ব্যক্তিগত হিসাবে চলছিল। কবি খাফাফ ইব্‌ন নুদ্‌বাঃর কবিতায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

اقول له والرمح يأطر متنه + تأمل خفافا انني انا ذالكا

অতঃপর আবার যদি প্রশ্ন হয়, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইবরাহীম (আ.)-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, তাঁকে অবশ্যই দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। যদি প্রশ্ন হয়, কোন্ অবস্থায় তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল? বলা হবে, যখন তিনি বলেছিলেন, يا قوم انى برى مما تشركون ۝ انى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ○ (হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে শিরক করছ, আমি তাতে অসন্তুষ্ট এবং তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আমি ঐকান্তিকভাবে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করছি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আন'আম ৬/৭৮-৯)। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) একথাটি তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালক বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর'। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করার পরে।

(١٣٢) وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

(১৩২) এবং ইব্‌রাহীম ও য়া'কূব এ সম্পর্কে তাদের পুত্রদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না।'

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط-এর ব্যাখ্যা:

ইব্‌রাহীম (আ.) যে বিষয়ে ওসীয়ত করেছিলেন তা হলো, পবিত্র কুরআনের ভাষায় اسلمت لرب العالمين (আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের অনুগত হলাম)। আর তা হলো সেই ইসলাম, যে সম্পর্কে নবী (স.) আদেশ দিয়েছেন। আর ইসলামের তাৎপর্য হলো, শুধু এক আল্লাহ্‌র জন্য

ইবাদত করা, তাঁর একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তরকে তাঁর সমীপে বিনীত করা। ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের থেকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন।

ويعقوب অর্থাৎ হযরত য়া'কূব (আ.)-ও তাঁর সন্তানদেরকে এই ওসীয়ত করেছেন। এসম্পর্কে কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পর হযরত য়া'কূব (আ.)-ও তাঁর সন্তানদেরকে এই ওসীয়ত করেছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের ব্যাপারে ওসীয়ত করেছেন এবং য়া'কূব (আ.)-ও অনুরূপ ওসীয়ত করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আরো বলেন, ইবরাহীম (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে 'ইসলামের' নির্দেশ দিয়েছেন এবং য়া'কূব (আ.)-ও তাঁর পুত্রদেরকে অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ووصى بها ابراهيم بنيه আয়াতাংশটি একটি বিবৃতির সমাপ্তি। আর ويعقوب শব্দটি দ্বারা অন্য একটি বিবৃতি শুরু করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে একথার নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা বলে اسلمنا لرب العالمين (আমরা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।) আর য়া'কূব (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে আদেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র তাদেরকেই সম্বোধন করে, যা আয়াতটির পরের অংশে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা এই: يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون (হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ কর না)। আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যার কোন অর্থ হয় না বা যুক্তি থাকতে পারে না। কারণ য়া'কূব (আ.) তাঁর পুত্রদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ইবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্রদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারই অনুরূপ এবং তা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয়, তাঁর একত্ববাদ এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয়। তবে এ সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিষয়টির উপরোক্ত ব্যাখ্যা যদি মেনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى 'এ বিষয় সম্পর্কে ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর পুত্রদেরকে এবং য়া'কূব (আ.)-ও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হে পুত্রগণ'! —তবে বাক্যটিতে ان শব্দ উহ্য ধরে নেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে: কারণ ওসীয়ত (وصية)-কে একটি কথা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। যার ফলে এর সাথে ان শব্দ প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করলে ভাষাগত দিক থেকে মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ان শব্দ মেনে নেওয়ার পর তা দূর করে দিয়ে শব্দটিকে উহ্য ধরা হয়েছে, এতে করে ভাষার সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে। যেমন এর দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদের আয়াতে রয়েছে, যা এই, يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষ সন্তানেরা নারী সন্তানদের দ্বিগুণ অংশ পাবে)। এ ছাড়া আরবী ভাষায় কবি-সাহিত্যিকদের কবিতায়ও এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গির দৃষ্টান্ত বিরল নয়; যেখানে ان শব্দকে ভাষায় প্রকাশ না করে অর্থে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেন —

انى سأبدى لك فيما ابدى + لى شجنان شجن بنجد + وشجن لى ببلاد السند

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب আয়াতাংশের ان শব্দকে সম্বোধনসূচক কথার দৃষ্টিতে রহিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, يا بنى শব্দ। ان।

শব্দ ভাষায় প্রকাশ না করে তৎস্থলে এই 'সম্বোধন'কেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, আরবরা এধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন তারা বলে, ناديت اين زيد و ناديت هل قمت (আমি ডাকলাম যায়দ কোথায়? এবং আমি আহবান করলাম, তুমি কি দাঁড়িয়েছ?) অনেক সময় তারা ان। শব্দ প্রকাশ্যভাবেও ব্যবহার করে থাকে। উল্লেখ্য যে, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একটি দল অঙ্গীকার অর্থে وصى শব্দটিকে اوصى। পড়ে থাকেন। কিন্তু وصى শব্দটি যারা تشديد-এর সঙ্গে পাঠ করেন, তাঁরা এর অর্থ করেন—'পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার নিয়েছেন'।

يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইব্রাহীম (আ.) ও য়া'কূব (আ.) তাঁদের পুত্রদেরকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন —'হে পুত্রগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এই দীনই পসন্দ করেছেন, যার অঙ্গীকার তোমাদের কাছ থেকে তিনি নিয়েছেন এবং তা তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। এখানে নির্দিষ্ট-বোধক الف ও لام অক্ষর دين শব্দে যোগ করার কারণ হলো, যে বিষয়টি সম্পর্কে সন্তানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাঁরা তৎসম্পর্কে ওসীয়ত দ্বারা অবহিত ও পরিচিত হয়েছেন। অতঃপর তাঁরা এভাবে পরিচয় লাভের পর তাঁদেরকে বলেছেন, এই দীন—যার ওয়াদা তোমাদের কাছ থেকে নেওয়া হলো, একমাত্র তাই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। অতএব, তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, যেন ঐ দীন ব্যতীত অপর কোন ধর্মের উপর কখনো মৃত্যুবরণ না কর।

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ؕ -এর ব্যাখ্যা ঃ

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আদম সন্তান—মানুষের উপর কি জীবন ও মৃত্যু নির্ভরশীল যে, তাকে একথা বারন করা যাবে যে, কোন অবস্থা বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে পসন্দ মত কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর? এ কথার উত্তর প্রশ্নকারীকে এ ভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ তুমি যেভাবে চিন্তা করেছ এর অর্থ তা নয়। এর অর্থ এই, তোমাদের আয়ুষ্কালের দিনগুলোতে দীন ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে যেও না। এ ব্যাখ্যা এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ জানে না যে, কখন তার মৃত্যু আস্‌বে। এ কারণেই তাঁরা (ইব্রাহীম (আ.) ও য়া'কূব (আ.)) তাঁদের সন্তানদেরকে বল্লেন, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করনা। কেননা, তোমরা জান না যে, দিন ও রাতের সময়গুলোতে কখন তোমাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে। অতএব, ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না, যাতে মৃত্যু তোমাদের কাছে এসে যায়—আর তোমরা আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন ভিন্ন অন্য কোন দীনে প্রতিষ্ঠিত থাক আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। যার ফল-শ্রুতিতে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হও

(١٣٣) اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

(১৩৩) য়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?' তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার ইলাহ-এর ও আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাকের ইলাহ-এরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ভাষাগত দিক থেকে এখানে আল্লাহ তা'আলা أكنتم -এর স্থলে ام শব্দ দ্বারা প্রশ্নবোধক করেছেন। কেননা, বিগত বিষয়ের আলোচনার পর এটা আর একটি নতুন প্রশ্ন। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে, الم ○ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ○ ام يقولون افتراه (আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাব বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি তারা বলে, 'এ তো সে নিজে রচনা করেছে? সূরা সাজদা ঃ ১—৩)। আরবরা কোন বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে কোন প্রশ্নের অবতারণা করলে তাতে اَ -এর পরিবর্তে اَمْ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। شهداء শব্দ বহুবচন; এর একবচন شهيد যেমন, شركاء শব্দের একবচন شريك এবং خصماء-এর একবচন خصيم —।

এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মদকে মিথ্যা জ্ঞানকারী ও তাঁর নুবুওয়াতে অবিশ্বাসী য়াহূদ ও খৃস্টান সম্প্রদায়! তোমরা কি য়া'কূবের মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলে? অর্থাৎ তোমরা উপস্থিত ছিলে না। অতএব, আমার নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে এরূপ মিথ্যা দাবী কর না যে, তারা য়াহূদীবাদ ও খৃস্টানবাদ গ্রহণ করেছিল। কেননা, আমার খলীল ইব্রাহীম এবং তার পুত্র ইস্‌হাক ও ইস্‌মা'ঈল এবং তাদের বংশধরদেরকে আমি একনিষ্ঠ দীন ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছি। আর তারা তাদের সন্তানদেরকে একমাত্র ইসলামেরই নির্দেশ দিয়েছে এবং একথারই অঙ্গীকার তারা গ্রহণ করেছে। যদি তোমরা সেখানে তখন উপস্থিত থাক্‌তে আর তাদের কাছ থেকে শুন্‌তে, তাহলে অবশ্যই জানতে পারতে যে, তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে পরবর্তীকালে তোমরা যে ধারণা পোষণ করছ, তারা তার ঘোর বিরোধী ছিল।

য়াহূদ ও খৃস্টানদের ধারণা, ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর সন্তান য়া'কূব (আ.) তাদের ধর্মের অনুসারী ছিলেন। য়াহূদী ও খৃস্টানদের এ দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি য়া'কূবের মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলে যে, য়া'কূব তার সন্তানদেরকে এবং তারা তাদের পিতাকে যা বলেছিল, তা

তোমরা জানতে পেরেছ? এরপর য়া'কূব (আ.) তাঁর পুত্রদেরকে এবং পুত্ররা তাঁদের পিতাকে যা বলেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি এ বিষয়ের আলোচনায় যা বললাম অন্যান্য তাফসীরকারও তাই বলেছেন। এ মতের সমর্থকদের বক্তব্য ঃ রবী' (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ام كنتم شهداء-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ দ্বারা আহলে কিতাব অর্থাৎ য়াহূদ ও খৃস্টানদেরকে বুঝান হয়েছে।

اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ط قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ -এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ তোমরা কি য়াকূবের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে, যখন য়া'কূব তার ছেলেদেরকে বলেছিল? ما تعبدون من بعدى। এখানে বলা হয়েছে, তোমরা আমার মৃত্যুর পরে কিসের উপাসনা করবে? এবং তারা (পুত্ররা) বলল, তুমি এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইসহাক যে ইলাহ্-এর ইবাদত করতেন, আমরাও সেই ইলাহ্-এর ইবাদত করব, বিশেষ করে তাঁরই জন্য ইবাদতকে নির্ভেজাল ও খাঁটি করে নিরংকুশভাবে তাঁরই রুবুবিয়্যাতের একত্ব মেনে চলব, এতে কোন কিছুকেই শরীক করব না এবং তিনি ব্যতীত অপর কাউকে 'রব' বা প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করব না।

আর ونحن له مسلمون-এর অর্থ হলো, যেন তারা বলল, আমরা তোমার মা'বূদের বন্দিগী করব, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করব। অথবা এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, আমরা তোমার পরে তোমার মা'বূদের বন্দিগী করব এবং আমরা এখনও সর্বদা তাঁর অনুগত থাকব। ব্যাখ্যার এ দুটি দিকের মধ্যে উত্তমটি হলো ونحن له مسلمون আয়াতাংশ حال বা অবস্থার বিবরণ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া। এমতাবস্থায় অর্থ হবে—আমরা তোমার মা'বূদের এবং তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদের ইবাদত করব, যা হবে পূর্ণ অনুগত অবস্থায়। এ ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের নামের তালিকায় ক্রম হিসাবে ইসমাঈলের নাম ইসহাকের নামের পূর্বে বর্ণনা করার কারণ তিনি বয়সে বড় ছিলেন। এমতের অনুসারীদের আলোচনা ঃ ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, نعبد الهك واله اباءك ابراهم واسماعيل واسحاق। এখানে ইসমাঈলের নাম প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, তিনি বয়সে বড় ছিলেন। আবার কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী اباءك-এর স্থলে ابيك, পাঠ করেছেন এ ধারণায় যে, ইসমাঈল (আ.) য়া'কূব (আ.)-এর চাচা। অতএব, اباء থেকে অনুবাদ সঙ্গত নয় এবং এ ভাবে তাকে গণনায় আনা যায় না। তবে যারা এ ভাবে পাঠ করেন, আরবী ভাষার রীতিধারা সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যের কারণেই তাঁরা এরূপ করেন।

আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, পাঠরীতি সম্পর্কে আমাদের মতে اله اباءك পাঠ করাই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কারণ, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একমত। আর যারা এ পাঠরীতির বিরোধী, তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

(١٣٤) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(১৩৪) সেই উম্মত অতীত হয়েছে। তাদের জন্য তাদের কীর্তি এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কীর্তি। তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে য়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান ছিল, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বল না, যে বিষয়ের পাত্র তারা নয় বা ছিল না এবং এ ভাবে য়াহূদী ও নাসারা হওয়ার ন্যায় অপবাদ তাদেরকে দিও না। কেননা, তারা ছিল একটি উম্মত, যারা নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে অতীত হয়ে গেছে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এখানে উম্মত অর্থ মানুষের একটি নির্দিষ্ট দল এবং যুগ—যারা মরে গেছে ও অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আর তারা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কাজেই তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। মূলত خلت শব্দ خلا المنزل কথা থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ, লোকটি লোকালয় ছেড়ে এমন জায়গায় স্থান নিয়েছে, যেখানে তার কোন বন্ধু বা আপনজন বলতে কেউ নেই। এরপর এ কথাটি যাদের মৃত্যু হয়, তাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা য়াহূদ ও নাসারাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা কুফ্র ও গোমরাহীতে লিপ্ত থেকে তা আমার নবী ও রাসূলগণের প্রতি আরোপ করেছ। সে সম্পর্কে কথা এই, (ভাল-মন্দের বিচারে) তারা তাই পাবে, যা তারা অর্জন করেছে।

لها শব্দের ها ও الف। আগে উল্লিখিত تلك শব্দকে নির্দেশ করে, অথবা امة শব্দকে। অর্থাৎ لها ما كسبت—সে উম্মতের লোকদের জন্য। ভাল-মন্দ তারা যা অর্জন করেছে, তারা তা পাবে এবং হে য়াহূদ ও খৃস্টান সম্প্রদায়! তোমরা যা অর্জন করেছ, অনুরূপভাবে তোমরাও তা পাবে। অতএব, হে আমার নবী ও রাসূলদের ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে মিথ্যারোপকারীর দল! ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও য়া'কূবের সন্তানেরা যে আমল করেছিল, তৎসম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কেননা, ভাল-মন্দ যে যা অর্জন করবে, তার ফল সে-ই পাবে। অতএব, তাদের ধর্মীয় আকীদা ও মতাদর্শ সম্পর্কে তোমাদের মিথ্যা দাবী পরিহার কর। কারণ, এরূপ নিছক মিথ্যা দাবী আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কাজে আসবে না। যদি তোমাদের কোন কাজ ফলপ্রসূ হয়, তবে তা হবে নেক আমলের বিনিময়ে, যদি তোমরা তা করে থাক। আর সে কাজগুলো কিয়ামতের আগেই করে থাক।

(١٣٥) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(১৩৫) তারা বলে, 'য়াহূদী বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا -এর ব্যাখ্যা ঃ

আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিত ঃ য়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর অনুরক্ত মু'মিন সাহাবীগণকে বলেছিল, 'তোমরা য়াহূদী হয়ে যাও, সুপথ পাবে। অনুরূপভাবে খৃস্টানরাও তাঁকে ও তাঁর সাহাবীগণকে বলেছিল, তোমরা খৃস্টান হয়ে যাও, সৎপথ পাবে। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সুরিয়া আল-আ'ওয়ার (টেরা চোখবিশিষ্ট) রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলেছিল, আমরা যে ধর্মে আছি, সে ধর্ম ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। অতএব, হে মুহাম্মদ। তুমি আমাদের ধর্ম অনুসরণ কর, হিদায়াত পাবে খৃস্টানরাও অনুরূপ কথা বলল। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (স.)-এর সামনে তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন এবং তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন– হে মুহাম্মদ। য়াহূদ ও খৃস্টানদের মধ্যে যারা তোমাকে ও তোমার সাহাবীগণকে বলেছিল, 'তোমরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, সৎপথ পাবে', তাদেরকে বলে দাও, বরং তোমরাই এসো, আমরা ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করি। যে ধর্ম তোমাদের ও আমাদের সবাইকে একত্র করে দেয় যে এটাই আল্লাহর একমাত্র দীন—যাতে তিনি সন্তুষ্ট, যা তাঁর নির্বাচিত এবং যে ধর্ম পালনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, ইবরাহীমের দীন একনিষ্ঠ ইসলাম। এসো, আমরা এ ছাড়া অন্য সব ধর্ম বর্জন করি। যেগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে থাকে। যার ফলে আমাদের কিছু লোক অস্বীকার করে, আবার কিছু লোক সে ধর্মকে স্বীকার করে। কেননা, এই মত-পার্থক্যের কারণেই আমাদের একত্র হওয়ার কোন উপায় থাকে না। যেমন একত্রিত হওয়ার উপায় ও সুযোগ পাওয়া যায় মিল্লাতে ইবরাহীমে। অর্থাৎ ইব্রাহিমী ধর্ম সকলকে এক হওয়ার সুযোগ দেয়—যা য়াহূদী, খৃস্টান কিংবা অন্য কোন ধর্ম দেয় না।

আরবী ব্যাকরণের দিক থেকে بل ملة ابراهيم-কে যবর (ـَ) দিয়ে পাঠ করা যায় তিনটি কারণে। وقالوا كونوا هودا او نصارى বাক্যাংশের অর্থকে وقالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। কেননা, তাদের كونوا هودا او نصارى কথার মাধ্যমে তারা يهودية ও نصرانية -এর দিকে নিয়ে গিয়ে সে দিকেই তারা আহবান করল। এরপর এই অর্থের ভিত্তিতেই ملة কথাটিকে সম্পৃক্ত করা হলো। এ প্রেক্ষিতে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে মুহাম্মদ। আপনি বলুন, আমরা য়াহূদিয়্যাত ও নাসরানিয়্যাতের অনুসরণ করব না, বরং আমরা একনিষ্ঠ হয়ে মিল্লাতে ইব্রাহীমীর অনুসরণ করব। এরপর দ্বিতীয় نتبع কে বিলোপ করা হবে। আর তা يهودية ও النصرانية-এর ন্যায় হরকত বিশিষ্ট হবে এবং ملة শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। দ্বিতীয়ত, 'যবর' হওয়ার কারণ نتبع অর্থে একটি فعل উহ্য ধরে নিতে হবে। তৃতীয় কারণ এটা হতে পারে যে, এখানে بل نكون اصحاب ملة ابراهيم او اهل ملة ابراهيم কথাটি ধরে নেওয়া হয়েছে (যার অর্থ— বরং আমরা হব মিল্লাতে ইবরাহীম-এর অনুসারী অথবা মিল্লাতে ইবরাহীম-এর পরিবারভুক্ত।) এরপর اصحاب ও اهل শব্দ দুটি বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার স্থলে ملة শব্দটি

রয়েগেছে। কেননা, বিষয়টির মর্ম এভাবেই রক্ষিত হয়। এর উদাহরণ স্বরূপ একজন কবির কবিতার একটি পংক্তির উধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

حسبت بغام راحلتى عناقا + وما هى ويب غيرك بالعناق

উপরোক্ত পংক্তির শেষ শব্দ بالعناق -এর পূর্বে صوت শব্দ উহ্য রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে ملة শব্দটির পূর্বে اهل অথবা اصحاب শব্দ উহ্য রয়েছে। তাই এমনি অবস্থায় ملة শব্দটি যবর দিয়ে পাঠ করতে হবে। মিল্লাতে ইবরাহীম-এর অনুসরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ملة শব্দটিকে যবর দিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। আবার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ শব্দটিকে পেশ দিয়েও পাঠ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা এই ঃ بل الهدى ملة ابراهيم (বরং মিল্লাতে ইব্রাহীমই প্রকৃত হিদায়াত)।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

'মিল্লাত' অর্থ ধর্ম আর 'হানীফ' অর্থ সঠিক, সরল ও সুদৃঢ়। আর যে লোক তার দু'পায়ের একটি অপরটির উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলে, নিরাপত্তার দৃষ্টিতে তাকেও احنف বলা হয়, যেমন শহর বা জনপদের ধ্বংসের স্থানকে উদ্ধার ও রক্ষা পাওয়ার অর্থে مفازة বলা হয় এবং যেমন দংশনকারীকে তার কারণে মৃত্যু বা এ ধরনের বিপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য শুভ মনে করে سليم বলা হয়। সুতরাং কথাটির অর্থ এই দাঁড়ায়, হে মুহাম্মদ। তুমি বল, আমরা বরং দৃঢ়ভাবে মিল্লাতে ইবরাহীম-এর অনুসারী। এ অর্থে حنيف শব্দ ابراهيم থেকে حال হয়ে যাবে। কিন্তু ভাষ্যকারগণ এ ব্যাখ্যায় একমত হতে পারেননি। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, حنيف অর্থ হাজী এবং বলা হয়েছে, দীনে ইবরাহীমকে ইসলামে হানীফিয়্যাহ নামকরণ এ কারণে করা হয়েছে যে, তিনিই ছিলেন প্রথম ইমাম যাঁর অনুসরণ হজ্জের ক্রিয়াকর্মের (আমলসমূহের) ব্যাপারে তাঁর সময়ের এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। অতএব, যে কোন ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মতাদর্শ অনুসারে, তার নীতিমালা অনুসরণে কা'বাঘরের হজ্জব্রত পালন করে, তিনিই দীনে ইব্রাহীম-এর অনুসারী হানীফ্-মুসলিম। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা ঃ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.) সূত্রে কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'হানীফিয়্যাহ' সম্পর্কে হযরত হাসান (র.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, এর অর্থ কা'বাঘরের হজ্জ পালন। মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাদাহ্ (র.) সূত্রে 'আতিয়্যাহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতে 'হানীফ্' (حنيف) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এর অর্থ الحاج—অর্থাৎ হাজী। আল-হুসায়ন ইবন আলী আস্-সাদায়ী (র.) সূত্রে আতিয়্যাহ (র)-এর রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। ইব্ন হুমায়দ (র) সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, الحنيف অর্থ হাজী। হাসান ইব্ন য়াহ্য়া (র.) সূত্রে হযরত ইব্ন যিয়াদ (র.) বলেন, আমি হযরত হাসান (র)-কে حنيفية সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, এর অর্থ এ কা'বাঘরের হজ্জ করা। তিনি বলেন, ইবনুত তায়মী (র.) সূত্রে হযরত যাহহাক (র.) ইব্ন মুযাহিম (র.)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন বাশশার (র.) সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনায় حنفاء অর্থ হাজীগণ। হযরত মুছান্না (র) সূত্রে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, حنيف অর্থ হাজী। ওয়াকী' (র.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আল্ কাসিম (র.)

বলেন, মুদার গোত্রের লোকেরা, যারা জাহিলিয়াতের যুগে কা'বাঘরের হজ্জ করত, তাদেরকে حنفاء বলত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা حنفاء لله غير مشركين به (হজ্জ কর আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তাঁর সঙ্গে অপর কাউকে শরীক না করে) আয়াতটি নাযিল করেন। মতান্তরে বলা হয়েছে حنيف অর্থ অনুসরণকারী, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, এর অর্থ স্থিতিশীলতা।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনাঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র.) সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, حنفاء অর্থ, অনুসরণকারিগণ। অন্যরা বলেছেন, দীনে ইবরাহীমকে এ কারণে হানীফিয়্যাহ (حنيفية) নামকরণ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন প্রথম ইমাম, যিনি আল্লাহ্ পাকের বান্দাগণের জন্য 'খাত্‌নাহ'-এর সুন্নাত প্রবর্তন করেন। এরপর পরবর্তিগণ তা অনুসরণ বা পালন করে। বর্ণনাকারিগণ বলেন, অতএব, যে লোক ইসলামে বহাল থেকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর রীতি-নিয়মে 'খাত্‌নাহ্' করবে, তাকেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত 'হানীফ্' বলা হবে। অন্যরা বলেছেন, بل ملة ابراهيم حنيفا-এর অর্থ بل ملة ابراهيم مخلصا অর্থাৎ এর অর্থ—বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে বিশুদ্ধচিত্ত বা একাগ্র। অতএব, তাঁদের কথায় حنيف অর্থ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর দীনের অনুসরণে বিশুদ্ধচিত্ত।

এ মতের সমর্থকগণের আলোচনাঃ হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন (র.) সূত্রে হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, واتبع ملة ابراهيم حنيفا আয়াতাংশে উল্লিখিত حنيف শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত। অন্যরা বলেছেন, বরং حنيفية অর্থ ইসলাম। অতএব, যে কেউ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁকে ইমামরূপে মানবে, তাকেই 'হানীফা' বলা হবে। এ তাফ্‌সীর গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে 'হানীফা' অর্থ দীনে ইবরাহীমের উপর স্থিতিশীল ও তাঁর ধর্মের অনুসারী। এটা একারণে যে, حنيفية অর্থ যদি حج البيت অর্থাৎ কা'বাঘরের হজ্জ পালন করা মনে করা হয়, তাহলে জাহিলী যুগে যে মুশরিকরা হজ্জ করত, তাদেরকেও حنفاء নামে অভিহিত করা আবশ্যক হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একে تحنف বা হানীফিয়্যাতের ভান বলে আখ্যায়িত করে তাঁর বাণীতে অস্বীকার করেছেন— ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين (বরং ইব্‌রাহীম ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।) অতএব, ختان সম্পর্কিত ব্যাখ্যাও একই পর্যায়ের। কেননা, حنيفية অর্থে যদি ختان বা 'খাত্‌নাহ্' বুঝায়, তবে একথা মেনে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়বে যে, য়াহূদীরাও حنفاء—। কারণ তারাও খাতনাহ্ করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে حنفاء এর আওতা থেকে বের করে দিয়েছেন তাঁর এই আয়াতে ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما (ইব্‌রাহীম য়াহূদীও ছিল না, আর নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলমান)। অতএব, একথা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হলো যে, حنيفية শব্দে যা বুঝায়, তা এককভাবে কেবলমাত্র খাত্‌নাহ্ করাও নয়, আর কেবলমাত্র কা'বাঘরের হজ্জ করাও নয়। তবে এর অর্থে তাই বুঝায়, যা আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং এ হলো মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের উপর স্থিতিশীল থাকা, তাঁর অনুসরণ করা এবং এ মিল্লাতের ইমাম হিসাবে তাঁকে মান্য করা। এ ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পূর্বের নবীগণ ও তাদের অনুসারিগণ কি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে যে সব কাজে আদিষ্ট ছিলেন সেগুলোতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মত স্থিতিশীল ছিলেন না? এর উত্তরে হাঁ, বলা হয়েছে। তবে আবার যদি এমন প্রশ্ন হয় যে, কি করে حنيفية কথাটা অন্যান্য নবী ও তাঁদের

অনুসারীদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারিগণের জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পূর্বের সকল নবীই حنيف ছিলেন এবং এভাবে আল্লাহ্ পাকের একান্তই অনুগত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ব্যতীত তাঁর পূর্বের কোন নবীকেই কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী লোকদের জন্য ইমাম রূপে নির্বাচন করেন নাই, যেমন করেছেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে। তিনি তাঁকে مناسك الحج —হজ্জের ক্রিয়াকলাপ, খাত্‌না এবং ইত্যাকার ইসলামের অবশ্যপালনীয় ইসলামী শরীয়তের ইমাম মনোনীত করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল তথা চিরকালের জন্য এবং এতে যে সব সুন্নাত প্রতিপালিত হয়েছে, সেগুলোকে এমন নিদর্শন হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেগুলো ঈমানদার ও কাফিরদের মধ্যে এবং পুণ্যবান, অনুগত ও অবাধ্য পাপীদের মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে পরিচয় দান করে। অতএব, তাঁর মায্‌হাবের অনুসারী ও স্থিতিশীল লোকদেরকে 'হানীফ্' নাম দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর মিল্লাত থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত অন্যান্য নামের যাবতীয় ধর্মের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট নাম দেওয়া হয়েছে। এভাবে তাদেরকে য়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি নানা ধর্মের অনুসারীদেরকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর وما كان من المشركين আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মূর্তি বা পুতুলপূজারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এবং তিনি য়াহূদী ও খৃস্টানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'হানীফ্' বা একনিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্ত মুসলমান।

(١٣٦) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

(১৩৬) তোমরা বলে দাও, 'আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক, য়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা এ য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে যারা তোমাদেরকে বলেছিল, য়াহূদী অথবা খৃস্টান হয়ে যাও, সৎপথ পাবে, তাদেরকে বলে দাও, 'আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেছি অর্থাৎ তাঁকে সত্যজ্ঞান করেছি। ঈমান অর্থ সত্যজ্ঞান করা, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাদেরকে আরো বলে দাও, আমরা সত্য জেনেছি, যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ যে কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিল করেছেন। এখানে কিতাব

অবতরণের ব্যাপারে সম্বোধনের ধারা নবীর দিক থেকে পরিবর্তন করে মু'মিন বা তাদের নিজেদের দিকে একারণে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তারা নবীরই অনুসারী ও তাঁরই আদেশের বাধ্যানুগত। কাজেই মূলত কিতাব অবতরণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর হলেও তা তাদেরই জন্য হয়েছে এবং এ দৃষ্টিতে তাদেরই উপর নাযিল হওয়ার সমতুল্য মনে করা হয়েছে। এরপর আমরা আরো বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং ঈমান এনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত য়া'কূব আলায়হিমুস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের উপর। উল্লেখ্য, এখানে اسباط কথায় হযরত য়া'কূব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে যারা নবী, তাঁদেরকে বুঝায়।

وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى—এর ব্যাখ্যা :

যা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীল। এবং এ ছাড়া অন্যান্য নবীকে যে সব কিতাব দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা একথা স্বীকার ও জানত বিশ্বাস করি যে, এগুলোর সবই সত্য, শাশ্বত হিদায়াত এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং আমরা এ কথাও বিশ্বাস করি যে, যে নবীগণের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সত্য, ন্যায় ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে একে অপরকে সত্যজ্ঞান করতেন এবং আল্লাহ্র একত্ববাদের একই পথে আহবান জানাতেন ও তাঁরই আনুগত্যে কাজ করার নির্দেশ দিতেন। তাঁদের মধ্যে কাউকে আমরা পার্থক্য জ্ঞান করি না এ দৃষ্টিতে যে, আমরা তাদের কাউকে বিশ্বাস করব, কাউকে করব না, কাউকে নবী বলে স্বীকার করব, কাউকে করব না। কোন নবীর বিরোধিতা করে তাঁর উপর অসন্তুষ্ট থাকব, আবার কাউকে সমর্থন করে তাঁর সহযোগিতা করব। যেমন য়াহূদীরা হযরত 'ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার করে তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বিরোধিতায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তাঁদেরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নবী-কে স্বীকার করে নিয়েছিল। যেমন খৃস্টানরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার করে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নবীকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বরং আমরা তাঁদের সবারই ব্যাপারে একথা সাক্ষ্য দিই যে, তাঁরা সবাই সত্য ও হিদায়াত প্রচারের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রাসূল ছিলেন।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○-এর ব্যাখ্যা :

এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে : আমরা তাঁর আনুগত্যে, ইবাদত-বন্দিগীতে বিনয়াবনত থাক্‌ব এবং তাঁরই বন্দিগীতে রত থাকব। এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ কথাটি হযরত নবী (স.) য়াহূদীদেরকে বলেছিলেন। এতে তারা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে অস্বীকার করেছিল। যেমন আবূ কুরায়ব (র.) সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, য়াহূদীদের একটি দল, যাদের মধ্যে আবূ য়াসির ইব্ন আখ্তাব, রাফি' ইব্ন আবী রাফি' 'আযির, খালিদ, যায়দ, ইযার ইব্ন আবী ইযার্ এবং আশ্ইয়া ছিল। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

তিনি রাসূলদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করি এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইস্মাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত য়া'কূব (আলায়হিমুস্সালাম) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর আমরা তাঁরই অনুগত। যখন তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম উল্লেখ করলেন, তখন তারা তাঁর নুবুওয়াত অস্বীকার করে বলল, আমরা ঈসাকে বিশ্বাস করি না এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে আমরা তাদেরও বিশ্বাস করি না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন—

قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون ○ (বল, হে আহলে কিতাব! তবে কি এ কারণেই তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি? নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ। সূরা মায়িদা : ৫৯)

ইব্ন হুমায়দ (র.) সূত্রে বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতে 'রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট উপস্থিত হলে' কথাটির পরে আগের রিওয়ায়াতের অনুরূপই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় رافع بن ابى رافع-এর স্থলে نافع بن ابى نافع বলা হয়েছে। কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সব রাসূলকেই সত্যায়ন করার জন্য মু'মিনদের প্রতি একটি নির্দেশ হিসাবে নাযিল করেছেন। বিশ্‌র ইব্ন মা'আয (র.) সূত্রে قولوا امنا بالله থেকে ونحن له مسلمون পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ্ (র.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর নবী ও রাসূলের কারোর মধ্যে পার্থক্য না করে তাঁদের সবাইকে সত্যায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আয়াতে উল্লিখিত اسباط শব্দ দ্বারা য়া'কূব ইব্ন ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ.)-এর সন্তানদেরকে বুঝান হয়েছে, যাঁরা সংখ্যায় ১২ জন ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের থেকে এক একটি গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে, এ কারণে এঁদেরকেই اسباط নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسباط হচ্ছে য়া'কূব (আ.)-এর বংশধর বা পুত্রগণ— য়ূসুফ (আ.) ও তাঁর ভাইয়েরা। য়া'কূব ও তাঁর ঔরসজাত পুত্রদের নিয়ে তাঁরা সংখ্যায় ১২ জন ছিলেন। এরপরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক একটি গোত্রে পরিণত হয়। আর এজন্যই এদেরকে اسباط বলা হয়। সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسباط য়া'কূব (আ.)-এর সন্তানগণকে বলা হয়, যারা হলেন য়ূসুফ, বিন্‌য়ামীন, রূবায়ল, য়াহূযা, শামা'উন, লাভী, দান ও কাহাছ। রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسباط য়া'কূব (আ.)-এর সন্তান য়ূসুফ ও তাঁর ভাইয়েরা, যাঁরা সংখ্যায় বারো জন। এরপর এঁদের প্রত্যেকের সন্তানেরা এক একটি গোত্রে পরিণত হয় আর একারণেই এদেরকে اسباط বলা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইস্রাঈল বংশীয় য়া'কূব ইব্ন ইসহাক (আ.) তাঁর মামা লিয়ান ইব্ন তাওবীল ইব্ন ইল্‌য়াসের কন্যা লিয়াকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবায়ল, এবং শামাউন, লাভী, য়াহূযা, রিয়ালুন, য়াশ্জার এবং দীনা বিন্‌ত য়াকূব জন্মগ্রহণ করে। এরপর লিয়া বিন্‌ত লিয়ান মারা যান এবং য়া'কূব তাঁর বোন রাহীল বিন্‌ত লিয়ান ইব্ন তাওবীল ইব্ন ইল্‌য়াস-কে বিয়ে করেন। এ ঘরে তাঁর গর্ভে য়ূসুফ

ও বিন্য়ামীন (যার অর্থ আরবীতে বাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই ভাবে 'যুলফাহ্' ও 'বাল্হিয়া' নাম্নী তাঁর আরো দুই স্ত্রীর গর্ভে চার পুত্র যথাক্রমে দান, নাফ্তালী, জাদ্ এবং আশ্রাব জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব, য়া'কূব (আ.)-এর পুত্রদের সংখ্যা ছিল মোট বারো জন। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীকালে এঁদের মধ্য থেকেই বারোটি গোত্র বিস্তার করেন, যাঁদের লোক সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব এবং যাদের বংশের পরিচয় বা তথ্য-বিবরণী আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وقطعنا هم اثنتى عشرة اسباطا امما (আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। আ'রাফ ঃ ১৬০)

(১৩৭) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(১৩৭) তোমরা যাতে ঈমান এনেছ, তারা যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আর তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا -এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! য়াহূদী ও খৃস্টানরা যদি আল্লাহকে সত্য জানে এবং সত্য জানে যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সত্য জানে যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও 'ঈসা-কে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং এসব যদি তারা স্বীকার করে এবং সত্য বলে মেনে নেয়, যেমন তোমরা সত্য জেনেছ এবং স্বীকার করেছ, তাহলে তো তারা তোমাদের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছেছে এবং অবশ্যই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় এসব স্বীকারোক্তিতে তোমাদের ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তারা তোমাদের সাথী এবং তোমরাও তাদের সঙ্গী। অতএব, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ করেছেন যে, এ সব অর্থে ঈমান ব্যতীত, যা পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে, কোন 'আমলই কারো কাছ থেকে তিনি কবুল করবেন না। এ প্রসঙ্গে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে ঃ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ আয়াতের অর্থ— ঈমান যেন একটি শক্ত হাতল এবং এ ব্যতীত কোন আমলই তিনি গ্রহণ করেন না এবং যে ব্যক্তি ঈমান থেকে বঞ্চিত, তার জন্যই বেহেশত হারাম।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

যারা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবা কিরামকে বলেছিল- আপনারা য়াহূদী অথবা খৃস্টান হন, তখন তারা তা অস্বীকার করে। হে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনগণ! তোমরা যেমন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, নবীগণের প্রতি এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ, তদ্রূপ তারা ঈমান আনয়ন করেনি। তারা রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের ব্যতিক্রম করে। তারা কোন কোন নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কেউকে অস্বীকার করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে রেখো, নিঃসন্দেহে তারা অবাধ্যতা ও অসহযোগে লিপ্ত রয়েছে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে আছে। যেমন فانما هم فى شقاق -এর ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এর অর্থ বিচ্ছিন্নতা। রবী' (র.)-এর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে شقاق অর্থ বিচ্ছিন্নতা, পৃথক হয়ে যাওয়া। হযরত ইব্ন যায়দ (র.) فانما هم فى شقاق -এর ব্যাখ্যায় বলেন, شقاق অর্থ فراق — বিচ্ছিন্নতা, বিরোধিতা ও যুদ্ধ। অর্থাৎ কেউ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে সংগ্রাম করে। আর সংগ্রাম করলেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মূলত এ দুটি শব্দ আরবী ভাষায় সমার্থ-বোধক। এরপর প্রমাণ হিসাবে তিনি ومن يشاقق الرسول আয়াতাংশ পাঠ করলেন। شقاق শব্দ মূলত নেওয়া হয়েছে আরবী প্রবচন شق عليه هذا الامر اذا كبر عليه واذاه (তার উপর একাজটি কঠিন হয়ে পড়েছে, যখন কাজটি কষ্টকর হয় এবং তা তাকে কষ্ট দেয়, তখন এমন বলা হয়) থেকে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। আরবী প্রবাদে আরো বলা হয়, شاق فلان فلانا (অমুক ব্যক্তি অমুকের উপর কঠিন হয়ে পড়েছে)। একথাটি তখনই বলা হয়, যখন একজন অপরজন থেকে দুঃখকষ্ট পায় এবং একে অপরের সাথে ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে মহান আল্লাহ্র বাণী وان خفتم شقاق بينهما (যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আশংকা কর। সূরা নিসা ঃ ৩৫) এখানে شقاق অর্থ فراق অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা বা পৃথক হওয়া অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যারা আপনাকে ও আপনার সাহাবীগণকে বলে আপনারা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হন, সুপথ পাবেন, সেসব য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বলে দিন, তারা যদি আপনার সাহাবীগণের মত আল্লাহ্ এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করা ও সত্যজ্ঞান করা থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক এবং এ ছাড়া অন্যান্য নবীর প্রতি, তা বিশ্বাস ও সত্যজ্ঞান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, হয় তরবারির আঘাতে হত্যা করে অথবা আপনার এলাকা থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে, কিংবা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কেননা, তারা মুখে যা বলে এবং যা প্রকাশ করে, তা সবই আল্লাহ শুনেন। কুফর ও গোমরাহীর দিকে তারা যে আহবান করে, তাও তিনি শোনেন। আপনার ও আপনার সাহাবা কিরামের প্রতি তারা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ পাক তা পূর্ণরূপে অবগত। সুতরাং আল্লাহ্ এর বিরুদ্ধে যথারীতি কার্যকর পদক্ষেপ ও আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং এ ভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তাদের উপর বিজয় দান করেছেন এবং তাদের কিছু লোক নিহত হয়েছে, কিছু লোক নির্বাসিত এবং কিছু লোক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জিয্য়াহ্ দিতে বাধ্য হয়েছে।

(١٣٨) صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○

(১৩৮) আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز-এর ব্যাখ্যা :

রং-এর দ্বারা ইসলামের রংকে বুঝান হয়েছে। এটা এ কারণে যে, খৃস্টানরা রীতি অনুসারে যখন তাদের সন্তানদেরকে পুরোপুরি খৃস্টান বানাতে ইচ্ছা করত, তখন পানিতে রং মিশিয়ে গোসল করাত। এতে তাদের ধারণায় তাদের পবিত্রকরণ করা হতো, যেমন মুসলমানরা সৃষ্টিগত কারণে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে থাকে। খৃস্টানদের এটাই পুরোপুরিভাবে খৃস্টান হওয়ার নিয়ম। তবে যখন তারা আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণকে বলে, তোমরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, সুপথ পাবে, তখন এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি এসব খৃস্টান ও য়াহূদীদেরকে বলে দাও, 'বরং তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী হয়ে যাও। এটা আল্লাহর রং, যে রঙের চাইতে সুন্দর রং আর হতে পারে না। কেননা, এটা একনিষ্ঠ ইসলামের রং। আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে শিরক পরিহার কর এবং তাঁর সত্য পথের বিরোধিতায় যুক্তি-তর্কের অবতারণা পরিত্যাগ কর।

ব্যাকরণের দিক থেকে صبغة শব্দে পূর্বের ملة শব্দের بدل হিসাবে তার 'যবর' দেওয়া হয়েছে। আবার যারা শব্দটিতে 'পেশ' দিয়ে পড়েন, তাদের যুক্তিতে صبغة الله-কে بدل হিসাবে না রেখে একে অপর একটি স্বতন্ত্র বাক্য হিসাবেই তারা 'পেশ' দিয়ে পড়ে থাকেন। অতএব, শব্দটিতে 'যবর' কিংবা 'পেশ' উভয় রকম পাঠ-পদ্ধতিই এ ক্ষেত্রে সঙ্গত। তবে 'যবর' পড়ার আর একটি যুক্তি এই, صبغة শব্দকে ملة শব্দের بدل না ধরে قولوا امنا থেকে শুরু করে ونحن له مسلمون পর্যন্ত কথার بدل ধরে তাতে যবর প্রদান করা। কিন্তু এ প্রেক্ষিতে অর্থ হবে امنا هذا الايمان — 'আমরা এ ঈমান এনেছি', যা صبغة الله বা আল্লাহ্র রং এবং ঈমানের অর্থ হবে আল্লাহ্র রং।

صبغة শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা আলোচনায় যা বলেছি, তা তাফ্সীরকারদের একটি দলের অভিমত। এমতের সমর্থকদের আলোচনা ও বক্তব্য : কাতাদাহ (র.) صبغة الله ومن احسن من الله صبغة কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদীরা তাদের সন্তানদেরকে য়াহূদী এবং খৃস্টানরা তাদের সন্তানদেরকে খৃস্টান বানানোর উদ্দেশ্যে যার যার রীতি অনুসারে রাঙ্গিয়ে দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র রং ইসলাম এবং কোন রং-ই ইসলামের চাইতে সুন্দরতম এবং পবিত্রতম নয়। আর এ হচ্ছে আল্লাহ্র দীন, যা দিয়ে হযরত নূহ ও পরবর্তী নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য সূত্রে صبغة الله সম্পর্কে হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত, য়াহূদীরা তাদের সন্তানদেরকে রাঙ্গিয়ে দিত এবং এতে তারা 'ফিত্রাত্' বা স্বভাব ধর্মের বিরোধিতা করত।

তাফ্সীরকারগণ صبغة الله-এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ্র দীন। এ মতের সমর্থনে আলোচনা : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, صبغة الله আল্লাহ্র দীন। হযরত আবু কুরায়ব (র.) সূত্রে আবুল আলিয়াহ (র.) صبغة الله সম্পর্কে বলেছেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্র দীন এবং ومن احسن من الله صبغة-এর ব্যাখ্যা من احسن من الله دينا অর্থাৎ কার দীন আল্লাহ্র দীনের চাইতে উত্তম? মুছান্না (র.) সূত্রে রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকেও একই রূপে বর্ণনা এসেছে। মুছান্না (র.)-এর অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে একই ধারার রিওয়ায়াত পাওয়া গেছে। মুছান্না (র.)-এর আর একটি সূত্রে ইব্ন আবী নুজায়হ্ (র.) থেকে মুজাহিদ (র.)-এর রিওয়ায়াতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হযরত আতিয়্যাহ (র.) থেকে বর্ণিত, صبغة الله আল্লাহ্র দীন। হযরত সুদ্দী (র.) صبغة الله ومن احسن من الله صبغة কথার ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আল্লাহর দীন, আর আল্লাহ্র দীন অপেক্ষা উত্তম দীন কারই বা আছে? (অর্থাৎ কারোরই নাই)। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র.) সূত্রে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, صبغة الله আল্লাহ্র দীন। ইউনুস (র.) সূত্রে ইব্ন যায়দ (র.) صبغة الله কথাটি সম্পর্কে বলেন, এটা আল্লাহ্র দীন বা ধর্ম। ইবনুল বারকী (র.) সূত্রে 'আমর ইব্ন আবী সালমাহ্ (র.) বলেন, আমি ইব্ন যায়দ (র.)-কে আল্লাহ্র বাণী صبغة الله সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনুরূপ বর্ণনা দেন। অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, صبغة الله অর্থ فطرة الله অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র বিধান। এমতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বাণী صبغة الله-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুছান্না (র.) সূত্রে ومن احسن من الله صبغة-এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, صبغة শব্দের অর্থ 'ফিতরাত'। কাসিম (র.) সূত্রে অপর এক বর্ণনা মতে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, صبغة الله-এর অর্থ ইসলাম, মহান আল্লাহ্র বিধান, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর (র.) বলেছেন, صبغة الله আল্লাহ্র দীন, কোন্ ধর্ম আল্লাহ্র ধর্মের চাইতে উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ্র 'ফিত্রাত্' এবং যিনি একথা বলেন, তিনি صبغة শব্দ দ্বারা 'ফিত্রাত' অর্থ করেছেন। অতএব, এর অর্থ এই দাঁড়ায়, আমরা বরং আল্লাহ্র 'ফিত্রাত' ও তাঁর বিধানের অনুসরণ করব, যার উপর তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাই হলো دين القيم বা মযবুত ধর্ম এবং যা ব্যক্ত করা হয়েছে فاطر السماوات والارض— আসমান ও যমীনের স্রষ্টা অর্থে।

وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

এআয়াতাংশ য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বলার জন্য হযরত নবী করীম (স.)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র একটি আদেশ। যেহেতু তারা তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে বলেছিল, 'আপনারা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হন, সুপথ পাবেন, তাই একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, قل بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا صبغة الله ونحن له عابدون —বল, বরং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করব, যা মহান আল্লাহ্র বিধান এবং আমরা তাঁরই বান্দাহ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ী ও ভরসাকারীদের ধর্ম আমরা অনুসরণ ও আকীদায়, ধর্মীয় বিশ্বাসে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মতাদর্শে স্থিতিশীল থেকে মহান আল্লাহ্র আদেশ পালনে কোন প্রকার অহমিকা ও হঠকারিতা প্রদর্শন করব না এবং তাঁর রাসূলগণের রিসালাত স্বীকার করে নিতে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ বা অবাধ্যতা প্রদর্শন করব না, যেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হঠকারিতা প্রদর্শন করেছিল য়াহূদী ও খৃস্টানরা। তারা অহমিকা, অবাধ্যতা ও হিংসাবশত হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছিল।

(১৩৯) قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

(১৩৯) বল, 'আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের আর আমরা তাঁর প্রতি অকপট।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ পাক বলেন, 'হে মুহাম্মদ! এ সব য়াহূদী ও খৃস্টানের দল, যারা আপনাকে ও আপনার সাহাবাদেরকে বলেছিল—'তোমরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, সুপথ পাবে, এবং তারা এ ধারণা করেছিল যে, তাদের দীন ও কিতাব আপনাদের দীন ও কিতাবের চাইতে উত্তম, কেননা সেগুলো আপনার সময়ের আগেকার। এ কারণে তারা মনে করেছিল, তারা আল্লাহ্র কাছে আপনাদের চাইতে উত্তম। এদেরকে আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি আমাদেরও 'রব্', আর তোমাদেরও 'রব'। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ, তাঁরই কাছে ছাওয়াব ও শাস্তি এবং ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের বিনিময়। এতদ্সত্ত্বেও তোমাদের নবী ও কিতাব পূর্বে আসার কারণে তোমরা মনে কর, তোমরা অপেক্ষাকৃত উত্তম? আর তোমরা এ-ও জান যে, তোমাদের 'রব' আর আমাদের 'রব' একই 'রব্'। আমাদের ও তোমাদের দলের প্রত্যেকেরই যার যার ভাল-মন্দ আমলের বিনিময় ও

শাস্তি বংশ-মর্যাদা, আভিজাত্য এবং দীন ও কিতাবের সময়ের ব্যবধান বা পূর্ববর্তিতার উপর নির্ভরশীল নয়।

قل اتحاجوننا فى الله অর্থ ঃ বলুন, 'তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اتحاجوننا فى الله। অর্থ ঃ 'বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করতে চাও?' ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, اتحاجوننا فى الله। অর্থ ঃ তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করতে চাও? ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, اتحاجوننا। শব্দের ব্যাখ্যা হলো اتجادلوننا। অর্থাৎ তোমরা কি আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাও?

ونحن له مخلصون আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দিগীতে এমন নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধচিত্ত যে, আমরা তাতে কোন কিছুই শরীক করি না এবং তিনি ব্যতীত আর কারো উপাসনা করি না। যেমন দেব-দেবী ও বাছুরপূজারীরা আল্লাহ্র সাথে উপাসনায় শরীক করত। এ কথাগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে য়াহূদীদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ এবং তাদের বিতর্কের উত্তর হিসাবে নবী করীম (স.) ও ঈমানদার সাহাবীগণকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা এ সব য়াহূদী ও খৃস্টান, যারা তোমাদেরকে বলেছিল, য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, হিদায়াত পাবে, তাদেরকে বলে দাও যে, যে দীন গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর সেই দীন সম্পর্কে তোমরা আমাদের সাথে তর্ক করতে চাও? আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমাদের ও আমাদের উভয়ের প্রতিপালক হচ্ছেন এক আল্লাহ। তিনি ন্যায়বিচারক—কারোর উপর যুল্ম করেন না বা কারোর পক্ষপাতিত্ব করেন না। নিঃসন্দেহে তিনি বান্দাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, তোমরা মনে কর যে, তোমাদের দীন, কিতাব এবং নবী পূর্বে আসার কারণে তোমরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের চাইতে উত্তম। আর আমরা একাগ্রচিত্তে তাঁর ইবাদত করি। তাঁর সাথে কিছুকেই শরীক করি না। তোমরা তাঁর ইবাদতে শরীক কর। তোমাদের কেউ গো-বৎসের পূজা করেছে, আবার কেউ বা 'ঈসা-এর উপাসনা করেছে। কি করে তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম হতে পার?

(১৪০) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(১৪০) তোমরা কি বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁদের বংশধরগণ য়াহূদী অথবা খৃস্টান ছিল? (হে রাসূল) আপনি বলুন, 'তোমরাই কি অধিক

জান, না আল্লাহ? আর তদপেক্ষা অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত সাক্ষ্য গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন।'

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা :

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে পাঠ-পদ্ধতির দুটি ধারা রয়েছে। প্রথমত أم تقولون। শব্দ تاء অক্ষর যোগে পাঠ করা। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, হে মুহাম্মদ! যে সব য়াহূদী ও খৃস্টান আপনাকে বলেছিল, য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হন, সুপথ পাবেন, তাদেরকে বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে তর্ক করতে চাও? অথবা তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল প্রমুখ নবীগণ য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন? এ প্রেক্ষিতে এ কথাটি أتحاجوننا في الله। বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

দ্বিতীয় পাঠরীতি হলো أم يقولون — ياء অক্ষর যোগে পাঠ করা। এ প্রেক্ষিতে أم يقولون। শব্দকে একটি নতুন প্রশ্নের সূচনা ধরে নিতে হবে। যার সঙ্গে আগের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন কুরআন মজীদের সূরা সাজদায় বলা হয়েছে أم يقولون افتراه। এবং যেমন বলা হয় إنها لإبل أم شاء। আরো যেমন বলা হয় أتقوم أم يقوم أخوك। (তুমি দাঁড়াও? নাকি তোমার ভাই দাঁড়াবে?) এখানে أم يقوم أخوك। (না তোমার ভাই দাঁড়াবে?) একটি নতুন خبر —। কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে, ياء অক্ষরযোগে পাঠ করা অবস্থায় যদি أم। শব্দের পরবর্তী বাক্যটি পূর্ণ বাক্য ধরা হয়, তবে তা প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, কথাটির অর্থ—দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্টি গ্রহণীয়। যা হোক, এসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমাদের ধারণায় أم تقولون। শব্দটি পাঠের সঠিক পদ্ধতি হলো تاء অক্ষরের সঙ্গে পাঠ করে قل أتحاجوننا। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। যাতে অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্টি তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য? তোমরা কি আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে আমাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চাও? এ ধারণায় যে, তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতেও অধিকতর সৎপথপ্রাপ্ত। অথবা তোমরা কি মনে কর যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, য়া'কূব ও তাঁর বংশধররা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন? এতে তো তোমাদের বানোয়াট কথা ও মিথ্যাবাদিতা মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে। কেননা, য়াহূদীবাদ ও খৃস্টানবাদ, আল্লাহ্র এ নবীগণের পরবর্তী যুগের নতুন আবিষ্কৃত মতবাদ। আর শব্দটি ياء অক্ষরযোগে সাধারণত পাঠ করা হয় না। তাই ياء যোগে পাঠ করা অনুচিত।

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য য়াহূদী ও খৃস্টান, যাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাদের বিপক্ষে একটি স্পষ্ট প্রমাণ। যাতে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি এ সব য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বলে দিন, তোমরা কি

আল্লাহ্র দীন সম্পর্কে আমাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চাও? আর তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমাদের দীন আমাদের দীনের চাইতে উত্তম? আর তোমরা কি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছ আর আমরা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে আছি? একারণেই কি তোমাদের দীনে আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছ? তাহলে তোমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ উপস্থিত কর, যাতে করে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারি। অথবা, তোমরা কি বলতে চাও, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁর বংশধররা তোমাদের দীনের অনুসারী য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের এ দাবীর সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণাদি পেশ কর। তবেই আমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নেব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অনুসরণীয় ইমাম হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-কে আদেশ দিলেন, তাদেরকে বলুন, তোমরা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁর বংশধরেরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল— এ দাবী প্রত্যাহার কর। তাঁদের সম্পর্কে এবং তাঁরা কোন্ ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারী ছিল এ সম্পর্কে তোমরাই কি বেশী জান, না আল্লাহ্ পাক?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা :

হে মুহাম্মদ! যে সব য়াহূদী ও খৃস্টান আপনাকে ও আপনার সাহাবীদেরকে বলেছিল, 'তোমরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, হিদায়াত পাবে,' তারা যদি মনে করে থাকে যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁর বংশধররা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল, তাহলে তাদের চাইতে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আর তাদের চেয়ে বড় যালিম কে হবে? আর প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, আল্লাহ্র নিকট থেকে তাদের প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা গোপন করেছে এ বিষয়ে যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণ মুসলমান ছিল। এ প্রমাণ তারা গোপন করে তাঁদের প্রতি য়াহূদীবাদ ও খৃস্টানবাদ আরোপ করেছে।

এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এই মর্মে হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত, ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله আয়াতাংশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গে উল্লিখিত অন্যান্য নবী প্রসঙ্গে য়াহূদীদের কথা যে, তাঁরা য়াহূদী অথবা নাসারা ছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের কাছে উক্ত নবীগণের সম্পর্কে আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত যে প্রমাণ রয়েছে, তা তোমরা গোপন কর না। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله। আয়াতাংশে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নবীর ব্যাপারে য়াহূদীদের এ উক্তি যে, তাঁরা য়াহূদী অথবা খৃস্টান ছিলেন, এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমাণ তোমরা গোপন কর না। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। হযরত আল্-হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل থেকে ومن أظلم ممن كتم قل ءأنتم أعلم أم الله

شهادة عنده من الله পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ জাতির নিকট মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত এমন প্রমাণ রয়েছে যে, তাঁর নবীগণ য়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যেমন তাদের কাছে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের রক্ত, পরস্পর পরস্পরের জন্য হারাম। অতএব, তারা কিভাবে তা হালাল জ্ঞান করতে পারে? হযরত রবী' (র.) ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, য়াহূদী ও নাসারারা ইসলামকে গোপন করেছে, যদিও তারা জানত যে, ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দীন। এ কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে লিখিতভাবে পেয়েছিল যে, হযরত ইব্‌রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক (আলায়হিমুস্ সালাম) প্রমুখ নবীগণ কেউ য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন না। আর য়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ তো পরবর্তী সময়ের নতুন সৃষ্টি। য়াহূদী ও নাসারারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও অন্য নবীগণের প্রতি য়াহূদী অথবা নাসারা হবার যে অপবাদ দিয়েছে, তা বর্জন করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। এ কথাটি তারা সেই সব মুশরিকের নিকট প্রচার করেছিল, যারা তাদের দাবী ও আল্লাহ্ পাকের নবীগণের নামে মিথ্যা প্রচারে সাহায্যকারী ছিল। এ সব কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, য়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ নবীগণের পরবর্তী সময়ের সৃষ্টি। সুতরাং তারা যেন তাঁদেরকে য়াহূদীবাদ কিংবা খৃস্টবাদের কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকে। আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে, এসো সে দীনের দিকে, যে দীনের অনুসারী তাঁরা ছিলেন, আমরা তার অনুসারী হই, আর অবস্থা এই যে, নিশ্চয় আমরা ও তোমরা সকলেই একথা স্বীকার করি যে, তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা যে ধর্মে ছিলেন 'আমরা তার বিরোধিতা করব' এ হতে পারে না।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله আয়াতাংশে য়াহূদীদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর নুবুওয়াতকে গোপন করেছিল। যদিও তারা এ বিষয়ে জানত ও বুঝত এবং তাদের কিতাবে এ কথা লিখিতভাবে পেয়েছিল। এ মতের সমর্থকগণের আলোচনা : হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি

ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত লোকেরা ছিল আহ্‌লে কিতাব। তারা ইসলামকে গোপন করেছিল। যদিও তারা একথা উপলব্ধি করত যে, এটাই আল্লাহর দীন, এবং এ কথা জেনেবুঝেও তারা য়াহূদী ও খৃস্টান মতবাদ গ্রহণ করেছিল। আর তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে গোপন করেছিল। যদিও তারা জানত যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র রাসূল। এর বিষয়টি তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে লিখিত পেয়েছিল। কাতাদাহ (র.) ومن اظلم ممن كتم شهادة আয়াতাংশে উল্লিখিত شهادة শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে এ, দ্বারা হযরত নবী করীম (স.)-কে বুঝান হয়েছে, যার সাক্ষ্য তাদের কিতাবে তারা লিখিত পেয়েছিল। আর এই শাহাদতটিই গোপন করেছিল।

ইব্‌ন যায়দ (র.) তাঁর বর্ণনায় ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা শাহাদত (شهادة) গোপন করেছিল, তারা ছিল য়াহূদী। যারা তাদের কিতাবে লিখিত রাসূল (স.) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাঁর পরিচিতি ও বর্ণনা গোপন করত। কিন্তু বিষয়টির

যে ব্যাখ্যা আমরা আগে দিয়েছি, তা সঠিক বলে এ কারণে নির্ধারণ করেছি যে, ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله আয়াতাংশে যে সব নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদেরই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরে বর্ণিত হয়েছে, অপর কারোর নয়। সুতরাং সঠিক ব্যাখ্যা তাই, যা ব্যক্ত করা হয়েছে তাঁদেরই কাহিনী প্রসঙ্গে, অন্য কারোর নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক প্রমুখ নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে য়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট প্রমাণ কোন্‌টি? উত্তরে বলা হবে, তাদের নিকট প্রমাণ তাই, যা আল্লাহ্ তাদের নিকট অবতীর্ণ তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে তাঁদের ব্যাপারে নাযিল করেছেন। এ দুটো কিতাবে সে সব নবীর সুন্নাত ও ধর্ম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। এটাই তাদের নিকট আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ। আর এটাই তারা গোপন করেছিল, যখন তাদেরকে নবী করীম (স.) ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে সময় তারা বলেছিল, য়াহূদী কিংবা খৃস্টান ব্যতীত অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশলাভ করতে পারবে না। তারা নবী (স.)-কে ও তাঁর সাহাবাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা য়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, সঠিক পথ পাবে'। এ প্রেক্ষিতেই তাদের ব্যাপারে এ সব আয়াত নাযিল হয়েছে, যেগুলো তাদের মিথ্যাবাদিতা, সত্য গোপন করা এবং আল্লাহ্‌র নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ ও বানোয়াট কথা বলার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -এর ব্যাখ্যা :

এ বিবৃতিতে নবী (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ! আপনার সঙ্গে যে সব য়াহূদী ও খৃস্টান বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলে দিন, 'তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অজ্ঞাত নন। তাঁর কিতাবে ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, য়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে ইসলামের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেসব সত্য কথা মেনে নেওয়া তোমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আর তাঁরা মুসলমান ছিল এবং একনিষ্ঠ মিল্লাতে ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন, যে দীন গ্রহণ ও অনুসরণ সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে। তা য়াহূদী, খৃস্টান বা অপর কোন ধর্ম নয়। কিন্তু এসব সত্য তোমরা গোপন করেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ সব কর্মকলাপ ও আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তোমাদের কাজের প্রতিফল বা শাস্তি দেবেন। তোমরা যে শাস্তির যোগ্য, তেমন শাস্তি ইহলোকে তিনি অচিরেই তোমাদেরকে দেবেন এবং পরলোকে বিলম্বে দান করবেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, দুনিয়াতেই তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছে। এবং কিছু লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করা হয়েছে। এ ছাড়া আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছেই।

(১৪১) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৪১) সে উম্মত অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করেছ, তা তোমাদের। তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে [illegible] শব্দে হযরত ইব্রাহীম (আ.), ইস্‌মাঈল (আ.), ইস্‌হাক (আ.), য়া'কূব (আ.) ও তাঁর বংশধরকে বুঝিয়েছেন। যেমন হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে [illegible]-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, তাঁরা হযরত ইব্রাহীম (আ.), ইস্‌মা'ঈল (আ.), ইস্‌হাক (আ.), য়া'কূব (আ.) ও তাঁর বংশধরগণ। হযরত রবী' (র.)-এর হাদীছেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমরা আগের আলোচনায় বলেছি, [illegible] অর্থ সম্প্রদায়। তাতে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে মুহাম্মদ ! আপনি এ সব য়াহূদী ও নাসারা, যারা আপনার সঙ্গে আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে তর্ক করে, তাদেরকে বলে দিন যে, ইব্রাহীম ও তার সঙ্গে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাদের কাছে যে প্রমাণ রয়েছে, তা তারা গোপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। কিন্তু তারা (য়াহূদী ও নাসারারা) মনে করেছে, তারা ছিল য়াহূদী কিংবা খৃস্টান। এতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, য়া'কূব ও তার বংশধরগণ এমন এক সম্প্রদায় ছিল, যারা স্বকীয় মতাদর্শে ও ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং এখন নিজেদের আমল ও আশা-আকাংখা নিয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাদের দুনিয়ার জীবনের কৃত সৎকাজের বিনিময় তাদের জন্য এবং মন্দ কাজের বিনিময়ও তাদেরই জন্য। অতএব, হে য়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমরা একথাটি ভাল করে উপলব্ধি করে নাও। কেননা, তোমরা যদি তাদেরকে নিয়েই নিজেরা গৌরবান্বিত বোধ কর এবং নিজেদের মন্দ কাজ ও বিরাট পাপাচার সত্ত্বেও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকটে তাঁর আযাব থেকে মুক্তিলাভের কামনা অন্তরে পোষণ কর, তাহলে এতে তাদের কোন উপকার হবে না যদি না তাঁরা কোন সৎকাজ করে থাকে এবং তাদের কোন ক্ষতিও হবে না যদি না তারা কোন খারাপ কাজ করে থাকে। তদ্রূপ আল্লাহর নিকটে কোন সৎকাজ ব্যতীত তোমাদের কোন উপকার হবে না, আর মন্দ কাজ ব্যতিরেকে কোন ক্ষতিও হবে না। অতএব, নিজেদেরকে বাঁচাও, কুফ্‌র ও গোম্‌রাহী পরিত্যাগ করে তাওবাহ্‌ কর এবং মহান আল্লাহ্‌র দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। মহান আল্লাহ ও তাঁর নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা পরিহার কর। বাপ-দাদা ও পিতৃপুরুষের গুণ-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই কর না এবং তাদের উপর ভরসা ও নির্ভর করা বর্জন কর। কেননা, তোমাদের সৎকাজের বিনিময় ও প্রতিদান তোমাদেরই কল্যাণ বয়ে আনবে, আর তোমাদের অন্যায় ও অপকর্মের বিনিময়ও তোমাদেরই অকল্যাণ ঘটাবে। বস্তুত তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না সেই সব 'আমলের ব্যাপারে, যা ইব্রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইস্‌হাক, য়া'কূব ও তার বংশধরগণ করেছিল। কারণ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে যার যার কাজ সম্পর্কেই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, অপরের কাজ সম্পর্কে নয়।

ইফাবা, (উ) ১৯৯০-৯১/অঃ সঃ / ৪২৯৩-৫২৫০